রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর পাশ্চাত্য যখন অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে, ঐস্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে—এক কথায় সমগ্র এসিয়ায়, তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত ও উত্তর-গুপ্ত যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি।

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয় মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আর এক বৈপ্লবিক ঘটনা। ইসলামের উর্বর সামাজিক মৃত্তিকায় বিজ্ঞান নূতনরূপে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। একদিন এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোম বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে উচ্চ আদর্শ ও গৌরবের জন্য পৃথিবীর সুধিবৃন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র বাগদাদ, টলেডো ও করডোভা সেই আদর্শ ও গৌরবের যোগ্য উত্তরাধিকার লাভ করে। চারিশত বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার শেষ ফসল ঐস্লামিক মধ্যপ্রাচ্য নিজেদের গোলায় তুলিতে না পারিলেও সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকে নাই। দীর্ঘ সুপ্তির পর খ্রীষ্টান ইউরোপের নবজাগ্রত মনীষা তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিল।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতগণ কর্তৃক অ্যারিস্টটলের মর্মোদ্ধার এবং চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রেণেশাঁসের সর্বাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব কেবল বিজ্ঞানের কেন, সমগ্রভাবে চিন্তাধারা ও মননশীলতার ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রেণেশাঁসের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল সর্ব বিষয়ে চিন্তার স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সাজানো প্রকোষ্ঠে কালাতিপাতের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট পথ ও অনিশ্চিত ভাগ্যের অনুসন্ধান। এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনুভব করিয়াছিল দিকে দিকে জীবনের বিচিত্র আহ্বান, বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিল এক সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবী অপূর্ব সম্ভাবনীয়তায় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই অনুসন্ধানেরই সার্থক পরিণতি।

সুদীর্ঘকাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য বার টাকা

বিজ্ঞানের ইতিহাস

অধ্যাপক অজিত কুমার সাহা
প্রীতিভাজনেষু

সমরেন্দ্র নাথ সেন
২৯।৫।৭৭

বিজ্ঞানের ইতিহাস

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতীয় বিজ্ঞান—বেদোত্তর যুগ : আরব্য বিজ্ঞান : ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম : রেণেশাঁস—আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স
যাদবপুর : কলিকাতা—৩২

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই গ্রন্থে প্রকাশিত হাফ্‌টোন ও রেখাচিত্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকাশকের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। এই সব চিত্র হুবহু অথবা ভাব অবলম্বনে প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স নিম্নলিখিত প্রকাশকদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন :—

Plate I: *The Bākhshālī Manuscript,* edited by G. R. Kaye, The Archaeological Survey of India, Government of India.

Plate II: *The Bower Manuscript,* edited by A. F. Rudolf Hoernlé, The Archaeological Survey of India, Government of India.

Plate III: *Science Awakening,* by B. L. Van der Waerden, Erven P. Noordhoff Ltd., Groningen, Holland.

Plates IV, VII (top), XVII: *History of Medicine,* by Arturo Castiglioni, Alfred A. Knopf., Inc., New York.

Plates V, VI, XI: 'Some symbols used by the alchemists', by Denis I. Duveen; 'Teniers' alchemists', by John Read; 'Evolution of chemical laboratory', by J. R. Partington; 'Nicolaus Copernicus', by H. Dingle; *Endeavour,* July 1948, July 1945, October 1942, and October 1943; Imperial Chemical Industries Ltd., London.

Plate VII (bottom), Fig. 35: *From Magic to Science,* by Charles Singer, Ernest Benn Ltd., London.

Plates VIII, XIV, XVI, XVIII and Figs. 36, 42, 55, 60, 61: 'The biology of old age', by Florence Moog; 'Vesalius: discoverer of the human body' by Martin Gumpert; 'Galileo', by I. Bernard Cohen; 'William Harvey', by F. G. Kilgour; *Scientific American,* June 1948, May 1948, August 1949, October 1948, June 1952.

Plate IX (top): *The Growth of Physical Science,* by James Jeans, Cambridge University Press. Crown copyright, Windsor Castle Library.

Plates IX (bottom), X, XIII: *Studies in the History and Method of Science,* edited by Charles Singer, The Oxford University Press. Leonardo sketches from Quaderni; Galileo portrait—Copyright, the Bodleian Library, Oxford.

Plate XII, Figs. 47, 49, 50: *Pioneers of Science,* by Oliver Lodge, Macmillan, London.

Plate XV, Figs. 41, 51, 68: *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th. and 17th. Centuries,* by A. Wolf, George Allen & Unwin Ltd., London.

Fig. 32: *Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science,* by A. C. Crombie, The Oxford University Press.

Figs. 40, 69, 70, 71: *De re metallica,* by Georgius Agricola, translated by Herbert Hoover and Lou Henry Hoover, Dover Publications, Inc., New York ($10.00).

ঋণ-স্বীকার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪নং পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশনে অর্থসাহায্য করায় গ্রন্থের সুলভ মূল্য নির্ধারণ সম্ভবপর হইয়াছে। এই অর্থ-সাহায্যের জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর কর্তৃপক্ষ ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

[The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of India and the State Government under scheme No. 4 of the Five-Year Plan. For this subvention, the authorities of the Indian Association for the Cultivation of Science express their sincere gratitude to the Government of India and the State Government.]

লেখকের নিবেদন

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে সুরু করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর অনুরূপ সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া কিরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ইতিহাস রচনার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এতদিনে তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইল। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন দুনিয়ার বিজ্ঞান-সাধনা। রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যেরও পতন ঘটে। ইহার পর যে যুগ সুরু হয় ঐতিহাসিকগণ তাহাকে মোটামুটিভাবে মধ্যযুগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যদিও তাহার সূত্রপাত ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মতান্তরের অন্ত নাই। এই মধ্যযুগে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস বর্তমান খণ্ডের প্রধান আলোচনার বিষয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার দিক হইতে মধ্যযুগ বন্ধ্য, বহুকাল পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে এইপ্রকার এক ধারণা প্রবল ছিল। টলেমী ও কোপার্নিকাস অথবা গ্যালেন ও ভেসালিয়াসের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার বৎসরের ফাঁক কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার মত তেমন কোন প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয় নাই এবং উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদিত হয় নাই, ইহাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। এই সময় যাহা ছিল তাহা কাল ম্যাজিক ও ভুতুড়ে বিদ্যার বেশী কিছু নয়। এইরূপ ধারণা এখন ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, মধ্যযুগেও প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে প্রকৃত মনীষা ও প্রতিভার কোন অভাব ঘটে নাই, এবং সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সময়েই আধুনিক বিজ্ঞানের সকল প্রস্তুতি পুরাদমে চলিতেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি, কারিগরিবিদ্যার আদর, কারিগরের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কাগজ, মুদ্রণ, কম্পাস, বারুদ ইত্যাদি যুগান্তকারী কারিগরি আবিষ্কার, শিক্ষার বিস্তার ও উচ্চতর জ্ঞানের অনুশীলনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও স্থাপনা মধ্যযুগেই সংঘটিত হইয়াছিল। আরও লক্ষণীয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ইউরোপে আত্ম-প্রকাশ করিলেও ইহার প্রস্তুতিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উদ্যোগ সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক কিছুই বাকী থাকিয়া যায়। যে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত এবং যাহাকে হোয়াইটহেড 'প্রতিভাধরদিগের শতাব্দী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রথমার্ধের সামান্য অংশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিয়াছি। ইহার পর হইতে পরবর্তী সাড়ে তিন শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়াছে। এতদিন কেবল খাল বিল নদী নালায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিলাম; এইবার সমুদ্রের সাক্ষাৎ মিলিল। আশা করিতেছি, একদিন এই দুস্তর সমুদ্রে পারি দিবার মত সুযোগ ও অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইবে।

কলিকাতা
১০ই মাঘ, ১৩৬৪, ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৫৮

লেখক

সূচী

ভারতীয় বিজ্ঞান : বেদোত্তর যুগ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

আরব্য বিজ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম : পাণ্ডিতীয় যুগ (১০০০-১৪০০)

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

ইউরোপীয় রেনেশাঁস : আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব (১৪০০-১৬০০)

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

আর্ট প্লেট

ভারতীয় বিজ্ঞান : বেদোত্তর যুগ

প্রথম অধ্যায়

১·১। বৈদিক যুগের অবসান—ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার —জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায় নূতন পরিবেশ সৃষ্টি

প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আর্য ঋষিগণের স্বাধীন ও সবল চিন্তাধারার প্রথম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদির মধ্যে। প্রাচীনতম বেদ ঋক্-সংহিতার বহু স্তোত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে প্রকৃতি ও বস্তুজগতের রহস্য সম্বন্ধে এক সজাগ কৌতূহল এবং এই রহস্য ভেদ করিবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সৃষ্টিকর্তার মহিমাকীর্তন, মানুষের গভীর ধর্মানুভূতি বৈদিক স্তোত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ইহারই ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিগণের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মূল্য কম নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা। বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদির মধ্যে ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার কিছু আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে সমসময়ে অন্যান্য সভ্য জাতির তৎপরতা অপেক্ষা ভারতীয়দের এই তৎপরতা কোনও অংশে ন্যূন বোধ হয় না; বরং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বৈদিক হিন্দুদের এই জ্ঞান-চর্চার কাল প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের প্রথম পর্বে রচিত হইয়াছিল ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব প্রভৃতি বিভিন্ন সংহিতা, তারপর ঐতরেয়, কৌশিতকী, পঞ্চবিংশ, তৈত্তিরীয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সাহিত্য, তারপর উপনিষদ্ ও সূত্র সাহিত্য। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্য প্রধানতঃ মূল চারি সংহিতার ব্যাখ্যা, টীকা বা সম্প্রসারণ মাত্র। বেদের দর্শনভাগ সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন করিয়া উপনিষদের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় বৈদিক সাহিত্যের এই পরবর্তী পরিণতি বিজ্ঞান-চর্চার বিশেষ সহায়ক হয় নাই। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে প্রথম যুগের ঋষিগণের সেই স্বাধীন, নির্ভীক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আর দৃষ্ট হয় না। ধর্মানুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি বিষয়ের নিষ্ফল খুঁটিনাটিতেই এই সব আলোচনা নিবদ্ধ। বেদী-নির্মাণে গণিতের ও কাল-নির্ণয়ে জ্যোতিষের প্রয়োজন থাকায় এই দুই বিদ্যার উন্নতি বিশেষ ব্যাহত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার সেরূপ কোন উন্নতি দেখা যায় না। চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি সুস্পষ্ট। সূত্রযুগে চিকিৎসাবৃত্তি নীচবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত; সূত্রধর, কর্মকার ও অন্যান্য কারিগর-সম্প্রদায় পূর্ব মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট। সমাজে এইরূপ উচ্চ-নীচ ভেদের প্রাবল্য, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞাদি ও পশুবলির আধিক্য, বেদের অভ্রান্ততায় অন্ধ বিশ্বাস ও তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা নানাভাবে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল ছিল না। সমগ্র আর্যাবর্ত পরস্পর বিবদমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। একতাবদ্ধ হইয়া বিরাট রাজশক্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণত্বের কাছে ক্ষাত্রধর্মের নতি-স্বীকার ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

ধর্মীয় আন্দোলন

খৃীঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আমরা ধীরে ধীরে এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার অবসান দেখিতে পাই। এই সম্পর্কে ধর্ম-সংস্কারকদের আন্দোলন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

নিষ্প্রাণ ধর্মানুষ্ঠানের বাহুল্য, যাগযজ্ঞাদির নামে পশুবলির অহেতুক নিষ্ঠুরতা, সর্বোপরি ব্রাহ্মণত্বের উৎপীড়ন হইতে সমাজকে রক্ষা করা ধর্ম-সংস্কারকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহারা শুধু বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মানবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একাধিক ধর্মমত ও জীবনাদর্শ প্রচারেও তাহারা তৎপর হয়। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী এই ধর্মীয় আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। মহাবীর ও শাক্যসিংহের জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এই শতাব্দীতে প্রচারিত বা প্রবর্তিত বহু নূতন ধর্মের অন্যতম। কাল সহকারে এই দুই ধর্ম ও দর্শন অন্যান্য ধর্মমতকে নিষ্প্রভ করিলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনে ইহাদের গুরুত্ব বড় কম নহে। শ্রমণ ও পরিব্রাজকেরা আর্যাবর্তের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শন প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বুদ্ধের সময় এইরূপ প্রায় তেষট্টিটি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় তৎপর ছিল। জৈন সাহিত্যে ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী ব্রাহ্মণ-বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।*

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের ফল শুভ হইয়াছিল। বেদের অভ্রান্ততায় সন্দেহ এবং তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত হয় এবং নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ বর্ধিত হয়।

রাজনৈতিক প্রাধান্য

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের কিছু পূর্বে কাবুল উপত্যকা হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত আর্যাবর্তের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আমরা ষোলটি প্রধান রাজ্যের উল্লেখ পাই—অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), বৃজি (উত্তর বিহার), কাশী, কোসল (অযোধ্যা), মল্ল (গোরখপুর জেলা), ছেদি (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী ভূভাগ), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল), কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী ও মীরাট জেলা), পাঞ্চাল (বেরিলি, বুদায়ুন, ফারুকাবাদ জেলা), মৎস্য (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরীর তীরে অবস্থিত), অবন্তী (মালওয়া), গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলা), ও কম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর)। সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহাদের মধ্যে চারিটি রাজ্য—অবন্তী, বৎস, কোসল ও মগধ, প্রধান হইয়া উঠে। তন্মধ্যে পূর্ব ভারতে মগধের অভ্যুত্থানই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক যুগে মগধ ছিল ব্রাহ্মণ-অধ্যুসিত আর্যাবর্তের প্রান্তদেশে। এই অঞ্চলের যুদ্ধপ্রিয় মিশ্রজাতি বেদোক্ত অনার্য কীকটদের উপর উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে কখনই সক্ষম হয় নাই। মাগধীরাও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের উপর বিরূপ ছিল। শিশুনাগ বংশীয় নৃপতিদের অধীনে, বিশেষতঃ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে, মগধের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও শক্তিবৃদ্ধি এক দিক দিয়া উপরিউক্ত ধর্মীয় আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হয়। মহাবীর ও বুদ্ধের মগধে আগমন এবং তথা হইতে তাঁহাদের ধর্ম-প্রচার-প্রচেষ্টা নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নহে।

মগধের অভ্যুত্থানের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ভারত সাম্রাজ্য গঠনের ইহাই প্রথম সূচনা। দুই শত বৎসর পরে মৌর্য সম্রাটদের তৎপরতায় মগধের রাজশক্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল। ইহাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি সম্ভবপর হয়। রাজনৈতিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অনুসরণ করিয়া এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চারও যে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের মত গ্রন্থের প্রণয়ন। এই সময়ে গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও

---

* Jarl Charpentier, 'The History of the Jains', *The Cambridge History of India*, Vol. I, 1922 ; p. 150.

নানা ব্যবহারিক ও ফলিত বিজ্ঞানের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির দিক হইতেও এই যুগ স্মরণীয় হইয়া আছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনী ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি সংস্কৃত ভাষার উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই দুই বৈয়াকরণের সৃষ্ট ব্যাকরণ ও ভাষা-বিজ্ঞানের তুলনা নাই। এই ভাষা-বিজ্ঞানের উল্লেখ প্রসঙ্গে ভিন্‌টার্‌নিৎস্‌ লিখিয়াছেন :

> "In the earliest ages the Indians already analysed their ancient sacred writings with a view to philology, classified the linguistic phenomena as a scientific system, and developed their grammar so highly that even today modern philology can use their attainments as a foundation ; . . . . . "*

'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' মহাকাব্যদ্বয়ও সম্ভবতঃ এই সময় হইতে তাহাদের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এ সম্বন্ধে ভিন্‌টার্‌নিৎসের সুচিন্তিত অভিমত হইল :

> "Between the 4th century B.C. and the 4th century A.D. the transformation of the *epic* Mahābhārata into our present compilation took place, probably gradually."
>
> "It is probable that the original Rāmāyaṇa was composed in the 3rd century B.C. by Vālmiki on the basis of ancient ballads."*

মগধের অভ্যুত্থানের পর, বিশেষতঃ মৌর্য আমল হইতে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার যে ঊর্ধ্ব গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা পরবর্তীকালে কুষাণ ও গুপ্তসম্রাটদের প্রাধান্যের কালে অব্যাহত ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক হইতে কুষাণ ও গুপ্তসম্রাটদের আমল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মৌর্য ও গুপ্তযুগের মাঝামাঝি সময়ে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের আবির্ভাবও বিশেষ লক্ষণীয়। গণিতে ও জ্যোতিষে আর্যভট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত এবং চিকিৎসাবিদ্যায় ও কিমিয়াশাস্ত্রে নাগার্জুন, চরক, দৃঢ়বল ও বাগ্‌ভট ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর ভারতবর্ষ এই সময়ে যে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোভাগেই ছিল তাহা নহে, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল সমগ্র এসিয়ার শিক্ষকতার ভার। আলেকজান্দারের পর মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে হেলেনীয় সভ্যতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল মধ্য এসিয়ায়, দূরপ্রাচ্যে ও সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখি।

১·২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বৈদেশিক প্রভাব—ভারত ও বহির্জগতের মধ্যে চিন্তাধারার আদান-প্রদান

ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা ছাড়া খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অগ্রগতিকে তাহাও কম প্রভাবিত করে নাই। এই প্রভাব উভয় দিকেই সক্রিয় হইয়াছিল। ভারতীয় গবেষণায় যেমন বৈদেশিক চিন্তাধারার ছাপ পড়িয়াছিল, সেইরূপ গ্রীক, চৈনিক ও আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও ভারতীয় গবেষণা ও চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। চিন্তাধারার এই প্রকার আদান-প্রদান জ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। এদেশে পারসীক,

---

* M. Winternitz, *A History of Indian Literature,* Vol. I, pp. 8, 475, 517.

গ্রীক, ইন্দো-গ্রীক, পার্থিয়ান ও কুষাণদের আক্রমণাত্মক সামরিক অভিযানের ফলে বিদেশীদের সহিত এই সম্পর্ক ও ভাবের আদান-প্রদান যে ত্বরান্বিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত ও পারস্য—অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্যের মারফত গ্রীক-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

ভারত ও পারস্যের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই দুই দেশের আর্য অধিবাসীরা একই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি হইতে উদ্ভূত। প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই জাতির দুইটি শাখা ভারতবর্ষে ও পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ভাগ্য অনুসরণ করিলেও তাহাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বেদ ও অভেস্তর দেব-দেবীর এবং ধর্মগত ও দার্শনিক চিন্তাধারার নানা মিল এই সম্পর্কের নির্দেশ করিয়া থাকে। বেদের 'বরুণদেব' অভেস্তর 'অহুর মাজ্দা' (জলদেবতা), বেদের 'মিত্র' ও ইরাণীয়দের 'মিথ্র' (আলোকদেবতা), ঋগ্বেদের 'ইন্দ্র বৃত্রহন' অভেস্তর 'বীরথ্রঘ্ন', হিন্দুদের 'যম' ও ইরাণীয়দের 'যিম', এবং ভারতীয়দের পবিত্র পানীয় 'সোম' ও ইরাণীয়দের 'হোম' এই দুই জাতির ধর্মগত সাদৃশ্যের পরিচায়ক।* এই দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কও প্রাগৈতিহাসিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার আমলে ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি; পারস্যোপসাগরের পথে দুই দেশের বাণিজ্য-তরীর যাতায়াত ছিল। ইন্দো-ব্যাবিলনীয় বাণিজ্যে পারস্যও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

খৃীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত ও পারস্যের সম্পর্কে এক নূতন অধ্যায় সুরু হয়। অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাসের (রাজত্ব-কাল : খৃীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০) সৈন্যবাহিনী পূর্ব পারস্যে অভিযান চালাইয়া একেবারে ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার দেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। দরায়ুসের রাজত্বকালে (৫২২-৪৮৬) অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের উপত্যকা ও রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই সব নূতন অধিকৃত অঞ্চল ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ও সম্ভবতঃ সমৃদ্ধতম করদ রাজ্য। এই রাজ্যের বার্ষিক করের পরিমাণ ছিল ৩৬০ ট্যালেন্ট পরিমিত স্বর্ণ, অর্থাৎ আধুনিক হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ফলে আয়োনীয় গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়। অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্য এই দুই সভ্যতার মধ্যে অনেকটা সেতু স্বরূপ কাজ করে। পারস্যের বিভিন্ন নগরে ও বন্দরে এই সময় আয়োনীয় ও ভারতীয় বণিকদের পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে আসিবার প্রচুর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। দরায়ুসের বাহিনীতে বেতনভোগী আয়োনীয় গ্রীক ও ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। দরায়ুসের অধীনে স্কাইলাক্স্ নামে এক গ্রীক নৌ-সেনাপতি সিন্ধুনদের গতি-পথ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক নৌ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহার এই অভিযানের বর্ণনা গ্রীকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। পারস্যের রাজসভায় টিসিয়াস্ (ইনি খৃীঃ পূঃ ৪১৫ হইতে ৩৯৭ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৮ বৎসর পারস্যে ছিলেন) নামে এক গ্রীক চিকিৎসকও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। ভারতীয় পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীদের মুখে নানা বৃত্তান্ত ও গল্প শুনিয়া *Indica* নামে তিনি এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই জনপ্রিয় গ্রন্থটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

---

* A. V. Williams Jackson, 'The Persian Dominions in Northern India down to the time of Alexander's invasion', *Cambridge History of India*, Vol. I, pp. 319-20.

"The influence of Ctesias upon the Greek conception of India was probably great. It confirmed for ever in the West the idea that India was a land where nothing was impossible—a land of nightmare monsters and strange poisons, of gold and gems."*

টিসিয়াসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষকে সম্যকভাবে বুঝিবার ও জানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছা করিয়া এই দেশের এক বিকৃত ও কল্পিত রূপ চিত্রিত করিয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া অনেক মিথ্যা কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

সমসাময়িক রচনা ও প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক হিরোডোটাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের বিরাট বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যার কথা অবগত ছিলেন। এই সূর্যোদয়ের দেশে যে বিভিন্ন ভাষাভাষী বহু জাতির বাস ছিল, ইহারা যে নানা বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকে, তিনি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। পারসীক বাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথারোহী সৈন্যদের বেশভূষার বৈচিত্র্যের কথা তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। ভারতীয় স্বর্ণ, তুলা ও বিচিত্র পশু-পক্ষীর কথাও তিনি অল্প-বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন।

অ্যাকিমিনীয় সাম্রাজ্যের মারফত ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা আয়োনীয় গ্রীকরা কতদূর অবগত হইয়াছিল সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা সম্ভবপর না হইলেও এই দুই সভ্যতার বিজ্ঞান ও দর্শনের কতকগুলি ব্যাপারে নানা মিল লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে, এই সময় ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত গ্রীকদের কিছু কিছু পরিচয় ঘটিয়াছিল। হিপোক্রেটিসের বায়ু সম্বন্ধীয় একটি পুস্তিকায় (*Treatise on Winds*) ও প্লেটোর *Timaeus*-এ যেসব ধারণা ও মতবাদ আলোচিত দেখা যায় তাহার উৎস ভারতবর্ষ। হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরতা আমরা গ্রীক দর্শনে আলোচিত দেখি। পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের আদর্শ ভারতীয় সন্ন্যাস-ধর্ম হইতে অভিন্ন। সংখ্যা-গণিতে পিথাগোরীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও হিন্দু গাণিতিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ বর্তমান।

আলেকজান্দারের অভিযানের ফল—ইন্দো-গ্রীক ও পর্থিয়ানদের প্রভাব

আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের পর হইতে এদেশে যে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে গ্রীক-ভারত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। স্বয়ং আলেকজান্দারের সামরিক অভিযানের প্রত্যক্ষ গুরুত্ব অবশ্য খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। ভারতে বিজয়ীরূপে ইউরোপীয়দের প্রথম পদার্পণ হিসাবে এই ঘটনা স্বভাবতঃই ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকের চোখে বিশেষ মূল্যবান ঠেকিয়াছে এবং ইহার ইতিহাস তাহারা সালঙ্কারে বর্ণনা করিতেও ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ সুলতান মামুদ, তৈমুর লঙ্গ বা নাদির শাহের আক্রমণ অপেক্ষা আলেকজান্দারের আক্রমণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান ঘটনা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আলেকজান্দার এই অভিযানে মাত্র দুই বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬-২৪) অতিবাহিত করেন এবং পদে পদে তাঁহাকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের প্রবল প্রতিরক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার ভারত ত্যাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাসিডোনীয় গ্রীকরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং ভারতীয়রা এই অভিযানের কথা ভুলিয়া যায়। ভারতবর্ষে আলেকজান্দারের বীরত্বের কাহিনী গ্রীক ঐতিহাসিকগণই ফলাও করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; এদেশের সমসাময়িক বা প্রাচীন কোন গ্রন্থে তাঁহার শৌর্য-বীর্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পর্যন্ত শুনা যায় না।

---

* E. R. Bevan, 'India in Early Greek and Latin Literature', *Cambridge History of India*, Vol. I, p. 397.

ম্যাসিডোনীয় অভিযানের ফল ফলিয়াছিল পরোক্ষভাবে। পারসীকদের আক্রমণের পর হইতেই এক সর্ব-ভারতীয় প্রবল কেন্দ্রীয় রাজশক্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। আলেকজান্দারের আক্রমণে সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধ তীব্রতর হয়; সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তনও ইহাতে ত্বরান্বিত হইয়াছিল। ম্যাসিডোনীয় সৈন্যবাহিনীর ভারত-প্রবেশ ও পরিত্যাগের চেষ্টায় ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের অন্ততঃ চারিটি নূতন পথ উন্মুক্ত হয়—তিনটি স্থলপথ ও একটি জলপথ। এই সম্পর্কে আলেকজান্দারের নৌ-অধ্যক্ষ নিয়ার্কাসের সিন্ধুনদ ও পারস্যোপসাগরের পথে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখযোগ্য। এই অপরিচিত ও বিপদ-সঙ্কুল পথে গ্রীক নৌবহরের ইহাই প্রথম অভিযান। নিয়ার্কাস তাঁহার অভিযানের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা গ্রন্থাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই সব নূতন পথে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার-লাভ ঘটিয়াছিল।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত, ভারতবর্ষকে পাকাপাকিভাবে গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এদেশে হেলেনীয় সভ্যতার বিস্তার ছিল আলেকজান্দারের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও তাঁহার সেনাপতিগণ সিরিয়া, পার্থিয়া ও বক্ত্রিয়ায় যে গ্রীক সাম্রাজ্য ও হেলেনীয় সভ্যতার পত্তন করেন, ভারতের উপর তাহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। এই প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে বক্ত্রিয়ার অংশই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অক্সাস নদী হইতে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে (আধুনিক উত্তর আফগানিস্তান) প্রাচীনকালে বক্ত্রিয়া বা বক্ত্রিয়ানা বলা হইত। ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে বক্ত্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম ছিল পার্থিয়া। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বক্ত্রিয়া ও পার্থিয়ার ঔপনিবেশিক গ্রীকরা নিজেদের অঞ্চলকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করিয়া সেলুকিড সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং অল্পকালের মধ্যে দুইটি প্রবল রাজ্য গড়িয়া তোলে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে বক্ত্রিয়া ও পরে পার্থিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করে। ডিমিট্রিয়স্ ও মিনান্ডার আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধুনদের বদ্বীপ, সৌরাষ্ট্র ও মথুরা পর্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তৃত করিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৪০ হইতে ১৩০ অব্দের মধ্যে বক্ত্রিয়ার গ্রীকরা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই সময় হইতেই ভারতের সীমান্তে পার্থিয়ানদের আমরা সক্রিয় দেখিতে পাই। কাবুল উপত্যকায়, তক্ষশিলায় ও পাঞ্জাবের কিয়দংশে ইন্দো-পার্থিয়ান রাজারা প্রায় খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

বক্ত্রিয়ার গ্রীক ও ইন্দো-পার্থিয়ান শাসকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। মিনান্ডার বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নিজেও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বহু গ্রীক হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ হিন্দুদের মত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত।

সিরিয়ার গ্রীক সেলুকিড বংশের রাজত্বকাল হইতে হেলেনীয় ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের আমল হইতে ভারতবর্ষ ও মধ্য প্রাচ্যের গ্রীক রাজ্যগুলির মধ্যে নিয়মিতভাবে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময় সেলুকিড দূত মেগাস্থেনিসের কথাই আমরা সাধারণতঃ জানি। আনুমানিক খ্রীঃ ২৫০ পূর্বাব্দে মিশরের টলেমী ফিলাডেল্‌ফাস্ ডায়োনিসিয়াস্ নামে এক ব্যক্তিকে সম্ভবতঃ বিন্দুসার অথবা অশোকের সময় মগধে রাজদূত হিসাবে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষ ও গ্রীক জগতের মধ্যে এই প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক ও দূত-বিনিময় ব্যবস্থা মধ্য-প্রাচ্যে ও ইউরোপে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রসারের যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ট্রাবো লিখিয়াছেন, এই সময় ভারতীয় পণ্য ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলিতে আনীত হইয়া ইউরোপে রপ্তানী করা হইত। মধ্য এসিয়ার কিছুটা স্থলপথে কিছুটা অক্সাস নদীপথে এই বাণিজ্যের গতিবিধি ছিল। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ইহা ছিল মধ্য এসিয়ার

একটা প্রধান বাণিজ্য-সরক।* হেলেনীয় জগৎ ছাড়া রোম, সিংহল, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। নাগার্জুনিকোন্ডা লিপি ও 'মিলিন্দা পান্‌হো' নামে মিনান্ডার সম্বন্ধে রচিত এক বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ এই সময় মাঝে মাঝে যবনদের দেশে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিদ্যার কথা প্রচার করিতেন। এমন কি এথেন্সেও এই সময় ভারতীয় দার্শনিকদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভারতীয়রাও গ্রীকদের শিল্পকলা ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া গ্রীকদের এই সব বিদ্যার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়াছিল। গ্রীক শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলার উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল গান্ধার শিল্পকলা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দু জ্যোতিষের উপর গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাব সুস্পষ্ট। তারপর গ্রীকদের উন্নততর মুদ্রা-প্রণয়ন-পদ্ধতিও ভারতীয় মুদ্রা-শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভবতঃ কিছু কিছু যান্ত্রিক জ্ঞানও এই সময় ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া থাকিবে। এই সম্পর্কে এদেশে জলচাকার (water-mill) প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেট্রোডোরাস্‌ নামে জনৈক গ্রীক এই যন্ত্রটি এদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন।†

কুষাণদের সময় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক ও পার্থিয়ানরা যখন ভারতের দিকে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত, মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন যাযাবর ও অর্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে তখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ভারতবর্ষে অনুভূত হয়। নান শান পর্বতের সানুদেশে পশ্চিম কান্‌সু অঞ্চলে ইউ-চি নামে এক প্রাচীন জাতির বাস ছিল; ইহাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৭৫ অব্দের কিছু পরে হূনদের আক্রমণে ইউ-চি জাতি তাহাদের আদি বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন বাসভূমির অন্বেষণে অক্সাস উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন অক্সাস উপত্যকায় শক জাতির আধিপত্য। ইউ-চিদের আক্রমণ রোধে অসমর্থ হইয়া শকরা অক্সাস-উপত্যকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু-উপত্যকার দক্ষিণভাগে বসতি স্থাপন করে। এদিকে ইউ-চিরা অক্সাস-উপত্যকায় অল্পকালের মধ্যে এক অতি শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তোলে। ইউ-চিদের এক প্রবল শাখা কুষাণরা খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্বল গ্রীক, পার্থিয়ান ও শক অধিপতিদের একে একে পরাভূত করিয়া অক্সাস হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিরাট ও শক্তিশালী কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ইউ-চিরা উন্নত বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে। চীনের প্রতিবেশী হিসাবে তাহারা প্রথম চৈনিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়; অক্সাস-উপত্যকায় বসতি স্থাপনের পর আমরা তাহাদের ইরাণীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে দেখি। ভারতবর্ষে আগমনের পর তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রস্রবণে পরিপূর্ণভাবে অবগাহন করে। কুষাণদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনার জন্য পাটলিপুত্রে

* George Macdonald, 'The Hellenic Kingdoms of Syria, Bactria and Parthia', *Cambridge History of India,* Vol. I, pp. 433-34.

† Joseph Needham, *Science and Civilisation in China,* Vol. I, Cambridge University Press, 1954, p. 177.

বৌদ্ধদের যেরূপ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন কনিষ্কও সেইরূপ বসুমিত্রের পৌরহিত্যে কাশ্মীরের কুন্দলবন নামক স্থানে বৌদ্ধদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বৌদ্ধ প্রধানগণ বৌদ্ধ-ধর্মের এক প্রামাণিক টীকা প্রণয়ন করেন।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কুষাণদের আর এক প্রধান তৎপরতা। গ্রীক ও পার্থিয়ানদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন বক্ষুয়ানায় ও সোগ্দিয়ানায় প্রসারলাভ করিয়াছিল, কুষাণদের সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সেইরূপ মধ্য-এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা অর্ধসভ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে দলে দলে বহু ভারতীয় ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারকদের মধ্য-এসিয়ার খোটান, খাস্গার, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থানে আগমন ও সেই সব স্থানে তাহাদের ধর্মীয় তৎপরতার বহু বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই প্রচার কার্যে ভারতীয়রা নিঃসঙ্গ ছিল না। মধ্য-এসিয়ার ইউ-চি ও কুচি রাজ্যের একাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতীয় প্রচারকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ধর্মরক্ষ ও কুমারজীবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউ-চি ধর্মরক্ষ (৩য় শতাব্দীর শেষ ও ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) চীন সীমান্তে অবস্থিত টুনহুয়াং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সংস্কৃত ও চৈনিক ভাষা সমেত ছত্রিশটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু স্বদেশেই নহে, চীনদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে চৈনিক ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ তিনি তর্জমা করেন।

মধ্য-এসিয়ার আর একজন বৌদ্ধ নেতা কুমারজীবের (৪র্থ শতাব্দীর শেষ ও ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) পিতা ছিলেন ভারতীয় ও মাতা কুচি-রাজবংশীয়া। তিনি কাশ্মীরে বন্ধুদত্তর নিকট বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন শিক্ষা করেন। মধ্য-এসিয়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি এরূপ ব্যাপক ছিল যে, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে, এমন কি সুদূর ভারতবর্ষ ও চীন হইতে পর্যন্ত পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন। কুচি ও চীনের রাজনৈতিক বিরোধের সময় কুমারজীব চীনাদের হাতে বন্দী হইয়া ৪০১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে প্রেরিত হন এবং সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের সুযোগ পান। তিনি ১২ বৎসর চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে চৈনিক ভাষায় তর্জমা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং চীন-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রীর এক প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করেন। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী কুমারজীব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> "Kumarjiva symbolises the spirit of cultural collaboration between Central Asia and India and the joint effort made by the Buddhist scholars of these countries for the dissemination of Indian culture in China."*

এইভাবে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত মধ্য-এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বহু যাযাবর জাতি ও উপজাতির মধ্যে এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনপদের অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপে ও বিহারে ভারতীয় ও মধ্য-এসীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এইসব অঞ্চলে বৃহৎ সংখ্যায় ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনেরও বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আজ অবশ্য এই অতীত তৎপরতার অতি অল্প নিদর্শনই বর্তমান আছে। পরবর্তীকালের ঘটনা-স্রোতের আবর্তে, বিশেষতঃ মধ্য-এসিয়ার অগ্রসরমান মরুভূমির কবলে পতিত হওয়ায় এই সব একদা বর্ধিষ্ণু জনপদের অধিকাংশই এখন নিশ্চিহ্ন। তবে মরুভূমি

* P. C. Bagchi, *India and China*, China Press Limited, 1944, pp. 36-38.

গ্রাস করিয়াও আবার প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু কিছু সাক্ষ্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। স্যার অরেল ষ্টাইন লোলান, পূর্ব-তুর্কীস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্বীয় খনন-কার্য পরিচালনা করিয়া বালুরাশির মধ্যে প্রোথিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসব ধ্বংসস্তূপ হইতে তিনি বুদ্ধের ও হিন্দু দেব-দেবীর কতকগুলি প্রতিমূর্তি এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর খরোষ্ঠী ভাষায় রচিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট এ. বাওয়ের চৈনিক তুর্কীস্তানের একটি বৌদ্ধ স্তূপ হইতে সাতখানি প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'নাবনীতক' নামক ভারতীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে। উপরিউক্ত প্রত্নতত্ত্বীয় খনন-কার্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্যার অরেল ষ্টাইন মন্তব্য করিয়াছেন, এই সব ধ্বংস-স্তূপ দেখিয়া মনে হয় যেন আমরা পাঞ্জাবের কোন অবলুপ্ত প্রাচীন সহরের সন্ধান পাইয়াছি। মধ্য-এসিয়ার অধিবাসীদের উপর এরূপ গভীরভাবেই একদিন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ পড়িয়াছিল। এমন কি সপ্তম শতাব্দীতে এই পথে চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় হুয়েন সাং এই অঞ্চলে তখনও ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেন। অনেকের ধারণা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গোল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গীস্-খানও সম্ভবতঃ এক ধরনের বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।*

ভারত ও চীন

আমরা টুনহুয়াং অধিবাসী ইউ-চি ধর্মরক্ষর ও কুচিবংশীয় কুমারজীবের চীনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধদের মাধ্যমেই চীনদেশ প্রথম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা অবগত হয়। তারপর অবশ্য ভারতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ দলে দলে কাশ্মীর, মধ্যভারত ও নালন্দা হইতে মহাচীনে গিয়াছেন এবং চৈনিক পরিব্রাজকগণও দুর্গম গিরি কান্তার মরু ও দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া বুদ্ধের দেশে আগমন করিয়াছেন। এই দুই মহাদেশের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাব বিনিময়ের আলোচনার পূর্বে এই সময় স্থলপথে ও জলপথে চীন, ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহার সহিত কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সব পথে চৈনিক রেশম চালান দেওয়া হইত তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। রেশম-চালানোর পথে শুধু রেশম ও অন্যান্য বাণিজ্য-সম্ভারই যে শুধু যাতায়াত করিয়াছে তাহা নহে, এই পথে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আদান-প্রদানও ঘটিয়াছিল বিস্তর।

বক্ত্রিয়ানা, পারস্য ও সোগ্‌দিয়ানার পথে ভারতবর্ষের সহিত মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুপ্রাচীনত্বের কথা একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। আরও পূর্বে মধ্য-এসিয়ার পথে সুদূর চীন পর্যন্ত এই যোগাযোগের বিস্তৃতি সম্ভবপর হয় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি ও কুষাণদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সময়। এই সম্পর্কে চ্যাংকি'য়েন নামে এক চৈনিক রাষ্ট্রদূতের মধ্য-এসিয়ায় এক রাজনৈতিক দৌত্য ও ভৌগোলিক অভিযান পরিচালনার বৃত্তান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউ-চি রাজ্যের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীঃ ১৩৮ পূর্বাব্দে এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নানা কারণে অভিযানের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও চ্যাংকি'য়েনের অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নাই। খ্রীঃ ১২৬ পূর্বাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাটের নিকট তাঁহার দৌত্যের বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি পার্থিয়া, বক্ত্রিয়া, ফার্‌ঘানা, সোগ্‌দিয়ানা, সেলুকিড মিডিয়া ও সিরিয়া এবং সম্ভবতঃ মিশর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জ্ঞাপন করেন। বক্ত্রিয়ায় অবস্থান-

---

* Majumdar, Raychaudhuri and Datta, *An Advanced History of India,* p. 213.

১। এশিয়ার মধ্য দিয়া রেশম ও বাণিজ্য চলাচলের প্রধান প্রধান পথ।

কালে সেখানকার স্থানীয় বাজারে তিনি চীনের সেচুয়ান প্রদেশে উৎপন্ন বাঁশের লাঠি ও সুতীবস্ত্র বিক্রয় হইতে দেখেন। অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এইসব দ্রব্য চীন হইতে ভারতবর্ষের পথে বক্ষুয়ায় চালান দেওয়া হইত এবং পূর্ব-ভারত (আসাম) ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিদ্যমান। চ্যাংকি'য়েন লিখিয়াছেন :—

> "When I was in Ta-Hsia (Bactria), I saw there a stick of bamboo from Chiung (Chiungchow in Szechuan), and some cloth from Shu (Szechuan). When I asked the inhabitants of Ta-Hsia how they had obtained possession of these, they replied, 'The people of our country buy them in Shen-Tu' (India)."*

চ্যাংকি'য়েনের বিবরণ-পাঠে সম্রাট মধ্য-এসিয়ার রাজ্যগুলির সহিত চীনদেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হন। ইহার পর হইতে এইসব দেশে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রদূত প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তারপর এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যে চৈনিকেরা পশ্চিম সীমান্ত হইতে হূনদের হটাইয়া দিলে চীন ও মধ্য-এসিয়ার মধ্যে সহজ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থলপথে চীনের রেশম-রপ্তানী বাণিজ্যের সূত্রপাতও এই সময় হইতে (খৃীঃ পূঃ ১০৬)। চ্যাংকি'য়েনের অভিযানের এই সুদূর-প্রসারী ফল লক্ষ্য করিয়াই জোসেফ নীডহ্যাম তাঁহাকে 'চৈনিক লিভিংস্টোন' আখ্যা দিয়াছেন।

এই ভাবে মধ্য-এসিয়ার পথে চীনের সহিত ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের যেসব বাণিজ্যিক সরক উন্মুক্ত হয়, তাহা মানচিত্রে দেখানো হইল। হাডসনের মানচিত্র অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে।† চীন হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই পড়িবে চীনের সীমান্তবর্তী বিখ্যাত জনপদ টুনহুয়াং। ইউ-চি ধর্মরক্ষর জন্মস্থান হিসাবে টুনহুয়াং পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চৈনিক ও বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবে টুনহুয়াং ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে তিনটি পথ গিয়াছে খাস্‌গার অভিমুখে : (১) উত্তরদিকে তুর্ফান, কারাশার ও কুচি হইয়া খাস্‌গার পর্যন্ত; (২) সরাসরি পশ্চিমে লৌ-লান ও কারাশার হইয়া খাস্‌গার; এবং (৩) দক্ষিণে চার্কলিক, নিয়া ও খোটান হইয়া খাস্‌গার পর্যন্ত। পশ্চিমে বক্ষুয়ানা ও সোগ্‌দিয়ানা এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে অনেকগুলি পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে খাস্‌গারে ও খোটানে। তন্মধ্যে একটি গিয়াছে তাস্‌কেন্ট, সমরকন্দ, বোখারা হইয়া মার্ভ পর্যন্ত এবং আর একটি গিয়াছে সিধা বক্ষুয়ার দিকে ও তথা হইতে আবার মার্ভ পর্যন্ত। তক্ষশিলার সহিত খোটান ও খাস্‌গারের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে এইরূপ দুইটি প্রধান পথ মানচিত্রে দৃষ্ট হইবে। মার্ভ ও একবাতানার (হামাদান) পথে স্টেসিফন, এডেসা, এণ্টিওক প্রভৃতি সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিবার বহু পথ ছিল।

এ ছাড়া আসাম, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের মধ্য দিয়া কয়েকটি পথ চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। চ্যাংকি'য়েন বক্ষুয়ানায় চীনের প্রস্তুত যেসব কাপড় ও বাঁশের লাঠি দেখিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে আসাম-ব্রহ্মদেশের পথে প্রথমে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আসে এবং পরে সেই স্থান হইতে তক্ষশিলার পথে বক্ষুয়ায় চালান যায়। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র হইতে চম্পা (ভাগলপুর), কজঙ্গল (রাজমহল), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বাংলা) হইয়া কামরূপ পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত ছিল। কামরূপ হইতে একটি পথ উত্তর-পূর্বে

---

* Joseph Needham, *Science and Civilisation in China,* Vol. 1, Cambridge, 1954, p. 174.

† G. F. Hudson, *Europe and China; A Survey of their Relations from the Earliest Times to 1800,* Arnold, London, 1931.

অগ্রসর হইয়া পাতকৈ পর্বতের মধ্য দিয়া চীন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; আর একটি পথ গিয়াছিল মণিপুর ও ভামো (ব্রহ্মদেশ) হইয়া চীনদেশের সীমান্ত পর্যন্ত।

তিব্বতের মধ্য দিয়াও এইরূপ এক বা একাধিক পথ চীন ও ভারতকে সংযুক্ত করিয়াছিল। তিব্বতী পথের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ লাডাক বা সিকিমের মধ্য দিয়া এই পথ পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুই-একজন চৈনিক পরিব্রাজক খাস্‌গার অথবা খোটান হইতে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া সিমলার নিকটবর্তী শিপ্‌কি গিরিবর্ত্ম-পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।*

চৈনিক রেশম, লৌহ ও অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার যে শুধু স্থলপথেই যাতায়াত করিত তাহা নহে, জলপথেও এই বাণিজ্যের একটা বড় অংশের গতিবিধি ছিল। রাজনৈতিক গোলযোগ ও সামরিক তৎপরতার সময় স্থলপথে বাণিজ্যের গতিবিধি নিরাপদ নয় এবং মধ্য-এসিয়ায়, সিরিয়ায় ও পারস্যে এইরূপ গোলযোগ ও অশান্তি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রায় লাগিয়াই থাকিত। এজন্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময় স্থলপথের অপেক্ষা জলপথকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়াছে। এই জলপথের বাণিজ্যেও ভারতবর্ষ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। চৈনিক রেশম ও লৌহ খাস্‌গার-খোটান-তক্ষশিলার পথে অথবা ব্রহ্মদেশ-আসামের পথে প্রথমে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া পরে বর্বারিকন, বারিগাজা অথবা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সাগরপারের নানা দেশে রপ্তানী হইত।

বহু প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্র-পথে পারস্য, সিরিয়া, মিশর এমন কি ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে ভারতের এই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে (৭০) জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক কর্তৃক রচিত *Periplus Maris Erythraei* (*The Periplus of the Erythraean Sea*) গ্রন্থে এই বাণিজ্যের ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বন্দরের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।† এই গ্রন্থে বর্ণিত বন্দরগুলির মধ্যে বার্বারিকন (করাচীর নিকট), বারিগাজা (আধুনিক ব্রোচ), মুজিরিস্‌, নেলকুণ্ডা (মালাবার উপকূলে অবস্থিত), বাকারৈ, কোরুকৈ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *Periplus*-এর রচয়িতা অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক লোহিত সাগরের এক বন্দর বেরেনিস্‌ হইতে যাত্রা করিয়া বাব্‌-এল্‌-মান্দব প্রণালী পার হইবার পর মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্য-সমুদ্র-পথে আরব সাগর অতিক্রম করেন এবং বার্বারিকন, বারিগাজা প্রভৃতি বন্দরে উপস্থিত হন।

Periplus- এর সময় বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরাসরি সমুদ্র পার হইবার সুবিধা আবিষ্কৃত হয়। ইহার পূর্বে আরব, পারস্য ও গেদ্রোসিয়ার (বেলুচিস্তান) উপকূল-পথে মিশরীয় বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিত। *Periplus*-এর বহু পূর্ব হইতে পূর্ব-আফ্রিকার বণিকদের সরাসরি আরব সাগর পার হইয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবার কথা ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমকরা পূর্ব-আফ্রিকার এই বণিকদের অভিজ্ঞতার কথা পরে অবগত হয় এবং *Periplus*-এর সময় হইতে সমুদ্র পারাপারের ব্যাপারে তাহারাও মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

এইসব পথে ভারতীয় বাণিজ্যপোতের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মণি, মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তর, হাতীর দাঁত, মসলা, সুতার ও মসলিনের কাপড়, চাল, তিল তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, নানাবিধ ভেষজ ও বনজদ্রব্য (ইহাদের মধ্যে 'নীল' উল্লেখযোগ্য) এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি বিবিধ ধাতু ও ধাতবদ্রব্য এই বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল।

---

* Bagchi, *India and China*, p. 21.

† J. W. McCrindle, *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*, being a translation of *Periplus Maris Erythraei* and of Arrian's Account of the Voyage of Nearkhos, Thacker, Spink and Co., 1879.

চৈনিক রেশম, লৌহ, চামড়া, তুলা, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য বার্বারিকন ও বারিগাজা হইতে পশ্চিমে চালান যাইত। পূর্ব-পশ্চিম সামুদ্রিক-বাণিজ্য কেবল ভারতের পশ্চিম-উপকূলবর্তী বন্দর-গুলিতেই নিবন্ধ থাকে নাই। এইসব বাণিজ্য-তরী কুমারিকা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া বীরপটনম্ (পণ্ডিচেরীর নিকট), তাম্রলিপ্ত, তাকোলা (রেঙ্গুনের নিকট), সাবানা (মৌলমিনের নিকট) ও আরও দক্ষিণ-পূর্বে মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়ার নানা বন্দরে বাণিজ্য করিয়া ফিরিত। হ্যানয়ের নিকট চৈনিক বন্দর কাট্টিগারা পর্যন্ত রোমক ও ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের যাতায়াতের কথা জানা যায়।

এইভাবে স্থলপথে ও জলপথে ভারত-চীন বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হইলে দুই দেশের মধ্যে প্রথিতযশা বৌদ্ধ দার্শনিকদের যাতায়াত আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে কাশ্মীরী দার্শনিকগণই অগ্রণী হইয়াছিলেন। কুষাণদের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কাশ্মীরী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনদেশে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘভূতি, সঙ্ঘদেব, পুণ্যত্রাত, ধর্মযশ ও বিমলাক্ষর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে মধ্য-এসিয়ার দুর্গম স্থলপথে চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। সমুদ্র-পথেও কয়েকজন কাশ্মীরী পণ্ডিতের চীনদেশ যাত্রার বৃত্তান্ত জানা যায়। বুদ্ধজীব সমুদ্র-পথে নানকিং পৌঁছেন ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে; ফাহিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি তাহার কিছু কিছু চৈনিক ভাষায় তর্জমা করেন। গুণবর্মা চীনদেশে যান আনুমানিক ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রথমে সিংহল ও যবদ্বীপে বৌদ্ধ দর্শন চর্চা ও প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা অবগত হইয়া চীন সম্রাট তাঁহাকে চীনে যাইবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। গুণবর্মা সেখানে এক বৎসরের মধ্যে এগারটি সংস্কৃত গ্রন্থের চৈনিক তর্জমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চীনদেশে যাইতে আরম্ভ করেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে। মধ্য-ভারত হইতে ধর্মক্ষেম (৪৩৩) ও গুণভদ্র (৪৩৫), পশ্চিম-ভারত হইতে উপশূন্য ও পরমার্থ (৫৪৬), উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে বুদ্ধভদ্র, বিমোক্ষসেন, জিনগুপ্ত (৫৫৯) ও ধর্মগুপ্ত এবং পূর্বভারত হইতে জ্ঞানভদ্র, জিনযশ ও যশোগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা অধিকাংশই সমুদ্র-পথে নানকিং পৌঁছেন। সপ্তম শতাব্দী হইতে এইরূপ চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পকালের মধ্যে ইহা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনরূপে পরিগণিত হয়। কুষাণদের আমলে তক্ষশিলা যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল গুপ্ত সম্রাটদের বিদ্যোৎসাহিতার কল্যাণে নালন্দা সেইরূপ একটি জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশ্মীরের মত নালন্দাও দলে দলে ভারতীয় বৌদ্ধ ও দার্শনিকদের চীনদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া চীন-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রী সুদৃঢ় করিয়া তুলে। প্রভাকরমিত্র (৬২৭), বোধিরুচি (৭০৬), শুভাকরসিংহ (মৃত্যু ৭৩৫), বজ্রবোধি (৭২০), অমোঘবজ্র (৭৪৬) প্রমুখ নালন্দার বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ এই সময় চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা প্রচার করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় তর্জমা করেন।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের ও ভারতীয় সভ্যতার বার্তা যে কেবল ভারতীয়রাই চীনদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে, বহু বিশিষ্ট চৈনিক বৌদ্ধও বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এইসব চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে

ইসলামের অভ্যুত্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার নূতন স্পৃহা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইলে প্রথমে এই পারসীক ও সিরীয় পণ্ডিতদের মারফত আরবা পণ্ডিতগণ ভারতীয় পুঁথিপত্রের কথা অল্প-বিস্তর অবগত হন। পারসীকরা বহু পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্প, 'চরক-সংহিতা' ও অন্যান্য গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিল। পারস্যের উপর আরবদের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তৃত হইলে এই সব গ্রন্থ আরবদের মধ্যে প্রচারলাভের সুযোগ পায়। আরবী ভাষায় 'কলীল ও দিম্ন' নামে বহুল প্রচলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ।

পারস্যের বার্মাকবংশীয় বিদ্যোৎসাহী রাজপুরুষগণ আরবদের মধ্যে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের ব্যাপারে এক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্ষুয়ার বাল্খ নামক স্থানে এই বার্মাকবংশীয়রা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ ছিলেন; বাল্খের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার 'নবিহারের' প্রধান অধিকর্তার পদ তাঁহারাই পুরুষানুক্রমে অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। পারস্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রথমভাগেই বার্মাক রাজবংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে বাগ্দাদের আব্বাসীয় খলিফাদের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন। এই বংশের খালিদ্ ইব্ন্ বার্মাক আল্-মানসুরের সময় মেসোপোটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার পর হইতে পুরুষানুক্রমে বার্মাকবংশীয়গণ আব্বাসীয় খলিফাদের সময় শাসনসংক্রান্ত উচ্চ পদ ও মর্যাদা ভোগ করেন। ধর্মান্তর ও রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও খালিদ্ ইবন্ বার্মাক ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ বংশের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের তৎপরতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং বাগ্দাদে এই তর্জমা কার্যে একাধিক ভারতীয় পণ্ডিত, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের নিয়োগ সম্ভবপর হইয়াছিল। ডাঃ এড্ওয়ার্ড জাচাউ লিখিয়াছেন :

> "Induced probably by family traditions, they sent scholars to India, there to study medicine and pharmacology. Besides, they engaged Hindu scholars to come to Bagdad, made them the chief physicians of their hospitals, and ordered them to translate from Sanskrit into Arabic books on medicine, pharmacology, toxicology, philosophy, astrology, and other subjects."*

খলিফা আল্-মানসুরের সময় আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের (৭৫৩-৭৭৪) পর ভারতীয় পণ্ডিতদের সহিত আরবা পণ্ডিতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদানের আর এক সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' বা 'সিন্ধহিন্দ', 'খণ্ডখাদ্যক' বা 'অর্কন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় আরবা পণ্ডিত মহলে প্রসারলাভ করে। ইব্রাহিম আল-ফাজারি ও ইয়াকুব ইব্ন্ তারিক নামে দুই আরবা গণিতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের দুই জ্যোতিষীয় গ্রন্থের আরবী তর্জমা প্রণয়ন করেন। এই তর্জমার ফলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ ঐস্লামিক জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই দুই শাস্ত্রে আরবা গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে।

> *"It was on this occasion that the Arabs first became acquainted with a scientific system of astronomy. They learned from Brahmagupta earlier than from Ptolemy."**

আব্বাসীয় খলিফাদের প্রাধান্য তিরোহিত হইবার পর আরব-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তারপর গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও ইহার এক বড় কারণ। হিপোক্রেটিস্, অ্যারিস্টট্ল্, ইউক্লিড, অ্যাপোলোনিয়াস্, টলেমী ও গ্যালেনের স্বাদ পাইবার পর আরব্য অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান-পিপাসা স্বভাবতঃই সুলভ গ্রীক জ্ঞান-প্রস্রবণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তথাপি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমান জগতের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কখনই নষ্ট হয় নাই। সংখ্যায় অল্প হইলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুসলমান পণ্ডিত ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। খলিফা আল্-মানসুরের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আল্-বীরুণী ভারতবর্ষে আসিয়া মূল সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, মণিকবিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন এবং এই অধ্যয়নের ফল গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ করেন।

১·৩। প্রাচীন ভারতীয়দের শিক্ষা-ব্যবস্থা—বিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়—কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থা

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয়দের শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাহাদের বিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়, পঠন-পাঠনের ধারা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। এক সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় শিক্ষা-ব্যবস্থা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা যে উচ্চতর মননশীলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পক্ষে অপরিহার্য তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবহিত হইয়াছিল। তক্ষশিলা, কাশী, কনৌজ, মিথিলা, ধারা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানের শিক্ষায়তন ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রসিদ্ধি ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নালন্দা, বলভি, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব-জোড়া সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইউরোপে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশ্ব-বিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝায় সেইরূপ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বোলোনা, মঁপেলিয়ে, প্যারী, রেগ্‌গিও, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ইউরোপের প্রাচীনতম কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় স্থাপিত হয়। নেপ্‌ল্‌স্ উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত সালের্ণোর চিকিৎসা-বিদ্যালয়কে ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া অনেকে মনে করেন যদিচ সালের্ণো প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদমর্যাদা পাইবার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করিবার অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নালন্দা স্থাপিত হইয়াছিল। বলভি, বিক্রমশিলা ও জগদ্দলের স্থাপনা প্রাচীনতম ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশ কয়েকশত বৎসর পূর্বেকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও স্থাপনা মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রধানতম কীর্তি, পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। এই অভিনব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনে ও তাহার সার্থক রূপায়ণে ইউরোপের বহু পূর্বে ভারতবর্ষ যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা রীতিমত শ্লাঘার বিষয়।

প্রাচীন হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ আশ্রম রচনা করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতেন। নৃপতিগণ ভূমিদান ও অন্যবিধ উপায়ে ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদান ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। বিদ্যাদান ছিল তাঁহাদের ধর্মাচরণের একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার মত শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত ছিল। এই কারণে একাধিক পণ্ডিতের মিলিত চেষ্টায় কোন বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে বিরল। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীদের তীর্থস্থান তক্ষশিলা ও কাশীর সহস্র ব্রাহ্মণের সহস্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের

কথাই জানা যায়; কিন্তু বহু ব্রাহ্মণের মিলিত উদ্যোগে স্থাপিত কোন বড় বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয় বৌদ্ধদের আমলে। অশোকের সময় হইতেই শিক্ষা ব্যাপারে বৌদ্ধ বিহারগুলির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ বিহার বা সঙ্ঘারাম কালক্রমে এক একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিক্ষায়তনে পর্যবসিত হয়। সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুরা যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রথমে সঙ্ঘারামগুলিতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল; পরে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ জনসাধারণের জন্যও উন্মুক্ত হয়। নালন্দা, বলভি, বিক্রমশিলা এইরূপ এক একটি বৌদ্ধ বিহারকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও স্থাপনা বাস্তবিকই বৌদ্ধ ভারতের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বৌদ্ধদের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে হিন্দু শিক্ষাব্রতী ও রাজন্যবর্গকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বড় বড় হিন্দু মন্দিরগুলি ক্রমশঃ জনসাধারণের শিক্ষা ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী ও তৎপর হয় এবং বহু ক্ষেত্রে এই সব মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া সুবৃহৎ বিদ্যায়তন গড়িয়া উঠে। এ ধরনের মন্দির-কেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপনে দক্ষিণ ভারতই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সালোৎগি, এন্নারিয়ম্, তিরুমুক্কুদল, তিরুভোরিয়ুর, মালকাপুরম্ প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরগুলিকে ঘিরিয়া এক সময় অতি চমৎকার সব বিদ্যালয়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে 'অগ্রহার' গ্রামগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণগণ কোনও একটি জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া যাহাতে শিক্ষকতার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তজ্জন্য নৃপতিগণ তাহাদের এক বা একাধিক গ্রাম দান করিতেন। এই সব গ্রামকে 'অগ্রহার' গ্রাম বলা হইত। কলস তাম্রশাসনে জানা যায়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ কাদিয়ুর বা আধুনিক কলস গ্রামে প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণের এক উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেই স্থানকে 'অগ্রহার' গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করেন। কলস গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বেদ, ব্যাকরণ, পুরাণ, ন্যায়, রাজনীতি, সাহিত্য, টীকা রচনা ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।*

এবার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের কয়েকটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিব।

তক্ষশিলা

শিক্ষা-জগতে তক্ষশিলার খ্যাতির কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। এই জনপদের সুপ্রাচীনত্ব ও গান্ধার প্রদেশের রাজধানী হিসাবে ইহার প্রাধান্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা সমগ্র প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। কাশী, মিথিলা, উজ্জয়িনী, রাজগৃহ প্রভৃতি সুদূর স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা এখানে একত্রিত হইত। ধনুর্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তক্ষশিলার অধ্যাপকেরা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার কোনও একটি সামরিক বিদ্যালয়ে এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ১০৩ জন যুবরাজ ও রাজপুরুষ একসঙ্গে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিতেন এরূপ উল্লেখ আছে। খ্যাতনামা চিকিৎসক আত্রেয় এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। জীবক কোমারভচ্চও এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।†

---

* Dr. A. S. Altekar, *Education in Ancient India,* Benaras, 1934; p. 295.

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১৫।

অনেকে তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হইয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। তক্ষশিলার শিক্ষক ও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও খ্যাতি অনুসারে ছাত্র গ্রহণ করিতেন; সাধারণতঃ ২০ হইতে ৩০ জন পর্যন্ত ছাত্র এক এক জন শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকের নিকট শতাধিক ছাত্রও যে এককালে বিদ্যাশিক্ষা করিত, জাতকে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এরূপ ছাত্র-সংখ্যার উল্লেখ হইতে অনেকে তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্ভবপর মনে করেন। ডাঃ আলতেকার লিখিয়াছেন :

> ". . . . Takshasila did not possess any college or university in the modern sense. It was simply a centre of education. It had many famous teachers to whom hundreds of students flocked for higher education from all parts of northern India."*

কুষাণ রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত (আনুমানিক খ্রীঃ অঃ ২৫০) শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলার তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং এই নগর পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখেন, ইহার প্রাচীন গৌরব ও প্রাধান্যের সবটুকুই অন্তর্হিত হইয়াছে। বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার কুমারলব্ধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অন্যান্য বিহারের অবস্থাও তদ্রূপ। হূনদের আক্রমণের পর হইতেই তক্ষশিলা এইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নালন্দা

নালন্দাই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়মকে বাদ দিলে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে। বিহারে রাজগিরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক স্থানে নালন্দা-বিহার গড়িয়া উঠে। পূর্বে ইহা একটি অখ্যাত পল্লীমাত্র ছিল; ইহার রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্রের জন্মস্থান হিসাবে বৌদ্ধদের কাছে এই পল্লীটি একটি পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হইত। লামা তারানাথের মতে এখানকার প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহারের স্থাপয়িতা স্বয়ং অশোক। তবে খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিশেষতঃ মহাযান বৌদ্ধ দর্শন প্রবর্তনের পূর্বে শিক্ষা-জগতে নালন্দার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে (৪১০) ফাহিয়ান নালন্দা-বিহার পরিদর্শন কালে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব লক্ষ্য করেন নাই। তবে ফাহিয়ানের আগমনের অনতিকালের মধ্যেই গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মুক্তহস্ত দানশীলতায় নালন্দা দেখিতে দেখিতে একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপয়িতা শক্রাদিত্য (৪১৪-৫৪)। 'আদি বিহার' নামে যে বিরাট বৌদ্ধ মন্দির তিনি স্থাপন করেন পরবর্তী কয়েক শত বৎসর যাবৎ ইহাই ছিল বিহারস্থ শ্রমণদের প্রধান উপাসনাগার। শক্রাদিত্যের পর তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য (৪৬৮-৭২), বুদ্ধগুপ্ত (৪৭৫-৫০০) ও বজ্র প্রত্যেকে 'আদি বিহারের' সংলগ্ন এক একটি বিহার নির্মাণ করেন।

এইভাবে পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের বদান্যতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন সম্পূর্ণ হইলে এই বিশ্ববিশ্রুত প্রতিষ্ঠান এদেশে উচ্চ শিক্ষা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সাত শত বৎসর তাহা একরূপ অব্যাহত ছিল। নালন্দার অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য, শিক্ষা-ব্যবস্থার সুনাম, ইহার অতুলনীয় গ্রন্থাগার সমগ্র এসিয়ার বিদ্বজ্জনসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং ও

* Altekar, *Education in Ancient India,* p. 251.

ইৎ সিং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন, কর্মপদ্ধতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা নালন্দা-বিহারের যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্য ও গবেষণার দ্বারা তাহার যাথার্থ্য এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রায় আট হইতে বারটি কলেজ, কয়েকটি সুবৃহৎ আগার, গ্রন্থাগার, মানমন্দির, শ্রমণ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাসস্থানের উপযোগী বহু বিচিত্র সৌধমালার অপূর্ব সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বেষ্টন করিয়াছিল একটি দীর্ঘ প্রাচীর। ইৎ সিং-এর বর্ণনায় জানা যায়, প্রায় ৩০০০ শ্রমণ ও বিদ্যার্থী এককালে অবস্থান করিবার মত ব্যবস্থা নালন্দায় ছিল। হুয়েন সাং-এর জীবনী-রচয়িতা হুই-লি এই সংখ্যাকে ১০,০০০ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এক তিব্বতী বর্ণনায় দেখা যায়, নালন্দার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের জন্য তিনটি বিরাট সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ' এবং ইহার জন্য ব্যবহৃত তিনটি সৌধের নাম ছিল 'রত্নোদধি', 'রত্নসাগর' ও 'রত্নরঞ্জক'। প্রতিটি সৌধ নবতল। 'রত্নোদধি'তে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্র, সমাজগুহ্য ও বহুবিধ মূল্যবান গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকিত; ধর্মশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার গ্রন্থ ও টীকা সংরক্ষণের জন্য 'রত্নসাগর' ও 'রত্নরঞ্জক' সৌধদ্বয় নির্মিত হইয়াছিল। কয়েকটি বিহারের গগনস্পর্শী উচ্চতা বহু দর্শক ও পর্যটকের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। হুই-লি লিখিয়াছেন, নালন্দা বিহারের চূড়া মেঘলোক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; যশোবর্মন শিলালিপিতেও দেখা যায়, নালন্দা বিহারের চূড়া মেঘলোক স্পর্শ করিত। খননকার্যের ফলে নালন্দা বিহারের বিভিন্ন অংশ, সৌধ ও স্তূপ কি ভাবে সাজানো ছিল তাহার একটি নক্সা ২নং চিত্রে দেখানো হইল।

নালন্দা বিহারে যে কয়েক সহস্র পণ্ডিত, বিদ্যার্থী ও শ্রমণ বাস করিতেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং সমগ্র ভারতের বিদ্বৎসমাজে তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এখানকার প্রায় এক সহস্র পণ্ডিত কুড়িটি বৃহৎ সূত্র-সংগ্রহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; প্রায় পাঁচ শত পণ্ডিত এইরূপ ত্রিশটি সংগ্রহের ব্যাখ্যা জানিতেন; এবং অন্ততঃ দশজন অনন্যসাধারণ অধ্যাপক পঞ্চাশটি সূত্র-সংগ্রহের ব্যাখ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা ও চর্চা নালন্দার বিশেষত্ব হইলেও এখানে বেদ ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যাদি, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য-দর্শন ইত্যাদি নানা বিদ্যা নিয়মিতভাবে অধীত ও আলোচিত হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধিকর্তার পদ যাঁহারা অলংকৃত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও শীলভদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কার্যকাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এবং প্রত্যেকেই জ্ঞান-জগতের সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এক এক জন দিক্‌পাল ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার বিশ্ব-জোড়া সুনাম ও খ্যাতির পশ্চাতে ছিল এইসব প্রতিভাবান পণ্ডিতদের একনিষ্ঠ সাধনা।

বিদেশী পণ্ডিত, পর্যটক ও বিদ্যানুরাগীদের মধ্যে আমরা ফাহিয়ান, হুয়েন সাং ও ইৎ সিং-এর নাম করিয়াছি। বলা বাহুল্য নালন্দার বিদেশী ছাত্র-তালিকা এই তিনজনের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। এক হুয়েন সাং ও ইৎ সিং-এর আগমনের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, টোখারা প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে বহু ছাত্র নালন্দায় বিদ্যার্জন ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে থনমি ও অপর ছয়জন প্রধান ব্যক্তি এখানে অধ্যয়ন করেন; সুদূর কোরিয়া হইতে আসিয়াছিলেন আর্যবর্মা (আলিয়ে-পো-মোনো) ও হিউই-ইয়ে; টোখারা হইতে বোধিধর্ম; এবং চীন হইতে হিউয়েন চাও, টাও হি; টাও শিং, ট্যাং, টাও-লিন, হুই-টা ও আরও অনেক চৈনিক ভিক্ষু।*

* Dr. Radha Kumud Mookerji, *Ancient Indian Education*, Macmillan, 1951 ; p. 579-80.
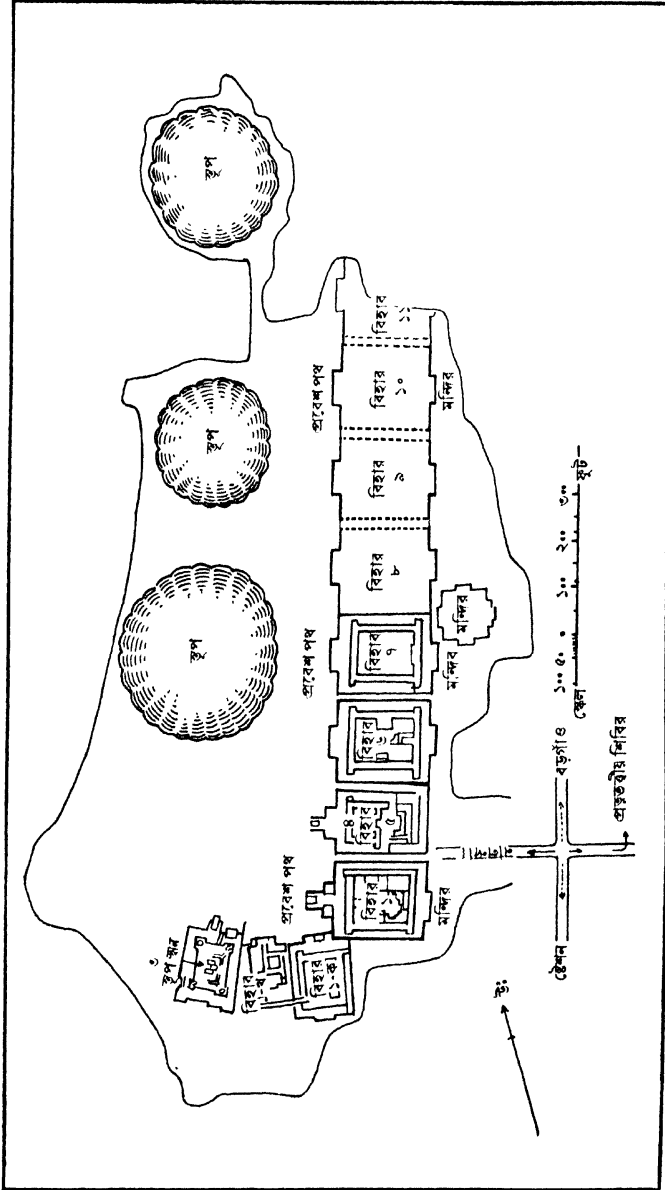
২। খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নক্সা।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানে বিদেশ হইতে নালন্দায় যেমন ছাত্র সমাগম হইয়াছিল তেমন নালন্দার পণ্ডিত ও শ্রমণগণও বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দী হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকল্পে নালন্দার পণ্ডিতগণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময় চীনদেশেও নালন্দা যে একাধিক বৌদ্ধ দার্শনিক প্রেরণ করিয়াছিল সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বলভি

পূর্বভারতে গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন গড়িয়া উঠিতেছিল ঠিক সেই সময় পশ্চিম ভারতে বিদ্যোৎসাহী মৈত্রক নৃপতিগণ (৪৭৫-৭৭৫) গুজরাটের বলভি নামক স্থানে অনুরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কার্যে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন। বলভি মৈত্রক রাজাদের শুধু রাজধানীই ছিল না, একটি বর্ধিষ্ণু বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও ইহার প্রাধান্যের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে বলভি নালন্দার মতই একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আচার্য স্থিরমতি ও গুণমতি এক সময় বলভির প্রধান অধিকর্তা ছিলেন। হুয়েন সাং-এর বর্ণনায় জানা যায়, বলভির শতাধিক সঙ্ঘারামে প্রায় ছয় সহস্র শ্রমণ ও বিদ্যার্থী অবস্থান করিত। এই বিহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হীনযান বৌদ্ধ-দর্শনের ব্যাখ্যা ও চর্চা। বৌদ্ধদর্শন ছাড়া ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। নালন্দার ন্যায় বলভিও একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হুয়েন সাং ও ইৎ সিং-এর বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায়, ভারতের এই দুই প্রান্তবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এককালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

বিক্রমশিলা

বিক্রমশিলা অনেকটা নালন্দার একটি ছোট সংস্করণ। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গাধিপ ধর্মপাল এই বিহার স্থাপন করেন। বিক্রমশিলার স্থান লইয়া কিছুটা বিতর্ক আছে। তারানাথের মতে উত্তর মগধে গঙ্গাতীরবর্তী একটি টিলার উপর এই বিহার স্থাপিত হইয়াছিল; কানিংহ্যাম বড়গাঁও-এর নিকট সিলাও নামক গ্রামে ইহার অস্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন; বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে এবং এন. এল. দে মহাশয়ের মতে উক্ত জেলার পাথরঘাটা পাহাড়ের উপর এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল।*

মহারাজ ধর্মপাল প্রথমে ১০৮ জন পণ্ডিতের জন্য ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ১০৮ জন পণ্ডিত একটি বিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষার ভার পান। ক্রমে এরূপ ছয়টি বিরাট বিদ্যালয় বিক্রমশিলায় স্থাপিত হয়। মধ্যদেশে যে কেন্দ্রীয় ভবনটি নির্মিত হইয়াছিল তাহার নাম 'বিজ্ঞানাগার'। বিজ্ঞানাগারের ছয়টি দ্বার; এক একটি দ্বার দিয়া এক একটি কলেজের প্রবেশ-পথ। বিক্রমশিলা রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গড়িয়া উঠে। রাজাই ছিলেন ইহার প্রধান কর্তা। তিনি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পুরস্কারাদি যোগ্য পণ্ডিত ও ছাত্রদের বিতরণ করিতেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার ব্যাপারে বিক্রমশিলার পণ্ডিতগণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বহু তিব্বতী ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পারস্পরিক সুবিধার জন্য তিব্বতী ভাষা শিক্ষাদানের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। জ্ঞানপাদ,

* *Ancient Indian Education*, p. 587.

বৈরোচণ, রক্ষিত, জিতারি, রত্নাকরশান্তি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নবজ্র, অভয়ঙ্করগুপ্ত প্রমুখ বিক্রমশিলার খ্যাতনামা আচার্যগণ সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিক্রমপুরের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশিলার শ্রেষ্ঠ আচার্যদের অন্যতম ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বতে যান এবং সেখানে প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন।

চারিশত বৎসরের উপর বিক্রমশিলার প্রথিতযশা আচার্যগণ এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা তিন সহস্রের উপর উঠিয়াছিল। ইহার ক্রমবর্ধমান উন্নতি, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থা শেষের দিকে নালন্দার গৌরবকেও নিষ্প্রভ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান আক্রমণের মুখে পড়িয়া এই বিহার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

জগদ্দল ও ওদন্তপুরী

জগদ্দল ও ওদন্তপুরী পূর্বভারতের এইরূপ আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গদেশে পাল রাজাদের আমলে বিহারদ্বয় স্থাপিত হয়। নালন্দা বা বিক্রমশিলার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন না হইলেও এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্যের কর্মক্ষেত্র ছিল এবং গৌরব ও প্রতিপত্তির দিনে এখানে সহস্রাধিক শ্রমণ ও বিদ্যার্থীর অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উপরিউক্ত বৃত্তান্ত হইতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে। আমরা দক্ষিণভারতের কয়েকটি বড় বড় মন্দির-কেন্দ্রিক সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম করিয়াছি। এ ছাড়া মাঝারি ও ছোট অসংখ্য বিদ্যালয় ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া ছিল। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় লিখিয়াছেন, অশোকের সময় সমগ্র ভারতে প্রায় ৮৪,০০০ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সক্রিয় ছিল।*

পাঠ্য-তালিকা

নালন্দা, বলভি, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণভাবে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে যেসব বিষয় পড়ানো হইত ললিতবিস্তার, কাদম্বরী, রামচন্দ্রের টীকা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে সে সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ললিতবিস্তারে উল্লিখিত বিষয়গুলি হইল :—

১। গণনা
২। সংখ্যা
৩। বেদ (কাদম্বরী মতে ধর্মশাস্ত্র)
৪। ইতিহাস
৫। পুরাণ
৬। নির্ঘণ্টু
৭। নিরুক্ত
৮। নিগম
৯। শিক্ষা
১০। ছন্দ
১১। জ্যোতিষ
১২। ব্যাকরণ
১৩। যজ্ঞ-কল্প
১৪। সাংখ্য
১৫। যোগ
১৬। বৈশেষিক
১৭। বেশিক (একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদ)
১৮। বার্হস্পত্য (বৃহস্পতির, চার্বাকের অথবা লোকায়ত দর্শন)
১৯। হেতুবিদ্যা
২০। অর্থবিদ্যা
২১। কাব্য
২২। গ্রন্থ-রচিতম্
২৩। আখ্যাতম্ (গল্প বলিবার বিদ্যা)
২৪। হাস্যম্ (কৌতুক রস বিতরণ বিদ্যা)

---

* P. K. Acharya, *University Life in Ancient India, Science & Culture,* December, 1935, p. 384.

শিল্পকলা ও কয়েকটি ব্যবহারিক বিদ্যার উল্লেখও ললিতবিস্তারে আছে—যেমন, নগর-নিবেশ (নগর-পরিকল্পনা), বাস্তু-নিবেশ, নগর-মানম্‌, বস্ত্র-রাগ (কাপড় রং করা), মণি-রাগ (মণিমুক্তা রং করা) ইত্যাদি। রসবাদ (পারদ সংক্রান্ত বিদ্যা), গন্ধবাদ (গন্ধক সংক্রান্ত বিদ্যা), ও ধাতুবাদ (ধাতুনিষ্কাশন বিদ্যা) ইত্যাদি কয়েকটি রাসায়নিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন রামচন্দ্র।

কারিগরিবিদ্যা ও তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিল্প-কলা ও বিবিধ ব্যবহারিক বিদ্যার শিক্ষাদান ব্যাপারে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিল্প-কলা ও ব্যবহারিক বিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই ভারতের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি রচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে অতি সামান্য তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ পুঁথিপত্রের অপ্রতুলতা, দ্বিতীয়তঃ যাহা আছে তাহাও ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। একমাত্র চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যের অভাব নাই। তাহার কারণ বেদ, ব্যাকরণ, সাংখ্য, যোগ, জ্যোতিষ ইত্যাদি উচ্চতর বিদ্যার মত চিকিৎসাবিদ্যাও বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি তক্ষশিলায়, নালন্দায়, বলভিতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সুশ্রুত-চরক হইতে আরম্ভ করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণও এ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারিক-বিদ্যার ভাগ্যে এরূপ সুযোগ কখনও উপস্থিত হয় নাই। এই ধরনের বিদ্যা কোন বিদ্যালয়ে শেখানো হইত না। কাহাকেও ইহা আয়ত্ত করিতে হইলে কোন কারিগরের গৃহে তাহাকে শিক্ষানবিসি গ্রহণ করিতে হইত। কারিগরিবিদ্যায় শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা যে বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল মনু-সংহিতায়, নারদ কর্তৃক সঙ্কলিত আইন-গ্রন্থে ও বীর-মিত্রোদয়ে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শিক্ষানবিসকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া হাতে-কলমে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে উপযুক্ত গুরু-দক্ষিণার পর তাহার ছুটি হইত এবং তখন সে স্বাধীনভাবে অর্জিত বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে শিক্ষানবিসকে অবশিষ্ট সময় গুরুগৃহে থাকিয়া তাঁহার কার্যে সাহায্য করিতে হইত। এইরূপ বিধি লঙ্ঘন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শিক্ষানবিস গুরুগৃহ ত্যাগ করিলে তাহার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও আইন বড় কম কড়া ছিল না। ছাত্রের জন্য শিক্ষক উপযুক্ত বাসস্থান ও আহার্যের ব্যবস্থা করিবেন; ছাত্রকে তিনি আপন পুত্রের ন্যায় দেখিবেন ও সেইমত আচরণ করিবেন। শিক্ষানবিসকে তিনি কখনও ভাড়া করা মজুরের মত খাটাইবেন না অথবা নিজ স্বার্থের জন্য বিদ্যার্থী যাহা শিখিতে আসিয়াছে তাহার বাহিরে কোন কাজ তাহাকে দিয়া করাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনকারীকে কাত্যায়ন দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, শিক্ষককে সর্বান্তঃকরণে অভীপ্সিত বিদ্যার সকল গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষানবিসকে শিখাইতে হইবে। ব্যবহারিকবিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসি-ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হইয়াছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ভাবেই নানা কারিগরিবিদ্যা স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী কারিগরেরা নিজেদের শিল্প-স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নানারূপ শ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল। এই শ্রেণী ইউরোপীয় 'গিল্ড'-এরই ভারতীয় সংস্করণ। বিভিন্ন বৃত্তি ও বিদ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী এক এক শ্রেণীর জন্য এক এক রূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ৬৪টি শিল্প-কলার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন লেখকই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সময় এই ৬৪টি কলার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগবৎ-পুরাণ, মহাভাষ্য, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, কামসূত্র, শুক্রনীতিসার, বামণ, মাঘ, ভবভূতি ইত্যাদি প্রত্যেক গ্রন্থেই ইহা পাওয়া যায়। ললিতবিস্তার, জাতকমালা, কল্পসূত্র, ঔপপাতিক-সূত্র প্রভৃতি কয়েকটি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এই সংখ্যা কখনও ৭২ কখনও ৮৬ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। নর্তন, পাশাখেলা, রন্ধন, তাম্বুল তৈয়ারীবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনুর্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব কিছুই এই ৬৪টি কলার অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন কেবল এইরূপ কয়েকটি বিশেষ ধরনের কারিগরিবিদ্যার উল্লেখ এখানে করিতেছি :—

১। বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ—বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান;
২। ধাতুপাদ বা ধাতুপাকম্; হিরণ্যপাক, সুবর্ণপাক, মণিপাক ইত্যাদি—ধাতুনিষ্কাশন বিদ্যা;
৩। ধাত্বৌষধীনাম্ সংযোগ-ক্রিয়া-জ্ঞানম্—ধাতু ও ভেষজ সংযুক্ত করিবার বিদ্যা;
৪। ধাতু-সাংকর্য্য-পার্থক্য-করণম্;
৫। ক্ষারনিষ্কাশন-জ্ঞানম্;
৬। ধাত্বাদিনাং সংযোগ-অপূর্ব-বিজ্ঞানম্—নূতন নূতন ধাতব যৌগিক প্রস্তুত-বিদ্যা;
৭। তটাক-বাপি-প্রসাদ-সমভূমি-ক্রিয়া—পুষ্করিণী ও কূপ খনন, জমি সমতলকরণ ইত্যাদি;
৮। উপকরণ-ক্রিয়া, যন্ত্রপ্রয়োগ বা যন্ত্রমাতৃকা—যন্ত্রবিদ্যা;
৯। নৌকা-রথাদি যানানাং কৃতি-জ্ঞানম্—নৌকা, রথ ও অন্যান্য যানবাহন নির্মাণ-বিদ্যা;
১০। রত্নানাং বেধাদিসদসৎ জ্ঞানম্ বা রত্নশাস্ত্রম্—মূল্যবান রত্ন-পরীক্ষা, তাহার কর্তন ও বেধনবিদ্যা;
১১। কৃত্রিম-স্বর্ণ-রত্নাদি-ক্রিয়া-জ্ঞানম্—কৃত্রিম স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রস্তুত-বিদ্যা;
১২। কাচ-পাত্রাদি-করণ-বিজ্ঞানম্—কাচপাত্র নির্মাণ-বিদ্যা;
১৩। জলানাং সংসেচনং সংহরণম্—জলসেচ-বিদ্যা;
১৪। লোহাদিসারশাস্ত্র-অস্ত্র-কৃতিজ্ঞানম্—লৌহ অস্ত্রাদি নির্মাণ-বিদ্যা।

দেশের বিভিন্ন কারিগরিবিদ্যা ও শিল্পোন্নতি ব্যাপারে শাসনকর্তাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। শিল্প ও শিল্পবিদ্যার উচ্চ মান যাহাতে রক্ষিত হয় তদুদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞগণ সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। দেশের প্রায় প্রত্যেক বড় শিল্পের জন্য এক একজন অধ্যক্ষ থাকিতেন, যেমন, টাঁকশালের জন্য 'কোষাধ্যক্ষ', বস্ত্রশিল্পের জন্য 'সূত্রাধ্যক্ষ', খনি-সম্পদ তদারক করিবার জন্য 'আকরাধ্যক্ষ', ধাতুশিল্পের জন্য 'লোহাধ্যক্ষ', কৃষির জন্য 'সীতাধ্যক্ষ' ইত্যাদি। শিল্প ও কারিগরিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে অধ্যক্ষগণ নির্বাচিত হইতেন। উদাহরণস্বরূপ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান রত্নের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল কোষাধ্যক্ষের উপর; সুতরাং তাঁহাকে রত্নপরীক্ষা বা রত্নশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইত। আকরাধ্যক্ষের উপর রাজ্যের সমগ্র খনিজ সম্পদ ও ধাতুশিল্প নিয়ন্ত্রণের ভার; মণিক-বিদ্যায়, ধাতুনিষ্কাশন-বিদ্যায়, রসায়নে, এমন কি রত্নশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এই পদের গুরু দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব এবং সেইরূপ যোগ্য ব্যক্তিই নিযুক্ত হইতেন।

অর্থশাস্ত্রে যে সময়কার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার, শিল্পের ও নানা কারিগরিবিদ্যার বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ জাতীয় গ্রন্থ আর রচিত হইল না। এরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে আর কেহ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখিবার ও যাচাই করিবার চেষ্টা করিল না। ইউরোপখণ্ডেও কারিগরিবিদ্যার ইতিহাস, কারিগরদের কর্মপদ্ধতি ও তাহাদের উদ্ভাবিত নানা যন্ত্রপাতি ও টেক্‌নিকের কথা বহুদিন পর্যন্ত অনাদৃত ও অজ্ঞাত ছিল। এগ্রিকোলার *De re metallica,* বিরিংগুচ্চিওর *Pirotechnica* এবং আরও দুইজন অজ্ঞাতনামা লেখকের

Ein Nützlich Bergbuchlein, Probierbuchlein প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে এই বিদ্যার ঐশ্বর্য ও অভাবনীয় সম্ভাবনীয়তার কথা উপলব্ধ হয়; দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এগ্রিকোলা ও বিরিংগুচ্চিওর মত কোন লেখকের আবির্ভাব হয় নাই। হইলে এদেশে কারিগরি-বিদ্যার এবং সম্ভবতঃ বিজ্ঞানেরও ইতিহাস অন্যরূপ হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২·১। বেদোত্তর যুগের গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চা—কয়েকজন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্

বৈদিকযুগে শুল্বকারদের গাণিতিক তৎপরতা ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) উল্লিখিত জ্যোতিষীয় চর্চার পর প্রায় আট শত হইতে এক হাজার বৎসর হিন্দু গণিত ও জ্যোতিষে এক প্রকার অচল অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি। অচল অবস্থা এই অর্থে যে, এই সময়ে রচিত কোন মৌলিক গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থের অথবা প্রথিতযশা কোন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের রচনা কাল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ আর্যভট (খ্রীষ্টাব্দ ৪৭৬) পাটলিপুত্রের নিকট কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে আর্যাবর্তে গণিত ও জ্যোতিষ চর্চায় এক নূতন ও উজ্জ্বল অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অধ্যায়ের ব্যাপ্তি। এই দীর্ঘ আট শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞগণ আশ্চর্য মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, পদ্মনাভ, ভাস্কর, মুঞ্জাল, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞগণ হিন্দু জ্যোতিষীয় ও গাণিতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইউরোপে ও আলেকজান্দ্রিয়ায় ডায়োফ্যাণ্টাস্, প্যাপাস্, হাইপেসিয়া ও বোয়েথিয়াসের পর গ্রেকো-রোমক গণিতের, তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যখন পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষ তখন আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে ব্যস্ত।

বৈদিক যুগের পরবর্তী ও প্রাক্-সিদ্ধান্ত যুগে রচিত উচ্চাঙ্গ কোন গাণিতিক বা জ্যোতিষীয় গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া না গেলেও এই আট শত বৎসর হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌রা যে নিশ্চেষ্ট ছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই সময়েই হিন্দুরা দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন (decimal place value notation) পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছিল। গণিতে শুধু এই দুইটি আবিষ্কারের জন্যই হিন্দুরা বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই দুই আবিষ্কারে শুধু যে গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় অগ্রগতির পথ সুগম হইয়াছিল তাহা নহে, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যও এই অতি মৌলিক আবিষ্কার বিশেষভাবে দায়ী। শূন্য সংবলিত নূতন অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার ও সুবিধা উপলব্ধির পর হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌দের প্রথম ও প্রধান কাজ হয় এই পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত গ্রন্থাদির সংশোধন ও সংস্কার সাধন করা। অতি ধীরে এই সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থাদি যে একেবারেই রচিত হয় নাই তাহা নহে; সম্ভবতঃ কালক্রমে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইলে এইসব গ্রন্থ অব্যবহার্য মনে করিয়া বিনষ্ট করা হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের আবির্ভাবের পর হইতে আমরা সহসা প্রত্যেক গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থে দশমিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ ইহা কোন আকস্মিক পরিবর্তন নহে। ইহার পশ্চাতে বহুশত বৎসরের নানা সংশোধন, সংস্কারসাধন ও প্রস্তুতির অধুনালুপ্ত যে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিল তাহা মনে করা একান্তভাবেই যুক্তিসঙ্গত।

ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা এই যুগের

বিখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক তৎপরতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

আর্যভট (আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ৪৯৯)

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের অন্যতম আর্যভট পাটলিপুত্রের নিকট কুসুমপুরে আনুমানিক ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়ে'র রচনাকাল বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহার জন্মসন নির্ণয় করেন। এই গ্রন্থ তিনি ২৩ বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গণিতে ও জ্যোতিষে আর্যভটর শিক্ষা ও গ্রন্থাদি ভারতের বিদ্বৎসমাজে যে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিভিন্ন শতাব্দীতে তাঁহার গ্রন্থাদির উপর রচিত বহু সমালোচনা ও টীকা ইহার অকাট্য প্রমাণ।

আর্যভটর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। এই গ্রন্থে সর্বসমেত ১২৩টি শ্লোক আছে এবং ইহা চারিটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। এই চারিটি অধ্যায় হইল (১) দশগীতিকা, (২) গণিতপাদ, (৩) কালক্রিয়া, ও (৪) গোলপাদ। গণিতপাদে নানা গাণিতিক বিষয়, যেমন বর্গমূল, ঘনমূল, সমান্তর শ্রেণী, ত্রৈরাশিক, সমীকরণ সমাধান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিঘাত ও প্রথম মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের একস্থানে আমরা π-এর অতি নির্ভুল মান পাই; $\pi = ৩\cdot১৪১৬$। সাইন ও ভার্সড্ সাইনের কয়েকটি সারণী এই অধ্যায়ে আছে।

দশগীতিকা, কালক্রিয়া ও গোলপাদে আর্যভট জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিজের গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গবেষণার প্রধান অবলম্বন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ; কিন্তু বহু স্থানে তিনি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের নানা মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা উল্লেখ করেন। এক মহাযুগে (৪,৩২০,০০০ বৎসর) পৃথিবী কতবার আবর্তিত হয় তাহা তিনি নির্ণয় করেন। আর্যভট প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিকগতি পরবর্তীকালে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্তের মত খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্ এইরূপ অশাস্ত্রীয় মতবাদ শিক্ষা দিবার জন্য আর্যভটের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহিরও পৃথিবীর আহ্নিক গতিবাদের বিরোধী ছিলেন।

হিন্দু জ্যোতিষে আর্যভটর আর একটি অবদান পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহ-গতির ব্যাখ্যা প্রদান। আধুনিক সূর্যসিদ্ধান্তে পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে যে গণনা-পদ্ধতির আলোচনা দেখা যায় তাহা প্রাক্-আর্যভটীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে ছিল না। এই বিষয়ে আর্যভট জ্যোতির্বিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে পরে তাঁহার শিক্ষা অনুসারে সূর্য-সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধিত হয়। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

আর্যভট সূত্রকার ছিলেন। সূত্রকারের রীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র গবেষণার ফলগুলি তিনি সূত্রের আকারে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কি ভাবে তিনি এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হন, অর্থাৎ তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারিত পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। এই পদ্ধতি তিনি একমাত্র শিষ্যদের কাছে মৌখিক অধ্যাপনা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেন। আর্যভটর শিষ্যরা গুরুর শিক্ষার নানা টীকা, ভাষ্য ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার জ্যোতিষকে সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রচনাতেও এই পদ্ধতির বিশেষ কোন আভাস পাওয়া যায় না।

আর্যভটর কয়েকজন শিষ্য টীকাকার হিসাবে হিন্দু জ্যোতিষে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তন্মধ্যে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর ও লল্লর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাটদেব আর্যভটর নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা রচনা করেন। আল্-

বীর‍ুণীর ধারণা ছিল, লাটদেবই ছিলেন স‍ূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা, কিন্তু বরাহমিহির নিজেই লিখিয়াছেন, তিনি ইহার একজন টীকাকার ছিলেন মাত্র। যাহা হউক, হিন্দ‍ু জ্যোতিষে আর্যভটর শিষ্যদের মধ্যে লাটদেবের খ্যাতিই সর্বাধিক; গ‍ুণগ্রাহীরা তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'সর্ব-সিদ্ধান্ত-গ‍ুর‍ু'। প্রথম ভাস্কর 'লঘ‍ু ভাস্করীয়' ও 'মহা ভাস্করীয়' নামে আর্যভটর জ্যোতিষের উপর দ‍ুইটি টীকা রচনা করেন। 'আর্যভটীয়'র উপর রচিত তাঁহার একটি সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় স‍ুধাকর দ্বিবেদীর মতে 'শিষ্যধীব‍ৃদ্ধিদ'র রচয়িতা লল্ল আর্যভটর শিষ্য ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেনগ‍ুপ্ত মহাশয়ের মতে, লল্ল ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর লোক। স‍ুতরাং আর্যভটপন্থী হইলেও তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ ছাত্র হইতে পারেন না।

বরাহমিহির (আন‍ুমানিক খ‍্রীষ্টাব্দ ৫০৫)

বরাহমিহির ছিলেন ভারতবর্ষের প্লিনি। তাঁহার জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষের মত ব্যাপক। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, মণিকবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তিনি স‍ুপণ্ডিত ছিলেন এবং এই সব বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যার ভার যত ছিল ধার তত ছিল না। গণিত ও জ্যোতিষে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন মৌলিক অবদান নাই। প্রাচীন হিন্দ‍ু বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসের দিক হইতে, তাঁহার গ্রন্থাবলী বিশেষ গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ। উজ্জয়িনীতে ৫০৫ খ‍্রীষ্টাব্দের অন‍ুর‍ূপ সময়ে আমরা তাঁহার কার্য-কলাপের পরিচয় পাই।

বরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীয় গ্রন্থ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন হিন্দ‍ুদের পাঁচটি প্রধান জ্যোতিষীয় গ্রন্থ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ট, স‍ূর্য ও পৈতামহ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার কল্যাণেই সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের প্রাচীনতম অংশগ‍ুলি রক্ষা পাইয়াছে। বরাহের প‍ূর্বগামী বহ‍ু লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দ‍ু জ্যোতির্বিদের কার্যকলাপের উল্লেখ আমরা প্রথম তাঁহার রচনায় পাই। আর্যভট ও লাটদেবের বিশদ উল্লেখ ছাড়া তিনি সিংহাচার্য, প্রদ্য‍ুম্ন, বিজয় নন্দী প্রম‍ুখ কয়েকজন জ্যোতির্বিদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রদ্য‍ুম্ন মঙ্গল ও শনি গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করেন; বিজয় নন্দীর কাজ প্রধানতঃ ব‍ুধ গ্রহের গতি সম্পর্কে। ই‍ঁহারা উভয়েই আর্যভটর প‍ূর্বগামী।

বরাহের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব‍ৃহৎ-সংহিতা'। এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় ফলিত জ্যোতিষ। মান‍ুষের উপর গ্রহাদির নানা দ‍ুষ্ট প্রভাব কাটাইবার উদ্দেশ্যে দ‍ুষ্প্রাপ্য ও ম‍ূল্যবান নানাবিধ প্রস্তর, মণি, ম‍ুক্তা, প্রবাল প্রভৃতির ব্যবহার স‍ুপ্রাচীন। বরাহ এইসব প্রস্তরের বাহ্যিক গ‍ুণাগ‍ুণ সম্বন্ধে বহ‍ু ম‍ূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নানার‍ূপ রঞ্জকদ্রব্য বকুল, উৎপল, চম্পক প্রভৃতি বিভিন্ন প‍ুষ্পের গন্ধ অন‍ুকরণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কয়েকটি স‍ুগন্ধি দ্রব্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা সম্বন্ধে 'ব‍ৃহৎ-সংহিতায়' অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'বজ্রলেপ' নামে তিনি একপ্রকার গ‍ুঁড়া বা সিমেন্টের উল্লেখ করিয়াছেন; এই গ‍ুঁড়ার বাঁধন-শক্তি বজ্রের মত কঠিন এবং মন্দিরাদি নির্মাণকার্যে ইহা প্রাচীন ভারতে ব্যবহ‍ৃত হইত।*

বরাহমিহির ক্ষ‍ুদ্র-ব‍ৃহৎ কয়েকটি জাতক রচনা করিয়াছিলেন। আল্-বীর‍ুণী এইর‍ূপ একটি জাতক আরবী ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মগ‍ুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ‍্রীষ্টাব্দ)

আর্যভটর পর গণিতে ও জ্যোতিষে বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দেন ব্রহ্মগ‍ুপ্ত। ব্রহ্মগ‍ুপ্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক সার্টন লিখিয়াছেন, "One of the greatest scientists of his

---

* B. N. Seal, *Positive Sciences of the Ancient Hindus,* Longmans, 1915 ; p. 64.

race and the greatest of his time."* ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র উজ্জয়িনী ছিল তাঁহার বিজ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' রচনা করেন। মূলতঃ সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভটর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে তাঁহার নিজস্ব বহু গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় আবিষ্কার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে 'খণ্ডখাদ্যক' ও 'উত্তর-খণ্ড-খাদ্যক' নামে তিনি আরও দুইখানি জ্যোতিষীয় গ্রন্থ রচনা করেন। 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের' খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। খলিফা আল্-মানসুরের রাজত্বকালে ইব্রাহিম আল্-ফাজারি ও ইয়াকুব ইব্‌ন্ তারিক নামে দুই আরব্য পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদ প্রণয়ন করেন। সিদ্ধান্তের আরবী নাম 'সিন্দহিন্দ'। তাঁহার 'খণ্ডখাদ্যক' গ্রন্থটিও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ভাষান্তরের ফলে এই গ্রন্থের নাম হয় 'অর্কন্দ'।

নানা জ্যোতিষীয় ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভটর মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। আর্যভট প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। গ্রহণ সম্বন্ধে বৈদিক হিন্দুদের রাহু-কেতু মতবাদ তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। মতবাদের সমালোচনা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও তিনি আর্যভটর উপর তীব্র আক্রমণ চালান। অনেকে বলেন, আর্যভটর ব্যাপক খ্যাতি ও তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশের গভীর প্রভাবে তিনি ঈর্ষাবশতঃ এইরূপ অন্যায় বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, ব্রহ্মগুপ্তের নিজস্ব অবদানের গুরুত্বও বড় কম নহে। মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ দেবতাদের প্রভাবে গ্রহদের গতির কিরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং দিনের যে কোন সময়ে গ্রহদের সঠিক গতি ও অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করা যায় তাহার গণনা-পদ্ধতি তিনি বাহির করেন। তারপর লম্বন, সূর্যের উন্নতি, বলন ইত্যাদি জ্যোতিষীয় বিষয়ের নির্ভুল পরিমাপ গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক অবদান আছে।

গণিতে ব্রহ্মগুপ্ত আরও অনেক বেশী স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের নানা ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রতিজ্ঞা গণিতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পিরামিডের ফ্রাস্টামের আয়তন নির্ণয় কল্পে তিনি নিম্নোক্ত সূত্রটি প্রদান করেন :—

$$V = \frac{1}{3} h(s_1^2 + s_2^2 + s_1 s_2)$$

$s_1, s_2 =$ ফ্রাস্টামের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য;

$h =$ উচ্চতা।

ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক অবদানের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

মহাবীর (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী)

মহাবীর দক্ষিণভারতের মহীশূর রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার কার্যকাল সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীতে নিবদ্ধ। 'গণিত-সার-সংগ্রহে'র রচয়িতা (আনুমানিক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) হিসাবে ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে তাঁহার আসন চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। গুণোত্তর প্রগতি, দ্বিঘাত সমীকরণের তিন প্রকার সমাধান, উপবৃত্ত, ভগ্নাংশ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে কাল্পনিক মূল তিনি অবশ্য বাদ দিয়া গিয়াছেন। গণিত সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ব্রহ্মগুপ্তের অপেক্ষা বিশদ ও ব্যাপক হইলেও মৌলিকতার দিক হইতে তিনি ব্রহ্মগুপ্তের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

---

* George Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. I; p. 474.

মুঞ্জাল (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী)

নবম শতাব্দীর আর একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ হইলেন মুঞ্জাল। মুঞ্জালের কর্মক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী, যদিও তাঁহার জন্মস্থান বা জন্মসন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন, আনুমানিক ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জাল 'লঘুমানস' নামে জ্যোতিষের একখানি করণগ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতীয় জ্যোতিষে অয়ন-চলন, অয়ন-চলনের বেগ ও ইহার তাৎপর্য সর্বপ্রথম আলোচনা করিবার জন্য মুঞ্জালের খ্যাতি। এদেশে মুঞ্জালই অয়ন-চলন সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন; অন্ততঃ তাঁহার পূর্বে অন্য কোন ভারতীয় জ্যোতির্বিদের রচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় তথ্যের কোনরূপ আলোচনা দেখা যায় না। ভাস্কর অয়ন-গতি বর্ণনা করিবার সময় মুঞ্জালের নাম করিয়াছেন; মুঞ্জাল কর্তৃক প্রদত্ত অয়ন-গতিবেগও তাঁহাকে হুবহু গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

শ্রীপতি (আনুমানিক ৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ)

কাশ্যপ বংশীয় কেশবের পৌত্র ও নাগদেবের পুত্র শ্রীপতি জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল এ পর্যন্ত কেহ সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ ভাস্করের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'জ্যোতিষ রত্নমালা', 'ধীকোটি' নামক একখানি করণগ্রন্থ এবং 'সিদ্ধান্তশেখর' নামে একখানি জ্যোতিষীয় সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানির কথা তাঁহার টীকাকারদের রচনা হইতে জানা যায়; অদ্যাবধি ইহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

শ্রীধর (জন্ম ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ শ্রীধর আবির্ভূত হন দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে। আনুমানিক ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গণিত-গ্রন্থ 'গণিতসার' বা 'ত্রিশতিকা' রচনা করেন। তিনশত শ্লোকে সংকলিত বলিয়া এই গ্রন্থ 'ত্রিশতিকা' নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। দ্বিবেদী মহাশয় মনে করেন, এই শ্রীধরই আবার 'ন্যায় কন্দলী'র প্রণেতা ছিলেন।* 'ন্যায় কন্দলী'র শ্রীধরের বাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিসৃষ্টি বা ভূরসুট গ্রামে।

শূন্যের (০) তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রীধরের একটি অতি চমৎকার ও প্রাঞ্জল আলোচনা আছে। ত্রিশতিকার এক শ্লোকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সাংকেতিক অর্থ হইল :

$$a \pm o = a \;;\; o \times a = o \;;\; a \times o = o$$

অধ্যাপক সার্টনের মতে সংস্কৃত ভাষায় শূন্যের গুণ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে ইহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল আলোচনা।† এই আলোচনায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শূন্যকে কোন রাশির দ্বারা অথবা কোন রাশিকে শূন্যের দ্বারা ভাগ করিলে কি ফল পাওয়া যাইবে তাহা আলোচিত হয় নাই।

দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান সম্বন্ধে আজ আমরা যে সাধারণ নিয়মের সহিত পরিচিত, অর্থাৎ

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

---

* শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী', পৃঃ ১০২।

† *Introduction to the History of Science*, Vol. I ; p. 589.

তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন শ্রীধর। দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান সম্পর্কে তিনি একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, তবে এই গ্রন্থখানি এখন নিখোঁজ।

শতানন্দ (একাদশ শতাব্দী)

জনপ্রিয় জ্যোতিষীয় করণ-গ্রন্থ 'ভাস্বতী'র প্রণেতা শতানন্দ ভাস্করের কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন। 'ভাস্বতী' ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থের এক টীকাকার মাধব মিশ্র লিখিয়াছেন, সূর্যসিদ্ধান্তের অনুকরণে শতানন্দ এই করণ-গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সূর্য-সিদ্ধান্তের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় বলেন, বরাহমিহিরের সূর্য-সিদ্ধান্তে বীজ সংস্কার করিয়া ভাস্বতী লিখিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশের পঞ্জিকাকারদের মহলে এখনও ভাস্বতীর বিশেষ সমাদর আছে।

ভাস্কর (জন্ম ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষে যেন মধ্যাহ্ন গগনে সূর্যের মত দীপ্তি লইয়া ভাস্কর এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্যোতিষে তাঁহার প্রতিভা আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের সহিত তুলনীয়। ভাস্করের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত হইলেও তাঁহার আবির্ভাব-কালকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন বলা যায় না। তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি সুরু হইয়া গিয়াছিল। দীপ নিভিবার পূর্বে সে যেমন শেষবারের জন্য অস্বাভাবিক দ্যুতিতে জ্বলিয়া উঠে ভাস্করের আবির্ভাব অনেকটা সেইরূপ। ভাস্কর সম্বন্ধে অধ্যাপক সার্টন লিখিয়াছেন, "দ্বাদশ শতাব্দীর এই হিন্দু গণিতজ্ঞ কেবল কুশলী ব্যাখ্যাকারই ছিলেন না, তিনি অনেক নূতন জিনিসের মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, এবং বীজগণিতে যেরূপ সুসম্বন্ধ জ্ঞানের পরিচয় দেন অন্য কোন গণিতজ্ঞের মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। দুঃখের বিষয়, ভাস্কর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন ইউরোপে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজন্মের ঊষাকাল এবং ভারতবর্ষে প্রদোষকাল, যদিচ অতি উজ্জ্বল প্রদোষকাল। প্রায় আমাদের কাল পর্যন্ত ভাস্কর তাঁহার জাতির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ।*

পশ্চিমঘাটে সহ্য পর্বতের নিকট কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত বিজ্জবিড় বা আধুনিক বিজাপুরে ভাস্করের বাস ছিল। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কনাড়া ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ চূড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। নাসিক হইতে ৭০ মাইল দূরে চালিস গাঁ নামক স্থানে ভাউদাজী যে তাম্রফলক আবিষ্কার করেন তাহা হইতে ভাস্করের কুল ও পূর্বপুরুষের পরিচয় জানা যায়। বিদ্বান, পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্ হিসাবে ভাস্করের পূর্বপুরুষদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ভাস্কর তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচনা করেন ৩৬ বৎসর বয়সে ১০৭২ শকে বা ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' লিখিবার প্রায় ৩৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (সার্টনের মতে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি 'করণ-কুতূহল' নামে একটি করণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি প্রায় ৭০ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। ভাস্কর কর্তৃক রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'সর্বতোভদ্র যন্ত্র' নামে কাল-পরিমাণ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' চারখণ্ডে প্রণীত : (১) লীলাবতী, (২) বীজগণিত, (৩) গ্রহগণিতাধ্যায়, ও (৪) গোলাধ্যায়। প্রথম দুইটিতে গণিত (পাটীগণিত ও বীজগণিত) ও শেষোক্ত দুই খণ্ডে জ্যোতিষ আলোচিত হইয়াছে।

---

* *Introduction to the History of Science,* Vol. II; p. 212.

ভাস্করের পাটীগণিত 'লীলাবতী'র নাম জগদ্বিখ্যাত। পাটীগণিতের নাম কেন 'লীলাবতী' রাখা হইয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। একটি প্রবাদ এই যে, লীলাবতী ভাস্করের কন্যা ছিলেন। বাল্যবিধবা কন্যাকে পাটীগণিত শিখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'র পাটীগণিত খণ্ডটি রচনা করেন এবং কন্যার নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন 'লীলাবতী'। আর একটি প্রবাদ অনুসারে, লীলাবতী ছিলেন ভাস্করের সহধর্মিণী; সন্তান না হওয়ায় দুঃখিনী পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থের ঐরূপ নাম দেন। এই সকল প্রবাদ ও কিংবদন্তীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। 'অয়ি বালে লীলাবতী', 'ব্রূহি সখে', 'ব্রূহি কান্তে', 'বৎসে', 'বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে' ইত্যাদি যে সকল সম্বোধন লীলাবতীতে দেখা যায়, তাহা কন্যা বা ভার্যার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। লীলাবতী হয়ত কোন কাল্পনিক নাম। তারপর 'লীলাবতী' শব্দের অর্থ 'গুণসম্পন্না'। 'লালিত্য লীলাবতী' মাধুর্যগুণসম্পন্না বলিতে সম্ভবতঃ তিনি নিজের গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'কেই বুঝাইয়াছেন। স্বকৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার বিশেষণ ব্যবহার করা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিবিরুদ্ধ ছিল না।

গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় আলোচনায় ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর ও পদ্মনাভর গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীধরের বীজগণিতের কোন খোঁজ মিলে নাই; পদ্মনাভর বীজগণিতও এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আছে। বীজগণিতের এক আলোচনা প্রসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট রাশিকে শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে কি হইতে পারে ভাস্কর তাহা যথাযথ নির্ণয় করেন। তারপর ঋণাত্মক রাশিকে ঋণাত্মক রাশির দ্বারা গুণ করিলে $[(-1)\times(-1)=+1]$ যে ধনাত্মক রাশি পাওয়া যায় এবং ঋণাত্মক ও ধনাত্মক রাশির গুণফল $[(-1)\times(+1)=-1]$ যে ঋণাত্মক তিনি তাহা দেখান। অজ্ঞাত রাশি প্রকাশ করিতে দেবনাগরী বর্ণমালার ব্যবহার তিনি প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন প্রকার দ্বিঘাত সমীকরণকে প্রথমে এক সাধারণ আকারে রূপান্তরিত করিয়া তাহাদের সমাধান সম্পাদন করিবার পদ্ধতি ভাস্কর উদ্ভাবন করেন। বিশেষ ধরনের কয়েকটি ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানও তিনি নির্ণয় করেন। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সমীকরণগুলি হইল এই প্রকার :

$$N x^2 + c = y^2$$
$$N x^2 + 1 = y^2$$

পাশ্চাত্ত্য গণিতে ইহাদের নাম পেলিয়ান সমীকরণ। চক্রাকার পদ্ধতিতে (cyclic method) তিনি ইহাদের সমাধান করেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য, ভাস্করের পূর্বে ব্রহ্মগুপ্ত ও শ্রীপতি এই জাতীয় সমীকরণের সমাধান আলোচনা করিয়াছিলেন।

জ্যামিতিতে সমকোণী ত্রিভুজ ও সুষম বহুভুজের বিচার হইতে তিনি π -এর মান ৩৯২৭/১২৫০ এবং ৭৫৪/২৪০ অর্থাৎ ৩·১৪১৬৬৬ নির্ণয় করেন। এই কার্যে তিনি ৩৮৪ বাহুর একটি সুষম বহুভুজ ব্যবহার করেন। এইভাবে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্রসর হইবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি গোলকের তল ও ঘন নির্ণয় করেন। তাঁহার এই পদ্ধতি অনেকটা সমাস-গণিতের (integral calculus) অনুরূপ। সুতরাং নিউটন ও লাইব্‌নিৎজের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ভাস্করের পদ্ধতিতে সমাস-গণিতের আভাস পাওয়া যায়।

গ্রহের 'তৎকালিক গতি' (instantaneous motion) নির্ণয়ে ভাস্কর যে ব্যাস-গণিতের (differential calculus) মূলতত্ত্ব প্রয়োগ করেন, স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় তাহা প্রমাণ করেন। পূর্বে হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা পর পর দুই দিন একই সময়ে কোন গ্রহের দেশান্তর নির্ণয় করিয়া তাহার দৈনিক গতি বাহির করিত। ভাস্কর এই গতিকে স্থূল গতি নামে অভিহিত করেন। ইহার পরিবর্তে গ্রহের সূক্ষ্ম গতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তিনি যে 'তৎকালিক গতি'র পরিকল্পনা এবং তাহা নির্ধারণ করিতে যে প্রণালীর উদ্ভাবন করেন তাহা

মূলতঃ ব্যাস-গণিতের পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নহে। তৎকালিক গতি নির্ণয়ে কালের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ প্রয়োজন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায় কালের এক ক্ষুদ্র বিভাগের নাম 'ক্ষণ'। এক ক্ষণ হইল $\frac{২}{৪৫}$ সেকেন্ড। ভাস্কর ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর সময়ের ভাগ 'ত্রুটি' ব্যবহার করেন। এক 'ত্রুটি' হইল এক সেকেন্ডের প্রায় চৌত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজজ্যোতিষী স্পটিশউড ভাস্করের এই আবিষ্কারে রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশংসাসূচক ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন :—

> "That the penetration shewn by Baskara in his analysis is in the highest degree remarkable ; that the formula which he establishes and his method of establishing it, bear more than a resemblance—they bear a strong analogy to the corresponding process in modern mathematical astronomy ; and that the majority of scientific persons will learn with surprise the existence of such a method in the writings of so distant a period and so remote a region."

তবে ভাস্করের এই পদ্ধতি যে ব্যাস-গণিতের পূর্বাভাস, বাপুদেব শাস্ত্রীর এই উক্তিকে স্পটিশউড অতিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার আপত্তির কারণ দ্বিবিধ : (১) এই প্রণালীতে যে স্থূল মান বাহির হয় ভাস্কর তাহা বলেন নাই, এবং (২) অতি সূক্ষ্ম সময় ও স্থানের উল্লেখ তিনি করেন নাই। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইউরোপীয় গণিতজ্ঞগণও ব্যাস-গণনার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দ্বারা যে স্থূল মান নির্ণয় সম্ভবপর সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন অনেক পরে।* সময়ের সূক্ষ্ম ব্যবহার সম্বন্ধে ভাস্করের যে অতি স্পষ্ট ধারণা ছিল তাহা 'ত্রুটি' ব্যবহারের মধ্যেই সুপরিস্ফুট। তারপর ত্রিকোণমিতির সাইন-সারণী প্রণয়নে তিনি যে ধরনের গণনা অবলম্বন করেন তাহাতেও তিনি ব্যাস-গণিতের মূলতত্ত্ব প্রয়োগ করেন।

ত্রিকোণমিতির এই সাইন-সারণী প্রণয়নও ভাস্করের গাণিতিক প্রতিভার আর একটি দৃষ্টান্ত। প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে ৩°৪৫′ (বা ২২৫′) অন্তর ০ হইতে ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে ২৪টি বিভিন্ন কোণের সাইন কোণানুপাত নির্ণীত দেখা যায়। ভাস্কর আরও ক্ষুদ্র কোণের সাইন ও কোসাইন কোণানুপাত বাহির করেন। যেমন,

সাইন ১° = $\frac{১০}{৫৭৩}$,
কোসাইন ১° = $\frac{৬৫৬৮}{৬৫৬৯}$,

ভাস্কর দেখান যে, একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধি d ও p হইলে এবং তাহার এক চাপ ও জ্যা যথাক্রমে a ও c হইলে, এই জ্যা, চাপ, ব্যাস ও পরিধির মধ্যে সম্পর্ক নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায় :—

$$c = \frac{4\,da(p-a)}{5/4\,p^2 - a\,(p-a)}\dagger$$

ভাস্কর সম্ভবতঃ তলটানের (surface tension) কথা জানিতেন। জলের উপর তৈল ঢালিলে তাহা যে জলের উপর ছড়াইয়া পড়ে এই তথ্য তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য অতি প্রাচীন আবিষ্কার। প্রাচীন গ্রীক নাবিকেরা ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের উপর তৈল ঢালিয়া দিত।

---

* B. N. Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, p. 78-79.
† *Introduction to the History of Science*, Vol. II ; p. 212.

ভাস্করের প্রতিপত্তি ও প্রভাব এদেশে বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সিদ্ধান্ত-শিরোমণির বহু টীকা ও সমালোচনা এই গ্রন্থের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১২০৬) ভাস্করের এক প্রপৌত্র সিদ্ধান্ত-শিরোমণির চর্চার জন্য এক বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপি

বেদোত্তর যুগের ইহা একটি প্রাচীন গাণিতিক গ্রন্থ। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার হইতে ৫০ মাইল দূরে মর্দানের কাছে বাখ্‌শালী নামক স্থানে এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়। পাণ্ডুলিপিটি এখন অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারের একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ হোয়ের্নলে ও জর্জ কে এই পাণ্ডুলিপি ও ইহাতে আলোচিত গাণিতিক বিষয় সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। হোয়ের্নলের অভিমত, ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী; পাণ্ডুলিপির বর্ণমালা ও ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ হইতে জর্জ কে দেখাইয়াছেন যে, সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে কি তাহারও কিছু পরে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুলিপির রচয়িতা জনৈক শৈব ব্রাহ্মণ গণিতজ্ঞ। ভূর্জপত্রে এক প্রকার অসংলগ্ন সংস্কৃত ভাষায় 'শারদা' অক্ষরে ইহা রচিত হইয়াছিল। 'শারদা' মূল ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত এক প্রকার প্রাচীন ভারতীয় লিপি। পাণ্ডুলিপির প্রায় অর্ধেক অংশই এরূপ খারাপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাহার পাঠোদ্ধার দীর্ঘ পরিশ্রম ও গবেষণার পর সম্ভবপর হইয়াছে।

গ্রন্থে একঘাত, দ্বিঘাত ও দ্বিতীয় মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান-পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। বর্গমূলের স্থূল মান নির্ণয়, সমান্তর প্রগতি ও কয়েকটি জটিল শ্রেণীর আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। এইরূপ একটি জটিল শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইতেছে :

$$x\,(1-a_1)\,(1-a_2)\;\;.\;.\;.\;.\;\;(1-a_n)=p.$$

কয়েকটি অধ্যায়ে আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি ও পরিমিতি সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্নের আলোচনা আছে।

সমস্যার সমাধানে মোটের উপর পাটীগণিতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে ভাবে সাধারণ মীমাংসা ও সমাধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাণ্ডুলিপিটিকে বীজ-গণিতের গ্রন্থও বলা চলে। গাণিতিক সমস্যা-সমাধান-কল্পে গ্রন্থকার পাঁচটি বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—(১) সূত্রম্‌, (২) উদাহরণম্‌, (৩) স্থাপনম্‌, (৪) করণম্‌ ও (৫) প্রত্যয়ম্‌। প্রশ্নের সদুত্তর বাহির করিতে হইলে এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহাতে অজ্ঞাত রাশির ব্যবহারও সুস্পষ্ট। 'যদৃচ্ছা', 'বাঞ্ছা', 'কামিক' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অজ্ঞাত রাশিকে বুঝানো হইত। ঋণাত্মক রাশি নির্দেশ করিতে হইলে সেই রাশির অব্যবহিত পরে '+' চিহ্নটি ব্যবহৃত হইত।

অধ্যাপক সার্টন মনে করেন, মহাবীরের 'গণিতসারসংগ্রহে'র সহিত এই গ্রন্থের কিছু কিছু মিল আছে। দুই এক জায়গায় আরব্য গণিতের প্রভাবও বর্তমান। ষষ্ঠিক ভগ্নাংশের আলোচনা এবং স্থূল বর্গমূল নির্ণয়কল্পে

$$\sqrt{(A+b)}=A+b/2A$$

নিয়মের ব্যবহার হইতে সার্টন ঐস্লামিক প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন।*

---

* *Introduction to the History of Science*, Vol. II, Part I ; p. 215.

২.২। গণিত

দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও শূন্যের আবিষ্কার

দশমিক অর্থাৎ দশ ধরিয়া গণনা করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে, মিশরে, ব্যাবিলনে ও চীনে এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায় এবং সম্ভবতঃ স্বাধীনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। অনুমান হাতের বা পায়ের দশটি আঙুলের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। দশমিক ছাড়া ব্যাবিলনীয়দের দ্বাদশিক ও ষাষ্ঠিক পদ্ধতির আবিষ্কার ও ব্যবহারের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।* সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য সঙ্কেতের প্রয়োজন। যত অল্পসংখ্যক সঙ্কেতের ব্যবহার করা যায় ততই সুবিধা। কিউনিফর্ম লিপির সাহায্যে ব্যাবিলনীয়েরা, হায়রোগ্লিফিকের সাহায্যে মিশরীয়রা, গ্রীক ও কয়েকটি ফিনিশীয় বর্ণমালার সাহায্যে গ্রীকরা সংখ্যা প্রকাশের নানা চেষ্টা করিয়াছে। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপির সাহায্যে ভারতীয়রাও এ সম্বন্ধে চেষ্টার কসুর করে নাই। কিন্তু বহু সঙ্কেতের ব্যবহার এড়াইতে না পারায় ইহাদের কোনটাই সন্তোষজনক হয় নাই। ক্ষুদ্র সংখ্যা প্রকাশের বেলায় বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে না হইলেও বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলেই এইসব পদ্ধতির অসুবিধা ও অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

মাত্র দশটি সঙ্কেতের (শূন্য ধরিয়া) সাহায্যে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের নিয়মে ছোট-বড় যে কোন সংখ্যা প্রকাশ করা যায়, এই আবিষ্কারের দ্বারা হিন্দুরা অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে যুগান্তর আনয়ন করে। আমরা জানি দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের নিয়মে সংখ্যার ঘরগুলি একক, দশক, শতক, সহস্রক ইত্যাদি ভাগে দক্ষিণ হইতে বামে ভাগ করা হয়; প্রত্যেকটি ঘরের মান পূর্ববর্তী ঘরের দশগুণ। এক একটি ঘরে প্রয়োজনমত দশটি সঙ্কেতের যে কোন একটি বসাইয়া আমরা যে কোন সংখ্যা পাইতে পারি। এই নিয়মের পূর্বে তাহা করা হইত না; তখন দশক, শতক, সহস্রক ইত্যাদি দশগুণ অন্তর প্রত্যেকটি রাশির জন্য ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিয়া সাধারণতঃ যৌগিক নিয়মে সংখ্যা প্রকাশ করা হইত। প্রাথমিক ব্রাহ্মীলিপিতে আমরা দেখিয়াছি, ২৮৯ সংখ্যাটি নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা হইত :†

$$২৮৯ = ২০০ + ৮০ + ৯ = \text{[illegible]}$$

দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার-কাল : এখন অঙ্কপাতনের এই দশমিক স্থানিক নিয়ম ভারতবর্ষে কখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল? বিভূতিভূষণ দত্ত ও অভধেশনারায়ণ সিংহ দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত অন্ততঃ ৩৩টি লিপি ও তাম্রশাসনে এইরূপ অঙ্কপাতনের দৃষ্টান্ত আছে। অগ্নিপুরাণে ও বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে ইহার ব্যবহার সুস্পষ্ট। আর্যভট, ভাস্কর প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের বিরচিত গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের ব্যবহার আছে। এইসব প্রমাণ হইতে তাঁহারা মনে করেন, খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্বত্র এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়াছিল। একটি পদ্ধতির প্রথম আবিষ্কার ও তাহার ব্যাপক প্রচলনের মধ্যে সে যুগে বেশ কয়েক শত বৎসরের ব্যবধান থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া ডাঃ দত্ত ও ডাঃ সিংহ অনুমান করেন, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে সম্ভবতঃ এই আবিষ্কার সংঘটিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান অমূলক নহে। গ্রীকরা বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে; কিন্তু খ্রীঃ অঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে এই পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করে

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৭৭।

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৯।

নাই। অর্থাৎ ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহারের অবস্থায় পৌঁছিতে গ্রীক সংখ্যা-পদ্ধতির প্রায় আট শত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতির কথা ক্রমে আরব দেশে ও ইউরোপে রাষ্ট্র হইবার পরেও প্রায় ছয়-সাত শত বৎসরের মধ্যে এই অতি সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যে প্রথম আবিষ্কার এবং তাহার ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রচলনের মধ্যে অনুরূপ কালের ব্যবধান ঘটিয়াছিল তাহা মনে করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ডাঃ দত্ত ও ডাঃ সিংহ লিখিয়াছেন :

> "The exact date of the invention, however, would be nearer to the 1st century B.C. or even earlier, because for a long time after its invention, the system must have been looked upon as a mere curiosity and used simply for expressing large numbers. . . . There should, therefore, be a gap of about eight centuries between the time of invention and its coming into popular use, just as was the case with the Greek alphabetic notation.*

শূন্য আবিষ্কার : দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কারের সহিত 'শূন্যে'র আবিষ্কার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ এরূপ অঙ্কপাতন পদ্ধতি শূন্যের আবিষ্কার সাপেক্ষ। মনে করা যাক, সাত সহস্র চব্বিশ অঙ্কে প্রকাশ করিতে হইবে। স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির পূর্বে ইহা লিখিবার একমাত্র উপায় ছিল সাত সহস্রের জন্য একটি প্রতীক (ইহা অবশ্য সহস্র ও সাতের প্রতীকদ্বয় মিলাইয়া লেখা হইত), কুড়ির জন্য একটি ও চারের জন্য একটি প্রতীক ব্যবহার করা। দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে ইহাকে প্রকাশ করিতে হইলে সহস্রের ঘরে সাত, শতের ঘরে শূন্য বা কিছুই নহে, দশকের ঘরে দুই ও এককের ঘরে চার লিখিতে হইবে। এখন এই শতকের ঘরের ফাঁক শূন্য বা অনুরূপ কোন প্রতীকের সাহায্যে ভরাট করিবার উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত যে স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির উদ্ভব সম্ভবপর নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই মনে হয় খৃীঃ পূঃ দ্বিতীয় কি প্রথম শতাব্দীতে, অর্থাৎ দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কারের সময় হিন্দুরা 'শূন্য' ও তাহার প্রতীক আবিষ্কার করিয়াছিল। এক হইতে নয় অঙ্কের পর দশম অঙ্কের নাম দেওয়া হয় 'শূন্যবিন্দু' ও পরে সংক্ষেপে শুধু 'শূন্য'।

পিঙ্গল কর্তৃক রচিত 'ছন্দসূত্রে' (খৃীঃ পূঃ ২০০) শূন্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আর্যভট বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন ও শূন্যের ব্যবহার অবলম্বন করা হয়। তারপর তিনি একাধিকবার গণনায় স্পষ্টভাবে শূন্যস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।† সুতরাং শূন্য ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির সহিত তিনি যে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎ সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বরাহমিহির বার বার শূন্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এক, দুই, তিন প্রভৃতি যেমন এক একটি সংখ্যা বরাহমিহির শূন্যকেও সেইরূপ একটি সংখ্যা জ্ঞান করিয়া গণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। বরাহমিহিরের সমসাময়িক জিনভদ্রগণির (খৃীঃ পূঃ ৫২৯-৫৮৯) রচনায় 'শূন্য' ব্যবহারের আরও নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি একাধিক 'শূন্য' সংবলিত বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—২২৪, ৪০০, ০০০, ০০০; ৩,২০০, ৪০০, ০০০, ০০০। কথায় এই

* B. Datta and A. N. Singha, *History of Hindu Mathematics*, Part I ; p. 51.

† D. E. Smith and L. C. Karpinski, *The Hindu Arabic Numerals*, Boston and London, 1911 ; p. 43.

সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করা হইয়াছে এইভাবে : বাইশ চুয়াল্লিশ, আট শূন্য; বত্রিশ দুই শূন্য, চার আট শূন্য ইত্যাদি। জিনভদ্রগণির রচনার আর এক জায়গায় এক বিরাট ভগ্নাংশের লঘুকরণের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহাতেও শূন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অঙ্কটি এইরূপ :

$$২৪১৯৬০\frac{৪০৭১৫০}{৪৮৩৯২০} = ২৪১৯৬০\frac{৪০৭১৫}{৪৮৩৯২}$$ *

উপরিউক্ত ভগ্নাংশের লব ও হর হইতে শূন্য অপসারণ করিবার নাম 'অপবর্তন'। গণনা কার্যে শূন্য ব্যবহারের ইহা একটি প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত।

শূন্যের সাহায্যে গণনার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। যেমন :

"| ৮৮০ | ৯৬৪ | গুণ করিলে দাঁড়ায় | ৮৪৮৩২০ |
| ৮৪ | ১৬৮ | | ১৪১১২ |

চল্লিশের বর্গ |১৬০০|। উপরিউক্ত সংখ্যার লব (৮৪৮৩২০) হইতে ইহা (১৬০০) বাদ দিলে দাঁড়ায় |৮৪৬৭২০ / ১৪১১২| ; এই ভগ্নাংশ হইতে সাধারণ গুণ বাদ দিলে উত্তর হইবে ——→ |৬০|।"

উপরিউক্ত তথ্য হইতে আমরা এখন বলিতে পারি, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের পরিকল্পনা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং আর্যভট ও বরাহমিহিরের সময় হইতে ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ গণনার কার্যে শূন্য ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও সাধারণ হিসাবপত্রের কাজে অবশ্য শূন্যের ও সেই সঙ্গে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের প্রচলন ঘটিয়াছিল অনেক পরে। স্মিথ্ ও কার্পিন্‌স্কি লিখিয়াছেন—

> "The élite of the mathematicians may have known the zero even in Aryabhata's time, while the merchants and the common people may not have grasped the significance of the novelty until a long time after."

তাঁহাদের মতে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনও স্থানে সর্বপ্রথম শূন্যের ব্যবহার ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং তথা হইতে এই উপমহাদেশের সর্বত্র ও পরে ভারতের বাহিরে ধীরে ধীরে ইহা ছড়াইয়া পড়ে।

শূন্যের প্রতীক : শূন্যের প্রতীক হিসাবে প্রথমে শুধু একটি বিন্দু [·] ব্যবহৃত হইত। বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে বিন্দুর দ্বারাই আমরা শূন্যকে প্রকাশ করিতে দেখি। 'বাসবদত্তা' কাব্যের রচয়িতা বিখ্যাত কবি সুবন্ধুর (খ্রীঃ অঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) রচনাতেও শূন্যের প্রতীক-হিসাবে বিন্দুর ব্যবহার উল্লিখিত দেখা যায়। তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে শূন্যের প্রতীক-হিসাবে ক্ষুদ্র বৃত্তের ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে গোয়ালিয়র লিপিতে (ভোজ-দেবের রাজত্বকালে খ্রীঃ অঃ ৮৭৬)। এই লিপিতে ৫০ ও ২৭০ লেখা হইয়াছে এইভাবে—৫০,২৭০।

ক্ষুদ্র বৃত্তের দ্বারা শূন্যের নির্দেশ যে হিন্দুদের আবিষ্কার তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন বিন্দুর পরিবর্তে বৃত্তের ব্যবহারের ধারণা কি ভাবে তাহাদের মাথায় আসিল সে বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। নানাঘাট লিপিতে দশ, কুড়ি,

---

* Datta and Singh, *loc cit*, Pt. I; p. 79.

ভাষায় তর্জমা করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের সাহিত্য ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছে, এবং পরে প্রভূত মৌলিকতার পরিচয় দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে তাহাদের অবদান রাখিয়া গিয়াছে।

প্রথম দুই শত বৎসরের শিক্ষানবিসির সময়ে তাহারা হিন্দু সংখ্যা ও অঙ্কপাতন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করে। আরবদের অভ্যুত্থানের বহু পূর্ব হইতেই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপের পণ্ডিতগণ ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতির কথা অবগত ছিল। ভোয়েপ্‌কে প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে ভারতীয় সংখ্যা ও অঙ্কপাতন পদ্ধতি আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে ও তথা হইতে মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই জ্ঞান ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে গুবার* নামে যে সংখ্যালিপি মধ্যপ্রাচ্যে, স্পেনে ও ইউরোপে প্রসারলাভ করে তাহার বিবর্তনের সহিত ভারতীয় সংখ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। গুবার সংখ্যা অবশ্য সংখ্যাবিবর্তনের একটি অপরিণত অবস্থা এবং আরবরা প্রথম অবস্থায় এই গুবার সংখ্যাই গ্রহণ করে। আরব্য সংখ্যালিপি অনেকটা গুবার সংখ্যালিপির ছাঁচে ঢালা।

ভারতের বাহিরে হিন্দু সংখ্যা ও অঙ্কপাতন পদ্ধতির সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা পাই সেভেরাস্‌ সেবক্‌তের (সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ) রচনায়। সিরিয়ার অন্তর্গত নিসিবিসে সেবক্‌তের জন্ম হয়। যেসব সিরীয় ও নেষ্টোরীয় খৃষ্টান পণ্ডিতদের রচনা ও গ্রন্থাদি অনগ্রসর আরবদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করে সেবক্‌ত তাহাদের অন্যতম। সেবক্‌ত হিন্দু সংখ্যা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা অকপটে স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে গ্রীক পণ্ডিতদের কথাই যে শেষ কথা নহে, অন্যান্য জাতিরাও যে নানা মৌলিক আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে ইহা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু সংখ্যার কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, "সিরীয়দের হইতে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জাতি হিন্দুদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনাই আমি করিব না, এমন কি তাহাদের জ্যোতিষ সম্বন্ধেও না, যে শাস্ত্রে অতি সূক্ষ্ম আবিষ্কারসমূহের জন্য তাহারা গ্রীক ও ব্যাবিলনীয়দেরও হার মানাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের গণনাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। মাত্র নয়টি চিহ্নের দ্বারা এই গণনা সম্পাদিত হয়। যেসব গ্রীকদের বিশ্বাস তাহারাই কেবল বিজ্ঞানের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এই তথ্য (হিন্দু সংখ্যা) সম্বন্ধে তাহারা অবহিত হইবার চেষ্টা করুক। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিছু কিছু অধিকার রাখে এরূপ আরও অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে।"

আরবরা সেভেরাস্‌ সেবক্‌তের গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে হিন্দু সংখ্যার কথা অবগত হইয়াছিল। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে খলিফা আল্‌-মানসুরের রাজত্বকালে ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ড-খাদ্যক' বাগদাদে আনীত হইয়া আরবী ভাষায় অনূদিত হইলে এই গ্রন্থদ্বয়ও হিন্দু সংখ্যার কথা আরবদের মধ্যে প্রচারের ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ অনূদিত হইবার কিছু পরে বিখ্যাত আরব গণিতজ্ঞ আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাঁহার বিলম্ব হয় না, এবং তাঁহার প্রণীত পাটীগণিতে তিনি প্রথম হইতে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির এই পাটীগণিত ও হিন্দু দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির নানা আলোচনা আরবদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রচার করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। অধ্যাপক সার্টনের মতে,

> "The earliest Muslim exponent was Al-Khwarizmi (9th Century) whose work remained the fountain head on the subject (Hindu numerals)."†

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৭৬।

† *Introduction to the History of Science*, Vol. II ; p. 4.

আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির দুইশত বৎসর পরে আল্‌-বীরুণী হিন্দু সংখ্যা সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল সন্দর্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপে হিন্দু দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির প্রচলন : দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ইউরোপ আরবদের নিকট হইতে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির কথা অবগত হয়, এই কথাই ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ লিখিয়া থাকেন। আরবদের নিকট হইতে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য ইহাকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা আরব্য সংখ্যা পাতন পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পর্যন্ত এই ভুলের সংশোধন হয় নাই। কিন্তু আরবদের বহু পূর্বে হিন্দু সংখ্যার কথা যে ইউরোপে পৌঁছিয়াছিল সে বিষয় এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

রোমক গণিতজ্ঞ ও পণ্ডিত বোয়েথিয়াসের (৪৭৫-৫২৪) জ্যামিতিতে হিন্দু সংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বোয়েথিয়াস্‌ প্রাচীন গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের শেষ প্রদীপ। তাঁহার গাণিতিক খ্যাতি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। তবে জ্যামিতিক আলোচনার মধ্যে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে হিন্দু সংখ্যার উল্লেখ ও আলোচনার নমুনা হইতে অনেকের অভিমত এই জ্যামিতি সম্ভবতঃ একটি জাল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ জাল মনে করিবার স্বপক্ষে কয়েকটি কারণ হইল—(১) বোয়েথিয়াস তাঁহার বিখ্যাত পাটীগণিতে হিন্দু সংখ্যার কোন উল্লেখ করেন নাই; এই পাটীগণিত গ্রীক গণিতজ্ঞ নিকোমেকাসের পাটীগণিতের আদর্শে রচিত। (২) বোয়েথিয়াসের সমসময়ের ও পরবর্তী কালের ল্যাটিন গণিতজ্ঞগণ, যেমন ক্যাপেলা, কেহই হিন্দু সংখ্যার উল্লেখ করেন নাই। (৩) সংখ্যার ছাঁচগুলি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ এবং ইহা আরবদের অনুকরণে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সাজানো। (৪) গ্রন্থের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে সংখ্যার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। (৫) মধ্যযুগে গ্রন্থজালিয়াতির ও লিপিকারদের খুসীমত অংশ যোজনার ব্যাপকতা। বোয়েথিয়াসের জ্যামিতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও হিন্দু সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশভ্রমণ ইত্যাদির মারফত সে সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তাহার সুযোগে বণিক ও পর্যটকদের পক্ষে হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতির কথা অবগত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নহে। সম্ভবতঃ এই জ্ঞান শুধু বণিক ও পর্যটক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইউরোপের সেই অন্ধকার যুগে সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কোনওরূপ উৎসাহ ও কৌতূহল না থাকায় এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা গ্রন্থাদি রচনা সম্ভবপর হয় নাই। এজন্য ল্যাটিন ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দীর অর্থাৎ বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্মের পূর্বে হিন্দু সংখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রামাণিক লিপি পাওয়া যায় না। এই প্রামাণিক লিপির অভাবকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বলিয়া মনে করা নিশ্চয়ই ভুল হইবে।

> "That they were more or less known early in the Middle Ages, certainly to many merchants of Christian Europe, and probably to several scholars, but without the zero, is hardly to be doubted. The lack of documentary evidence is not at all strange, in view of all of the circumstances."*

ইউরোপে হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতির সর্বপ্রথম প্রচারক সম্ভবতঃ আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির পাটীগণিতের ল্যাটিন অনুবাদক আদেলার্দ অব্‌ বাথ। তাঁহার সমসাময়িক আব্রাহাম ইব্‌ন্‌ এজ্‌রা আরব্য সংখ্যা পদ্ধতি অবলম্বনে এক নূতন সংখ্যাপাতন পদ্ধতি রচনা করিয়া তাহা ইহুদীদের মধ্যে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করেন। আদেলার্দ ও আব্রাহামের প্রচেষ্টা বিশেষ

---

* *The Hindu Arabic Numerals ;* p. 90.

ফলবতী হয় নাই। সুপ্রাচীন রোমক সংখ্যা ও গণনাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত সাধারণ লোক অত সহজে এক নূতন পদ্ধতিকে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

ইহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফিবোনাচ্চি বা লিওনার্দো পিসানোর তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিবোনাচ্চিই ইউরোপে মধ্যযুগে পাটীগণিত চর্চার প্রথম প্রবর্তক। এই পাটীগণিতের মূল ভিত্তি দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের ব্যবহার। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Liber abaci* তে (প্রকাশ-কাল ১২০২) হিন্দু সংখ্যার যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়, ইউরোপে তাঁহার পূর্বে বা পরে হিন্দু সংখ্যার উপর এরূপ আলোচনা খুব কমই দেখা যায়। এ বিষয়ে সর্বকালের জন্য ইহা একটা উৎকৃষ্ট আলোচনাও বটে। স্যারাসেনদের দেশে অবস্থানকালে ফিবোনাচ্চি মুসলমান গণিতজ্ঞদের নিকট এই পদ্ধতি শিক্ষা করেন; তবে তাঁহার রচনা কোন আরবী গ্রন্থের নকল অনুবাদ নহে, এই আলোচনায় তিনি যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। ভিল্‌দিউ ও স্যাক্রোবস্কো প্রমুখ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণ ফিবোনাচ্চির পাটীগণিত ও তাঁহার ব্যাখ্যাত দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি প্রচার করেন। দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন আরবদের আবিষ্কার, স্যাক্রোবস্কোর রচনায় এরূপ উল্লেখ প্রথম দেখা যায় এবং পরবর্তী ল্যাটিন লেখকগণ এই ভুলই চালাইয়া গিয়াছিলেন। ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে এই পদ্ধতি প্রচারে ইহুদীদের তৎপরতা বিশেষ লক্ষণীয়। এজন্য ইহা ইহুদীদের আবিষ্কার এইরূপ কথাও বহুদিন পর্যন্ত একশ্রেণীর লেখকদের রচনায় প্রচারিত হইয়াছিল।

যাহা হউক ইউরোপে হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতির প্রচারে *Liber abaci* র অবদান অতুলনীয়। ফিবোনাচ্চির মত প্রতিভাবান গণিতজ্ঞের সমর্থন ও চেষ্টা নিঃসন্দেহে ইহার প্রচার ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তথাপি আশানুরূপ দ্রুতগতিতে ইউরোপ এই নূতন পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নাই। ফিবোনাচ্চির সমসাময়িক পদার্থবিদ্‌ ও গণিতজ্ঞ জোর্দানাস্‌ নেমোরারিয়াস্‌ হিন্দু অঙ্কপাতনকে সম্পূর্ণ অবহেলা ও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত একাধিক গাণিতিক গ্রন্থে এই পদ্ধতির এতটুকু উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আল্‌ফন্‌সোর বিখ্যাত জ্যোতিষীয় গ্রন্থেও (১২৫২) হিন্দু সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই। এই গ্রন্থ আরবী ও ল্যাটিন উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। আরবী ভাষায় লিখিবার সময় আরবী সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় লিখিবার সময় অনুবাদকেরা রোমক সংখ্যা-হরফই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্‌ফন্‌সোর জ্যোতিষীয় গ্রন্থের সম্পাদকগণ আরবী অঙ্কপাতন পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহা যে এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি ও নূতন পাটীগণিত এই সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আরবী সংখ্যা-হরফগুলি আরবী ভাষারই এক বিশেষত্ব; সুতরাং ভাষান্তরের সময় আরবী অক্ষরের বদলে যেমন ল্যাটিন অক্ষরের ব্যবহার অপরিহার্য, সেইরূপ অপরিহার্য আরবী সংখ্যার বদলে রোমক সংখ্যার ব্যবহার। দশমিক স্থানিক অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের অক্ষমতাই ইউরোপে ইহার প্রবর্তনে এত অধিক বিলম্বের প্রধান কারণ। তারপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের বিশেষ কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। হিসাব নিকাশের কার্যে 'আবাকাসই' যথেষ্ট ছিল এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার ও জটিলতা তখন পর্যন্ত এতদূর বৃদ্ধি পায় নাই যাহাতে নূতন গণনা-পদ্ধতির সুবিধা স্বভাবতঃই উপলব্ধ হইতে পারে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক সার্টনের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

> "The delay in the acceptance of Hindu numerals was largely due to material causes. In spite of their advantages they were not actually needed by business men because most computations were done by mechanical means (abacus, counters) only the

results being written down. There was no social need for the new numerals. Nor was there for a long time any scientific need because hardly anybody realized the implications of the new symbolism. Inspite of all the explanations it had not yet dawned upon them that this was not simply a matter of new symbols, but a radically new arithmetic."*

সুতরাং দেখা যাইতেছে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি সংখ্যা সংক্রান্ত কেবল একটি বিশেষ আবিষ্কার মাত্র নহে, বস্তুতঃ ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পাটীগণিতের আবিষ্কার। এইরূপ পাটীগণিতের সহিত ইতিপূর্বে ইউরোপের কোনও পরিচয় ছিল না; তাই বর্ণচোরা আমের মত ইহার প্রকৃত তাৎপর্যও তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

পাটীগণিত

সাধারণ চারি নিয়ম : দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কারের পর পাটীগণিতের আমূল পরিবর্তন-সাধন অনিবার্য হইয়া পড়ে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এই চারি নিয়ম সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির উদ্ভব লক্ষ্য করি। হিন্দুরা পূর্বে বাম হইতে দক্ষিণে সংখ্যা লিখিত, যেমন লিখিত বর্ণমালার সাহায্যে তাহাদের ভাষা। তাই যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি পদ্ধতিতেও বাম হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইবার রীতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২৫৪-এর সহিত ৬৬৩ যোগ দিতে হইবে। ২+৬=৮; তারপর ৫+৬=১১; ৮এর সহিত ১১র ১ যুক্ত হইয়া হইবে ৯; এবং ৪+৩=৭; সুতরাং যোগফল ৯১৭। গুণ সম্বন্ধে একাধিক পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়। মনে করা যাক, ৫৬৯কে ৫এর দ্বারা গুণ করিতে হইবে। প্রথমে ৫×৫=২৫; তারপর ৬×৫=৩০, এখন ২৫এর তলায় ডান দিকে এক ঘর সরাইয়া ৩০ সংখ্যাটিকে লিখিয়া এবং ২৫এর ৫এর সহিত ৩০এর ৩ যোগ করিলে যোগফল ২৮০ হইবে। তারপর ৯×৫=৪৫; পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ০'র সহিত ৪ যোগ করিয়া পুরা গুণফলটি হইল ২৮৪৫। 'কপাট সন্ধি' পদ্ধতিতে আবার দক্ষিণ হইতে বামে গুণ করিবার পদ্ধতি দেখা যায়। বিষয়টি একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইলে সহজ হইবে। ১৩৫কে ১২র দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

সংখ্যা দুইটিকে প্রথমে বসাইতে হইবে : ১৩৫ (উপরে ১২)

১২কে ৫ দ্বারা গুণ করিয়া ফল লিখিতে হইবে : ১৩৬০ (উপরে ১২)

১২কে এখন এক ঘর বামে সরাইয়া লেখা হউক : ১৩৬০ (উপরে ১২)

১২কে ৩ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ৬ যোগ করিলে হইবে : ১৪২০ (উপরে ১২)

সেইরূপ ১২কে এক ঘর সরাইয়া ১এর সহিত গুণ করিয়া

গুণফলের সহিত ৪ যোগ করিলে দাঁড়াইবে : ১৬২০ (উপরে ১২)

উত্তর : ১৬২০।

দাবাখেলার ছকের মত গুণ্য ও গুণককে সাজাইয়া গুণের আর একটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সতরঞ্জ পদ্ধতিতে ৭৩৫×১২র গুণ-নির্ণয় নীচের দৃষ্টান্ত হইতে সহজে বুঝা যাইবে। জর্জ রুস্টিক কে সাহেবের অভিমত, হিন্দুদের পূর্বে আরবরাও নাকি এই পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিল।†

---

* Sarton, Vol. II ; p. 4.

† G. R. Kaye, *Indian Mathematics,* 1915 ; p. 34.

বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি আর্যভটের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান পদ্ধতি আর্যভটর পদ্ধতিরই উন্নত সংস্করণ। এই পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে ঐস্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে ও পরে ইউরোপে প্রচারিত হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পুরবাক, শুকে, লা রোশ, কাতানিও প্রমুখ ইউরোপীয় গণিতজ্ঞগণ আর্যভটর পদ্ধতিই অবিকল অনুকরণ করেন।*

৪। সতরঞ্চ পদ্ধতিতে গুণ-নির্ণয়।

ত্রৈরাশিক নিয়ম : হিন্দুরা ত্রৈরাশিক নিয়মের (rule of three) আবিষ্কর্তা। আর্যভট এই নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাখ্শালী পাণ্ডুলিপিতে ইহার আলোচনা বর্তমান, ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তী ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ বরাবর নানা পাটীগণিতীয় প্রশ্নে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'প্রত্যয় ত্রৈরাশিকেন' অর্থাৎ 'ত্রৈরাশিক নিয়মানুযায়ী প্রমাণিত হইল', এইরূপ কথা বাখ্শালী পাণ্ডুলিপির প্রায় বারটি জায়গায় উল্লিখিত দেখা যায়। ইহার একটি উদাহরণ এইরূপ :

১	১	৪	ফলং ১৮
৩	১	১	১
	২		

অর্থাৎ, ⅓ : ১½ : : ৪ : ১৮

ষোড়শ শতাব্দীতে উইলিয়ম ডিগ্স্ ত্রৈরাশিক পদ্ধতির যে বর্ণনা দেন তাহা ভারতীয় পদ্ধতির হুবহু নকল।

বীজগণিত

বীজগণিতে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে হিন্দুদিগের দান অতুলনীয়। ডায়োফ্যান্টাসের আলোচনা প্রসঙ্গে† আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বীজগণিতের বিবর্তনে তিনটি পর্যায় সুপরিস্ফুট। প্রথম পর্যায়ে বীজগণিত প্রধানতঃ আলঙ্কারিক (rhetorical) অর্থাৎ গাণিতিক সমস্যাগুলি ভাষায় ব্যক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষত্ব পরিপূর্ণ শব্দ-প্রয়োগের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যবহার, অর্থাৎ শব্দ-সংক্ষেপণ (syncopation)। ডায়োফ্যান্টাসের বীজগণিত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা সাঙ্কেতিক (symbolical) বা আধুনিক বীজ-গণিতের উদ্ভব লক্ষ্য করি। সাঙ্কেতিক বীজগণিত অর্থাৎ গাণিতিক সমস্যায় অজ্ঞাত রাশিকে বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করিবার নিয়ম প্রবর্তনের পর হইতেই আধুনিক বীজগণিতের

* A. N. Singh, Hindu Mathematics, *Science and Culture*, Vol. 3, No. 10 ; p. 523.

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৬৯-৭০।

অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়াছিল; এবং এই কার্যে হিন্দুরাই যে অগ্রণী হইয়াছিলেন ইহা এখন অধিকাংশ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের সমর্থন লাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮) এই বিদ্যার নাম দেন 'কুট্টক গণিত' বা সংক্ষেপে 'কুট্টক'। এই বিদ্যার প্রচলিত নাম 'বীজগণিত' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথুদকস্বামী (৮৬০); 'বীজ' অর্থে 'ধাতু' বা 'বিশ্লেষণ'; 'গণিত' হইল 'গণনা-পদ্ধতি'। সুতরাং ইহা যে আঙ্কিক গণনা (পাটীগণিত) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামকরণের মধ্যেই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝানো হইয়াছে। পরবর্তী গণিত-কাররা সাধারণতঃ এই নামই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তবে কোন কোন গণিতকারকে এই বিদ্যাকে 'অব্যক্ত গণিত' নামেও অভিহিত করিতে দেখা যায়। অব্যক্ত বা অজ্ঞাত রাশির সাহায্যে গণনা-পদ্ধতি যে বিদ্যার আলোচ্য বিষয় তাহাই 'অব্যক্ত গণিত'। নামের দিক হইতে সংগত হইলেও ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় না।

বীজগণিতীয় সঙ্কেত : অজ্ঞাত রাশি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি নির্দেশ করিতে হিন্দুরা নানাবিধ সঙ্কেতের ব্যবহার প্রবর্তন করে। নিয়মিতভাবে ও বিশেষ নিষ্ঠার সহিত এইসব সঙ্কেতের ব্যবহার হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য। স্থানাঙ্গসূত্রে (খৃীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) অজ্ঞাত রাশিকে বলা হইয়াছে 'যাবৎ-তাবৎ'। বাখশালী পাণ্ডুলিপিতে ইহা নির্দেশ করিতে 'যদৃচ্ছা', 'বাঞ্ছা', 'কামিক' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আর্যভট 'গুলিকা' শব্দের দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। অজ্ঞাত রাশি বা যাবৎ-তাবৎ প্রকাশ করিবার জন্য 'যা' প্রতীকটি ব্যবহৃত হইত। সুতরাং 'যা' হইল আধুনিক x-এর প্রাচীন ভারতীয় রূপ। বাখশালী পাণ্ডুলিপিতে '০' প্রতীকের দ্বারা অজ্ঞাত রাশিকে প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যে সব গাণিতিক সমস্যায় একাধিক অজ্ঞাত রাশির প্রয়োজন তাহা নির্দেশ করিতে বিভিন্ন বর্ণের নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'কালক'র (কৃষ্ণবর্ণ) 'কা' $(=y)$, 'নীলক'র (নীলবর্ণ) 'নী' $(=z)$, ইত্যাদি। তারপর যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের চিহ্ন ছিল যথাক্রমে 'যু' ('যুত' হইতে), 'ক্ষ' ('ক্ষয়' হইতে), 'গু' বা 'ভ' ('গুণিত' বা 'ভাবিত' হইতে), 'ভা' ('ভাগ' বা 'ভাজিত' হইতে)।

উদাহরণস্বরূপ, বাখশালী পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত $\begin{smallmatrix} \cdot & ৫ \\ ১ & ১ \end{smallmatrix}$ যু বলিতে বুঝিতে হইবে $\frac{x}{১} + \frac{৫}{১}$, 'যাকাভ'র অর্থ xy ।

রাশির ঘাত (power) ও মূল নির্দেশ করিতে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসারে আক্ষরিক প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন বর্গের প্রতীক 'ব', ঘনর 'ঘ', বর্গমূলের 'মূ', ইত্যাদি। এইরূপ প্রতীকের সাহায্যে রাশির বর্গ, ঘন, মূল ইত্যাদি কিভাবে প্রকাশ করা হইত তাহার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

$$\text{যা ব–কা ঘ–ভ} = (\text{যা})^{২} \times (\text{কা})^{৩} = x^2y^3$$

$$\left| \begin{matrix} ১১ & \text{যু} & ৫ & \text{মূ} & ৪ \\ ১ & & ১ & & ১ \end{matrix} \right| = \sqrt{১১+৫} = ৪$$

ঋণাত্মক রাশি : ঋণাত্মক রাশির অস্তিত্ব পরিকল্পনা হিন্দুদের আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ঋণাত্মক রাশির তাৎপর্য বুঝিবার ফলেই তাহারা দ্বিঘাত সমীকরণের যে দুইটি করিয়া মূল হয় ইহা নির্দেশ করিতে সমর্থ হয়। ভাস্কর

$$x^2 - 45x = 250$$

সমীকরণের দুইটি মূল x = ৫০ ও – ৫ বাহির করেন। ডায়োফ্যান্টাস্ ঋণাত্মক রাশি অসম্ভব মনে করিয়া বরাবর তাঁহার সমীকরণের উত্তর স্বরূপ কেবলমাত্র একটি মূলের (ধনাত্মক) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সমীকরণ সমাধানে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্বের ইহা একটি নিদর্শন।

সমীকরণ-সমাধান : এইবার আমরা হিন্দু বীজগণিতের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বিভিন্ন প্রকার সমীকরণ সমাধান হিন্দু বীজগণিতের প্রধান লক্ষ্য। সমীকরণ নামটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রহ্মগুপ্ত; একই অর্থে 'সম-করণ' কথাটিরও ব্যবহার তাঁহার রচনায় দেখা যায়। শ্রীপতির বীজগণিতে আবার 'সদৃশী-করণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সমীকরণের দুইধারের নাম **'পক্ষ'**।

বৈদিক যুগে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।* শুল্বসূত্রে দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও এই জাতীয় সমীকরণ আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বীজগণিতীয় পদ্ধতিতে সাধারণভাবে দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের নজির আমরা পাই আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর প্রমুখ বিখ্যাত বীজগণিতজ্ঞদের গ্রন্থাদিতে। ক্যান্টর সাহেব মনে করেন, এই সব নির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের হিন্দু পদ্ধতির কিছু কিছু আভাস ডায়োফ্যান্টাসের অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যেও বর্তমান। তবে হিন্দু পদ্ধতি অনেক বেশী উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ, এবং পদ্ধতিগত কিছু মিল থাকিলেও ইহা যে ডায়োফ্যান্টাস্ হইতে ধার করা তাহার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডায়োফ্যান্টাসের আগে বা পরে গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে বীজগণিতের কোনরূপ চর্চা দেখা যায় না। গ্রীক গণিতীয় গবেষণার ধারা হইতে ডায়োফ্যান্টাসের গবেষণার মূলগত পার্থক্য ও হিন্দু চিন্তাধারার সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে এইরূপ ধারণা আদৌ অমূলক মনে হয় না যে, হয়ত ডায়োফ্যান্টাস নিজেই হিন্দু গণিতীয় ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। ভারতের বাহিরে হিন্দুদের অনেক পরে নিয়মিতভাবে বীজগণিতের চর্চা আমরা লক্ষ্য করি আরবদের মধ্যে নবম শতাব্দী হইতে। ইউরোপে বীজ-গণিতের চর্চা প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দেল ফেরো, তার্তাগ্লিয়া, কার্দানো, ফেরুয়ারি, বম্বেলি, ফ্রাঁসোয়া ভিয়েতা প্রমুখ বিখ্যাত বীজগণিতজ্ঞগণের নেতৃত্বে। সুতরাং সমীকরণ সমাধান ও সাধারণভাবে বীজগণিতের গবেষণার ব্যাপারে হিন্দুরা যে আগাগোড়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, ইহা যে তাহাদের সহজাত নিগমনাত্মক চিন্তাধারার এক বিশেষ পরিণতি, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্ততঃ এই বিভাগটিতে বিদেশী পণ্ডিতদের নিকট হইতে তাহাদের যে গ্রহণ করিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না, এইরূপ মনে করাই অধিকতর যুক্তি সংগত।

দ্বিঘাত সমীকরণ : যাহা হউক, আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের আলোচনা করিতেছিলাম। ব্রহ্মগুপ্তের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার দ্বিঘাত সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন,

$$ax^2 + bx = c\ ;$$
$$bx + c = ax^2\ ;$$
$$ax^2 + c = bx.$$

ব্রহ্মগুপ্ত দেখান যে, প্রত্যেকটি সমীকরণ এক সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণের বিভিন্ন প্রকাশ। দ্বিঘাত সমীকরণের এই সাধারণ রূপটি হইল :

$$ax^2 + bx + c = o$$

দ্বিঘাত সমীকরণের এই সাধারণ রূপকে $4a$ দ্বারা গুণ করিয়া $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ সমাধান নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন শ্রীধর।

অনির্ণেয় সমীকরণ : হিন্দু বীজগণিতীয় প্রতিভার আর একটি নিদর্শন অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান। অনির্ণেয় সমীকরণ লইয়া ডায়োফ্যান্টাস্ও অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ৯০-৯১।

"But the glory of having invented *general* methods in this most subtle branch of mathematics belongs to the Indians.* অর্থাৎ গণিতের এই বিভাগে যেখানে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রয়োজন সেই বিভাগে অনির্ণেয় সমীকরণের সাধারণ সমাধান-পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও গৌরব ভারতীয়দের।

আর্যভট সর্বপ্রথম অনির্ণেয় একঘাত সমীকরণের আলোচনা করেন। এই সমীকরণটি হইল :

$$by-ax=c$$

a, b, ও c'র বিভিন্ন পূর্ণ সংখ্যার জন্য তিনি এই সমীকরণের সমাধান বাহির করেন। ভাস্কর (আনুমানিক ৫২২ খৃষ্টাব্দ; 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচয়িতা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথিতযশা ভাস্কর হইতে ইনি ভিন্ন) আর্যভটের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া $by-ax=-c$ অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান করেন। অনির্ণেয় সমীকরণ সম্বন্ধে ব্রহ্মগুপ্তের আলোচনা আর্যভট ও ভাস্করের পদ্ধতির সম্প্রসারণ মাত্র। এতদ্ব্যতীত তিনি অনির্ণেয় একঘাত সহসমীকরণ সমাধানের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মাত্রার অনির্ণেয় সমীকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর ও শ্রীপতি। এই সমীকরণগুলির ধরন হইল :

$$Nx^2+c=y^2$$
$$Nx^2+1=y^2$$

ব্রহ্মগুপ্ত কতকগুলি উপপ্রতিজ্ঞার (lemma) দ্বারা উপরিউক্ত সমীকরণদ্বয় সমাধান করেন।† ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অয়লার (১৭৬৪) ও লাগ্রাঁজ্ (১৭৬৮) ব্রহ্মগুপ্তের উপপ্রতিজ্ঞাগুলি নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন।

শ্রীপতি $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণের নিম্নোক্ত সমাধান প্রদান করেন :

$$x=\frac{2m}{m^2\sim N},\ y=\frac{m^2+N}{m^2\sim N},$$ m যে কোন মূলদ সংখ্যা।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ ব্রাউনকের এই সমাধান পুনরাবিষ্কার করেন।

হিন্দুদের অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি অয়লার ও লাগ্রাঁজের পূর্বে বীজগণিতের তথা সমগ্র সংখ্যাতত্ত্বের বৃহত্তম আবিষ্কার বলিয়া এখন স্বীকৃত। এই সমাধানগুলি

---

* F. Cajori, *A History of Mathematics;* p. 95.

† **ব্রহ্মগুপ্তের উপপ্রতিজ্ঞা :**

(১) যদি $x=a,\ y=B,\ Nx^2+K=y^2$ —সমীকরণের সমাধান হয়,
$x=a^1,\ y=B^1,\ Nx^2+K^1=y^2$ —সমীকরণের সমাধান হয়, এবং
$x=aB^1\pm a^1B,\ y=BB^1\pm Naa^1,\ Nx^2+KK^1=y^2$-এর সমাধান হয়,
তাহা হইলে,
$$N(aB^1\pm a^1B)^2+KK^1=(BB^1\pm Naa^1)$$

(২) যদি $x=a,\ y=B,\ Nx^2+K=y^2$-এর সমাধান হয়,
তাহা হইলে, $x=2aB,\ y=B^2+Na^2$
$Nx^2+K^2=y^2$ সমীকরণের সমাধান।

(৩) যদি $x=a,\ y=B, Nx^2+K^2=y^2$-এর সমাধান হয়,
তাহা হইলে, $x=a/K,\ y=B/K,$
$Nx+1=y^2$ সমীকরণের সমাধান।

অনির্ণেয় সমীকরণের হিন্দু সমাধান পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা *History of Hindu Mathematics*: Datta and Singh, Part II-এ দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য A. N. Singh এর 'Hindu Mathematics' (*Science and Culture,* Vol. III, No. 10) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

পুনর্বার আবিষ্কার করিতে পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রাচীন কালের উৎকৃষ্ট সর্বপ্রকার গবেষণার সহিত গ্রীকদের নাম জড়াইবার অপচেষ্টায় উৎসাহী একদল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হিন্দুদের এই কৃতিত্বে অস্বস্তি বোধ করিয়া নানা কাল্পনিক মতবাদের ভিত্তিতে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, গ্রীকরাই এইসব পদ্ধতির প্রবর্তক। কিন্তু গণিতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হ্যাঙ্কেল দেখাইয়াছেন, অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের প্রথম অখণ্ড কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের প্রাপ্য।

বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতেও অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণের আলোচনা দেখা যায়। এইরূপ একটি সমীকরণের রূপ হইল (আধুনিক সঙ্কেতে লিখিলে) :—

$$x + a = s^2, \; x - b = t^2$$

সমাধান :

$$x = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{a+b}{c} - C \right) \right]^2 + b$$

প্রদত্ত উদাহরণে দেখা যায়, $a =$ ৫, $b =$ ৭ ধরিয়া x-এর মান বাহির করা হইয়াছে ১১। সমাধানের কোন সাধারণ নিয়ম অবশ্য আলোচিত হয় নাই। কেবল উত্তরটি লেখা হইয়াছে এইরূপ : "৫ ও ৭-এর যোগফল ১২, ১২কে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ৬, ৬ হইতে ২ বিয়োগ করিলে হয় ৪, ৪কে ২ দ্বারা ভাগ করিলে হয় ২, ২-এর বর্গ ৪, এবং ৪+৭ হইল ১১। ইহাই রাশি।"* Plate I-এ মূল পাণ্ডুলিপির এই অংশের একটি প্রতিলিপি ও তাহার বাংলা অক্ষরান্তরীকরণ দেওয়া হইল।

জ্যামিতি

আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানের যে যুগের কথা বলিতেছি গণিতের দিক হইতে তাহা মুখ্যতঃ পাটীগণিত ও বীজগণিতের যুগ। জ্যামিতিক গবেষণায় হিন্দুরা সেইরূপ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেয় নাই। এই সময়ে জ্যামিতির সামান্য যা কিছু চর্চা হইয়াছিল তাহা পরিমিতিবিদ্যাকে (mensuration) কেন্দ্র করিয়া। আর্যভট ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল দিয়াছেন তাহা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ত্রিভুজের স্থূল (approximate) ও নির্ভুল ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার সূত্রের নির্দেশ দেন ব্রহ্মগুপ্ত। নির্ভুল ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে তিনি হীরোর সূত্র† প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেন :

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

ব্রহ্মগুপ্ত হীরোর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের (inscribed quadrilateral) ক্ষেত্রফল প্রকাশ করেন নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা :

a, b, c, d হইল চতুর্ভুজের চারিটি বাহু;
$2s = a + b + c + d$; এবং
m ও n হইল ইহার কর্ণদ্বয়।

$$S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} \quad \text{..........(১)}$$

$$m = \sqrt{\frac{(ac+bd)(ab+cd)}{(ad+bc)}} \; ; \; n = \sqrt{\frac{(ac+bd)(ad+bc)}{(ab+cd)}} \quad \text{..........(২)}$$

---

* G. R. Kaye, *The Bakhshali Manuscript*, Archaeological Survey of India, Vol. XLIII, 1927 ; p. 42.

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৪৪।

(উপরিউক্ত লিপির বাংলা অক্ষরান্তীকরণ)

৮৮০ | ৯৬৪ | গুণিত জাতং | ৮৪৮৩২০ | চত্বারিংশ
৮৪ | ১৬৮ | পৃথক্‌স্থানাং ব | ১৪১১২ | র্গং | ১৬০০

ষ উপরাপাত্য শেষং | ৮৪৬৭২০ | বর্তাজ্জাতং | ৬০ |
॥ | ১৪১১২ |

বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত শূন্যের ব্যবহার, গুণ, বর্গ ও ভগ্নাংশের একটি নমুনা। বঙ্গানুবাদ ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (*The Bākhshālī Manuscript*, Archaeological Survey of India, Vol. XLIII, 1927: 56 verso, Plate XXXVIII.)
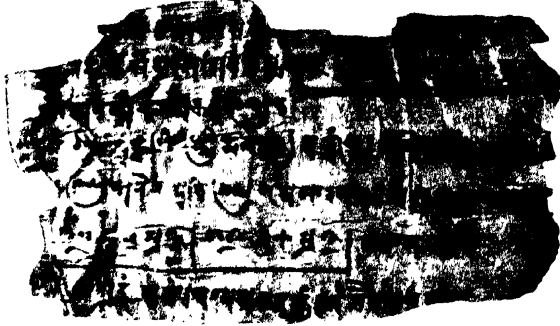
(উপরিউক্ত লিপির বাংলা অক্ষরান্তীকরণ)

॥ উদা ॥ কোরাসিপঞ্চযুতা · উ · · সা রাশিসপ্ত

মুলদকোসোরাশিরিতিপ্রষ্ণঃ || ০ ৫ যুমূ ০ | সা ০ ৭ + মূ ০ ||
ণং । যুতহীনঞ্চমেকত্বং | ১২ | ত || ১ ১   ১ | ১ ১ ||

লম্ | ৬ | দ্বিগুণম্ | ৪ | দলম্ | ২ | বর্গম্ | ৪ | হীনেযুতিঞ্চকর্তব্যা

· · | ৭ + | অনেনযুতি | ১১ | এশসারাশি ॥ অস্যপ্রত্যানয়নে

১১ যু ৫ মূ ৪ | ১১ ৭ + মূ ২ | পঞ্চাশমসূত্রম্ ৫০
১   ১   ১ | ১ ১   ১ |

॥ সূত্রম্ গবাং বিশেষ কর্তব্যং ধনৈশ্চৈবপুন · ·

বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণের নমুনা। আলোচনা ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (*The Bākhshālī Manuscript*, 59 recto, Plate XL.)

PLATE II

১ ▢▢▢▢▢वरकतिलतैलेनपाचयेत् नास्याभ्यंजनयोगीयसिद्ध पलितनाशन.प्र▢ष्ठ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

২ ▢▢▢पष्टीयंलिप:पलितनाशन:॥ रोचनाकाचमाचीचग्रतपुष्पातिलास्तथा अनेनमचिता:केशा भवं त्यं जनमन्निभा.॥नीलोकामे

৩ ▢▢ववजलपिष्टाचपिप्पली अनेनमचिता:केशाभयंत्यं जनमन्निभा:॥ अभ यामलकाभ्याञ्च पूर्व्वप्र चलयेच्छिर:अलं

৪ बुमञ्चमंगृह्य पोषेन्नीलिकयासह तेनौष्णेन शिरो लिंपेत्पलितंनभवि ष्यति॥तुल्यमुस्तं सकामी संकुर्म्मपित्तमयो

৫ रज:दंतोचमद्दवेवाचभा गोभृंगरजस्य च विभीतकानांतैलेन सिद्धंप लितनाशनम् अभ्यंगंसततंकुर्यात्

৬ पलितंनभविष्यति ॥ भृंगरजरसप्रस्थंत द्वत्ययस:पलंचम धुकस्य तैलकुडवे विपक्कंकुर्यात्

৭ कृष्णामपिबलाकाम् नाशयतिवलीपलितं द्वादशवर्षाणिसमरा चेण मासिनचव षंश तं नस्त:कर्म्म

৮ प्रयोगेन:गामतरुण्याइमूलपलेपलंचमधुकस्य शावरकस्यार्धपलन्दश चपलानचतै ल स्य आदित्ये नविपक्कंपा

৯ चेकार्ण्णायसेदशाहानि कुर्यान्नस्त.कर्मभ्रमरमवर्ण्णानि पलितानि॥ आमलकर सप्रस्त: स र्पि:प्र स्थ:पलंचमधुकस्य संभृत्यसर्व्वमेतद्दैद्यो मृद

১০ ग्निनाविपचेत् अन्धमनन्धंकुर्यात्पलितसपलितंतथैवदृढदत्तम् एतन्नस्त:करणं गतामपि निव र्त्तयतिद ष्टिम् त्रिफलांचसमांकुर्यान्नीलींनीलोत्पलानिच

১১ अचमाचान्पृथग्भागान्फलं पिण्डारक स्यच अंजनंपिप्पलीमूलंपत्रंसद्दचरस्यच जंबूकषाय: कर्त्तव्य:जंबमलाचम्र▢▢▢

নাবনীতকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭নং পত্রের একটি প্রতিলিপি। নীচে দেবনাগরী হরফে পাণ্ডুলিপির উক্ত পত্রের অক্ষরান্তরীকরণ। ৪, ৫ ও ৬ পংক্তিতে বর্ণিত একটি বিশেষ কল্প প্রস্তুত-বিধির আলোচনা ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (*The Bower Manuscript*. Archaeological Survey of India)

বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয়ের সহিত বাহুদিগের সম্পর্ক প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মগুপ্ত যে সূত্রটি (২) আবিষ্কার করেন তাহার নাম "ব্রহ্মগুপ্তের প্রতিজ্ঞা"।

ঘন জ্যামিতিতে আর্যভট পিরামিড ও গোলকের ঘন নির্ণয়ার্থে দুইটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন : পিরামিডের ঘন হইল তাহার ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক ($\frac{1}{2} sh$) ; গোলকের ঘন হইতেছে $\pi^{3/2}a^3$ । এই দুইটি সূত্রই অবশ্য ভুল। কিন্তু ঘন গণনার কার্যে যে π-এর দরকার হয় তাহার মান তিনি অতি নির্ভুল ভাবে বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ণীত π-এর মান হইল :

$$\pi = \frac{৬২,৮৩২}{২০,০০০} = ৩ + \frac{১৭৭}{১২৫০} = ৩\cdot১৪১৬$$

ভাস্কর নির্ভুল গণনার জন্য আর্যভটের মান এবং স্থূল গণনার জন্য আর্কিমিড়িসের মান ($\frac{২২}{৭}$) উল্লেখ করিয়াছেন। তবে হিন্দু গণিতজ্ঞদের সাধারণতঃ π-এর মান ৩ অথবা $\sqrt{১০}$ ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

কনিক জ্যামিতি সম্বন্ধে মহাবীর সামান্য কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল উপবৃত্ত। গ্রীকদের তুলনায় কনিক সম্বন্ধে ভারতীয় আলোচনা অবশ্য নিকৃষ্ট।

ত্রিকোণমিতি

জ্যামিতি অপেক্ষা ত্রিকোণমিতিতে হিন্দুরা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সাইন, কোসাইন, ভার্স-সাইন প্রভৃতি কোণানুপাত হিন্দুদের আবিষ্কার। এমন কি কথাগুলিও সংস্কৃত শব্দ হইতে গৃহীত। সংস্কৃতে সাইন কোণানুপাতের নাম 'জ্যা' বা 'জীবা'। প্রথম যুগের আরব গণিতজ্ঞরা ইহাকে বলিত 'জীব' এবং ক্রমশঃ ব্যবহারজনিত অপভ্রংশের ফলে 'জীব' শেষ পর্যন্ত 'জাইব'-এ পর্যবসিত হয়। জেরার্ড অব ক্রেমোনা (১১১৪-১১৮৭) আরবী গাণিতিক গ্রন্থরাজির ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন কালে 'জাইবে'র ল্যাটিন করেন 'Sinus' এবং তাহা হইতে অধুনা ব্যবহৃত 'সাইন' শব্দের উৎপত্তি। ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত 'কোটি-জ্যা' বা সংক্ষেপে 'কো-জ্যা' ভাষান্তরের ফলে ল্যাটিন 'Co-Sinus' ও পরে 'কোসাইন' শব্দে রূপান্তরিত হয়। 'ভার্স-সাইনে'র সংস্কৃত শব্দরূপ 'উৎক্রম-জ্যা'

'পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' বরাহমিহির বিভিন্ন সাইন অনুপাতের মান ও তাহাদের একত্র সাজাইয়া একটি সাইন-সারণী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সাইন ৩০° ও সাইন ৬০°-র মান যথাক্রমে ১/২ ও $\sqrt{১-\frac{১}{৪}}$ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সারণীতে ২৪টি সাইন কোণানুপাতের মান দেওয়া আছে। বরাহমিহিরের সময়ে হিন্দুদের আমরা নিম্নলিখিত ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলি ব্যবহার করিতে দেখি। সূত্রগুলি আধুনিক সঙ্কেতে লিপিবন্ধ হইল :

(১) $\text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta = 1$

(২) $\text{Sin}^2\theta/2 = \frac{1-\text{Cos}\,\theta}{2}$

(৩) $\text{Sin}\,(\alpha \pm \beta) = \text{Sin}\,\alpha\,\text{Cos}\,\beta \pm \text{Cos}\,\alpha\,\text{Sin}\,\beta$

(৪) $\text{Sin}^2\,2\theta + \text{Versin}^2\,2\theta = 4\,\text{Sin}^2\,\theta$

(৫) $\text{Sin}\,(45 \pm \theta) = \frac{1 \pm \text{Sin}\,2\theta}{2}$

(৬) $\text{Sin}(\alpha - \beta)/2 = \frac{1}{2}\{(\text{Sin}\,\alpha - \text{Sin}\,\beta)^2 + (\text{Cos}\,\alpha - \text{Cos}\,\beta)^2\}$

প্রথম তিনটি সূত্রের সহিত গ্রীক গণিতজ্ঞরা পরিচিত ছিল; চতুর্থটির কথা বরাহমিহির প্রথম উল্লেখ করেন; এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রের আবিষ্কারক দ্বিতীয় ভাস্কর।

বরাহমিহির তাঁহার সাইন-সারণীতে ২৪টি বিভিন্ন কোণের সাইন অনুপাত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সাইন ও সেইসঙ্গে একটি ভার্স-সাইন-সারণী প্রত্যেক প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীয় গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ। ৩°৪৫′ (=২২৫′) অন্তর অন্তর ০ হইতে ৯০°র মধ্যে ২৪টি বিভিন্ন কোণের সাইন কোণানুপাত নির্ণয় করিবার জন্য 'সূর্যসিদ্ধান্তে' আমরা নিম্নলিখিত সূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাই :

$$\text{Sin}(n+1)\,\theta = 2\,\text{Sin}\,n\,\theta - \text{Sin}(n-1)\,\theta - \frac{\text{Sin}\,n\,\theta}{225}$$

উপরিউক্ত সূত্রে, $\theta = 225 = \text{Sin}\,\theta$.

গোলক সংক্রান্ত ত্রিকোণমিতির সহিত হিন্দুদিগের কিছু কিছু পরিচয় ছিল। হিন্দু জ্যোতিষীয় গ্রন্থে আলোচিত নিম্নোক্ত সূত্রগুলি তাহার প্রমাণ :

$$\text{Cos}\,c = \text{Cos}\,a\ \text{Cos}\,b + \text{Sin}\,a\ \text{Sin}\,b\ \text{Cos}\,C,$$
$$\text{Cos}\,A\ \text{Sin}\,c = \text{Cos}\,a\ \text{Sin}\,b - \text{Sin}\,a\ \text{Cos}\,b\ \text{Cos}\,C,$$
$$\frac{\text{Sin}\,a}{\text{Sin}\,A} = \frac{\text{Sin}\,b}{\text{Sin}\,B} = \frac{\text{Sin}\,c}{\text{Sin}\,C}.$$

ভারত ও চীনের মধ্যে গাণিতিক জ্ঞানের আদান-প্রদান

ভারতীয় গণিত, বিশেষতঃ দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও বীজগণিত, কিরূপে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আলোচিত হইয়াছে। সেইরূপ গ্রীক গণিতের কথাও সম্ভবতঃ ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অবিদিত ছিল না। গাণিতিক জ্ঞানের এইরূপ লেন-দেন যে শুধু ভারতবর্ষ ও পশ্চিম দেশগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যেও এইরূপ আদান-প্রদানের বহু নজির বিদ্যমান। বিশেষতঃ গণিত ও জ্যোতিষের ক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্ট। চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কথা একটু উল্লেখ করিয়াছিলাম; এইখানে আর একটু বলিতে চাই।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সুই রাজবংশের রাজত্বকালে চীনে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক সার্টন দেখাইয়াছেন যে,* সুই রাজবংশের আমলে প্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে বহু গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পর্যালোচনা। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শে সিয়েন-জেন্ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক রচিত একুশ খণ্ডে সমাপ্ত 'পো'-লো-মেন তি'য়েন-ওয়েন-চিং' শীর্ষক জ্যোতিষীয় গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থের নাম (বঙ্গানুবাদ) 'ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিষ' 'ব্রাহ্মণ্য গণনা-পদ্ধতি', 'কাল গণনার ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি' ইত্যাদি।

অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য ও বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে চীনদেশে ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষের আর এক দফা প্রচার আমরা লক্ষ্য করি। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ট্যাং রাজবংশের রাজত্বকালে চৈনিক রাজসভায় গোতম সিদ্ধ নামে এক হিন্দু দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর উপস্থিতির কথা জানা যায়। তিনি তান্ত্রিক ধর্ম ও ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে ১১০ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের নাম 'টা ট্যাং কাই-য়ুয়ান চ্যান্ চিং'।†

---

* *Introduction to the History of Science,* Vol. I; p. 450.
† *Introduction to the History of Science,* Vol. I; p. 513.

ইহাতে হিন্দুদিগের দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির এক মনোজ্ঞ আলোচনা হইতে মনে হয় সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই চীনে ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।

জর্জ রুস্টিক কে হিন্দু গণিতের উপর চৈনিক গণিতের প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* চৈনিক গাণিতিক গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি সমস্যার পুনরাবৃত্তি হিন্দুদিগের রচিত একাধিক গণিতের গ্রন্থে স্থান পাইতে দেখা যায়। 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু' (নয় খণ্ডে পাটীগণিত) শীর্ষক চৈনিক পাটীগণিতের রচনা কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ। খ্রীষ্টাব্দ ২৬৩ অব্দে চ্যাং স্যাং ইহার একটি টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নিরূপণের উদ্দেশ্যে $\frac{1}{2}(c+a)\,a$ সূত্রটি পাওয়া যায়; হইতেছে জ্যা এবং a হইল লম্ব। বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে মহাবীর অবিকল এই সূত্রটি ব্যবহার করিয়াছেন। তারপর প্রাচীন চৈনিক গণিতের একটি জনপ্রিয় সমস্যা ছিল,—১০ ফুট লম্বা একটি বাঁশের উপরিভাগের কোন স্থান ভাঙিয়া মাটিতে কাণ্ড হইতে ৩ ফুট দূরে আসিয়া ঠেকিলে, কত ফুট উপরে বাঁশটি ভাঙিয়াছে? এই সমস্যাটির আলোচনা ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গণিতে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত আর একটি সুপ্রাচীন চৈনিক গাণিতিক গ্রন্থ 'সান-ৎজু সুয়ান-চিং'-এ এইরূপ একটি সমস্যা আছে : এমন একটি সংখ্যা বাহির কর যাহাকে ৩, ৫ ও ৭ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে ২, ৩ ও ২ অবশিষ্ট থাকে। ব্রহ্মগুপ্তের প্রস্তাবিত নানা গাণিতিক সমস্যার একটিতে আছে—"কোন সংখ্যাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫, ৫ দিয়া ভাগ করিলে ৪, ৪ দিয়া ভাগ করিলে ৩, এবং ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে?" মহাবীরও এইরূপ সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন।

হিন্দু ও চৈনিক গণিতজ্ঞরা উভয়দেশের গাণিতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে অল্প-বিস্তর অবহিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈনিক গণিত সম্বন্ধে হিন্দুদিগের জ্ঞানের এক তরফা আলোচনা প্রসঙ্গে জোশিও মিকামি মন্তব্য করিয়াছেন যে, চীনে হিন্দু গণিতের প্রভাবের কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে চৈনিক গণিতজ্ঞদের আবিষ্কারই নাকি হিন্দু পণ্ডিতদের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল।† আমরা সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় জ্ঞানের প্রচার ও প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক সার্টনের তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছি। যে দেশ ও জাতি দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির ও শূন্যের জন্মদাতা, যাহাদের কল্যাণে সমগ্র পাটীগণিত বিদ্যার উদ্ভব, যাহাদের প্রতিভা বীজগণিতকে সম্ভবপর করিয়াছে, অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের মধ্য দিয়া যাহারা অতুলনীয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, অন্যদেশের সহিত এখানে সেখানে দুইচারিটা সমস্যার, পদ্ধতির বা আলোচনার মিল থাকিলেই তাহাদের প্রতিভা ও স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় না।

২·৩। জ্যোতিষ

আমরা যে কালের কথা বলিতেছি গণিতের ন্যায় হিন্দু জ্যোতিষেরও তাহা সুবর্ণ যুগ। নানা 'সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ' রচনার মধ্য দিয়া এই যুগের সূচনা এবং আর্যভট, লাটদেব, লল্ল, বরাহ-মিহির, ভট্টোৎপল, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল, দ্বিতীয় ভাস্কর প্রমুখ প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌গণের প্রতিভার স্পর্শে নানাভাবে পরিবর্ধিত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া হিন্দু জ্যোতিষ উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত। বৈদিকযুগের শেষভাগে রচিত 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ' ও জৈনদের 'সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি', 'চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিফলিত জ্যোতিষীয় জ্ঞানের সহিত এ যুগের জ্যোতিষীয় জ্ঞানের

---

* G. R. Kaye, *Indian Mathematics;* p. 38-41.

† ". . . the discoveries made in China may have touched the eyes of Hindoo scholars"—Yoshio Mikami, *The Development of Mathematics in China and Japan,* Leipzig, 1912.

কোন তুলনাই চলে না। গ্রহ, নক্ষত্র ও তাহাদের অবস্থান সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত ভাসা ভাসা জ্ঞান পরিত্যক্ত হইয়া নির্ভুল গাণিতিক পদ্ধতির উপর এই জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠা। এজন্য হিন্দু জ্যোতিষ গণিত হইতে অভিন্ন। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের গাণিতিক গবেষণা ও আলোচনা। প্রকৃতপক্ষে গণিত ও জ্যোতিষের এই সমন্বয়ের ফলেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ও উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। তাই 'সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের' রচনাকাল হইতেই ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের উদ্ভব আমরা লক্ষ্য করি।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ

আনুমানিক ১০০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ রচিত হয়। এই সময়ে ভারতীয় জ্যোতিষ যে গ্রীক ও গ্রেকো-ক্যাল্‌ডীয় জ্যোতিষদ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আলেক্‌জান্দারের ভারতবর্ষে পদার্পণের পর হইতে, বিশেষতঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহ্লীক গ্রীকদের রাজত্বকালে, গ্রীক ও ভারতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। ঠিক কিভাবে, কোন পথে এবং কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ, আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা হিন্দুরা গ্রীক জ্যোতিষের কথা অবগত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও এই আদান-প্রদানের মারফত গ্রীক জ্যোতিষীয় ভাবধারা যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের কালে আমরা এদেশে একদল বিজাতীয় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদের তৎপরতার পরিচয় পাই। শকদ্বীপী বা স্কাইদীয়ান ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এই বহিরাগত পণ্ডিতদের দল কালসহকারে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতদের গ্রীক সভায় এবং গ্রীক পণ্ডিতদের হিন্দু রাজসভায় উপস্থিতির অনেক নিদর্শন আছে। গ্রীক জ্যোতিষ অবশ্য সমভাবে সমগ্র হিন্দু জ্যোতিষকে প্রভাবিত করে নাই। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে এই প্রভাবের স্বরূপ ও মাত্রার অনেক প্রভেদ দেখা যায়। যেমন পিতামহ- বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে গ্রীক প্রভাব একরূপ নাই বলিলেই চলে। পুলিশ- ও রোমক-সিদ্ধান্তে নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচ্য বিষয়বস্তু পর্যন্ত গ্রীক জ্যোতিষের ছাপ সর্বত্র সুপরিস্ফুট। কিন্তু নির্বিচারে এই বিদেশী ভাবধারা হিন্দুরা গ্রহণ করে নাই। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ গ্রীক জ্যোতিষের নিছক অনুকরণ নহে। প্রয়োজনীয় নূতন তথ্য ও তত্ত্বগুলিই কেবল গৃহীত হইয়াছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদের নিজস্ব অবদানের সহিত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের গবেষণার সামঞ্জস্য বিধানেই হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌দের স্বকীয়তা। এই প্রভাব সত্ত্বেও তথ্য-বিন্যাসে, আলোচনার ধারায়, গণনা-পদ্ধতিতে হিন্দুদের আপন বৈশিষ্ট্য কোথাও এতটুকু ক্ষুন্ন হয় নাই।

'সিদ্ধান্ত' বলিতে জ্যোতিষীয় গ্রন্থবিশেষকে বুঝায় না; উচ্চাঙ্গের যে কোন জ্যোতিষীয় গ্রন্থকেই হিন্দুরা এই সাধারণ নামে অভিহিত করিত। 'সিদ্ধান্ত' শব্দের অর্থ 'মীমাংসা', অর্থাৎ জ্যোতিষীয় সমস্যার চরম মীমাংসা। বিভিন্ন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌ ও টীকাকারদের রচনা হইতে আমরা অন্ততঃ ১৮টি সিদ্ধান্তের উল্লেখ পাই :

সূর্য-সিদ্ধান্ত	কাশ্যপ-সিদ্ধান্ত	লোমশ(রোমক)-সিদ্ধান্ত
পিতামহ-সিদ্ধান্ত	নারদ-সিদ্ধান্ত	পৌলিশ-সিদ্ধান্ত
ব্যাস-সিদ্ধান্ত	গর্গ-সিদ্ধান্ত	চ্যবন-সিদ্ধান্ত
বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত	মরীচি-সিদ্ধান্ত	যবন-সিদ্ধান্ত
অত্রি-সিদ্ধান্ত	মনু-সিদ্ধান্ত	ভৃগু-সিদ্ধান্ত
পরাশর-সিদ্ধান্ত	অঙ্গিরা-সিদ্ধান্ত	শৌনক-সিদ্ধান্ত

'গণতরঙ্গিনী'তে সুধাকর উপরিউক্ত ১৮টি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন :

"সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্টোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কাশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥"

ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়াছেন সিদ্ধান্ত একাধিক হইলেও তাহাদের মূল বিষয়বস্তু ও চরম মীমাংসাগুলি এক এবং তাহাদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নাই। একমাত্র সূর্য-সিদ্ধান্ত ছাড়া উপরিউক্ত কোন সিদ্ধান্তেরই মূল গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। বরাহমিহির তাঁহার 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকায়' সূর্য, পিতামহ, বশিষ্ঠ, পুলিশ ও রোমক এই পাঁচটি প্রধান সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন (পৌলিশ-রোমক-বাশিষ্ট-সৌর-পৈতামহাস্তু সিদ্ধান্তাঃ)। একমাত্র এই গ্রন্থ হইতেই পাঁচটি প্রধান সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানিতে পারি। অবশ্য বরাহমিহির হইতে মূল সিদ্ধান্তগুলির সম্যক পরিচয়লাভ সম্ভবপর নহে। কারণ স্থানে স্থানে তিনি নিজেই, বিশেষতঃ সূর্যসিদ্ধান্তের, অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। রোমক-সিদ্ধান্তের উপর এক টীকা রচনা করেন শ্রীসেন। আল্-বীরুণীর ধারণা, লাটদেব সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা। কিন্তু বরাহমিহির লিখিয়াছেন, লাটদেব মূল সূর্যসিদ্ধান্তের উপর একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন মাত্র।

সিদ্ধান্ত ছাড়া হিন্দুদের আর একশ্রেণীর জ্যোতিষীয় গ্রন্থের কথা জানা যায়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের নাম 'তন্ত্র' বা 'করণ'। তন্ত্র ও করণগুলি সিদ্ধান্তের মত উচ্চ পর্যায়ের নহে; সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই জাতীয় গ্রন্থ লিখিত হইত। আল্-বীরুণী ব্রহ্মগুপ্তের 'করণ-খণ্ড-খাদ্যক', বিজয়নন্দীর 'করণ-তিলক', চিত্তেশ্বরের 'করণ-সার' প্রভৃতি কয়েকটি করণ-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।*

'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় উল্লিখিত প্রধান পাঁচটি সিদ্ধান্তের কথা এইবার সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। বরাহমিহিরের মতে এই পাঁচ প্রকার সিদ্ধান্তের মধ্যে পুলিশ (বা পৌলিশ) ও রোমক সিদ্ধান্তের তথ্যগুলি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্তের তথ্যগুলিই অধিকতর নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। অবশিষ্ট সিদ্ধান্তদ্বয় ত্রুটীবহুল। প্রথমে এই ত্রুটীবহুল পিতামহ-(বা পৈতামহ) ও বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের কথাই ধরা যাক।

পিতামহ-সিদ্ধান্ত : মোট পাঁচটি শ্লোকে পিতামহ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বরাহমিহির তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে পঞ্চবার্ষিক চান্দ্র-সৌর পর্যায়-কালের উল্লেখ আছে। এই পঞ্চবার্ষিক পর্যায়-কালের মধ্যে সূর্য পৃথিবীকে ৫ বার প্রদক্ষিণ করে, ইহাতে ৬০ সৌর মাস, ২টি মলমাস, ৬২ চান্দ্রমাস, ১৮০০ তিথি ও ১৮৩০ সাবন দিন আছে। এই কালের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে ৬৭ বার। পিতামহ-সিদ্ধান্তের এই পর্যায়-কালের সহিত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের পর্যায়-কালের হুবহু মিল একান্ত লক্ষণীয়। এই গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া আর কোন গ্রহের আলোচনা নাই। মনে হয় পিতামহ-সিদ্ধান্তের প্রধান অবলম্বন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ।

বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত : বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের জ্যোতিষীয় তথ্যগুলি 'পিতামহ' অপেক্ষা অনেক উন্নত। এই গ্রন্থে চন্দ্রের ভগন-কাল অর্থাৎ পৃথিবী-পরিক্রমার কাল ২৭·৩২১৬৭০৬৩ ধরা হইয়াছে। প্রদত্ত বিভিন্ন রাশিগুলি গণনা করিলে দেখা যায় প্রায় ৩৬৫·৩৬৬ দিনে এক বৎসর হইতেছে। সুতরাং বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ বা পিতামহ-সিদ্ধান্ত অপেক্ষা এই গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী বৎসর

* *Alberuni's India,* Vol. I ; p. 155-156.

গণনা অনেক বেশী নির্ভুল। চন্দ্র ও সূর্য ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচ গ্রহের আলোচনা ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন বিভিন্ন গ্রহের ভগন-কাল, গ্রহদের সংযোগ, লগ্ন ও তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। গ্রহদের অসমান গতির উল্লেখও আমরা পাই এই গ্রন্থে। একদিকে সোজাসুজি গতির পরিবর্তে গ্রহরা যে মাঝে মাঝে থামিয়া থাকে ও পশ্চাদপসরণ করে তাহা আলোচিত হইয়াছে। গ্রহদের নিশ্চল অবস্থাকে বলা হইয়াছে 'অনুবক্র' ও পশ্চাদপসরণকে 'বক্র' অবস্থা। গ্রহণের কাল নির্ণয় করিবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির আলোচনা ইহাতে নাই।

আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত রচিত হইবার সম্ভাবনা। এই গ্রন্থে ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। গ্রীক জ্যোতিষের মত ব্যাবিলনীয়-ক্যাল্‌ডীয় জ্যোতিষও যে এদেশে এককালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত তাহার এক দৃষ্টান্ত।

পুলিশ (পৌলিশ)-সিদ্ধান্ত : বরাহমিহির ছাড়া টীকাকার ভট্টোৎপল এই সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। আল্‌-বীরুণীর রচনাতেও পুলিশ-সিদ্ধান্তের একাধিক উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে পৌলিশ নামে জনৈক গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌ সৈন্ত্র নামক নগরে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, এই সৈন্ত্র সম্ভবতঃ আলেকজান্দ্রিয়া।* অধ্যাপক সার্টন সন্দেহ করেন, আল্‌-বীরুণীর পৌলিশ ও আলেকজান্দ্রিয়ার পল (খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) হয়ত বা একব্যক্তিও হইতে পারেন।† তবে ইহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।

গ্রহ	এক মহাযুগে ভগন-সংখ্যা
সূর্য	৪,৩২০,০০০
চন্দ্র	৫৭,৭৫৩,৩৩৬
মঙ্গল	২,২৯৬,৮২৪
বুধ	১৭,৯৩৭,০০০
বৃহস্পতি	৩৬৪,২২০
শুক্র	৭,০২২,৩৮৮
শনি	১৪৬,৫৬৪
এক মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত দিন ...	১,৫৭৭,৯১৭,৮০০

৫। ভট্টোৎপল-উল্লিখিত পুলিশ-সিদ্ধান্তের সারণী, (*Hindu Astronomy*, Brennand ; p. 178)

পুলিশ-সিদ্ধান্তের নির্দেশ অনুসারে এক মহাযুগে, অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসরে ১,৫৭৭,৯১৭,৮০০ দিন হয়। ইহাতে বৎসরের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৬৫·২৫৮ দিন। মহাযুগের কল্পনা প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের এক বিশেষত্ব। আমরা এখন পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহের স্ব স্ব বৃত্তপথে পরিক্রমণকাল যেমন দিনে ব্যক্ত করি, অর্থাৎ পৃথিবীর পর্যায়কাল বলি ৩৬৫·২৫৮৭৫ দিন, চন্দ্রের ২৭·৩২১৬৭ দিন, মঙ্গল গ্রহের ৬৮৬·৯৯৭৫ দিন ইত্যাদি, হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা ঠিক সেইরূপ করিত না। তাহারা একটি নির্দিষ্ট কালে এই সব গ্রহ কতবার

* "*Puliśa-Siddhānta,* so called from Pauliśa, the Greek, from the city of Saintra, which I suppose to be Alexandria, composed by Puliśa." —*Alberuni's India ;* p. 153.

† *Introduction to the History of Science,* Vol. I ; p. 387.

পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে তাহা প্রকাশ করিত এবং এই নির্দিষ্ট কালটি এমনভাবে নির্বাচন করা হইয়াছিল যাহাতে এই কালের মধ্যে প্রত্যেক গ্রহের পরিক্রমণ-সংখ্যা এক একটি পূর্ণ সংখ্যা হয়। গ্রহদের ভগন-কাল দিনের হিসাবে প্রকাশ করিলে তাহাদের কোনটাই যে পূর্ণ সংখ্যা হইবে না এবং বড় বড় ভগ্নাংশ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা উপলব্ধি করিয়াই হিন্দুরা এইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই নির্দিষ্ট কালটিকেই তাহারা মহাযুগ নামে অভিহিত করে। ১২,০০০ দেব বৎসরে এক মহাযুগ; এক দেব বৎসরে ৩৬০ সৌর বৎসর; সুতরাং এক মহাযুগে ১২,০০০×৩৬০ বা ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর। কেহ কেহ আবার মহাযুগের পরিবর্তে 'কল্প' ব্যবহার করিয়াছেন। ১০০০ মহাযুগে এক কল্প। এক মহাযুগে বিভিন্ন গ্রহ কতবার ঘুরিয়া আসে পুলিশ-সিদ্ধান্তের টীকাকার ভট্টোৎপল সে সম্বন্ধে এক সারণীর (৫।) উল্লেখ করিয়াছেন। মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত দিনের সংখ্যাকে গ্রহদের পরিক্রমণ সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে তাহাদের পরিক্রমণ বা ভগন-কাল (revolution period) পাওয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ, শনির ক্ষেত্রে ইহা হইবে ১০৭৬৬·৪ দিন; আধুনিক হিসাবে ইহা ১০৭৫৯·২১৯।

পুলিশ-সিদ্ধান্তে গোলীয়-জ্যোতিষের (spherical astronomy) ব্যবহার দেখা যায়। দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নোক্ত সূত্রটির প্রয়োগ দেখি :

R Sin (বিষুবাংশের প্রভেদ) $= R \tan \phi \tan \delta$*

ϕ = স্থানের অক্ষাংশ; δ = সূর্যের বিষুব লম্ব (declination)।

এই সিদ্ধান্তে গ্রহণের কাল-নির্ণয়ের কয়েকটি স্থূল নিয়মের আলোচনা আছে।

রোমক-সিদ্ধান্ত : আল্‌বীরূণীর মতে রোমক-সিদ্ধান্তের রচয়িতা শ্রীসেন। শ্রীসেন সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তের অন্যতম টীকাকার মাত্র। ইহাতে গ্রীক, বিশেষতঃ হিপার্কাস্-টলেমীর জ্যোতিষের প্রভাব বর্তমান; এই প্রভাব পুলিশ-সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও গভীরতর। অন্যান্য সিদ্ধান্তের মত এই গ্রন্থের আলোচনায় ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসরে এক মহাযুগ ধরা হয় নাই, ধরা হইয়াছে ২৮৫০ সৌর বৎসরে এক মহাযুগ। এইরূপ একযুগে ১০,৪০,৯৫৩ দিন ও ৩৫২০ চান্দ্রযুতি মাস থাকে। সুতরাং ৩৬৫ দিন ১৪′৪৮″ সেকেণ্ডে এক সৌর বৎসর হয়; টলেমীর জ্যোতিষেও বৎসরের হিসাব অবিকল এইরূপ ধরা হইয়াছে। সেইরূপ চান্দ্রযুতি কাল হইল ২৯·৫৩০৫৮১৬ দিন বা ২৯ দিন ৩১′৫০″৫‴৩৭⁗। টলেমীর চান্দ্রযুতি হইতেছে ২৯ দিন ৩১′৫০″৮‴২০⁗। আর্যভটকেও চান্দ্রযুতির এই হিসাব গ্রহণ করিতে দেখা যায় (২৯·৫৩০৫৮২)।

চন্দ্র ও সূর্যের গতি সম্পর্কিত অন্যান্য হিসাবেও অনেক মিল আছে। যেমন চন্দ্রের পাতের (nodes) ভগন-কাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ১,৬৩,১১১ দিনে এই ভগন ২৪ বার সংঘটিত হয়। সুতরাং পাতের এই ভগন-কাল ৬৭৯৬ দিন ৭ ঘণ্টা। টলেমীর হিসাবে ইহা ৬৭৯৬ দিন ১১ ঘণ্টা। আর্যভট ধার্য করিয়াছেন ৬,৭৯৪·৭৪৯৫১১ দিন।

রোমক সিদ্ধান্তে অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই।

সূর্যসিদ্ধান্ত : বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা এখন যে সূর্য-সিদ্ধান্তের কথা জানি তাহার সহিত সর্বপ্রথম লিখিত সিদ্ধান্তের বিস্তর প্রভেদ। বহু জ্যোতির্বিদ্ ও টীকাকারের হাতে নানাভাবে পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত ও সংশোধিত হইয়া কাল-সহকারে এই গ্রন্থ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। পঞ্চম কি তাহারও পূর্ব হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এইসব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক জ্যোতিষীয় গ্রন্থ। বরাহমিহির তাঁহার 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' প্রাচীনতম সূর্যসিদ্ধান্তের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও মূল সিদ্ধান্তের সকল কথা অপরিবর্তিত অবস্থায়

---

* *The Cultural Heritage of India,* Vol. III, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'Hindu Astronomy' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বলা হয় নাই। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন, বরাহমিহির নিজেই আর্যভটর নানা গবেষণা অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্তের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন।* প্রায় সমস্ত জ্যোতিষীয় ধ্রুবক (constant) আর্যভটর 'আর্ধরাত্রিকা' হইতে গৃহীত। গ্রহদের গতি সম্বন্ধে পরিবৃত্তের ধারণা (epicyclic theory) মূল সূর্যসিদ্ধান্তের অন্তর্গত নহে; আর্যভট হিন্দু জ্যোতিষে ইহা প্রথম প্রবর্তন করেন এবং পরে ইহা সূর্যসিদ্ধান্তে সংযোজিত হয়।

যাহা হউক, পরিবর্তিত বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত ১৪টি পরিচ্ছেদে রচিত : (১) গ্রহদের মধ্যক গতি, (২) গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান, (৩) দিক, দেশ ও কাল, (৪), (৫) ও (৬) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, (৭) গ্রহদের সংযোগ, (৮) ও (৯) নক্ষত্র, (১০) চন্দ্রের উদয়াস্ত, উচ্চতা, (১১) সূর্য ও চন্দ্রের কয়েকটি দোষ, (১২) ব্রহ্মাণ্ডলোক, ভূগোল, সৃষ্টির ব্যাপ্তি, (১৩) আর্মিলারী গোলক ও কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি ও (১৪) কাল নিরূপণের বিভিন্ন উপায়। এইখানে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি প্রসঙ্গ শুধু উল্লিখিত হইবে।

মহাযুগে গ্রহদের ভগন, গ্রহদের নাক্ষত্র বৎসর, যুতিকাল ইত্যাদি : পুলিশ-সিদ্ধান্তের আলোচনা কালে মহাযুগে গ্রহদের ভগন সম্বন্ধে এক সারণীর কথা বলিয়াছি। সূর্যসিদ্ধান্তে

গ্রহ	এক মহাযুগে ভগন-সংখ্যা
সূর্য	৪,৩২০,০০০
চন্দ্র	৫৭,৭৫৩,৩৩৬
বুধ	১৭,৯৩৭,০৬০
শুক্র	৭,০২২,৩৭৬
মঙ্গল	২,২৯৬,৮৩২
বৃহস্পতি	৩৬৪,২২০
শনি	১৪৬,৫৬৮
চন্দ্রযুতির ভগন ...	৫৩,৪৩৩,৩৩৬
চন্দ্রের অনুভূ ...	৪৮৮,২০৩
চন্দ্রের পাত	২৩২,২৩৮
মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ দিন	১,৫৭৭,৯১৭,৮২৮
মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত চান্দ্র দিন	১,৬০৩,০০০,০৮০

৬। গ্রহদের ভগন-সংখ্যা।

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। সূর্যসিদ্ধান্তের এই সারণী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ-সিদ্ধান্তে প্রদত্ত সারণীর সহিত এক; সামান্য যা অদল-বদল করা হইয়াছে তাহাতে তথ্যের নির্ভুলতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ দিনের সংখ্যাকে (১,৫৭৭,৯১৭,৮২৮) বিভিন্ন গ্রহের ভগন-সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে আমরা গ্রহদের নাক্ষত্রিক ভগন-কাল (siderial period) পাইতে পারি। সেইরূপ কোন গ্রহের যুতিকাল নির্ণয় করিতে হইলে সেই গ্রহের ভগন-সংখ্যা হইতে সূর্যের ভগন-সংখ্যা বাদ দিয়া এই বিয়োগ ফলের দ্বারা মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত দিনকে ভাগ করিতে হইবে। আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিষীয় তালিকা-

* P. C. Sen Gupta, 'Āryabhata's Lost Works',—*Bulletin of the Calcutta Math. Soc.* Vol. XXIII, 2 & 3. P. C. Sen Gupta's, Introduction to Burgess's translation of the *Sūrya Siddhānta,* Calcutta University.

সমূহে গ্রহদের নাক্ষত্র পর্যায়-কাল ও যুতিকাল সৌর দিনে প্রকাশ করিবার রীতি। সূর্য-সিদ্ধান্তের সারণী অবলম্বনে এই সহজ আঙ্কিক পরিবর্তন সাধন করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় তালিকার সহিত মিলাইলেই বুঝা যাইবে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ কিরূপ নির্ভুলভাবে প্রাচীনকালে এইসব তথ্য নিরূপণ করিয়াছিলেন।

গ্রহ	নাক্ষত্রিক ভগন-কাল		যুতিকাল	
	সূর্যসিদ্ধান্ত	হার্শেলের জ্যোতিষ	সূর্যসিদ্ধান্ত	উডহাউসের জ্যোতিষ
পৃথিবী	৩৬৫·২৫৮৭৫	৩৬৫·২৫৬৩৬১২		
চন্দ্র	২৭·৩২১৬৭	২৭·৩২১৬৬১৪	২৯·৫৩০৫৮৬	২৯·৫৩০৫৮৮
বুধ	৮৭·৯৬৯৭	৮৭ ৯৬৯২৫	১১৫·৮৮	১১৫·৮৭৭
শুক্র	২২৪·৬৯৭৯২	২২৪·৭০০৭৮৬৯	৫৮৩·৯	৫৮৩ ৯২
মঙ্গল	৬৮৬ ৯৯৭৫	৬৮৬·৯৭৯৬৪৫৮	৭৭৯·৯২৪	৭৭৯·৯৩৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২ ৩২০৬	৪৩৩২·৫৮৪৮২১২	৩৯৮ ৮৯	৩৯৮·৮৬৭
শনি	১০৭৬৫·৭৭৩	১০৭৫৯·২১৯৮১৭৪	৩৭৮·০৮	৩৭৮·০৯

৭। সূর্যসিদ্ধান্তে ও আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থে প্রদত্ত গ্রহদের পর্যায়-কালের তুলনা।
[*Hindu Astronomy*, Brennand ; pp. 203-4 হইতে তালিকাটি গৃহীত]

নির্ভুল গণনার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত হিন্দুদের লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এক একটি মহাযুগের কল্পনাকে বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। এইসব মহাযুগের সহিত দেবতাদের বয়স, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলিযুগ ও নানা অলৌকিক ও আপাতকুহেলিকাপূর্ণ উপাখ্যানরাজি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইবার ফলে অনেক সময় ইহা উদ্ভট কল্পনাবিলাস বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, অন্ততঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে এইরূপ কল্পনার একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। প্রাক্-দশমিক যুগে আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণে যে বৃহৎ ও বেসামাল ভগ্নাংশের ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া পড়ে তাহা সুকৌশলে এড়াইবার জন্যই সূক্ষ্মবুদ্ধি হিন্দু বিজ্ঞানিগণ এইভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি, চন্দ্রের লম্বন, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব ইত্যাদি নির্ণয় : সূর্যসিদ্ধান্তে পৃথিবীর ব্যাসের মাপ দেওয়া হইয়াছে ১৬০০ যোজন।

"যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥"৫৯

অর্থাৎ ৮০০ যোজনকে দ্বিগুণ করিলে যে ১৬০০ হইবে, তাহাই পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ; এই পরিমাণকে বর্গ করিয়া সেই বর্গকে ১০ দ্বারা গুণ করিলে সেই গুণফলের বর্গমূলই পৃথিবীর পরিধি। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'তে ভাস্করাচার্য এই মাপ ধরিয়াছেন ১৫৮১ যোজন। ইহাকে মাইলে রূপান্তরিত করিলে প্রায় আধুনিক হিসাবের কাছাকাছি অঙ্ক পাওয়া যাইবে। অনেকে এক যোজনে পাঁচ মাইল ধরেন; সূর্যসিদ্ধান্তের মাপ গ্রহণ করিলে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল এবং ভাস্করের হিসাব অনুযায়ী ইহা ৭৯০৫ মাইল। আধুনিক মতে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১৮ মাইল।

ইরাটোস্থেনিস্ যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করিয়াছিলেন হিন্দুরাও অবিকল সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে। একই মধ্যরেখার (meridian) উপর অবস্থিত দুই বা ততোধিক

স্থানে ঠিক মধ্যাহ্নের সময় সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন উন্মুক্ত জায়গায় একটি দণ্ডের ছায়া পর্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর পতিত সূর্যরশ্মির তির্যকতার প্রভেদ অনায়াসেই

৮। ৯।
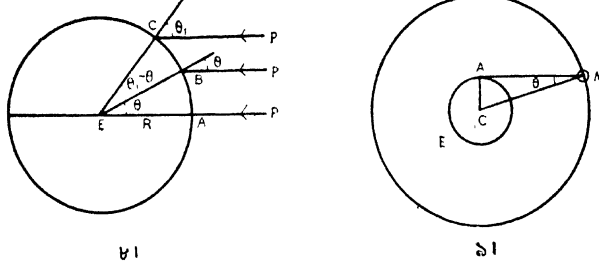
বাহির করা যায়। সূর্যরশ্মির তির্যকতার এই কৌণিক প্রভেদ এবং স্থানদ্বয়ের দূরত্ব জানা থাকিলে অতি সহজেই পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করা চলে। ৮নং চিত্রে $EA=$ ভূবিষুব, $ABC=$ মধ্যরেখা; $B, C=$ এই মধ্যরেখার উপর যেকোন দুইটি স্থান; $PA, PB, PC=$ সমান্তরাল সূর্যরশ্মি; $R=$ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। সহজ জ্যামিতির দ্বারা আমরা অনায়াসেই দেখাইতে পারি :

$$AB=R\theta\ ;\ \ BC=R(\theta_1-\theta)$$

অর্থাৎ,

$$R=\frac{AB}{\theta}=\frac{BC}{\theta_1-\theta}$$

পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ ব্যাসের সহিত √১০ পূরণ করা হইত। এই √১০ π-এর মান ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও নির্ভুল উত্তরের প্রয়োজন হইলে π-এর মান ধরা হইত ২২/৭ অথবা ৩৯২৭/১২৫০ (ভাস্কর), অথবা ৬২৮৩২/২০০০০ (আর্যভট)।

হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা চন্দ্রের লম্বনের সহিত পরিচিত ছিলেন। সূর্যসিদ্ধান্তে এই লম্বনের পরিমাণ ৫৩·৬৮১′ নির্ধারিত হইয়াছে। ৯নং চিত্রে E পৃথিবী, M চন্দ্র, C ভূকেন্দ্র এবং A ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত একটি বিন্দু। AMC কোণের নাম চন্দ্রের লম্বন। AC অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মাপ এবং চন্দ্রের লম্বন অর্থাৎ AMC জানা থাকিলে সহজ ত্রিকোণমিতির সূত্র ব্যবহার করিয়া CM বা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এই দূরত্ব আবার চন্দ্রকক্ষার (Moon's orbit) ব্যাসার্ধ। অতএব পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণীত হইলে সেই সঙ্গে আমরা চন্দ্রকক্ষার পরিধিও কষিয়া বাহির করিতে পারি। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এবং চন্দ্রকক্ষার পরিধি হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ নির্ণয় করেন যথাক্রমে ৫১,৫৬৬ যোজন ও ৩২৪,০০০ যোজন।

চন্দ্র পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী বলিয়া ইহার লম্বনের পরিমাণ বেশী এবং ইহা মাপিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দূরবর্তী গ্রহদের ক্ষেত্রে এই লম্বনের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে তাহা নির্ণয় করা সে যুগে একরূপ দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং চন্দ্রের বেলায় লম্বন নির্ণয় করিয়া সূর্য হইতে তাহার দূরত্ব যেমন অতি সহজে নির্ণয় করা সম্ভবপর অন্যান্য গ্রহের বেলায় সেরূপ করা যাইত না। হিন্দুরা এই দূরত্ব ও কক্ষার পরিধি নির্ণয়ের জন্য আর একটি উপায় অবলম্বন করে। তাহারা মনে করে যে, বিভিন্ন কক্ষায় সঞ্চরমান গ্রহদের বেগ সমান; অর্থাৎ চন্দ্রও যে বেগে তাহার কক্ষায় ভ্রমণ সম্পাদন করে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রহ শনিও আপন কক্ষায়

অবিকল সেই একই বেগে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। শনিকক্ষার পরিধি চন্দ্রকক্ষার পরিধি অপেক্ষা বৃহত্তর হওয়ায় শনির ভগনকাল চন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণযোগ্য নহে; তবে কেপ্‌লারের সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে পৃথিবীর সর্বত্র জ্যোতির্বিদেরা গ্রহদের বেগ সম্বন্ধে উপরিউক্ত ধারণাই পোষণ করিত। যাহা হউক, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন একটি গ্রহের বেগ জানা থাকিলে, বিভিন্ন গ্রহের নাক্ষত্রিক ভগন-কাল দ্বারা এই বেগ গুণ করিলে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষার পরিধি বাহির করা যাইবে। চন্দ্রকক্ষার পরিধি ও চন্দ্রের নাক্ষত্রিক ভগন-কাল হইল ৩২৪,০০০ যোজন ও ২৭·৩২১ দিন; সুতরাং চন্দ্রের, অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহের বেগ হইল :

$$\text{বেগ} = \frac{৩২৪,০০০}{২৭·৩২১} \text{ যোজন/দিন}$$

এই বেগকে গ্রহদের নাক্ষত্রিক ভগন-কাল দ্বারা গুণ করিয়া হিন্দুরা বিভিন্ন গ্রহকক্ষার পরিধির নিম্নলিখিত মান নির্ণয় করে :—

চন্দ্রের কক্ষার পরিধি		...	...	৩২৪,০০০	যোজন
সূর্য, বুধ ও শুক্রের	,,	...	...	৪,৩৩১,৫০০	,,
মঙ্গলের	,,	...	..	৮,১৪৬,৯০৯	,,
বৃহস্পতির	,,	...	...	৫১,৩৭৫,৭৬৪	,,
শনির	,,	...	...	১২৭,৬৬৮,২৫৫	,,
অচল নক্ষত্রদের	,,	...	...	২৫৯,৮৯০,০১২	,,
ব্রহ্মাণ্ডের	,,	...	..	১৮,৭১২,০৮০,৮৬৪,০০০,০০০	,,

—(অর্থাৎ যতদূর সূর্যকিরণ যায়)

উপরিউক্ত হিসাব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি সম্বন্ধে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌দের ধারণা কিরূপ ছিল তাহা মোটামুটি বুঝা যায়।

গ্রহগতিবাদ : গ্রহরা নিজ নিজ কক্ষায় সমবেগে ধাবিত হইলে পৃথিবী হইতে তাহাদের গতি ও বিভিন্ন সময়ে আকাশে তাহাদের অবস্থান যেইরূপ দেখা উচিত ঠিক তাহা দেখা যায় না। এই গতির নানা বৈষম্য ও প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। ব্যাবিলনীয় ও গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা গ্রহদের এই গতি-বৈষম্যের কথা অবগত ছিল। পৃথিবী-পরিক্রমায় তাহাদের গতি কখনও দ্রুত কখনও শ্লথ হইতে দেখা যায়, এবং কখনও কখনও আবার দিক পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে তাহাদের ধাবিত হইতে দেখা যায়। এই বৈষম্য ও খামখেয়ালী গতি প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌দের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সূর্যসিদ্ধান্তের মতে গ্রহদের গতি আট প্রকার : বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, সম, মন্দতর, অতিশীঘ্র ও শীঘ্র। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণও এই আট প্রকার গতির উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা উৎকেন্দ্রীয় (eccentric) বৃত্ত ও পরিবৃত্তের (epicycle) সাহায্যে গ্রহদের গতি-বৈষম্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা প্রসঙ্গে সেকথা আমরা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।* হিন্দুদের গ্রহগতিবাদও মূলতঃ এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের ব্যবহার-কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু জ্যোতিষে গ্রহদের গতি বুঝাইতে এই দুই প্রকার বৃত্তের অবতারণা করেন আর্যভট। সূর্যসিদ্ধান্তে উৎকেন্দ্রীয় ও পরিবৃত্তের ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ আর্যভটর পরবর্তী যুগের সংযোজনা। আধুনিক সূর্যসিদ্ধান্তের যে সকল অংশ আর্যভট অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া অনুমিত হয় তাহাতে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের বা পরিবৃত্তের কোন উল্লেখ নাই। প্রাক্‌-আর্যভটীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের যুগে গ্রহরা ভূকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পৃথিবীকে

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২২৯-৩০, ২৩৪-৩৫।

প্রদক্ষিণ করে, এইরূপ ধারণাই জ্যোতির্বিদ্‌দের বদ্ধমূল ছিল। এক প্রকার প্রবাহ বায়ুর টানে এবং মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ প্রভৃতি দেবতাদের নানাবিধ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রভাবে গ্রহদের গতি-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে, সূর্যসিদ্ধান্তের প্রাচীনতম স্তরগুলিতে এইরূপ আলোচনা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের পরিকল্পনা সংযোজিত হইবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌দের গ্রহগতিবাদ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ॥ ১ ॥
তদ্বাতরশ্মিভির্বদ্ধাস্তৈঃ সব্যেতরপাণিভিঃ।
প্রাক্‌পশ্চাদপকৃষ্যন্তে যথাসন্নং স্বদিঙ্মুখম্‌॥ ২ ॥
প্রবহাখ্যো মরুৎ তাংস্তু স্বোচ্চাভিমুখমীরয়েৎ।
পূর্ব্বাপরাপকৃষ্টাস্তে গতিং যান্তি পৃথগ্বিধাম্‌॥ ৩ ॥
গ্রহাৎ প্রাগ্‌ভগণার্দ্ধস্থঃ প্রাঙ্‌মুখং কর্ষতি গ্রহম্‌।
উচ্চসংজ্ঞোঽপরার্দ্ধস্থস্তদ্বৎ পশ্চান্মুখং গ্রহম্‌॥ ৪ ॥
স্বোচ্চাপকৃষ্টা ভগণৈঃ প্রাঙ্‌মুখং যান্তি যদ্‌গ্রহাঃ।
তৎ তেষু ধনমিত্যুক্তমৃণং পশ্চান্মুখেষু তু॥ ৫ ॥
[—সূঃ সিঃ ২য় অধ্যায়।]

অর্থাৎ,

"কালের মূর্তিস্বরূপ অথচ নেত্রের অগোচর, শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ, ও পাতসংজ্ঞক দেবতারা রবিমার্গ আশ্রয় করিয়া আছেন; ইহারাই গ্রহগণের গতির কারণ। ১।

"ঐ শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতসংজ্ঞক দেবতারা স্বীয় বায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা গ্রহ সকলকে বন্ধন করিয়া স্বাভিমুখে আকর্ষণ করেন। ঐ দেবতারা বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা রজ্জু গ্রহণ করিয়া পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। যে সকল গ্রহ ঐ দেবতাদিগের বাম দিকে অবস্থিত, তাহাদিগকে বাম হস্তে এবং যে সকল গ্রহ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তাহাদিগকে দক্ষিণ হস্তে আকর্ষণ করেন। ২।

"প্রবাহ নামক বায়ু গ্রহ সকলকে স্বীয় স্বীয় উচ্চাভিমুখে প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে গ্রহগণ কোন সময়ে পূর্বে ও সেই সময়েই পশ্চিমে আকৃষ্ট হয়; এই নিমিত্ত গ্রহদিগের বিভিন্ন প্রকার গতি হইয়া থাকে। ৩।

"ঐ উচ্চ সংজ্ঞক দেবতা গ্রহস্থান হইতে পূর্ব (east) ছয় রাশির মধ্যে অবস্থিত হইলে গ্রহদিগকে পূর্বদিকে এবং অপরার্ধস্থ অর্থাৎ অপর ছয় রাশির মধ্যে অবস্থিত হইলে পশ্চিম দিকে আকর্ষণ করে। ৪।

"গ্রহগণ ভগণ দ্বারা চলিতে চলিতে স্বীয় উচ্চরূপ দেবতা কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, পূর্বাভিমুখে যত অংশ গমন করে, সেই অংশ তাহাদিগের মধ্যে যোগ করিতে হয় এবং পশ্চিমাভিমুখে যত অংশ গমন করে, তত অংশ মধ্য হইতে হীন করিতে হইবে।" ৫।*

'মন্দোচ্চ' ও 'শীঘ্রোচ্চ' শব্দ দুইটির তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। গ্রহকক্ষার যে বিন্দুতে গ্রহের গতি সর্বাপেক্ষা মন্দ সেই বিন্দুর নাম 'মন্দোচ্চ, এবং যে বিন্দুতে এই গতি দ্রুততম তাহার নাম 'শীঘ্রোচ্চ'। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে apogee বা অপভূ বলিতে যাহা বুঝায় চন্দ্র ও সূর্যের 'মন্দোচ্চ' হইল তাহাই; অর্থাৎ পৃথিবী হইতে এই দুই গ্রহের ইহা সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অবস্থিতি। অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে aphelion বা অপসূর বলিতে যাহা বুঝায় 'মন্দোচ্চ' নামে তাহাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ চন্দ্র ও সূর্যের 'শীঘ্রোচ্চ' perigee বা অনুভূর নামান্তর এবং

---

* শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত—বঙ্গানুবাদক ও টীকাকার শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী, বেলুড় মঠ, ১৯০৯; পৃঃ ৩৯।

অন্যান্য গ্রহের শীঘ্রোচ্চ মানেই তাহাদের perihelion বা অনুসূর (১০নং চিত্র)। এই অপভূ ও অপসূরে মন্দোচ্চ দেবতা এবং অনুভূ ও অনুসূরে শীঘ্রোচ্চ দেবতা অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রহ-দিগকে তাহাদের মধ্যস্থান হইতে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলে গ্রহদের বেগ কখনও মন্দ কখনও বা দ্রুত হইয়া থাকে।
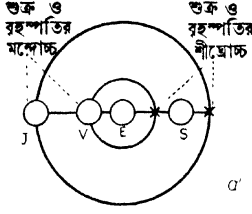
১০। গ্রহদের মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ; E—পৃথিবী; S—সূর্য; V—শুক্র J—বৃহস্পতি।
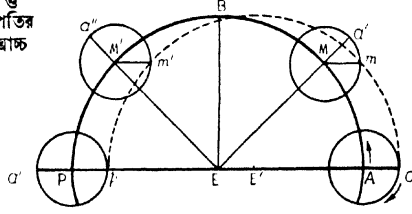
১১। গ্রহগতি ব্যাখ্যা।

পরিবৃত্তের ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহদের আপাত গতি-বৈষম্যের ব্যাখ্যা যে আর্যভট সর্বপ্রথম হিন্দু জ্যোতিষে সংযোজনা করেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আর্যভটীয়'র 'কালক্রিয়া' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন, গ্রহসকল উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে মধ্যগতিতে কক্ষ পরিক্রমণ করে; প্রত্যেক গ্রহের উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত তাহার 'কক্ষামণ্ডলে'র সমান এবং উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের কেন্দ্র পৃথিবী হইতে কিছুটা দূরে অবস্থান করে; পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে উপরিউক্ত উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্ব গ্রহদের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান; গ্রহরা মধ্যগতিতে পরিবৃত্তের পরিধিপথে ভ্রমণ করে।* সূর্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৪ হইতে ৩৯ ও পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে গ্রহদের অবস্থান-নির্ণয় ও গণনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিত্তি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্ত। আর্যভটের শিক্ষা ও উপদেশ অনুসারে এই নির্দেশগুলি যে সূর্যসিদ্ধান্তে সংযুক্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে এখন আর কোন সংশয় নাই।

উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদের গতি হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ কিভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহা আমরা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। ১১নং চিত্রে E পৃথিবী এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘূর্ণ্যমান যে কোন একটি গ্রহের কক্ষার একাংশ হইল $A\ M\ M'\ P$। এই গ্রহের উপর মন্দোচ্চ, শীঘ্রোচ্চ প্রভৃতি দেবতাদের যদি কোন প্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ না থাকিত তবে গ্রহটি চিরকালই সমবেগে এই বৃত্তাকার কক্ষায় পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া যাইত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন গ্রহই এইসব দেবতাদের প্রভাবমুক্ত নহে; এজন্য তাহাদের গতি ও গতিপথের

* 17. All the planets move by their (mean) motion on their orbits and their eccentric circles from the apsis eastward and from the conjunction westward.

18. The eccentric circle of each planet is equal to its Kakṣyāmaṇḍala (কক্ষামণ্ডল) (the orbit on which the mean planet moves). The centre of the eccentric circle is outside the centre of the solid Earth.

19. The distance between the centre of the Earth and the centre of the eccentric circle is equal to the radius of the epicycle. The planets move with their mean motions on their epicycles."—W. E. Clark, *The Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa*, Chicago, 1930 ; p. 57-8.

অনেক প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। এই প্রভেদ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে মনে করিতে হইবে গ্রহটি যেন একটি ক্ষুদ্র পরিবৃত্তের পরিধি পথে ঘুরিতেছে আর সেই সঙ্গে পরিবৃত্তের কেন্দ্রটিও পূর্বোক্ত বৃহৎ বৃত্তের পরিধি $A\ M\ M'\ P$ 'র উপর সমবেগে অগ্রসর হইতেছে। পরিবৃত্তে গ্রহের গতি এবং পরিবৃত্তের কেন্দ্রের গতি বিপরীতমুখী। অধিকন্তু এই দুইয়ের কৌণিক বেগ (angular velocity) সমান। পরিবৃত্তের কেন্দ্র যখন A বিন্দুতে মনে করা যাক গ্রহটি তখন অবস্থান করিতেছে a বিন্দুতে। পরিবৃত্ত যখন A হইতে M-এ অগ্রসর হইয়াছে, গ্রহটি তখন বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া m বিন্দুতে উপস্থিত হইয়াছে। সেইরূপ পরিবৃত্তটি M' ও P বিন্দু অতিক্রম করিবার সময় গ্রহের অবস্থান হইবে যথাক্রমে m' ও p বিন্দুতে।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা এবং ডেফারেণ্ট ও পরিবৃত্তের সাহায্যে টলেমী যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কেবল একটি বিষয়ে হিন্দু পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ ডেফারেণ্টে পরিভ্রমণকালে পরিবৃত্তের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ কল্পনা করিয়াছিলেন। A-বিন্দুতে অবস্থানকালে পরিবৃত্তের পরিধির যে আয়তন হইবে, A বিন্দু অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ B বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে এই পরিধির আয়তন আর পূর্ববৎ থাকিবে না, ইহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। এই সঙ্কোচনের শেষ সীমা B বিন্দুতে। তারপর B হইতে P বিন্দুতে অগ্রসর হইবার সময় পরিবৃত্তের পরিধি আবার ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া P বিন্দুতে আগের অবস্থায় উপনীত হইবে। কক্ষার অপরার্ধে এই সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।* গ্রীক জ্যোতিষের কোথাও পরিবৃত্তের এরূপ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের উল্লেখ নাই।

উপরিউক্তভাবে পরিবৃত্তপথে ভ্রমণ করিলে গ্রহের যে আপাত গতি দৃষ্ট হইবে, পরিবৃত্তের বদলে $a\ m\ m'\ p$ উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে গ্রহটিকে ভ্রাম্যমান মনে করিলেও সেই একই ফল পাওয়া যাইবে। চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের কেন্দ্র E' ও পৃথিবী E র মধ্যে দূরত্ব অবিকল পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের, অর্থাৎ Aa বা Pp-র সমান। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহদের অবস্থান গণনা করিবার জন্য এই দ্বিবিধ উপায়ই অবলম্বন করেন। তবে অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্ পরিবৃত্ত ব্যবহার করিয়া গ্রহ সংক্রান্ত গণনা বেশী পছন্দ করিতেন।

উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত অথবা পরিবৃত্ত সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। হিন্দুরা এই দুই জ্যামিতিক কৌশলকে কেবল গণনার সুবিধার জনাই প্রয়োগ করিয়াছিল। টলেমীর মত তাহারা বিশ্বাস করিত না যে, গ্রহরা সত্যসত্যই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে অথবা পরিবৃত্তে অনবরত ঘুরপাক খাইতে খাইতে পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা ছিল, গ্রহরা পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি এককেন্দ্রীয় বৃত্তপথে (concentric circle) পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।†

অয়নাংশ বা অয়ন-চলন (precession of the equinoxes): অয়নাংশ বা অয়ন-চলন সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান কিরূপ সুপ্রাচীন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাহারও কাহারও মতে বৈদিক হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই তথ্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রজাপতি কর্তৃক

---

* A remarkable peculiarity of the Hindu system is that the epicycles are supposed to contract their dimensions as they leave the apsis or the conjunction respectively . . ., becoming smallest at the quadrature, then again expanding till the lower apsis, or opposition, is reached, and decreasing and increasing in like manner in the other half of the orbit. . . ."—Burgess, *Translation of the Sūrya-Siddhānta*, p. 70.

† "The Hindu theory, however, as remarked above, . . . rejects the idea of the actual motion of the planet in the epicycle, or on the eccentric circle ; the method is but a device for ascertaining the effect of the attractive force of being at the apsis."—Burgess, *loc. cit*, 72-73.

রোহিণীর পশ্চান্ধাবনের উপাখ্যান যে এই তথ্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে, তাহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।* এইরূপ উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ৯ হইতে ১২ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পাই :

"ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুনাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাৎযদবাপ্যতে॥ ৯॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।
তৎসংস্কৃতাদ্‌গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্।
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে॥১০॥
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈ রথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে॥ ১১॥
এবং বিষুবতিচ্ছায়া স্বদেশে যা দিনার্দ্ধজা।
দক্ষিণোত্তররেখায়াং সা তত্র বিষুবৎপ্রভা॥ ১২"

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী উপরিউক্ত চারিটি শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন :†

"এক মহাযুগে ভচক্র অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ ৬০০ বার তুলাদণ্ডের ন্যায় একবার পূর্ব দিক আবার পশ্চিম দিক দুলিতে থাকে। উক্ত দোলন সংখ্যাকে অহর্গণ অর্থাৎ গত দিন সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া এক কল্পের সাবন দিন সংখ্যা দিয়া ভাগ কর। ভাগফলের দ্বারা গত দোলনের পূর্ণ সংখ্যা আর রাশ্যংশ কত, তাহা জানা যাইবে। ৯।

দোলনের পূর্ণ সংখ্যা ত্যাগ করিলে, বাকি রাশ্যংশ যাহা হয়, তাহার ভুজ ২ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক অনুযায়ী বাহির কর। এই ভুজকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ ভাগ পাওয়া যাইবে। (ইংরাজীতে ইহাকে precession of the equinoxes কহে।)

এই অয়নাংশ গ্রহের স্থানে যোগ বা তাহা হইতে বিয়োগ কর। এই যোগ বা বিয়োগফল হইতে ক্রান্তিজ্যা, শঙ্কুছায়া, চর প্রভৃতি নির্ণয় করিবে। যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব দিকে দুলিতেছে, তখন অয়নাংশ গ্রহস্থানে যোগ করিবে, আর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পশ্চিম দিকে, তখন গ্রহের স্থান হইতে বিয়োগ করিবে। যোগ বা বিয়োগফল গ্রহের ভুজাংশ হইতেছে। বিষুব বিন্দুদ্বয়ে (equinoxes) এবং অয়নান্ত বিন্দুতে (solstitial points) যখন সূর্য থাকেন তখন সূর্যকে নিরীক্ষণ করিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃক্‌গোচর হয়।১০।

গণনা দ্বারা প্রাপ্ত সূর্যের স্পষ্ট স্থান যদি ছায়াগত (অর্থাৎ স্পষ্ট) অর্কস্থান (সূর্যের ভুজাংশ) হইতে যত অংশ ন্যূন হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্ব দিকে এবং যত অংশ অধিক হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পশ্চিম দিকে স্থিত।১১।

এইরূপে বিষুব দিনের মধ্যাহ্নের ছায়া দক্ষিণোত্তর রেখাতে দৃষ্ট হয়; তাহাই তথাকার বিষুবচ্ছায়া বা পলভা।১২।"

অয়নাংশ সম্বন্ধে এই শ্লোকগুলিতে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই। মহাবিষুব একটি স্থির বিন্দুর (ইহা মীন নক্ষত্রের নিকট) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দোলকের ন্যায় দুলিয়া থাকে; উভয় দিকে এই দোলনের সীমা ২৭° ডিগ্রী এবং এই দোলন সম্পূর্ণ করিতে এক মহাযুগের (৪,৩২০,০০০ বৎসর) ৬০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৭২০০ বৎসর সময় লাগে। এই হিসাবে বৎসরে অয়নাংশের মাত্রা দাঁড়ায় ৫৪″ সেকেন্ড; আধুনিক জ্যোতিষীয় হিসাব ৫০″·২৫ সেকেন্ড।

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : পৃঃ ১০৩।
† বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত—বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত, ১৯০৯, পৃঃ ৯৬।

এখন অয়নাংশ সম্বন্ধে উপরিউক্ত শ্লোকগুলি প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ইহা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বার্গেস্ সাহেবের অভিমত* সূর্যসিদ্ধান্তের প্রাচীন রচয়িতাগণ অয়নাংশ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না; ইহা অনেক পরে, সম্ভবতঃ একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে সূর্যসিদ্ধান্তের মূল কলেবরে প্রক্ষিপ্ত হয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ, এমন কি প্রথিতযশা জ্যোতির্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্ত পর্যন্ত, তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে অয়নাংশের কোন উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই; হয় তাঁহারা অয়নাংশের কথা জানিতেন না, অথবা জানিলেও ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হিন্দু জ্যোতিবিদ্‌গণের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিষ্ণুচন্দ্র ও তাঁহার কিছু পরে শ্রীসেন সর্বপ্রথম অয়ন-চলনের উল্লেখ করেন।† তবে অয়ন-চলনের গুরুত্ব এদেশে সম্ভবতঃ মুঞ্জালই প্রথম উপলব্ধি করেন। 'লঘুমানসে' তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং অয়ন-গতিবেগও নির্ধারণ করেন। ইহা বৎসরে ৫৯″·৯ সেকেন্ড। অয়ন-চলনের কথা পৃথূদক স্বামীও (জন্ম ৯২৮) আলোচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'তে এ সম্বন্ধে যে বিশদ আলোচনা করেন তাহা প্রধানতঃ মুঞ্জাল হইতে গৃহীত। তিনি ক্রান্তিবিন্দুদ্বয়ের দোলনের পরিবর্তে বৃত্তাকার গতিতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার হিসাবমত এক কল্পে অর্থাৎ ১০০০ মহাযুগে ক্রান্তিবিন্দু বৃত্তপথে ১৯৯, ৬৬৯ বার ঘুরিয়া আসে, এবং এই বৃত্ত একবার পরিক্রমণ করিতে লাগে ২১, ৬৩৫·৮০৭৩ বৎসর। এই গণনায় বাৎসরিক অয়নাংশের মাত্রা ৫৯″·৯০০৭ সেকেন্ড। ভাস্করাচার্যকে অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষীয় গণনায় অয়নাংশের গুরুত্ব হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ উপলব্ধি করিলেও তাঁহার প্রস্তাবিত ক্রান্তিবিন্দুর বৃত্তাকার গতি তাঁহারা অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। দোলনের গতির মত ইহা যে বার বার পূর্ব-পশ্চিম দিক পরিবর্তন করিয়া থাকে এই মতই সাধারণ সমর্থন লাভ করে।

মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণও অয়নের এইরূপ দোলন (trepidation of the equinoxes) গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নবম শতাব্দীতে খ্যাবিত ইবন্ কুরা (৮২৬-৯০১) অয়নের এইরূপ দোলন-গতির আলোচনা করেন এবং মুসলমান বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন। এই দোলন-গতির কথা মধ্যযুগে ল্যাটিন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ আরব্য বিজ্ঞানীদের নিকট অবগত হয় এবং এক সময় ইউরোপেও এই মতবাদ বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

অয়নাংশ সম্বন্ধে হিন্দুদের নির্ভুল গণনাও বিশেষ লক্ষণীয়। হিপার্কাস্ অয়নাংশের মাত্রা বাহির করিয়াছিলেন বৎসরে ৩৬″ সেকেন্ড। 'অ্যালমাজেস্টে' টলেমী এই মানই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* *loc. cit;* p. 114-121.

† Prof. M. N. Saha and Sri N. C. Lahiri, Report of the Calendar Reform Committee, Part C, History of the Calendar in different countries through the ages, 1955; p. 267.

রোহিণীর পশ্চান্ধাবনের উপাখ্যান যে এই তথ্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে, তাহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।* এইরূপ উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ৯ হইতে ১২ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পাই :

"ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুনাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাৎযদবাপ্যতে॥ ৯॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।
তৎসংস্কৃতাদ্গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্।
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে॥১০॥
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈ রথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে॥ ১১॥
এবং বিষুবতিচ্ছায়া স্বদেশে যা দিনার্দ্ধজা।
দক্ষিণোত্তররেখায়াং সা তত্র বিষুবৎপ্রভা॥ ১২"

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী উপরিউক্ত চারিটি শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন :†

"এক মহাযুগে ভচক্র অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ ৬০০ বার তুলাদণ্ডের ন্যায় একবার পূর্ব দিক আবার পশ্চিম দিক দুলিতে থাকে। উক্ত দোলন সংখ্যাকে অহর্গণ অর্থাৎ গত দিন সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া এক কল্পের সাবন দিন সংখ্যা দিয়া ভাগ কর। ভাগফলের দ্বারা গত দোলনের পূর্ণ সংখ্যা আর রাশ্যংশ কত, তাহা জানা যাইবে। ৯।

দোলনের পূর্ণ সংখ্যা ত্যাগ করিলে, বাকি রাশাংশ যাহা হয়, তাহার ভুজ ২ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক অনুযায়ী বাহির কর। এই ভুজকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ ভাগ পাওয়া যাইবে। (ইংরাজীতে ইহাকে precession of the equinoxes কহে।)

এই অয়নাংশ গ্রহের স্থানে যোগ বা তাহা হইতে বিয়োগ কর। এই যোগ বা বিয়োগফল হইতে ক্রান্তিজ্যা, শঙ্কুছায়া, চর প্রভৃতি নির্ণয় করিবে। যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব দিকে দুলিতেছে, তখন অয়নাংশ গ্রহস্থানে যোগ করিবে, আর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পশ্চিম দিকে, তখন গ্রহের স্থান হইতে বিয়োগ করিবে। যোগ বা বিয়োগফল গ্রহের ভুজাংশ হইতেছে। বিষুব বিন্দুদ্বয়ে (equinoxes) এবং অয়নান্ত বিন্দুতে (solstitial points) যখন সূর্য থাকেন তখন সূর্যকে নিরীক্ষণ করিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃক্‌গোচর হয়।১০।

গণনা দ্বারা প্রাপ্ত সূর্যের স্পষ্ট স্থান যদি ছায়াগত (অর্থাৎ স্পষ্ট) অর্কস্থান (সূর্যের ভুজাংশ) হইতে যত অংশ ন্যূন হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্ব দিকে এবং যত অংশ অধিক হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পশ্চিম দিকে স্থিত।১১।

এইরূপে বিষুব দিনের মধ্যাহ্নের ছায়া দক্ষিণোত্তর রেখাতে দৃষ্ট হয়; তাহাই তথাকার বিষুবচ্ছায়া বা পলভা।১২।"

অয়নাংশ সম্বন্ধে এই শ্লোকগুলিতে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই। মহাবিষুব একটি স্থির বিন্দুর (ইহা মীন নক্ষত্রের নিকট) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দোলকের ন্যায় দুলিয়া থাকে; উভয় দিকে এই দোলনের সীমা ২৭° ডিগ্রী এবং এই দোলন সম্পূর্ণ করিতে এক মহাযুগের (৪,৩২০,০০০ বৎসর) ৬০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৭২০০ বৎসর সময় লাগে। এই হিসাবে বৎসরে অয়নাংশের মাত্রা দাঁড়ায় ৫৪″ সেকেন্ড; আধুনিক জ্যোতিষীয় হিসাব ৫০″·২৫ সেকেন্ড।

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : পৃঃ ১০৩।
† বিজ্ঞানানন্দ স্বামী, শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত—বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত, ১৯০৯, পৃঃ ৯৬।

হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশুচিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশের মধ্যে সুপরিস্ফুট। চরক ও সুশ্রুতে মাঝে মাঝে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বৌদ্ধযুগের পূর্বে এদেশে হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় একেবারে ছিল না, তাহা অবশ্য বলা চলে না। রোগীর বাসের উপযোগী গৃহাদি কিরূপ ধরনের ও কিভাবে নির্মিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্থপতির উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ আছে। প্রসূতি-ভবন, শিশুচিকিৎসালয় এবং অস্ত্রোপচার-গৃহের কিরূপ নক্সা হওয়া প্রয়োজন এবং এইসব গৃহে কি ধরনের সরঞ্জাম থাকা উচিত, এইসব গ্রন্থে তাহারও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।* যে যুগে চরক ও সুশ্রুত রচিত হইয়াছিল, সে যুগে হাসপাতালব্যবস্থার প্রচলন না থাকিলে এইসব উপদেশ ও বর্ণনার কোন তাৎপর্য থাকে না। তবে এইসব অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

মৌর্যযুগে হাসপাতালজাতীয় চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণের চিকিৎসার যে বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে তাহা জানা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্রে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল এবং বিদেশীরাও ইহার পূর্ণ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত না। অশোকের সময় এই ব্যবস্থা অবশ্য আরও অনেক উন্নত হয়। অশোকের দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র, এমন কি চোল, পাণ্ড্য, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি সীমান্তবর্তী নানা বিদেশী জাতির রাজ্যেও বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইসব দাতব্য চিকিৎসালয়ে মানুষ ও পশু উভয়ের উপযোগী ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা থাকিত। কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে মানুষ বা পশুর প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়ার অভাব ঘটিলে তাহা অন্যত্র হইতে আনাইবার ও সেই স্থানে রোপণ করিবার ব্যবস্থা হইত। যোগ্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী-দের দ্বারা রোগীরা এইসব কেন্দ্রে চিকিৎসিত হইত।

ফাহিয়ান পাটলিপুত্রের দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এ দেশের রাজন্যবর্গ ও ধনবান ব্যক্তিরা এই সহরে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, খঞ্জ প্রভৃতি দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য অনেকগুলি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। এইখানে তাহারা বিনা পয়সায় প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাহায্য পাইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ তাহাদের রোগ পরীক্ষা এবং রোগ বিশেষে প্রত্যেকের জন্য খাদ্য, পানীয়, ঔষধ অথবা কষায়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগ সারিয়া গেলে ইচ্ছামত যে যাহার স্থানে চলিয়া যায়।" সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়া হুয়েন সাং-ও এদেশের হাসপাতাল ব্যবস্থা দেখিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। দ্বিতীয় শিলাদিত্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি রাজ্যের প্রত্যেক সহরে, গ্রামে ও প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে বহু চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এইসব চিকিৎসালয়ের স্থায়ী চিকিৎসকদিগের নিকট অসুস্থ পথিকরা বিনা খরচে চিকিৎসার সকল সুযোগ পাইত।

হুয়েন সাং 'পুণ্যশালা' নামে আর এক ধরনের জনপ্রিয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। দানশীল নৃপতি ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা দরিদ্র, বিধবা নারী, পিতৃমাতৃহীন শিশু অথবা অন্য প্রকারে অনাথ ও নিরাশ্রয় লোকের জন্য 'পুণ্যশালা' নির্মাণ করিতেন। পুণ্যশালায় আহার ও আশ্রয় ছাড়া চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত থাকিত।

বৌদ্ধদিগের প্রভাবে সুদূর সিংহলেও বহু প্রাচীনকাল হইতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সিংহলরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলির বর্ণনা পাঠে ইহাদের পরিচালনা ও সংগঠন সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। প্রতি দশখানি গ্রামের জন্য একটি করিয়া হাসপাতাল সে সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব হাসপাতালের চিকিৎসকদের ও চিকিৎসার সকল ব্যয়ভার রাজা বহন করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলের

---

* G. N. Mukhopadhyaya, *The Surgical Instruments of the Hindus,* Vol. I; Calcutta, 1913; pp. 34-43.

পরাক্রান্ত রাজা মহামান্য পরাক্রম রাজধানীতে যে এক বিরাট হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে এককালে প্রায় সাত শত রোগী চিকিৎসিত হইতে পারিত। এই হাসপাতালে প্রত্যেক রোগীর শুশ্রূষার জন্য একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা ছিল। ব্যবস্থা ও আয়তনের দিক হইতে ইহা বর্তমান যুগের যে কোন বড় হাসপাতালের সঙ্গে তুলনীয়।

পশু-চিকিৎসা : অতি প্রাচীনকাল হইতে পশু-চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা হিন্দুদের অবহিত দেখি। অশ্ব, গজ ও গবাদি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

পশু-চিকিৎসার গ্রন্থকারদের মধ্যে শালিহোত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'অশ্বায়ুর্বেদ-সিদ্ধান্ত' বা 'শালিহোত্রসংহিতা' নামে তিনি অশ্ব-চিকিৎসার এক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে শালিহোত্র নাকি অশ্ব-চিকিৎসার জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট লাভ করিয়াছিলেন; তিনি অবশ্য নিজেকে পাঞ্জাবের শালাতুর নামক স্থানের অধিবাসী অশ্বঘোষের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের এইসব অঞ্চল ও নিকটবর্তী সিন্ধুপ্রদেশ এককালে অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। শালিহোত্র-সংহিতা ২৮০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। গ্রন্থটি আয়ুর্বেদের পদ্ধতিতে রচিত, আয়ুর্বেদের 'অষ্টাঙ্গের' মত ইহাতেও আটটি প্রধান অধ্যায় আছে। বিশেষজ্ঞ-দের অভিমত, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কিছু পূর্বে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জাঁ ফিলিওজা লিখিয়াছেন :—

> "L'oeuvre attribuée à Śālihotra n'est pas sans valeur. Elle est intitulée *Śālihotronnaya* 'Élève du cheval ou Elevage par Śālihotra', et aussi *Aśvāyurvedasiddhānta* 'Système complet de médecine des chevaux'. Elle est représentée surtout par un manuscrit de l'India Office et une version tibétaine qui comprend l'équivalent de 2,800 *śloka*. Elle est probablement antérieure au x siècle. Elle adapte *l'Āyurveda* classique à son sujet spècial et se divise en huit sections qui correspondent à peu près à la division de *l'Āyurveda* en huit articles."*

উপরিউক্ত বিবৃতিতে দেখা যায়, গ্রন্থের একটি তিব্বতী সংস্করণও প্রণীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ আরবী ভাষাতে অনূদিত হয়; আরবী সংস্করণের নাম 'শালাটোর'। শালিহোত্র-রচিত আরও দুইটি গ্রন্থের নাম 'অশ্বপ্রশংসা' ও 'অশ্বলক্ষণশাস্ত্র'। ইহার কোনটাই ঠিক অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ নহে; সাধারণভাবে অশ্বদের কথা ও অশ্ব চিনিবার উপায় ইত্যাদি গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রাণিবিদ্যার দুইটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলা যায়।

নকুলের 'অশ্ব-চিকিৎসা' ও জয়দত্তের 'অশ্ববৈদ্যক' অশ্ব-চিকিৎসার আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থদ্বয়ের প্রধান উপকরণ শালিহোত্র-সংহিতা হইতে গৃহীত।

পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' হস্তিচিকিৎসার প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সাত শত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থের আলোচনা চারিটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত : (১) মহারোগস্থান, (২) ক্ষুদ্র-রোগস্থান, (৩) শল্যস্থান, ও (৪) উত্তরস্থান। হস্তিচিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব নির্দেশ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করেন মেগাস্থিনিস্। পালকাপ্যের কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা না গেলেও হস্তিচিকিৎসাবিদ্যা যে এদেশে সুপ্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

---

* *L'Inde classique,* edited by Louis Renou, Jean Filliozat, vol. II, École Française d'Extrême-Orient, Hanoi, 1953 ; pp. 165-66.

হস্তীর স্বভাব, বন্য হস্তী ধরিবার ও পোষ মানাইবার উপায়, হস্তীর বিবিধ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া নীলকণ্ঠ 'মাতঙ্গলীলা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'অশ্ব-প্রশংসা' ও 'অশ্বলক্ষণশাস্ত্রে'র মত 'মাতঙ্গলীলা'ও প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিদ্যার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৩·২। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ

নাগার্জুন (১ম, ৪র্থ, ৯ম শতাব্দী?)

সুশ্রুত-সংহিতার সম্প্রসারক ও সংস্কারক হিসাবে আমরা নাগার্জুনের নাম ইতিপূর্বেই করিয়াছি। কিন্তু তিনি কোন নাগার্জুন? আমরা তিনজন নাগার্জুনের কথা জানি। প্রথম, মাধ্যমিক-সূত্রবৃত্তির রচয়িতা শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী'তে (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত) এই নাগার্জুনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে তিনি নাকি শাক্যসিংহের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে দার্শনিক নাগার্জুনের কাল গিয়া পড়ে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

দ্বিতীয়, এক নাগার্জুনের কথা বৃন্দ তাঁহার 'সিদ্ধযোগে' উল্লেখ করিয়াছেন; ইনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতকে জীবিত ছিলেন। অনেকের অনুমান এই চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর নাগার্জুনই সুশ্রুত-সংহিতা নূতন করিয়া লেখেন এবং মূল গ্রন্থের কিছু কিছু পরিবর্তন, সংস্কার-সাধন ও সম্প্রসারণ করেন। সুশ্রুতচন্দ্রিকা বা ন্যায়চন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জুনের পাঠ বলিয়া যে পাঠটি চলিয়াছে তাহা বর্তমান সুশ্রুতেরই পাঠ।

তৃতীয়, 'লোহাশাস্ত্র', 'কক্ষপুটতন্ত্র', 'রসরত্নাকর', 'আরোগ্যমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা গুর্জরের রাসায়নিক বা কিমিয়াবিদ্ নাগার্জুন। এই তৃতীয় নাগার্জুন অষ্টম কি নবম শতাব্দীর লোক। ধাতুবিদ্যা, পারদঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান ও নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় রসায়নে তিনি বিশিষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। আল্‌বীরূণী কিমিয়াবিদ্ নাগার্জুনের উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "এই বিদ্যার (কিমিয়ার) একজন বিখ্যাত প্রতিভূ হইলেন সোমনাথের নিকটবর্তী দাইহকের অধিবাসী নাগার্জুন। তিনি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং ইহার সকল দিক আলোচনা করিয়া যে মৌলিক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। আমাদের প্রায় শত বর্ষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন।"* আল্‌বীরূণী (৯৭৩-১০৪৮) দশম ও একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে নাগার্জুন নবম শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত হইতে পারেন না। আবার সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাংকে আমরা রাজা সাতবাহনের বন্ধু এক বৌদ্ধ কিমিয়াবিদের উল্লেখ করিতে দেখি। এই চৈনিক পরিব্রাজকের সমসাময়িক বাণও নাগার্জুন সম্বন্ধে হুয়েন সাং-এর উক্তি সমর্থন করেন।† ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে কিমিয়াবিদ্ নাগার্জুনের কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে। কোনটি সত্য?

নাগার্জুন নামধারী এই সকল ব্যক্তিরা সত্যসত্যই ভিন্ন ব্যক্তি না সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কেবল একজন নাগার্জুনই প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন, সুশ্রুতের নাগার্জুন, লোহাশাস্ত্রের নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক-সূত্রবৃত্তির নাগার্জুন সকলেই সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি ছিলেন।‡

* E. Sachau, *Alberuni's India*, I ; p. 189.
† P. C. Ray, *History of Hindu Chemistry*.
‡ B. N. Seal, *Positive Sciences of the Ancient Hindus*, p. 62.

নাবনীতক (খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বৃটিশ সৈন্যবিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট এ. বাওয়ের চৈনিক তুর্কীস্তানের একটি বৌদ্ধ স্তূপ খনন করিয়া সাতখানি প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। প্রত্নলিপিবিদ্‌গণ এই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, গ্রন্থগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ গুপ্তযুগের প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। সাতখানির মধ্যে তিনখানি গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয় চিকিৎসাশাস্ত্র। এই তিনখানির মধ্যে 'নাবনীতক' নামক গ্রন্থের গুরুত্বই সর্বাধিক। 'নাবনীতক' কোন মৌলিক গ্রন্থ নহে; ইহা চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত একখানি ভেষজসার সংগ্রহ। সুশ্রুত ছাড়া ইহাতে সাম্বব্য, গর্গ, বশিষ্ঠ, করাল, সুপ্রভ, বাড়্‌বলি প্রমুখ বহু প্রাচীন ভিষক্‌ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। এইসব ভিষক্‌দের অনেকেরই নাম পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালে রচিত কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। এই গ্রন্থ সুশ্রুত, চরক প্রমুখ গ্রন্থকারগণের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

নাবনীতক অনেকটা চরক-সংহিতার অনুকরণে রচিত। ইহাতে রোগ, চিকিৎসা-প্রণালী ও ভেষজ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। হরীতকী, শিলাজতু, পিপ্‌পলি প্রভৃতি বহুবিধ ভেষজের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। তারপর এই গ্রন্থে হবুষাবস্তি নামে একরূপ অন্ত্রবস্তি (enema) ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। চরক-সুশ্রুতেও মলদ্বার পথে প্রয়োগের জন্য নানাজাতীয় বস্তির বিধান ছিল। এই সকল বস্তিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ সঙ্কীর্ণ নলের মধ্য দিয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো হইত। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক ও পুরুষের মূত্রদ্বারের নানাপ্রকার ব্যাধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের বস্তি-প্রয়োগের (cathetar) বিধি ছিল।

বিবিধ চক্ষু ও চর্ম রোগ ও তাহাদের চিকিৎসা, হৃদ্‌রোগ, কুষ্ঠ ও ইরিসিপেলাস্‌-রোগের ঔষধ ইত্যাদি এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য নানারূপ কলপ ব্যবহারের পরামর্শ আছে। ইহাদের প্রস্তুতবিধি ইত্যাদি রসায়ন আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইবে।

চরকের অনুকরণে সংকলিত হইলেও নাবনীতকে চরকের কোন উল্লেখ নাই। ডাঃ জিমার মনে করেন, চরক ও ভেল সংহিতার মত চিকিৎসাশাস্ত্রের হয়ত অন্য কোন সুপ্রাচীন ধারা ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া নাবনীতক রচিত হয়।*

বাওয়ের সংগ্রহের আর একটি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থে রশুনের উপকারিতা আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে, রশুন ব্যবহারে বহু রোগের উপশম হয় এবং নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে ইহা শতায়ু হইতেও সাহায্য করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাগ্‌ভট (৭ম ও ৯ম শতাব্দী)

'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের' রচয়িতা প্রথম বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের খ্যাতি আত্রেয়, সুশ্রুত ও চরকের পরেই। সুশ্রুত ও চরক-সংহিতার মত অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। বাগ্‌ভট প্রাচীন ভারতের জনপ্রিয় 'বৃদ্ধ-ত্রয়ী'র একজন। এই 'বৃদ্ধ-ত্রয়ী' বলিতে কেহ কেহ আত্রেয়, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটকে বুঝিয়া থাকেন, আবার কাহারও কাহারও মতে চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভটই 'বৃদ্ধ-ত্রয়ী।'

বৃদ্ধ বাগ্‌ভটর প্রাচীনত্ব লইয়া অনেক মতভেদ আছে। তবে তিনি যে আত্রেয়, সুশ্রুত ও চরকের পরবর্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাগ্‌ভট নিজেই এই তিন প্রাচীন চিকিৎসকের নাম করিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত তাঁহাদের সংহিতা হইতে অংশ বিশেষ নিজের রচনায় উদ্ধৃত

* Henry R. Zimmer, *Hindu Medicine*, p. 52.

করিয়াছেন। ডাঃ হোয়ের্ণলে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ডাঃ সার্টনকেও এই মত গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁহার বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে (*Records of Buddhist Practices*) বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিং ৬৭৫ হইতে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র (আয়ুর্বেদ) আটটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি এক বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্ এই আটটি অংশকে একত্রিত করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের সর্বত্র চিকিৎসকেরা এই গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন।* এই বর্ণনা পাঠে মনে হয় বাগ্‌ভট ইৎসিং-এর বহু পূর্বের লোক হইতে পারেন না।

এখন ইৎসিং অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের রচয়িতা বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের পরিবর্তে 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা'র রচয়িতা দ্বিতীয় বাগ্‌ভট সম্বন্ধে যে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? আমরা এই দ্বিতীয় বাগ্‌ভট সম্বন্ধে জানি যে, তিনি সিন্ধুর অধিবাসী সিংহগুপ্তের পুত্র ছিলেন। চিকিৎসক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহারও বিশেষ খ্যাতি ছিল। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা মূলতঃ বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ' অবলম্বনে শ্লোকাকারে রচিত। জনপ্রিয়তার দিক হইতে ইহা শেষোক্ত গ্রন্থকেও ছাড়াইয়াছিল। এই গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে বাগ্‌দাদের খলিফার আদেশে ইহা আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আল্‌-রাজি আদা, কলা ও অন্যান্য ভেষজের গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'সিন্দাক্‌সার' বা 'সিন্দিচর' নামে জনৈক হিন্দু চিকিৎসকের উল্লেখ করেন; এই 'সিন্দিচর'ই সম্ভবতঃ সিন্ধুদেশবাসী দ্বিতীয় বাগ্‌ভট।† সুতরাং ইৎসিং যে এই দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা'র কথা উল্লেখ করেন নাই তাহা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায়? যাহা হউক, হোয়ের্ণলে দ্বিতীয় বাগ্‌ভটকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তিনি মাধবকর ও দৃঢ়বলের বেশ কিছু পরবর্তী।

'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ' ও 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা' উভয় গ্রন্থ পাঠেই মনে হয়, সুশ্রুত ও চরকের সময় শারীরস্থান ও শল্যবিদ্যার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, বাগ্‌ভটের সময় তাহার অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। সুশ্রুতে নরকঙ্কালের গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যেরূপ বিশদ ও নিখুঁত বর্ণনা দেখা যায় 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহে' তাহা নাই। এবিষয়ে সামান্য যেটুকু আলোচনা আছে তাহাও অসংলগ্ন ও মাঝে মাঝে সামঞ্জস্যহীন। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃদ্ধ বাগ্‌ভটের আমলে ব্যবহারিক অ্যানাটমির চর্চা একরূপ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের কালে এই অবনতি আরও চরমে পৌঁছে। সুশ্রুতে নানাবিধ চক্ষুরোগের অস্ত্রচিকিৎসা, যেমন ছানিকাটা, সম্বন্ধে দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা আছে; সুশ্রুতের টীকাকার দ্বিতীয় সুশ্রুতও (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) তাঁহার 'উত্তরতন্ত্রে' এই রোগ সম্বন্ধে যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের আলোচনা অনেক ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট; মাধবকর, দৃঢ়বল ও দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের রচনায় চক্ষুরোগের অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। বৌদ্ধদের অহিংস নীতির ফলে শারীরস্থান ও শল্যবিদ্যার একটানা অবনতির ইহা এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

---

* 'Eight arts (i.e. branches of medicine) formerly existed in eight books, but lately a man epitomized them, and made them into one bundle (or books)', and he adds that 'all physicians in the five parts of India (i.e., the whole of India) practise according to his book'.—A. F. Rudolf Hoernlé, *Studies in the Medicine of Ancient India*, p. 10.

† G. N. Mukhopadhyaya, *Surgical Instruments of the Hindus*, Vol. I, p. 23.

মাধবকর ও বৃন্দ (খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দী)

ইন্দুকরের পুত্র মাধবকর 'রুগ্বিনিশ্চয়' বা 'মাধব-নিদানে'র (সংক্ষেপে শুধু 'নিদান') রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তৎকৃত 'নিদানে'র খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার এক প্রমাণ এই যে, ইহার বহু টীকা রচিত হয় এবং আরবী ভাষায়ও এই গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল। গণ্ডালের ঠাকুরসাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্যের ভ্রাতা চিকিৎসক মাধবাচার্য ও মাধবকর একই ব্যক্তি ছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মাধব সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের লোক ছিলেন।

মাধবকরের সময়েই বৃন্দ নামে এক চিকিৎসক ও রাসায়নিকের নাম পাওয়া যায়। তিনি 'সিদ্ধযোগ' নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার সহিত নিদানের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন, মাধব ও বৃন্দ একই ব্যক্তি; বৃন্দই তাঁহার প্রকৃত নাম, কিন্তু নাম মাধুর্যের খাতিরে টীকাকারদের নিকট তিনি মাধব নামেই সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

চক্রপাণিদত্ত (একাদশ শতাব্দী)

'চিকিৎসা-সারসংগ্রহে'র প্রণেতা বঙ্গদেশীয় বৈদ্য ও রাসায়নিক চক্রপাণিদত্ত নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, গৌড়েশ্বর নরপালের (১০৩০-১০৪৫) সময় তিনি লোধ্রবলী বংশে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা নারায়ণ নরপালের রন্ধনশালার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'নরপালদেবের রাজত্বকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বৈদ্যগ্রন্থকর্তা চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ নরপালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন মন্দিরের প্রশস্তি রাজবৈদ্য সহদেব কর্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্য বজ্রপাণি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যা ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।'*

চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ হিন্দু চিকিৎসাবিধি ও প্রচলিত নানাবিধ ঔষধের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা অনেকটা সিদ্ধযোগের অনুকরণে রচিত। চক্রপাণিদত্ত সুশ্রুত-সংহিতার উপর 'ভানুমতী' নামে একটি টীকা এবং চরক-সংহিতার উপর 'চক্রতত্ত্বদীপিকা' নামে আর একটি মনোজ্ঞ টীকা রচনা করেন। চক্রদত্তের 'মুক্তাবলী' ঔষধ সম্বন্ধীয় আর একটি বহুল প্রচলিত গ্রন্থ।

রাসায়নিক হিসাবেও চক্রপাণিদত্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পারদ-গন্ধকঘটিত লবণ (মারকারি সালফাইড) কজ্জলী বা রসপর্পটি সম্ভবতঃ তিনিই আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বৃন্দের দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। সম্ভবতঃ চক্রপাণিই প্রথম ঔষধ হিসাবে কজ্জলীর ব্যবহার প্রচলন করেন। হিন্দু রসায়ন প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচিত হইবে।

ডহ্লণ (১১শ কি ১২শ শতাব্দী)

ডহ্লণের 'নিবন্ধ-সংগ্রহ' সুশ্রুত-সংহিতার একটি টীকা বিশেষ। চক্রপাণিদত্তের পর তিনিই সুশ্রুতের প্রাচীনতম টীকাকার। নিবন্ধ-সংগ্রহে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন বৃদ্ধ সুশ্রুতকৃত সুশ্রুত-সংহিতা নাগার্জুনের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

* দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড); পৃঃ ২৬৩।

শার্ঙ্গধর (১৩শ শতাব্দী)

শার্ঙ্গধর মধ্যযুগে পশ্চিম ভারতের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ও রাসায়নিক ছিলেন। তাঁহার কার্যকাল সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী, কারণ এই শতাব্দীর শেষ ভাগে বোপদেব নামে আর একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের টীকাকার শার্ঙ্গধর-সংহিতার উপর একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। শার্ঙ্গধর নামে এক কবি চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন;এই কবি শার্ঙ্গধর এবং চিকিৎসক ও রাসায়নিক শার্ঙ্গধর এক ব্যক্তি নহেন। মধ্যযুগে সমগ্র পশ্চিম ভারতে শার্ঙ্গধর-সংহিতা চিকিৎসাশাস্ত্রের এক অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ সুশ্রুত, চরক, বাগ্ভট, ও তান্ত্রিক যুগের কয়েকটি রাসায়নিক গ্রন্থের তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত।

শার্ঙ্গধর-সংহিতা তিন খণ্ডে বিভক্ত : (১) প্রথম খণ্ডে ভারতীয় ওজন ও মাপজোখের নানারূপ ব্যবস্থা, ঔষধের গুণাগুণ, রোগনির্ণয়, রোগের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিন্যাস, রোগের উপর বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব, অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে; (২) দ্বিতীয় খণ্ডে কষায়, নিষেক, চূর্ণ, বড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী, স্বর্ণভস্ম, ধাতবভস্ম ও পারদ ঘটিত যৌগিক প্রস্তুত-প্রণালী আলোচিত হইয়াছে; (৩) সাধারণভাবে চিকিৎসাবিধি আলোচিত হইয়াছে তৃতীয় খণ্ডে। শার্ঙ্গধরে নাড়ী পরীক্ষার অতি বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা দেখা যায়। অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে বিভিন্ন রোগের যে শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় সে তুলনায় এ বিষয়ে শার্ঙ্গধরের প্রচেষ্টা অনেক বেশী বিশদ ও প্রণালীবদ্ধ। তাঁহার ঔষধের তালিকায় অহিফেনের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় গ্রন্থাদিতে সম্ভবতঃ অহিফেনের ইহাই প্রথম উল্লেখ। অকরাকরভ (bertram root) নামে লালা-উৎপাদক ও উত্তেজক ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কেও এক আলোচনা ইহাতে আছে।

শার্ঙ্গধর-সংহিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য নানারূপ রাসায়নিক যৌগিক ও মিশ্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত এইসব ঔষধের মধ্যে ধাতব, পারদ ও আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ উল্লেখযোগ্য। উদয়চাঁদ দত্ত তাঁহার *Materia Medica of the Hindus* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পারদ, তাম্র, টিন, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ভস্মীকরণ ও প্রস্তুত-প্রণালী এবং ঔষধ হিসাবে ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে শার্ঙ্গধরের আলোচনাই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। ইহা অবশ্য ঠিক নহে। শার্ঙ্গধরের পূর্বে চক্রপাণি, বৃন্দ, বাগ্ভট ও নাগার্জুন ঔষধার্থ ধাতব যৌগিকের ব্যবহার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং শার্ঙ্গধর-সংহিতার প্রধান উপকরণ এইসব পূর্বগামী চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও রাসায়নিকদিগের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধার্থ ধাতব যৌগিক ও পারদঘটিত লবণের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগী হন প্যারাসেল্সাস্ (১৪৯৩-১৫৪১) ষোড়শ শতাব্দীতে। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, প্যারাসেল্সাসের বহু পূর্বে ভারতীয় বৈদ্যগণ এবিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক সার্টন ইহা স্বীকার করিয়াও হিন্দুদের স্বকীয়তা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। কিমিয়া ও ঔষধ হিসাবে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ব্যাপারে হিন্দুগণ ল্যাটিন ইউরোপীয়দের অনেক আগে গবেষণায় লিপ্ত হইলেও, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যে আরব্য ও চৈনিক কিমিয়াবিদ্‌দের পূর্বে সংঘটিত হয় নাই ইহাই তিনি বলিতে চাহেন। শার্ঙ্গধরের আলোচনা প্রসঙ্গে সার্টন লিখিয়াছেন :

> "The main quality of Śārṅgadhara's work was its emphasis upon the chemical side of materia medica. In this respect it may be considered an anticipation of the iatro-chemical reforms which were heralded in the centre of Europe many centuries later by Paracelsus. But even as early as Śārṅgadhara's time

this was not a novelty in India. The study of rasa can be traced back many centuries before his time, though the uncertainties of Hindu chronology do not allow us to prove its existence in pre-Islamic times. Thus the question of India's priority in this matter is very doubtful. Remember that Dioscorides knew many chemical preparations, including mercury. The Chinese alchemist, Ko Hung (first half of the fourth century), was familiar with cinnabar, and in all probability that substance had already been used during the Han dynasty, if not before, for the making of red ink."*

কিমিয়াশাস্ত্রে ভারতীয় হিন্দু ও আরবা মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রাধিকার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সুশ্রুত-সংহিতা, চরক-সংহিতা, দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা, মাধবকরের নিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভারতীয় গ্রন্থগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞান-রাজ্যে আরবা প্রতিভা বিকশিত হইবার অনেক পূর্বেই আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বাগ্‌দাদে খলিফাদের রাজত্বের সময় একাধিক ভারতীয় চিকিৎসকের উপস্থিতি প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থে কিমিয়াশাস্ত্রে ভারতীয়দের প্রাথমিক অবদানের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, এবং ইহা যে আরবা পণ্ডিতদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিমিয়াশাস্ত্রে আরবা ও সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান জাতিরা পরবর্তীকালে আশ্চর্য উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং তাহাদের কাছেই মধ্যযুগে ইউরোপীয় জাতিরা এই বিদ্যা অর্জন করিয়াছিল, একথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, আরবা বিদ্যোৎসাহিতার প্রথম পর্বে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল পশ্চিমে গ্রীস ও পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে।

'তালীফ শারীফ'-এর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সুম্‌বুল্‌খার (আর্সেনিক অক্‌সাইড) নামে আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধ হিন্দু চিকিৎসকগণ বিনা দ্বিধায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে দিয়া থাকেন; কিন্তু ইউনানী চিকিৎসকগণ কখনও এইরূপ তীব্র ও মারাত্মক ঔষধের বিধান দেন না। তাহাদের ধারণা, ইহা জীবনীশক্তির ক্ষতিকারক। ভারতীয় চিকিৎসকগণ লৌহঘটিত ঔষধ হামেশাই রোগীকে দিয়া থাকেন; কিন্তু ইউনানী চিকিৎসকগণ যথাসম্ভব এই জাতীয় দ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের পরামর্শদানে বিরত থাকেন।†

নরহরি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আর একজন সুচিকিৎসক ও বৈয়াকরণ নরহরির নাম উল্লেখযোগ্য। নরহরির জন্মস্থান ছিল কাশ্মীর। ১২৩৫-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'রাজনিঘণ্টু' বা 'অভিধানচূড়ামণি' নামে ভৈষজ্যশাস্ত্রের একখানি অভিধান রচনা করেন।

ভাব মিশ্র (১৬শ শতাব্দী)

ষোড়শ শতাব্দীর ভাব মিশ্র ছিলেন কাশীর লটক মিশ্রের পুত্র। তাঁহার 'ভাবপ্রকাশ' চিকিৎসা-শাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম সিফিলিস বা ফিরঙ্গ রোগের

* George Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. II, p. 667.

† P. C. Ray, *History of Hindu Chemistry*, lx and lxi.

উল্লেখ দেখা যায়। একপ্রকার চীনা মূল বা 'তোব চিনি'র দ্বারা তিনি ফিরঙ্গ রোগ নিরাময়ের পরামর্শ দেন। তাঁহার গ্রন্থে কয়েকটি বিদেশী ভৈষজ্যের উল্লেখ আছে, যেমন 'সুলেমানি খর্জুর', 'পারসীক বচ', 'অহিফেন' ইত্যাদি। অহিফেনের উল্লেখ অবশ্য শার্ঙ্গধর অনেক পূর্বেই করিয়াছিলেন।

কয়েকজন টীকাকার

আমরা এ পর্যন্ত যেসব চিকিৎসকের কথা আলোচনা করিলাম, তাঁহারা সকলেই চিকিৎসা-শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন, চক্রপাণিদত্ত, ডহ্লণ, সুশ্রুত, চরক প্রমুখ প্রাচীন গ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করিয়াছেন। এইবার কয়েকজন প্রসিদ্ধ টীকাকারের উল্লেখ করিয়া প্রাচীন হিন্দু বৈদ্যাদিগের কথা শেষ করিব। অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতার জনপ্রিয়তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অরুণ দত্ত, যশোধর চন্দ্রনন্দন, রামনাথ ও হিমাদ্রি এই গ্রন্থের পাঁচটি বিভিন্ন টীকা রচনা করেন। তন্মধ্যে অরুণ দত্তের (১৩শ শতাব্দী) 'সর্বাঙ্গ-সুন্দর' টীকাটিই প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় বৈদ্য বিজয় রক্ষিত (১৩শ শতাব্দী) মাধবের 'নিদানে'র উপর 'মধুকোষ' নামে একটি টীকা রচনা করেন। এই 'মধুকোষ' টীকাটি সম্পূর্ণ করেন বিজয় রক্ষিতের ছাত্র শ্রীকণ্ঠ দত্ত। সুশ্রুতের টীকাকারদের মধ্যে জৈয়ট, কার্তিক, গোমী, গদাধর ও গয়দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের শিবদাস চরক ও চক্রপাণিদত্তের টীকা রচনা করেন। চরক-সংহিতার আরও কয়েকজন টীকাকার হইলেন ঈশানদেব, হরিচন্দ্র, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট ও গুণাকর; ইঁহাদের টীকা এখন দুষ্প্রাপ্য।*

৩·৩। রসায়ন

দুইটি পৃথক সূত্র হইতে রসায়নের উদ্ভব—(১) মৃৎশিল্প, কাচশিল্প, ধাতুশিল্প সংক্রান্ত কারিগরিবিদ্যা; (২) চিকিৎসাবিদ্যা। ভারতবর্ষে দুই বিদ্যারই অনুশীলন সুপ্রাচীন; সেই কারণে রসায়নের ইতিহাসও সুপ্রাচীনত্ব দাবী করিতে পারে। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার যে নিপুণ মৃৎশিল্পীরা নানা বর্ণের অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্র গড়িয়াছিল, যাহারা চীনামাটি বা ফেইয়'সের পাত্র গড়িতে অদ্বিতীয় ছিল, যে ধাতুশিল্পীদের গড়া অজস্র ধাতব দ্রব্য বর্তমানকালে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে, বলিতে গেলে তাহারাই ভারতের প্রাচীনতম রাসায়নিক। তারপর আসিল আয়ুর্বেদের যুগ। সেই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে একান্ত অনিবার্য কারণেই রসায়নশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করিল। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদের প্রয়োজনেই রসায়ন এবং এই শাস্ত্রের অনুষঙ্গ হিসাবেই আমরা রসায়নের উন্নতি লক্ষ্য করি। রসায়ন শব্দটিও অথর্ব-বেদোক্ত 'অয়ষ্যাণি' শব্দ হইতে উদ্ভূত। 'অয়ষ্যাণি' শব্দের অর্থ দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভের উপায়। চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের রাসায়নিক জ্ঞান কিভাবে ধীরে ধীরে উন্নত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল প্রথমে তাহার আলোচনা করিব।

চরক ও সুশ্রুতের রসায়ন

চরক ও সুশ্রুত-সংহিতা উভয় গ্রন্থেই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন ও লৌহ এই ছয় ধাতু, কয়েক প্রকার লবণ, ক্ষার ও ক্ষার প্রস্তুতবিধি, সন্ধিত পানীয় (fermented drink) বা আসব এবং কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান সুপরিস্ফুট। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ ভূত বা মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি।

* গণনাথ সেন, আয়ুর্বেদ-পরিচয়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা।

লবণ : চরকে পাঁচ প্রকার লবণের উল্লেখ আছে—সৌবর্চল, (শোরা), সৈন্ধব (খনিজ লবণ—rock salt), বিট (কৃষ্ণ লবণ), ঔদ্ভিদ্ (উদ্ভিজ্জ লবণ) ও সামুদ্র (সামুদ্রিক লবণ)। তুঁতিয়া, মোমছাল, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতি খনিজের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ভেষজের সঙ্গে মিশাইয়া এইসব খনিজ চর্মরোগে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। লবণ ও ক্ষারের উত্তপ্ত দ্রবণে লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত রাখিয়া একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত-বিধি চরকে আছে। কজ্জল একটি যৌগিক পদার্থ; শঙ্খ, প্রবাল, রাজবর্তমণি, লৌহ, তাম্র, অ্যান্টিমনি সাল্ফাইড প্রভৃতি দ্রব্যের ভস্ম হইতে ইহা প্রস্তুত করিবার উপায়।

ক্ষার : ক্ষার ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুতে বিশদ নির্দেশ দেখা যায়। চরকে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে,

"পলাশের (*Butea frondosa*) তরুণ অংশকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া প্রথমে শুকাইতে ও পরে পোড়াইয়া ছাই করিতে হইবে। এখন এই ছাইকে চার কি ছয় গুণ বেশী জলে ভাল করিয়া গুলিয়া কাপড়ের ছাঁকনির দ্বারা একুশবার ছাঁকিয়া লইলে ক্ষার প্রস্তুত হইবে।"

আমরা জানি, এই উপায়ে সাধারণতঃ পটাশ কার্বনেট তৈয়ারী হইতে পারে। এ বিষয়ে সুশ্রুতের বর্ণনা আরও অনেক বিশদ। ক্ষারের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, কাটা-ছেঁড়ার যত রকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে ক্ষার তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্ষারের দ্বারা এইসব কাজ যে শুধু সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় তাহাই নহে, ইহা দেহের ত্রিদোষগত অসংহতি দূর করে এবং ক্ষত-স্থানের সর্বত্র সমভাবে কাজ করে। তারপর ইহা চামড়া ও মাংসকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষতস্থানকে তুলিয়া ফেলিতে সাহায্য করে; এই কারণে ইহার নামকরণ হইয়াছে 'ক্ষার'। তীক্ষ্ণতার প্রভেদে ক্ষার তিন প্রকার—মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ।

সুশ্রুতে বর্ণিত ক্ষার প্রস্তুত-প্রণালী সংক্ষেপে এইরূপ। চারাগাছ বা বড় গাছকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া প্রথমে শুকাইয়া লইতে হইবে। তারপর কিছু চুনাপাথরের সহিত গাছের টুকরাগুলিকে পোড়াইতে হইবে। এইবার পোড়া চুনাপাথর হইতে ছাইগুলিকে পৃথক করিয়া প্রায় ৩২ সের ওজনের ছাই-এর সঙ্গে তার ছয় গুণ ওজনের জল ভালভাবে মিশাইয়া একুশবার ছাঁকা হউক। পরিত্যক্ত দ্রবণটিকে বড় একটি পাত্রে ধীরে ধীরে ফুটাইতে থাকিলে ক্রমশঃ ইহা পরিষ্কার হইবে, ইহা হইতে একটি উগ্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে, এবং স্পর্শ করিলে অনেকটা সাবান-জলের মত বোধ হইবে। ইহা মৃদু ক্ষার। এখন আটপলা ওজনের পোড়া চুনামাটি, শঙ্খ ও কড়ি একটি লৌহপাত্রে গরম করা হউক। ইহারা লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে তিন পোয়া আন্দাজ মৃদু ক্ষারে ভিজাইয়া ইহাদের গুঁড়া করিতে হইবে। তারপর গুঁড়াগুলিকে ৬৪ সের পরিমাণ মৃদু ক্ষারে নিক্ষেপ করিয়া সযত্নে কিছুক্ষণ ফুটাইলে মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত হইবে। তীক্ষ্ণ ক্ষার তৈয়ারী করিতে হইলে ইহাকে অধিকক্ষণ ফুটাইয়া আরও ঘন ও গাঢ় করা প্রয়োজন।

সুশ্রুতের এক জায়গায় দ্বিবিধ ক্ষারের উল্লেখ আছে—একটির নাম 'যবক্ষার' (পটাশ কার্বনেট), অপরটির 'সার্জিকাক্ষার' (সোডিয়ম কার্বনেট)। সোহাগাও ক্ষারের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

সন্ধিত পানীয় : চরক ও সুশ্রুত উভয়ই সন্ধিত পানীয় বা আসবের উল্লেখ করিয়াছেন। চরকে প্রায় ৮৪ প্রকার আসবের কথা আছে। শস্য, ফল, মূল, পুষ্প, উদ্ভিদের কাণ্ড, পত্র, শর্করা ইত্যাদি দ্রব্য হইতে আসব প্রস্তুত হইত। দ্রব্যের নামানুসারে আসবের নাম হইত, যেমন, ধান্যাসব, ফলাসব, মূলাসব, পুষ্পাসব, শর্করাসব ইত্যাদি।

নাবনীতকের রসায়ন

আমরা চৈনিক তুর্কীস্তানের একটি বৌদ্ধস্তূপে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর চিকিৎসা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি 'নাবনীতকে'র উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সুশ্রুত-চরকের জ্ঞানই প্রতিফলিত হইয়াছে। দ্বিবিধ ক্ষার—যবক্ষার ও সার্জিকাক্ষার, ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষু-

রোগে ব্যবহারের জন্য বিবিধ কজ্জল ও মলম প্রস্তুত-বিধির আলোচনা 'নাবনীতকে'র এক বৈশিষ্ট্য। প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পত্রের সম্মুখভাগে এবিষয়ে যে আলোচনা পাওয়া যায়, তাহার কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি :

"যষ্টিহ্বরোধ্রাং ত্রিফলা মৃণালাং সিতোপলাং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ পত্রত্বগেলাগুরুদেবদারুপুনর্ন্নবা-ব্যাঘ্রনখাং জনঞ্চ ॥ মনঃশিলালং বৃহতীত্বচঞ্চ মাংসীহরে (ণুং পরি) পেলবং চ সৌবীরকং গৈরিক-কটফলঞ্চ স্যাচ্ছারিবা শর্করয়া বিমিশ্রা॥ ইত্যর্ধরুপৈশ্চতুরঃ প্রদিষ্টাঃ কফাস্রাপ(ত্তানিলা) রোগশান্তৌ বিড়ালকৈস্তৈর্ম্ময়নং সমন্তাদাপক্ষমূলাৎপ্রাদিহেদ্বহির্ব্বা॥ রোধ্রঞ্চ কিঞ্চিত্তু ঘৃতেন দিগ্ধময়োঘৃষ্টামভয়ামথোবা ত্বচং বৃহত্যাঃ সমমঞ্জন (ঞ্চ বিড়া) লকঃ সর্বরুজাপহঃস্যাৎ॥ গৈরিক-রসাঞ্জনাঞ্জনমনঃশিলারীতি কুসুমসমভাগাঃ ঈষন্মরিচসহী যাদ্বিগুণং ঐ...॥"*

ইহার ভাবার্থ এইরূপ। (১) যষ্টিমধু, রোধ্র (*Symplocos racemosa*), ত্রিফলা, পদ্মের বোঁটা, স্বর্ণ ও গৈরিক; (২) দারুচিনি, এলাচি, দেবদারু, পনর্নবা (*Boerhaavia diffusa*), ব্যাঘ্রনখ (*Unguis odoratus*) ইত্যাদির পাতা ও ছাল, এবং তাহার সহিত সীসাঞ্জন (galena)· (৩) মনঃশিলা হরিতাল এবং বৃহতী, মাংসী, হরেণু ও পরিপেলবের ছাল; (৪) সীসাঞ্জন, গৈরিক, কাটফল, ও শর্করা-মিশ্রিত শারিবা; এই চারিপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করিলে বায়ু-পিত্ত-কফের অসংহতি-জনিত রোগের উপশম হয়। চোখের চারিধারে চোখের পাতার মূল পর্যন্ত প্রলেপের মত এই চারিটি ঔষধ ব্যবহার করা যায়। সম পরিমাণ ঘৃত অথবা হরীতকী-চূর্ণ, বৃহতীর ছাল ও সীসাঞ্জনের সহিত সামান্য রোধ্র ঘষিয়া একরূপ মলম তৈয়ারী হইতে পারে; সকল প্রকার চক্ষুরোগে ইহা উপকারী। সমপরিমাণ গৈরিক, রসাঞ্জন, সীসাঞ্জন, মনঃশিলা ও কাংস্যভস্ম এবং দ্বিগুণ গোলমরিচ মিশাইয়া চক্ষুরোগে উপকারী আর একটি মলম তৈয়ারী করা যায়।

নাবনীতকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম পরিচ্ছেদে পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কলপ প্রস্তুত করিবার একাধিক পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে পাণ্ডুলিপির সমগ্র একটি পাতার নকল ও দেবনাগরী হরফে তাহার অক্ষরান্তরীকরণ ২নং প্লেটে দেখানো হইল; পাণ্ডু-লিপিটির একটি প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ইহাতে পাওয়া যাইবে। ৪, ৫ ও ৬ পংক্তিতে একটি বিশেষ কলপ প্রস্তুত-বিধি লক্ষণীয়। প্রস্তুত-বিধিটি এইরূপ :

"তুত্থমুস্তং সকাসীসংকুর্ম্মপিত্তময়ো রজঃদংতীচ সহদেবাচ ভাগো
ভৃঙ্গরজস্য চ বিভীতকানাং তৈলেন সিদ্ধং পলিতনাশনম্
অভ্যংগং সততং কুর্যাৎ পলিতং ন ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ, সমান ভাগে তুঁতিয়া, মুস্ত (*Cyperus rotundus*) কাসীস (iron sulphate) কূর্মের পিত্ত, লৌহচূর্ণ, দন্তী (*Baliospermum montanum*), সহদেবা (*Sida rhomboidea*) ও ভৃঙ্গরজ (*Eclipta alba*) বিভীতক অর্থাৎ বহেড়ার তৈলে সিদ্ধ করিয়া এমন একটি কলপ প্রস্তুত করা যায় যাহার দ্বারা পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ করা সম্ভবপর। নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে এই কলপের দ্বারা চুল পাকা বন্ধ করা যায়।†

বাগভট, বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্ত

বাগভটর রসায়নেও সুশ্রুত-চরকের অপেক্ষা খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। ক্ষার প্রস্তুত-বিধি অবিকল সুশ্রুতের পুনরুক্তি। একটি ঔষধ প্রস্তুত প্রসঙ্গে 'অন্ধমুষা' নামে ঢাকনি

* *The Bower Manuscript*, ed. A. F. Rudolf Hoernlé, Archaeological Survey of India ; p. 8, 23.

† *The Bower Manuscript ;* p. 162.

দেওয়া এক প্রকার মূষার (crucible) উল্লেখ দেখা যায়। বাগভট এক জায়গায় ('উত্তরস্থানম্') পারদের উল্লেখ করিয়াছেন। "সমপরিমাণ পারদ ও সীসকের সহিত সমান ওজনের রসাঞ্জন (stibium) ও কর্পূর মিশাইয়া কজ্জল তৈয়ারী কর।"* এই সামান্য একটু উল্লেখ হইতে বাগভটব সময় পারদ ও পারদঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল সে সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কিছু বলা যায় না।

আয়ুর্বেদের রসায়নে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের প্রাধান্যই বেশী। বাগভটর সময় হইতে ঔষধ হিসাবে খনিজ ও ধাতব দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। চিকিৎসক ও বৈদ্যগণ নূতন নূতন ধাতব লবণ ও যৌগিক রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে মনোযোগী হন। এই প্রচেষ্টায় রাসায়ন আয়ুর্বেদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পর্যবসিত হয়। আনুমানিক দশম শতাব্দী হইতে এই পরিবর্তনের সূচনা এবং বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্তর রচনা এযুগের রাসায়নিক জ্ঞানের ও রসায়ন-চর্চার দিক পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। সুশ্রুত, চরক ও বাগভটর আদর্শ মোটামুটি অনুসৃত হইলেও তন্ত্রসাধকদের ধারণা ও মতবাদের প্রভাব উভয়ের রচনাতেই সুস্পষ্ট। পারদ ও পারদঘটিত জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত।

'সিদ্ধযোগ' বৃন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে পর্পটি তাম্র, রসামৃত চূর্ণ প্রভৃতি পারদঘটিত কয়েকটি যৌগিকের প্রস্তুত-প্রণালী দেওয়া আছে। গন্ধক, তাম্র ও তাম্রমাক্ষিক পারদের সহিত উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া মিশাইলে এবং পরে একটি বন্ধ মূষার মধ্যে এই মিশ্রণকে জারিত করিলে পর্পটি তাম্র উৎপন্ন হয়। রসামৃত চূর্ণ গন্ধক ও পারদের একটি যৌগিক—সম্ভবতঃ মার্কারি সাল্‌ফাইড্। গন্ধকের সহিত ইহার অর্ধ পরিমাণ ওজনের পারদ পরস্পরের সহিত ঘষিয়া বসামৃত চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়। পানের রসের সহিত পারদ ঘষিয়া ছারপোকা-নাশক একটি দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ১৪টি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে এক কজ্জল প্রস্তুত-বিধি সিদ্ধযোগে পাওয়া যায়; এই সকল উপাদানের মধ্যে বহেড়া, খনিজ লবণ, তুঁতিয়া ও মারিত তাম্র (killed copper) প্রধান। আমলকী ও অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের রসে বার বার লোহকে ভিজাইয়া ও উত্তপ্ত করিয়া কি ভাবে এই ধাতুকে মারা যায় তাহার এক প্রক্রিয়াও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

চক্রপাণিদত্ত পারদ, তাম্র, লোহ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর কয়েকটি যৌগিক প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কজ্জলী বা রসপর্পটি বৃন্দের রসামৃত চূর্ণের মত পারদ-গন্ধকের একটি যৌগিক। এই যৌগিক প্রস্তুত প্রসঙ্গে তিনি পারদ শোধনের এক প্রণালী দিয়াছেন। চক্রপাণির যোগরাজ ও রৌপ্যমল সম্ভবতঃ রৌপ্য-গন্ধকের যৌগিক (silver sulphide)। লোহ মারিবার যে পদ্ধতি তিনি দিয়াছেন তাহা অনেকটা বৃন্দের উপরিউক্ত প্রণালীর অনুরূপ।

তান্ত্রিক রসায়ন—কিমিয়া

সপ্তম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাগভট, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত প্রমুখ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ ধাতু ও খনিজের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা যখন নূতন নূতন ধাতব যৌগিক আবিষ্কার করিতেছিলেন, বিশেষতঃ ঔষধ হিসাবে পারদ ও পারদঘটিত দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে মূল্যবান জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় তান্ত্রিকরাও রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় কিমিয়া প্রধানতঃ এই তন্ত্র সাধকদের সৃষ্টি। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের অবনতির যুগে তান্ত্রিকদের নানা ক্রিয়া-কলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং সমগ্র মধ্যযুগে ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে ইহা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। সহজ মোক্ষ ও ধর্ম-সাধনার নামে তান্ত্রিকদের নানারূপ কুসংস্কারকে প্রশ্রয়দান, যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজীতে বিশ্বাস, উদ্ভট, অশ্লীল ও নিষ্ঠুর ক্রিয়া-

* P. C. Ray, *A History of Hindu Chemistry*, Vol. I, 1902 ; p. 31.

কলাপের আধিক্য ইত্যাদি ব্যাপারে এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এযুগে আমাদের মন বিরূপ হইয়া উঠিলেও এই উদ্ভট ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই কিমিয়ার চর্চা ও উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, সুস্থ, নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন ছাড়া দুরূহ তন্ত্র-সাধনার ক্লেশ ও কৃচ্ছ সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে দেহকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নীরোগ রাখিবার উপায় আয়ত্ত করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাই স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্য সেবনে কিরূপে অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করা যায় তাহা আপনা হইতেই তান্ত্রিকদের অন্যতম গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই কার্যে পারদ ও পারদের আশ্চর্য গুণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব তান্ত্রিকদের প্রাপ্য কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা না গেলেও প্রথম হইতেই পারদের অতুলনীয় গুণ সম্বন্ধে তাহারা যে অবহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কালক্রমে পারদের মধ্যেই যে অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় অন্তর্নিহিত এ বিশ্বাস তান্ত্রিকদের দৃঢ় হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ রাসায়নিক গবেষণা পারদকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হয়। তান্ত্রিক কিমিয়ায় 'রস' শব্দের অর্থ পারদ, 'রসায়ন' পারদ-বিজ্ঞান।

তান্ত্রিক কিমিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হইলেন 'লোহাশাস্ত্র', 'রসরত্নাকর', 'কক্ষপুটতন্ত্র', 'আরোগ্যমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা গুর্জরের রাসায়নিক নাগার্জুন। আমরা একাধিক নাগার্জুন ও তাঁহার কাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর কোনও এক সময়ে তৎপর ছিলেন। রসরত্নাকরের মত মধ্যযুগে ভারতীয় তান্ত্রিক কিমিয়ার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল :—গোবিন্দভাগবতের 'রসহৃদয়' (১১শ শতাব্দী), 'রসার্ণব' (১২শ শতাব্দী), সোমদেবের 'রসেন্দ্রচূড়ামণি' (১২শ কি ১৩শ শতাব্দী), যশোধরের 'রসপ্রকাশসুধাকর' (১৩শ শতাব্দী), 'রসকল্প' (১৩শ শতাব্দী) ও বিষ্ণুদেবের 'রসরাজলক্ষ্মী' (১৪শ শতাব্দী)।

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম ও শিবপূজার বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছিল। 'সিত্তর' (সংস্কৃত 'সিদ্ধ') নামে এক শ্রেণীর তামিল তান্ত্রিকদের রচিত কাব্য গ্রন্থে কিমিয়া সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিমিয়া, যোগ, ও চিকিৎসাবিদ্যা সিত্তরদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রীযুক্ত বীররাঘব আইয়ার আঠার জন সিত্তরের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন।* কিমিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থাদির রচনা-কাল দশম শতাব্দী ও তৎপরবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়।

তান্ত্রিক কিমিয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল 'কাঞ্জুর' ও 'তাঞ্জুর' নামে দুই তিব্বতী বিশ্বকোষ। বাংলাদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঘটিলে অন্যান্য বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক কিমিয়া, চিকিৎসা-বিদ্যা, জ্যোতিষ ইত্যাদি ভারতীয় বিদ্যার গ্রন্থরাজিও হিমালয়-পারের দেশে পৌঁছিয়াছিল এবং মূল সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর বিভিন্ন বিদ্যার এইসব তিব্বতী অনুবাদের একত্রিত সঙ্কলন। তিন শতাধিক বৃহৎ খণ্ডে বিশ্বকোষদ্বয় সম্পূর্ণ। যে কয়খণ্ডের আলোচ্য বিষয় কিমিয়া ও রসায়ন তন্মধ্যে 'রসসিদ্ধিশাস্ত্র', 'ধাতুবাদ-শাস্ত্র', 'সর্বেশ্বর রসায়ন' ও 'ধাতুবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই বিরাট বিশ্বকোষদ্বয় সঙ্কলিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিক কিমিয়ার গ্রন্থাদিতে কি ধরনের রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কিছু আলোচনা করিব।

রসরত্নাকর (নাগার্জুন) : এই গ্রন্থের প্রথমেই কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তর সম্বন্ধে কয়েক প্রকার অর্ধসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন ও খাপছাড়া প্রণালীর বর্ণনা পাওয়া যায়। "কি

* K. C. Viraraghava Iyer, 'The Study of Alchemy', *Acharyya Ray Commemoration Volume,* Calcutta, 1932 ; p. 463.

আশ্চর্য, শিরীষের রসে নিসিক্ত রাজবর্তমণি এক গুঞ্জা ওজনের রৌপ্যকে ইহার শতগুণ ওজনের স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবে! উদীয়মান সূর্যের মত ইহার দ্যুতি।" "কি আশ্চর্য, পলাশের রসে শোধিত পীত গন্ধকের সহিত রৌপ্যকে তিনবার গোময়পিষ্টকের আগুনে জারিত করিলে ইহা স্বর্ণে পরিণত হইবে!" রসক (দস্তার খনিজ), হিঙ্গুল প্রভৃতি আরও কয়েকটি দ্রব্যকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে এইরূপ বিধান রসরত্নাকরে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রসকের সহিত তাম্র জারিত করিয়া কাঞ্চনের মত যে দ্রব্য উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহা পিতল ছাড়া আর কিছুই নহে। তাম্র ও রসক (calamine) পোড়াইয়া এদেশে পিতল প্রস্তুত-বিধি সুপ্রাচীন। রৌপ্য, তাম্র, সীসক ও দস্তাকে পারদের সহিত মিশাইলে যে অ্যামালগাম বা পারদমিশ্র প্রস্তুত হয় তাহাকে হরিতালের দ্বারা পীত বর্ণে রাঙ্গাইয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বলিয়া চালানো হইত। কিমিয়াবিদ্‌দের এইরূপ ব্যবসায় এক সময় বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতিরোধকল্পে অন্যান্য দেশের মত এদেশেও কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

রসরত্নাকরে কজ্জলী প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বৃন্দ ও চক্রপাণি কর্তৃক প্রদত্ত প্রণালীর অনুরূপ। সম্ভবতঃ বৃন্দ ও চক্রপাণি নাগার্জুনের প্রণালীই নকল করিয়াছিলেন। স্বর্ণ-পারদমিশ্রের সহিত গন্ধক, সোহাগা ইত্যাদি দ্রব্য মিশাইয়া তাহা বন্ধ মুষার মধ্যে মৃদু আগুনে জারিত করিয়া এক ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী নাগার্জুন বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা সেবন করিলে অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করা যায়। পারদ মারা (killing) ও বন্ধন করা (fixation) সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, পারদের তরলতা, গতিশীলতা, দ্যুতি প্রভৃতি ধর্ম বিনষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহা মৃত হইয়াছে। পারদ যখন উদীয়মান সূর্যের বর্ণ ও দ্যুতি প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে তখন বুঝিতে হইবে ইহার বন্ধন ঘটিয়াছে।

দস্তা বা জসদ আবিষ্কার : রসরত্নাকরে রসকের সারবস্তু অর্থাৎ দস্তা নিষ্কাশনের এক পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। রসককে ক্ষার, লাক্ষা, সোহাগা, সন্ধিত ধান্যাম্ল, স্নেহপদার্থ, ভুসা ইত্যাদি দ্রব্যের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বন্ধ মুষার মধ্যে আগুনে জারিত করিলে টিনের মত দেখিতে যে পদার্থটির উদ্ভব হয়, তাহাই রসকের সারবস্তু।

> "ক্ষারস্নেহৈশ্চ ধান্যাম্লৈ রসকং ভাবিতং বহু।
> উর্ণা লাক্ষা তথা পথ্যা ভূলতা ধূমসংযুতম্‌॥
> মূকমূষাগতং ধ্মাতং টঙ্কণেন সমন্বিতম্‌।
> সত্ত্বং কুটিলসঙ্কাশং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥"—রসরত্নাকর।

যতদূর মনে হয়, রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশনের ইহাই প্রাচীনতম বর্ণনা। 'রসার্ণব', 'রসরত্নসমুচ্চয়' প্রভৃতি পরবর্তীকালের কিমিয়া-গ্রন্থে রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশনের এই জাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায় এবং প্রায় একই রকম পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। জারিত করিবার সময় গলিত রসক হইতে নির্গত শিখার বর্ণ নীল হইতে সাদা হইলে দস্তার নিষ্কাশন যে সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, রসরত্নসমুচ্চয়ে এরূপ নির্দেশও বর্তমান। প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার প্রথম পর্বে উত্তাপের প্রভাবে রসক দস্তার অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। তারপর ভুসা, বিশ্লিষ্ট লাক্ষার অঙ্গারের সহিত দস্তার অক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে একদিকে অক্সাইড বিজারিত হইয়া দস্তাকে মুক্ত করিতে থাকে অন্যদিকে অক্সিজেন অঙ্গারের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এই কার্বন-মনোক্সাইডের দহন হইতেই নীলাভ শিখার সৃষ্টি। দস্তা-নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাষ্পীভূত হইয়া শিখার সংস্পর্শে আসিলে শিখার রং সাদা হয়। তাই শিখা শ্বেত বর্ণ ধারণ করিলেই বুঝিতে হইবে দস্তার নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস্‌ (১৪৯৩-১৫৪১), বেসিল ভ্যালেন্টাইন (আনুমানিক ১৪৭০), লিবাভিয়াস্‌ (১৫৪০-১৬১৬) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের রচনায়

প্রথম দস্তার উল্লেখ ও আলোচনা দেখা যায়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্যারাসেল্‌সাস্‌ সর্বপ্রথম ইহাকে একটি নূতন ধাতুরূপে চিনিতে পারেন যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই কৃতিত্ব প্রধানতঃ হোমবের্গের (১৬৯৫) প্রাপ্য।* ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী দেখাইয়াছেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ বণিকদের মারফত ভারতবর্ষ অথবা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইউরোপে দস্তা আমদানি হইলে সে দেশে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। নাগার্জুনের সময় রসক হইতে দস্তা পৃথকীকরণ-বিধি উদ্ভাবিত হইলেও দস্তাকে ধাতুরূপে চিনিয়া উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মদনপালের 'নির্ঘণ্টু'তে (১৩৭৪) সর্বপ্রথম ইহাকে ধাতুরূপে অভিহিত করিতে দেখা যায়। এই নূতন ধাতুর নামকরণ হয় 'জসদ'। কিন্তু তখনও ইহা সাধারণ স্বীকৃতি পায় নাই। 'শার্ঙ্গধর-সংহিতা', 'রসেন্দ্রচিন্তামণি', 'রসকল্প', নিত্যনাথের 'রসরত্নাকর' ইত্যাদি সমসাময়িক রসগ্রন্থের ধাতু-তালিকায় ইহা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ধাতু-তালিকায় নিয়মিতভাবে জসদের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায় 'ধাতুক্রিয়া', 'ভাবপ্রকাশ' ইত্যাদি ষোড়শ শতাব্দীর ও তৎপরবর্তী-কালের রসগ্রন্থে।

রসরত্নাকরে বহুবিধ রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উল্লেখ আছে, যেমন পেষণ যন্ত্র, বংশ যন্ত্র, নালিকা যন্ত্র, গজদন্ত যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, অধস্পাতন যন্ত্র, পাতন যন্ত্র, তুলা যন্ত্র, বালুকা যন্ত্র, মূষা যন্ত্র, অগ্নিসোম যন্ত্র ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রের কথা রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতির কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

রসার্ণব : বিভিন্ন ধাতু, খনিজ হইতে এই সব ধাতু-নিষ্কাশনের পদ্ধতি, ধাতু-মারা পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ধাতু চিনিবার উপায়, বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শে শিখার রং-পরিবর্তন, পারদ ও পারদ-ঘটিত যৌগিক, ক্ষার, এবং রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদনের উপযোগী বিবিধ যন্ত্রপাতির বর্ণনায় এই তান্ত্রিক কিমিয়া-গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

ধাতু ও ধাতু-পরীক্ষা : রসার্ণবের বর্ণিত ছয়টি ধাতু হইল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন ও সীসক। স্বর্ণের ক্ষয়-রোধ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী, সীসকের সর্বনিম্ন। ক্ষয়-রোধ ক্ষমতার প্রভেদ অনুযায়ী ধাতুদের পর পর সাজানো হইয়াছে। বিশুদ্ধ ধাতুর পরীক্ষা হইতেছে, মূষার মধ্যে ইহাকে গলাইলে ইহা হইতে কোনরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা বুদ্বুদ নির্গত হইবে না, কোনরূপ পট্‌পট্‌ শব্দ বাহির হইবে না, অথবা গলিত ধাতুর উপরিভাগে কোনরূপ রেখা দেখা যাইবে না; বরং মুক্তার মত ইহাকে শান্ত ও টলটলে দেখাইবে।

বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। তাম্র নীলবর্ণ শিখার সৃষ্টি করে, লৌহ পিঙ্গল বর্ণ, টিনের সংস্পর্শে শিখার রং হয় পারাবতের মত, সীসকের স্পর্শে ইহা হয় ফ্যাকাশে ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে, শিখা-বিক্রিয়ার (flame reaction) দ্বারা ধাতু চিনিবার একটি সহজ উপায় রসার্ণবের সময় ভারতীয় রাসায়নিকগণ জানিতেন।

ধাতু-নিষ্কাশন : খনিজ হইতে ধাতু-নিষ্কাশন প্রণালী প্রণিধানযোগ্য। মাক্ষিক, বিমল প্রভৃতি তাম্র-খনিজ হইতে তাম্র-নিষ্কাশনের নিম্নলিখিত উপায় বর্ণিত হইয়াছে। মধু, এরণ্ডর (*Ricinus communis*) তৈল, গোমূত্র, ঘৃত, ও কলার নির্যাসের সহিত (*Musa sapientum*) মাক্ষিককে বার বার ভিজাইয়া মূষার মধ্যে উত্তপ্ত করিলে তাম্র নিষ্কাশিত হইবে। বিমল মাক্ষিকের মত আর একটি তাম্র-খনিজ। বিমলকে প্রথমে ফটকিরি, হীরাকস, সোহাগা, শিগ্রুগোত্রীয় উদ্ভিদ্‌ (*Moringa oleifera*) ও কলার নির্যাসের সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। পরে সিতপাতলার (*Schrebera swietenioides*) ভস্মের সহিত উপরিউক্ত মিশ্রণকে একটি বন্ধ মূষার মধ্যে জারিত করিলে স্বর্ণের মত দ্যুতিসম্পন্ন চন্দ্রর্ক (তাম্র) উৎপন্ন হইবে। সস্যক বা তুঁতিয়া হইতে তাম্র-নিষ্কাশনের আর একটি পদ্ধতিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রসক

* Panchanan Neogi, *Copper in Ancient India*, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta, 1918; p. 41.

(calamine) দস্তার একটি প্রধান খনিজ। রসকের সহিত পশম, গালা, সোহাগা, হরীতকী (*Terminalia chebula*) ইত্যাদি মিশাইয়া বন্ধ মূষার মধ্যে এই মিশ্রণকে জারিত করিলে দস্তা পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে টিনের মত।

ধাতু-মারা : ধাতু মারিবার কয়েকটি পদ্ধতি রসার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে। ধাতু মারিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম 'বিদ'। কাসীস (হীরাকসের আর এক নাম), খনিজ লবণ, মাক্ষিক, গোলমরিচ, পিপ্পল, আদা, গন্ধক, শোরা ও মালতির রস মিশাইয়া এই মিশ্রণকে আবার শিগ্রুগোত্রীয় উদ্ভিদের (*Moringa oleifera*) নির্যাসে ভিজাইয়া এইরূপ এক বিদ প্রস্তুত করা যায়। ইহার দ্বারা সকল ধাতুকেই মারা যায়। গন্ধক, হরিতাল, সামুদ্র, নিশাদল, সোহাগা ও উদ্ভিদ্‌ভস্মকে মিশাইয়া আর এক প্রকার বিদ প্রস্তুত হইত।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি : রসার্ণবে কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও তাহাদের ব্যবহার আলোচিত হইয়াছে। দোলা যন্ত্র, মূষা যন্ত্র, গর্ভ যন্ত্র, হংসপাক যন্ত্র, ও কোষ্ঠী যন্ত্র ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। **দোলাযন্ত্রে** একটি পাত্রের অর্ধেক তরল পদার্থের দ্বারা ভর্তি করা হয়। ইহার মুখে অবস্থিত একটি শলাকা হইতে একটি কাপড়ের থলিয়া ঝুলাইবার বন্দোবস্ত। থলিয়ার মধ্যে দ্রব্য রাখিয়া তাহাকে পাত্রস্থ তরল পদার্থের বাষ্পে উত্তপ্ত করা যায় (১২ নং চিত্র)। রসরত্নসমুচ্চয়ে দোলা যন্ত্রের এই বর্ণনাটিই হুবহু গৃহীত হইয়াছে। **মূষাযন্ত্রে** দুইটি লৌহ মূষা বা মুচি থাকে; তন্মধ্যে একটি মূষা সছিদ্র। সছিদ্র মূষায় গন্ধক ও অপরটিতে পারদ পূর্ণ করিয়া প্রথমোক্তটি দ্বিতীয় মূষার উপর রাখা হয়। এইবার আর একটি মাটির পাত্রের মধ্যে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে মূষাদ্বয় বসানো হয়; মাটির পাত্রের মুখোমুখি আর একটি মাটির পাত্র উপুড় করিয়া বসাইয়া দুই-এর মুখ মাটির প্রলেপ দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করা হয়। **গর্ভ-**
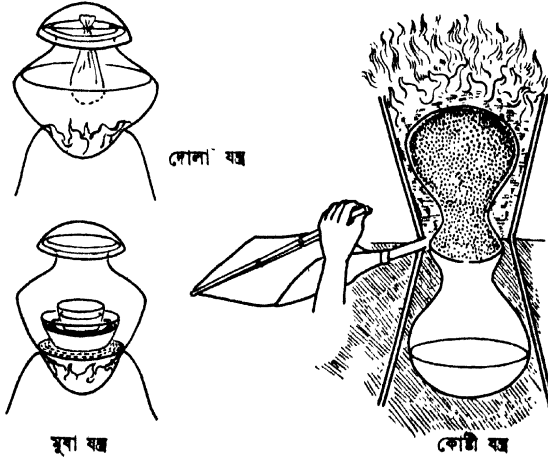
১২। রসার্ণবে বর্ণিত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতি।

যন্ত্রের সাহায্যে পারদ ও গন্ধক-পারদের পিষ্টিকাকে ভস্মীভূত করা যায়। রসরত্নাকর হইতে ইহা গৃহীত। **হংসপাক যন্ত্র** এক প্রকার বালিখোলা (Sand bath)। **মূষা** অনেক প্রকার; রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রকারভেদে ইহা মাটির অথবা ধাতু নির্মিত হয়। খোলা, বন্ধ ও ঢাকনি-দেওয়া মূষা ব্যবহৃত হইত। ধাতু-নিষ্কাশন কার্যে **কোষ্ঠী যন্ত্র** পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই যন্ত্রের একটি নক্‌সা চিত্রে দেখানো হইল।

ঔষধাদি প্রস্তুত-বিদ্যায় রসায়নের প্রাধান্যের যুগ (১৩০০-১৫৫০)

আমরা দেখিয়াছি, বাগভট, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্তর সময় হইতেই ঔষধাদি প্রস্তুত ব্যাপারে রসায়নের প্রয়োগ সুরু হইয়াছিল। তান্ত্রিক যুগে এই কার্যে রসায়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইলেও ইহার সর্বাত্মক প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নাই। বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিকার হিসাবে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ঔষধ উদ্ভাবনের অপেক্ষা সর্বরোগহর ও দীর্ঘ জীবন লাভের সহায়ক এক আশ্চর্য ও অলৌকিক ঔষধ উদ্ভাবনের দিকেই তান্ত্রিক কিমিয়াবিদ্‌রা অধিক মনোযোগী হইয়াছিল। ইহাতে পারদ সংক্রান্ত জ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি এবং পারদ ও অন্যান্য ধাতুর নানাবিধ যৌগিক প্রস্তুত-বিদ্যা যে আয়ত্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে কিমিয়া তন্ত্র-সাধনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় নানারূপ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উদ্ভট রাসায়নিক মতবাদও প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ভাল ফসল কিছু ফলিলেও আগাছা, পরগাছা, জঞ্জালও বড় কম রাশীকৃত হয় নাই। এই জঞ্জাল সরাইয়া আদত ফসলটুকু ভোগ করা এক সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কি তাহারও কিছু পূর্ব হইতে তান্ত্রিক কিমিয়ার প্রকৃত রাসায়নিক অংশটুকু সযত্নে উদ্ধার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিশেষতঃ ঔষধ প্রস্তুত-বিদ্যায় তাহার প্রয়োগকল্পে এক ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নততর জ্ঞান, এক পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এই সময়কার রাসায়নিক গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। ঔষধ হিসাবে বহু নূতন দ্রব্যের ব্যবহারও এই সময় আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে 'অহিফেন' উল্লেখযোগ্য। ফিরঙ্গ রোগের কথা এবং এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে রসকর্পূর (calomel), 'তোব চিনি' (China root) প্রভৃতি দ্রব্যের আলোচনা এই সময় প্রথম দেখা যায়। ধাতব অম্লের (mineral acid) গুরুত্ব উপলব্ধিও প্রণিধানযোগ্য। 'রসপ্রদীপে' ধাতব অম্লের নাম দেওয়া হইয়াছে 'শঙ্খদ্রবক'; 'ধাতুক্রিয়ায়' সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলা হইয়াছে 'দাহজল'।

এই সময় রাসায়নিক গ্রন্থও প্রণীত হইয়াছিল প্রচুর। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :

(১) রসরত্নসমুচ্চয়—নকল বাগভট কর্তৃক প্রণীত; অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহের রচয়িতা বাগভট হইতে ইনি ভিন্ন। প্রকাশ-কাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী; সে যুগের বহুল প্রচলিত এক উৎকৃষ্ট রাসায়নিক গ্রন্থ। ইহার কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

(২) রসনক্ষত্রমালিকা—মালবের রাজবৈদ্য মথনসিংহ প্রণীত; প্রকাশ-কাল ১৫৫০-এর পূর্বে।

(৩) রসরত্নাকর—সিদ্ধ নিত্যনাথ প্রণীত সুবৃহৎ রসগ্রন্থ।

(৪) রসেন্দ্রচিন্তামণি—প্রণেতা ও প্রকাশ-কাল অনির্দিষ্ট; গ্রন্থকার রসার্ণব, নাগার্জুন, গোবিন্দ, নিত্যনাথ, চক্রপাণি প্রমুখ প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) রসসার—গুর্জরের গোবিন্দাচার্য কর্তৃক প্রণীত; রচনা-কাল ত্রয়োদশ শতাব্দী; ইহাতে অহিফেনের কথা উল্লিখিত।

(৬) শার্ঙ্গধর-সংহিতা—শার্ঙ্গধর-প্রণীত; ত্রয়োদশ শতাব্দী; অহিফেনের কথা উল্লিখিত; কাহারও কাহারও মতে অহিফেনের ইহাই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম উল্লেখ। ঔষধ হিসাবে আর্সেনিক ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৭) রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—রচয়িতা বঙ্গদেশীয় গোপালকৃষ্ণ; বাংলাদেশে এই গ্রন্থ এককালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

(৮) রসেন্দ্রকল্পদ্রুম—রচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট; অধিকাংশ তথ্য রসার্ণব, রসমঙ্গল, রসামৃত, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

(৯) ধাতুরত্নমালা—গুর্জরের দেবদত্ত কর্তৃক প্রণীত; রচনা-কাল চতুর্দশ শতাব্দী।

(১০) রসপ্রদীপ—ষোড়শ শতাব্দীর একটি বহুল প্রচলিত রসগ্রন্থ; ইহাতে সিফিলিস বা ফিরঙ্গ রোগ ও ইহার প্রতিষেধক হিসাবে রসকর্পূর ও তোব চিনির ব্যবহার আলোচিত; এই গ্রন্থে ধাতব অম্লের কথা আছে—ইহার নামকরণ হইয়াছে 'শঙ্খদ্রবক'।

(১১) রসকৌমুদী—ভিষক্ মাধব প্রণীত; এই মাধব 'নিদানে'র রচয়িতা মাধবকর হইতে ভিন্ন এবং অনেক পরবর্তী।

(১২) ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র প্রণীত; রচনা-কাল ষোড়শ শতাব্দী; এই গ্রন্থে উল্লিখিত ফিরঙ্গ রোগ ও তাহার প্রতিষেধকের আলোচনা রসপ্রদীপ হইতে গৃহীত।

(১৩) ধাতুক্রিয়া—ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা; ধাতব অম্লের আলোচনা প্রসঙ্গে গন্ধকাম্ল বা সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলা হইয়াছে 'দাহজল'।

(১৪) অর্কপ্রকাশ—এই গ্রন্থে আরব্য কিমিয়ার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

এ ছাড়া শালিনাথের 'রসমঞ্জরী', রামসেনের 'রসসারামৃত', আনন্দানুভবের 'রসদীপিকা', রামরাজের 'রসরত্নদীপিকা' ইত্যাদি বহু রসগ্রন্থের কথা জানা যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই আলোচনার ধারা ও বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে রসায়নের গবেষণা কতদূর উন্নত হইয়াছিল তাহার একটা সুস্পষ্ট ছবি 'রসরত্নসমুচ্চয়ে' পাওয়া যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু জানিবার পক্ষে এই গ্রন্থের আলোচনাই যথেষ্ট হইবে।

রসরত্নসমুচ্চয় : একাদশ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হইল : (১) উপক্রমণিকা, (২) রস, (৩) উপরস, (৪) মণি-মুক্তা, (৫) ধাতু, (৬) রসশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলাপ, (৭) পরীক্ষাগার, (৮) বৈজ্ঞানিক শব্দ, (৯) যন্ত্র, (১০) মূষা প্রস্তুত করিবার উপাদান, এবং (১১) পারদ-শোধন।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় কয়েকজন প্রাচীন কিমিয়াবিদের উল্লেখের পর পারদের নানা ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। পারদ সেবনে দেহ সর্বপ্রকার রোগ-বিমুক্ত হয়। পারদ অগ্নিদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া দরদ নামক দেশের উপর পড়িয়াছিল। তাই এদেশের মৃত্তিকা পারদে এরূপ সমৃদ্ধ যে মৃত্তিকা সামান্য একটু পাতন করিলেই তাহা হইতে পারদ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলকে 'দরদিস্থান' বলা হইত; এই স্থান খনিজ হিঙ্গুলের (cinnabar) জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাপ্তিস্থানের নামানুসারে হিঙ্গুলের আর এক নাম ছিল 'দরদ'।*

রস : দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'রস'। হিন্দু রসায়নে খনিজ জগতকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইত—রস, উপরস ও রত্ন। রস বলিতে সাধারণতঃ পারদকেই বুঝাইত। পারদ ছাড়া আরও আট রকম রসের উল্লেখ 'রসরত্নসমুচ্চয়ে' পাওয়া যায়। এই আট রস হইল : অভ্র, বৈক্রান্ত, মাক্ষিক, বিমল, অদ্রিজ (শিলাজতু), সস্যক, চপল ও রসক। অভ্র তিন প্রকার—পিনাক, নাগমন্দুক ও বজ্র, এবং প্রত্যেক প্রকার অভ্রই শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি বর্ণের হইয়া থাকে। বৈক্রান্ত একটি অষ্টতলক (octahedral) স্ফটিক; আটটি বিভিন্ন রং-এর বৈক্রান্ত পাওয়া যায়। পীত ও শ্বেত দুই বর্ণের মাক্ষিকের মধ্যে পীতবর্ণ মাক্ষিক শ্রেষ্ঠ। মাক্ষিক হইতে তাম্র-নিষ্কাশন পদ্ধতিটি রসরত্নাকর ও রসার্ণবে বর্ণিত পদ্ধতির নকল। তুঁতিয়ার অপর নাম সস্যক। সস্যক হইতেও তাম্রকে পৃথক করা যায়; এই পৃথকীকরণ পদ্ধতিটিও হুবহু রসার্ণবের নকল। চপল গন্ধক-ঘটিত একপ্রকার খনিজ। উত্তাপ প্রয়োগে অতি সহজে গলিয়া যায় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। অনেক সময় পারদকেও এই নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়। রসক হইতে দস্তা-নিষ্কাশনের কয়েকটি পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে। একটি পদ্ধতি অনুসারে রসককে লাক্ষা, চিটা গুড়, শ্বেত সরিষা, হরীতকী, ক্ষার ও সোহাগার সহিত উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাল পাকাইতে হইবে; তারপর এই তালকে বদ্ধ মূষার মধ্যে তীব্র আগুনে গলাইয়া ফেলিলে টিনের মত শুভ্র ও সুন্দর যে পদার্থটিকে পাওয়া যায় তাহাই রসকের সার পদার্থ (দস্তা)। দস্তা উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিখার নীল রং বদলাইয়া সাদা হয়।

উপরস : উপরস বা নিকৃষ্ট রস (তৃতীয় অধ্যায়) আট প্রকার—গন্ধক, গৈরিক, কাসীস,

* Ray, *A History of Hindu Chemistry*, p. 43.

ফটকিরি বা তুবরী, হরিতাল বা তালক, মনঃশিলা, অঞ্জন ও কামকুষ্ঠ। উপরসের প্রকারভেদ ও তাহার গুণাগুণ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সাধারণ রসের কথা অবতারণা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে কম্পিল্ল, চপল, গৌরী-পাষাণ, নবসার (নিশাদল—salammoniac), কপর্দ, অগ্নিজার, গিরিসিন্দুর, হিঙ্গুল, রাজবর্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুক্তা সম্বন্ধীয় আলোচনাও (চতুর্থ অধ্যায়) বৈক্রান্ত, সূর্যকান্ত, হীরক, চন্দ্রকান্ত, রাজবর্ত, গরুদোদ্গার, পুষ্পরাগমণি, নীলকান্তমণি ইত্যাদি বিবিধ মুক্তার নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ। ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মুক্তা ভস্মীভূত করিবার কয়েকটি পদ্ধতিও আলোচিত হইয়াছে।

ধাতুদের কথা : পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে 'লোহানি' বা ধাতুদের কথা। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহকে খাঁটী ধাতু বলা হইয়াছে, সীসক ও টিনকে 'পূতিলোহ'। সম্ভবতঃ গলিত সীসক ও টিনের দুর্গন্ধ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। সংকর ধাতু (alloy) তিন প্রকার—পিত্তল, কাংস্য ও বর্তলোহ। ধাতুর ও সংকর ধাতুর আবার প্রকারভেদ আছে। এই পার্থক্য নির্দেশ করিতে অতি সুন্দর ও অর্থবোধক সব নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :

স্বর্ণ—পাঁচ প্রকার ... ১। ২। ৩। স্বর্গীয় বা সহজম্
৪। খনিজ
৫। কৃত্রিম (নিকৃষ্ট ধাতুর রূপান্তর)

রৌপ্য—তিন প্রকার ... ১। সহজম্
২। খনিজ
৩। কৃত্রিম

লৌহ—তিন প্রকার ... ১। মুন্দম্ (wrought iron)—
তিন প্রকার—১। মৃদু
২। কুণ্ঠম্
৩। কদারম্
২। তীক্ষ্ণম্ (ইস্পাত)—
ছয় প্রকার—ইহাদের কোন নূতন নাম দেওয়া হয় নাই
৩। কান্তম্—
পাঁচ প্রকার—১। ভ্রামক
২। চুম্বক
৩। কর্ষক
৪। দ্রাবক
৫। রোমকান্ত

বঙ্গম্ (টিন)—দুই প্রকার ... ১। ক্ষুরকম্
২। মিশ্রকম্

পিত্তল—দুই প্রকার ... ১। রীতিক
২। কাকতুণ্ডি

রসরত্নাকর, রসার্ণব ইত্যাদি গ্রন্থের মত রসরত্নসমুচ্চয়েও ধাতুদের মারিবার ও শোধন করিবার নানাবিধ পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে।

রাসায়নিক যন্ত্র : গ্রন্থের নবম অধ্যায়টি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির আলোচনার জন্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আমরা রসরত্নাকরে ও রসার্ণবেও পাইয়াছি। তবে বিষয়টি আর কোথাও এত বিশদভাবে আলোচিত দেখা যায় না। গ্রন্থকার অবশ্য নিজে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার এই আলোচনা সোমদেবের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। দুঃখের বিষয়

সোমদেবের এই রসগ্রন্থটি এখন নিখোঁজ। রসরত্নসমুচ্চয়ে আমরা নিম্নোক্ত যন্ত্রের উল্লেখ পাই : দোলা যন্ত্র, স্বেদনী যন্ত্র, পাতন যন্ত্র, অধস্পাতন যন্ত্র, ঢেকী যন্ত্র, বালুকা যন্ত্র, লবণ যন্ত্র, নালিকা যন্ত্র, ভূধর যন্ত্র, তির্যকপাতন যন্ত্র, বিদ্যাধর যন্ত্র ও ধূপ যন্ত্র।

দোলা যন্ত্রের কথা রসার্ণবের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা রসার্ণবের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। **স্বেদনী যন্ত্রে** একটি হাঁড়ির অর্ধেক জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখ কাপড়ের

১৩। 'রসরত্নসমুচ্চয়ে' বর্ণিত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির নক্সা।

টুকরার দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাষ্পে উত্তপ্ত করা প্রয়োজন এইরূপ দ্রব্য এই কাপড়ের উপর রাখিয়া আর একটি হাঁড়ি প্রথমোক্ত হাঁড়ির উপর মুখে মুখ লাগাইয়া উল্টাভাবে বসানো হয়।

পাতন ও ঊর্ধ্বপাতনের জন্য **পাতন যন্ত্র** আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে এমন দুইটি হাঁড়ি নির্বাচন করা হয় যাহাতে একটি হাঁড়ির গলা অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহজে অবস্থান করিতে পারে; এই অবস্থায় হাঁড়ি দুইটির সংযোগ-স্থল চুন, শর্করা, লোহার মরিচা, মহিষের দুধ ইত্যাদি দ্রব্যের এক মিশ্র প্রলেপের দ্বারা বন্ধ করা হয়। পাতন যন্ত্রের সামান্য পরিবর্তন সাধন করিয়া **অধঃপাতন যন্ত্র** তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহাতে উপরের পাত্রটি উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা এবং যে দ্রব্যটিকে পাতিত করিতে হইবে তাহাকে প্রলেপের মত করিয়া উপরের পাত্রের গায়ে মাখাইতে হইবে। পারদ-পাতনের উদ্দেশ্যে **ঢেকী যন্ত্রের** উদ্ভব। এই যন্ত্রে হাঁড়ির গলদেশে একটি ছিদ্রপথে বাঁশের নলের একদিক প্রবেশ করানো থাকে; নলের অপর দিক ঢুকানো থাকে পিত্তল নির্মিত গোলাকার একটি পাত্রের মধ্যে। দুইটি ফাঁপা অর্ধ গোলক জোড়া দিয়া পিত্তল পাত্রটি নির্মিত। ইহার মধ্যে জল ভর্তি করিয়া পাত্রকে ঠাণ্ডা রাখা হয়।

বালুকা যন্ত্র এক প্রকার বালিখোলা। লম্বাগলা একটি কাচের বোতলের উপর কয়েকবার মাটির প্রলেপ লাগাইয়া প্রথমে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। তারপর একটি হাঁড়ি যথেষ্ট পরিমাণে বালুকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই বালুকার মধ্যে বোতলটি তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়। হাঁড়ির মুখে উল্টা করিয়া আর একটি হাঁড়ি বসাইয়া জোড়ার মুখ মাটির প্রলেপ দ্বারা বন্ধ করিলেই হইল। পারদ ও পারদ-ঘটিত দ্রব্য বালিখোলায় উত্তপ্ত করিতে হইলে ইহাদের বোতলের মধ্যে পুরিয়া এইভাবে গরম করিতে হয়। বালুকা যন্ত্রে বালুকার পরিবর্তে লবণ ব্যবহার করিলে তাহার নাম হইবে **লবণ যন্ত্র**, অথবা কাচের বোতলের বদলে লোহার নল ব্যবহার করিলে তাহার নাম হইবে **নালিকা যন্ত্র**। বোতলের বদলে বালুকার মধ্যে মুষা বসাইয়া ঘুঁটের আগুনে দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা যেই যন্ত্রে তাহার নাম **ভূধর যন্ত্র**।

তির্যকপাতন যন্ত্রে দুইটি হাঁড়ির মধ্যে তির্যকভাবে একটি নল প্রবেশ করাইয়া সংযোগ রক্ষিত হয়। হাঁড়ির মুখ ঢাকনির দ্বারা বন্ধ করিয়া সংযোগস্থলে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। নল ও হাঁড়ির সংযোগস্থলেও এইরূপ মাটির প্রলেপ লাগাইবার ব্যবস্থা। চুল্লীর উপর বসানো হাঁড়িতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি রাখা হয়। এই হাঁড়ি তীব্র আগুনে উত্তপ্ত করিলে দ্রব্য পাতিত হইয়া অপর হাঁড়িতে জমা হইবে। দ্বিতীয় হাঁড়িটি জলের দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়। এইরূপ পাতনের নাম তির্যক পাতন।

হিঙ্গুল হইতে পারদ নিষ্কাশনের জন্য **বিদ্যাধর যন্ত্রের** পরিকল্পনা। এই যন্ত্রে একটির উপর আর একটি মাটির হাঁড়ি বসানো থাকে; নীচেরটিতে থাকে হিঙ্গুল উপরেরটিতে জল। উত্তাপের বলে পারদ বাষ্পাকারে নিষ্কাশিত হইয়া উপরের হাঁড়ির তলদেশে ঘনীভূত হয়। **ধূপযন্ত্রে** একটি মাটির হাঁড়ির মুখের সামান্য নীচে কয়েকটি লৌহ শলাকা তির্যকভাবে বসাইয়া তাহার উপর স্বর্ণের পাত রাখা হয়। হাঁড়ির মধ্যে থাকে গন্ধক, মোমছাল, হরিতাল ইত্যাদির মিশ্রণ। হাঁড়ির মুখে আর একটি হাঁড়ি উল্টা করিয়া বসাইয়া সংযোগস্থল মাটির প্রলেপদ্বারা বন্ধ করা হয়। এইবার নীচের হাঁড়ি গরম করিলে গন্ধক, মোমছাল ইত্যাদির মিশ্রণ হইতে যে ধূম নির্গত হইবে তাহাতে স্বর্ণের পাত উপধূপিত করা যায়। এইভাবে রৌপ্যাদি ধাতুর পাতও উপধূপিত হইতে পারে।

রসরত্নসমুচ্চয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে নানাবিধ মুষা ও তাহাদের নির্মাণকল্পে যেসব উপাদান প্রয়োজন তাহার বর্ণনা আছে। ছয় প্রকার লবণ—সামুদ্র, সৈন্ধব, বিদ, সৌবর্চল, রোমক ও চুলিকা লবণ (নিশাদল), ত্রিবিধ ক্ষার—যবক্ষার, সার্জিকাক্ষার ও সোহাগা, নানাবিধ অম্ল, স্নেহদ্রব্য ইত্যাদি গ্রন্থের দশম খণ্ডে আলোচিত। সমগ্র রসশাস্ত্রের কেন্দ্রে পারদ। সুতরাং পারদ-শোধনবিধি রসগ্রন্থমাত্রেরই এক প্রধান আলোচনার বিষয়। রসরত্নসমুচ্চয়ের একাদশ খণ্ডে পারদের খাদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইহাতে তিন প্রকার স্বাভাবিক খাদ—বিষ, বহ্নি ও মল ও সেই সঙ্গে কিছু সীসক ও টিন মিশ্রিত থাকে। ধাতুক্রিয়ার দ্বারা এই খাদ তাড়াইয়া

বিশুদ্ধ পারদ প্রস্তুত করিতে হয়। এই খণ্ডে পারদ-বন্ধন বা পারদ মারিবার উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

৩·৪। তাম্র, ব্রোঞ্জ, কাংস্য, লৌহ ইত্যাদি বিবিধ ধাতুশিল্পে প্রাচীন ভারতীয়দের দক্ষতা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে রাসায়নিক জ্ঞান কেবল তান্ত্রিক কিমিয়াবিদ্ এবং বৈদ্য ও ঔষধপ্রস্তুতকারকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। ধাতুশিল্পী ও খনির কাজে লিপ্ত কারিগরদের হাতেও রাসায়নিক জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল। কারিগরি-বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৭) আমরা বিবিধ রাসায়নিক ও ধাতুশিল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যেমন—ধাতুপাকম্, ধাত্বৌষধীনাম্ সংযোগক্রিয়া-জ্ঞানম্, ধাতু-সাংকর্য্য-পার্থক্য-করণম্, ক্ষারনিষ্কাশন-জ্ঞানম্, ধাত্বাদিনাং সংযোগ-অপূর্ব বিজ্ঞানম্, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, কৃত্রিম-স্বর্ণ-রত্নাদি-ক্রিয়া-জ্ঞানম্, কাচ-পাত্রাদি-করণ-বিজ্ঞানম্, লোহাদি-সারশাস্ত্র-অস্ত্র-কৃতিজ্ঞানম্ ইত্যাদি। এইসব শিল্পে নিযুক্ত সুদক্ষ কারিগররা যেসব দ্রব্য গড়িয়া গিয়াছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্তমান। এককালে ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বিশেষ আদর ও চাহিদা ছিল। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাসের পাতায়ও বহু সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায়। সাম্প্রতিক-কালে এইসব দ্রব্যের চুলচেরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর তাহা এখন আর মোটেই অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। তাম্র, ব্রোঞ্জ, কাংস্য, লৌহ ইত্যাদি বিবিধ ধাতুশিল্পে প্রাচীন ভারতীয়রা কিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

তাম্র

প্রাচীন তাম্রনির্মিত দ্রব্যের নমুনা : বিশুদ্ধ তাম্রদ্রব্যের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে নেপাল সীমান্তের নিকট প্রাপ্ত রামপূর্ব অশোক স্তম্ভের ২৪·৫ ইঞ্চি লম্বা অর্গলটি উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ইহা নির্মিত হয়। অর্গলটির পরিধি কেন্দ্রে ও উভয় প্রান্তে যথাক্রমে ১৪ ও ১২ ইঞ্চি। ইহা এখন কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে ব্যবহৃত তাম্রমুদ্রার নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক ও বক্ত্রীয় নৃপতিরা এই ধরনের তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। কুষাণ ও পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের আমলের বহু তাম্র-মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। এইসব মুদ্রায় অতি বিশুদ্ধ তাম্রের ব্যবহার দেখা যায়। দানপত্র লিখিবার কার্যে এদেশে তাম্রফলকের ব্যবহার সুপ্রাচীন। গোরখপুর জেলায় সোগৌরা গ্রামে যে প্রাচীন তাম্রফলকটি (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মী হরফে দানপত্রটি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

মূর্তি গড়িবার কার্যে অর্থাৎ ভাস্কর্যে তাম্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়র মিঃ হ্যারিস ভাগলপুর জেলায় সুলতানগঞ্জের এক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ হইতে ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চ তাম্রনির্মিত এক বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কার করেন। মূর্তিটির ওজন প্রায় এক টন এবং সমস্তটাই অতি বিশুদ্ধ তাম্রের দ্বারা সুগঠিত। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ইহা নির্মিত হয়। নালন্দায় ৮০ ফুট উচ্চ এক বিরাট তাম্রনির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি স্থাপনার কথা হুয়েন সাং-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইহা নাকি রোড্স্ দ্বীপের অতিকায় ব্রোঞ্জ মূর্তির মতই বিরাট ছিল। মূর্তিটির কোন চিহ্নই পরে আর পাওয়া যায় নাই; নালন্দা সম্বন্ধে অন্য কোন লেখকের রচনা বা বর্ণনাতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। হুয়েন সাং-এর কথা সত্য হইলে, মূর্তিটির নির্মাণ-কাল সপ্তম শতাব্দী এবং নির্মিত হইবার অল্প কালের মধ্যেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ইহা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।*

---

* P. Ray (editor), *History of Chemistry in Ancient and Medieval India,* Indian Chemical Society, 1955 ; p. 91.

১৪। তাম্র-নিষ্কাশন চুল্লী (*Economic Geology of India* গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্রাবলম্বনে)।

মোগলদের সময় বন্দুক, কামান ইত্যাদি গোলা-নিক্ষেপক অস্ত্রাদি তাম্র ঢালাই করিয়া তৈয়ারী করা হইত। অবশ্য প্রথম প্রথম তাম্র ব্যবহৃত হইলেও পরে কাঁসার ও লোহার বন্দুক ও কামানেরই প্রচলন হইয়াছিল সর্বাধিক। সে কথা পরে বলিতেছি।

তাম্রখনিজের অস্তিত্ব : প্রাচীন ভারতে সিংভূম, হাজারিবাগ, রাজপুতানা, নেপাল, মধ্যপ্রদেশ

ও মাদ্রাজের তাম্রখনি হইতে তাম্রখনিজ তোলা হইত। সিংভূম ও হাজারিবাগ অঞ্চলের তাম্র-খনিগুলিতে দুই হাজার বৎসর পূর্বে যে কাজ হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেরাক নামে এক জৈন সম্প্রদায় খনির কাজে ও তাম্র-নিষ্কাশনবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিল। রাজপুতানার বহু তাম্রখনি এখন নিঃশেষিত; প্রাচীনকালে খনিগুলি সক্রিয় ছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীরা এখনও সাবেক পদ্ধতিতে এইসব খনি হইতে কিছু কিছু খনিজ উত্তোলন ও তাম্র নিষ্কাশন করিয়া থাকে। তাম্রখনিজে নেপালের সমৃদ্ধি সুবিদিত; ইহাতে তাম্রের ভাগ সর্বাপেক্ষা বেশী। এজন্য নেপাল-তাম্রের এক সময় বিশেষ চাহিদা ছিল। মধ্যপ্রদেশের কুমায়ুন জেলা ও মাদ্রাজের কোন কোন অঞ্চল প্রাচীন ভারতে তাম্রখনির কাজে ও তাম্র-নিষ্কাশনবিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

তাম্র-নিষ্কাশন পদ্ধতি : বিগত শতাব্দীতেও ভারতের কোন কোন অঞ্চলের তাম্রকারদিগকে সাবেক পদ্ধতিতে খনিজ হইতে তাম্র নিষ্কাশন করিতে দেখা গিয়াছে। বল সাহেব তাঁহার *Economic Geology of India* গ্রন্থে এরূপ এক সাবেক পদ্ধতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাম্র-নিষ্কাশনকল্পে একপ্রকার মারুত চুল্লী (১৪নং চিত্র) ব্যবহৃত হইত। চুল্লী-ঘরের মেঝেতে প্রথমে কিছু সাধারণ বালি বিছানো হয়। ঘরের মাঝখানে থাকে ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তাকার একটি গর্ত; ইহার গভীরতা ২ হইতে ৩ ইঞ্চি। গর্তের তলদেশে প্রথমে মিহি বালি ও তার উপর ছাই সমানভাবে বিছানো হয়; গলিত ধাতু মেঝেতে যাহাতে লাগিয়া না যায় সেজন্য এই ব্যবস্থা। গর্তের মধ্যে আবার চারিটি মাটির নল প্রবেশ করানো থাকে—তিনটি নলের মধ্য দিয়া হাপরের সাহায্যে বাতাসের ঝাপ্‌টা প্রবেশ করাইবার বন্দোবস্ত, চতুর্থটি ধাতুমলের (slag) নির্গম-পথ। এইবার গর্তের পার মাটির দ্বারা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করিয়া ইহার উপর পর পর তিনটি অগ্নিসহ মৃত্তিকার বা ফায়ার ক্লের বলয় বসানো হয়। প্রতিটি বলয়ের ব্যাস ১৫ ইঞ্চি ও উচ্চতা ১০ ইঞ্চি। উপরের বলয় দুইটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা চলে, তবে নীচের বলয়টি প্রতিবারই বদলাইতে হয়।

মারুত চুল্লীতে দিবার আগে তাম্রখনিজকে প্রথমে পাথরের হাতুড়ির দ্বারা গুঁড়াইয়া গোবরের সহিত মাখিয়া তাল পাকাইতে এবং অপর একটি চুল্লীতে জারিত করিতে হইবে। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ কাঠকয়লা, জারিত তাম্রখনিজ ও ধাতুমল হিসাবে কিছু লৌহ মারুত চুল্লীতে সংস্থাপন করিয়া ইহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। চুল্লীতে বাতাসের ঝাপ্‌টা দিবার জন্য হাপরের ব্যবস্থার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মিঃ বল লিখিয়াছেন, এইরূপ একটি বাত্যা চুল্লীতে দিনে নয়-দশ ঘণ্টার মধ্যে আড়াই মণ খনিজ গলানো হইত, আর ইহাতে খরচ হইত তিন মণ কাঠকয়লা ও দুই মণ লৌহ ধাতুমল।

ব্রোঞ্জ, কাংস্য ও পিত্তল

ব্রোঞ্জ, কাংস্য ও পিত্তল তিনটিই তাম্রপ্রধান সংকর ধাতু। ব্রোঞ্জ ও কাংস্যের প্রধান উপাদান তাম্র ও টিন, পিত্তলের তাম্র ও দস্তা। ইহার সহিত অন্যান্য কয়েকটি ধাতুরও সামান্য খাদ থাকে। ব্রোঞ্জ ও কাংস্যের (bell-metal) মধ্যে প্রভেদ এই যে, শেষোক্তটিতে টিনের ভাগ প্রথমোক্তটির অপেক্ষা অনেক বেশী। টিনের ভাগের এই তারতম্যের জন্য কাঠিন্য, গলনাঙ্ক ইত্যাদি ধর্মের যথেষ্ট প্রভেদ হইয়া থাকে। বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য ব্রোঞ্জ ও কাংস্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না, উভয়কেই কাংস্য বলা হইত। চরক-সংহিতা ও অন্যান্য আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে পিত্তল অর্থে 'রীতি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ব্রোঞ্জ-নির্মিত প্রাচীন দ্রব্যাদির নমুনা : ভারতবর্ষে ব্রোঞ্জ ও কাংস্যের ব্যবহার সুপ্রাচীন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ব্রোঞ্জ-নির্মিত অলঙ্কার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র, গৃহস্থালীর উপযোগী নানাবিধ পাত্র ও দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এইসব দ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা হইতে দেখা যায়, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ব্রোঞ্জে টিনের ভাগ ৪·৫১ হইতে ১৩·২১ শতাংশের মধ্যে

থাকিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিনের ভাগ অবশ্য ১১/১৩ শতাংশ। এরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ টিনের ব্যবহার হইতে মনে হয়, সিন্ধু-সভ্যতার আমলে এদেশে ব্রোঞ্জের উৎপাদন কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে, এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ইহা প্রস্তুত হইত। এই কার্যে প্রয়োজনীয় টিন আমদানি করা হইত বিদেশ (পারস্য?) হইতে। ব্রোঞ্জের কাঠিন্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক মিশাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ব্যবহৃত তাম্র, ব্রোঞ্জ, পিত্তল ও সীসক নির্মিত অলংকার, প্রসাধন দ্রব্য, বাসনপত্র, শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য তক্ষশিলার খননকার্যকালে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই কুষাণ আমলের। মাদ্রাজের টিনিভেলির প্রাচীন গোরস্থান খনন করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর ব্রোঞ্জ-নির্মিত কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। দেবদেবীর মূর্তি গড়িবার কার্যে ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই শিল্পে পূর্বভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের শিল্পীরা অদ্বিতীয় ছিল। লামা তারানাথ দেবপাল ও ধর্মপালের রাজত্বকালে ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল নামে দুইজন সুদক্ষ শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এরূপ সুদক্ষ ব্রোঞ্জ-শিল্পীদের কাছেই নেপাল ও তিব্বত এই কারিগরিবিদ্যা অর্জন করিয়াছিল। ব্রোঞ্জের আর একটি ব্যবহার দেখা যায় মুদ্রা-প্রণয়নে। খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী কি তাহারও পূর্বেকার ব্রোঞ্জ মুদ্রার নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

পিত্তল-নির্মিত দ্রব্যের নমুনা : যেসব দ্রব্য নির্মাণে ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা যায় অনুরূপ দ্রব্য নির্মাণে অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা পিত্তলের ব্যবহারও দেখিতে পাই। অবশ্য পিত্তলের ব্যবহার ব্রোঞ্জের অনেক পরবর্তী। আয়ুর্বেদিক গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ আছে, তক্ষশিলার প্রাচীনতম ধাতব দ্রব্যাদির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) পিত্তল-নির্মিত দ্রব্য যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ভেণ্টুরা মাণিক্যালয়ের এক স্তূপ খনন করিয়া যে সকল দ্রব্য উদ্ধার করেন তন্মধ্যে পিত্তলের একটি সুন্দর বাক্স উল্লেখযোগ্য। দ্রব্যগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। কাংরাকোটের নিকট ফতেপুরের এক ধর্ম-শালায় ৩০ সেণ্টিমিটার লম্বা ও ১৩·৫ সেণ্টিমিটার চওড়া যে বুদ্ধমূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে তাহার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি হইতে মূর্তিটির নির্মাণ-কাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নির্ধারিত হইয়াছে। হুয়েন সাং রাজা শিলাদিত্যের সময় নালন্দার অনতিদূরে পিত্তল-নির্মিত অসম্পূর্ণ একটি বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। বিহারটি সম্পূর্ণ হইলে ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট হইত। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বিহার, মন্দির ও অনুরূপ সৌধ নির্মাণে এদেশে এক সময় পিত্তলের ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা এক অতি উন্নত পিত্তল-শিল্পেরই ইঙ্গিত দিয়া থাকে।

বন্দুক ও কামান নির্মাণে ব্রোঞ্জ ও পিত্তলের ব্যবহার : বন্দুক, কামান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে ব্রোঞ্জ ও পিত্তলের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোগলদের সময় এদেশে কামানের ব্যবহার প্রচলিত হইলে প্রথম প্রথম তাম্র ঢালাই করিয়া এই অস্ত্র তৈয়ারী করা হইত। পরে এই কাজে ব্রোঞ্জ ও পিত্তল তাম্রের স্থান অধিকার করে। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান বার্হাম নিজাম শাহের সময় আমেদনগরে পৃথিবীর বৃহত্তম ব্রোঞ্জ-কামান নির্মিত হইয়াছিল। এই কামানের সার্থক নাম 'মালিক-ই-ময়দান'—ময়দানের মালিক। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি; বহির্ভাগের ব্যাস সম্মুখে ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি ও পশ্চাতে ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি; ভিতরের ব্যাস ২ ফুট ৪·৫ ইঞ্চি। কামানটি এখন বিজাপুরে সংরক্ষিত। 'মালিক-ই-ময়দানে'র ব্রোঞ্জ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে তাম্রের ভাগ ৮০·৪৩ শতাংশ, টিনের ১৯·৫৭ শতাংশ।* পিত্তল-নির্মিত কামানের মধ্যে আগ্রার সুবৃহৎ কামান উল্লেখযোগ্য। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট, আভ্যন্তরীণ গহ্বরের ব্যাস ২২·৫ ইঞ্চি এবং ওজন ১৪৬৯ মণ। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পিত্তলের অতি উৎকৃষ্ট কামান ও

* Neogi, *Copper in Ancient India*; p. 39.

বন্দুক নির্মিত হইত; ইহাদের নাম ছিল 'ঈশা খাঁর বন্দুক'। বন্দুকে ব্যবহৃত পিতলের উপাদান পাওয়া গিয়াছে এইরূপ : তাম্র—৮৭·৭২ শতাংশ, দস্তা (কিঞ্চিৎ লৌহ মিশ্রিত)—১৩·৮২ শতাংশ; টিন—১·৮৩ শতাংশ।*

লৌহ ও ইস্পাত

লৌহের প্রাচীন ব্যবহার : ভারতবর্ষে লৌহের ব্যবহার সুরু হয় বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদের 'অয়স্' লৌহকে বুঝাইত। অক্সিজেনের সহিত যৌগিক ক্রিয়ার ফলে মরিচা পড়িয়া সহজে লৌহের ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার স্বভাবের জন্য সুপ্রাচীন লৌহদ্রব্যাদির ধ্বংসাবশেষ বড় একটা পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ও তৎপরবর্তীকালের লৌহদ্রব্যাদির কিছু কিছু নিদর্শন বর্তমান। মাদ্রাজে টিনিভেলি জেলার আদিত্যনালুর নামক স্থান হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বীয় বিভাগ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লৌহনির্মিত তরবারি, ছোরা, তীরের ফলা, বল্লমের অগ্রভাগ, লাঙলের ফলা ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই সময়ের একটি লৌহ বল্লম পাওয়া গিয়াছে উত্তর প্রদেশের বস্তিজেলার অন্তর্গত পিপ্রাহা নামক স্থানে। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে (নির্মাণ-কাল আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দী) অনেকগুলি লোহার আংটা পাওয়া গিয়াছে; এই মন্দিরের একটি স্তূপের ভিত্তি খনন করিয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে লৌহের যে ধাতুমল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে এই সময়কার লৌহ-নিষ্কাশন-পদ্ধতির একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ : প্রাচীন ভারতের লৌহ দ্রব্যাদির মধ্যে দিল্লীর লৌহ স্তম্ভের প্রসিদ্ধি সুবিদিত। স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অনুমিত হয়, চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চন্দ্রের (সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের) জয়স্তম্ভ হিসাবে ইহা প্রথম মথুরার বিষ্ণুপাদ পাহাড়ের উপর নির্মিত হইয়াছিল। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল এই স্তম্ভ দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। স্তম্ভটি উচ্চতায় ২৪ ফুট, ইহার ব্যাস নীচে ১৬·৪ ইঞ্চি ও উপরে ১২ ইঞ্চি, ওজন ৬ টনেরও বেশী। হ্যাড্‌ফিল্ড ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ৭·৮১; বিশুদ্ধ লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৮৪। তিনি এই লৌহ বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে বিভিন্ন ধাতুর ভাগ নির্ণয় করিয়াছেন এইরূপ† :

অঙ্গারক (কার্বন)	...	...	০·০৮০	শতাংশ
সিলিকন	...	...	০·০৪৬	"
গন্ধক	...	...	০·০০৬	"
ফস্ফরস	...	...	০·১১৪	"
নাইট্রোজেন	...	...	০·০৩২	"
ম্যাঙ্গানীজ	...	...	—	"
তাম্র	...	...	০·০৩৪	"
লৌহ	...	...	৯৯·৭২০	"
			১০০·০৩২	

গন্ধকের অল্পতা ও ম্যাঙ্গানীজের অনস্তিত্ব লক্ষণীয়। ফস্ফরসের ভাগ আবার অত্যধিক। এত পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও স্তম্ভটির কোথাও এতটুকু মরিচা ধরে নাই। মরিচা-রোধের এই বিস্ময়কর ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বর্তমান কালের বিশেষজ্ঞগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। ফস্ফরসের আধিক্য,

* Neogi, *Copper in Ancient India ;* p. 40.
† M. S. Krishnan, *Iron Ores of India,* Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta ; p. 26.

গন্ধকের অল্পতা ও ম্যাঙ্গানীজের অনস্তিত্ব ইহার প্রধান কারণ। অতি উৎকৃষ্ট লৌহখনিজ ও কাঠকয়লা যে লৌহ-নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হইয়াছিল, গন্ধকের অল্পতা তাহা নির্দেশ করে। প্রাচীন কিমিয়া-গ্রন্থে দেখা যায়, লৌহকে বার বার গরম ও ঠাণ্ডা করিয়া ও পরে চুম্বক ধর্মবিশিষ্ট লৌহ-অক্সাইড, নানাবিধ লবণ ও জৈব পদার্থের এক মিশ্র প্রলেপ লৌহের সর্বাঙ্গে মাখাইয়া ইহার মরিচা রোধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইত। সম্ভবতঃ এই ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া প্রাচীন হিন্দু লৌহশিল্পিগণ দিল্লীর স্তম্ভকে অক্ষয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রকাণ্ড একটি স্তম্ভ একবারে ঢালাই করা সে সময়ে সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; এ যুগেও ইহা দুঃসাধ্য। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ৮০ পাউণ্ড কি অনুরূপ ওজনের ছোট ছোট লোহার তাল অভীপ্সিত আকারে পৃথক পৃথকভাবে ঢালাই করিয়া পরে জোড়া লাগানো হইয়াছিল। ইহা এরূপ সুনিপুণভাবে করা হয় যে, সমগ্র স্তম্ভটিকে একটি অখণ্ড লোহার তাল বলিয়া মনে হয়। এই স্তম্ভ সম্বন্ধে ভ্যালেন্টাইন বল তাঁহার *Economic Geology of India* গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> "The famous iron pillar at the Kutab near Delhi indicates an amount of skill in the manipulation of large masses of wrought iron, which has been the marvel of all who have endeavoured to account for it. It is not many years since the production of such a pillar would have been an impossibility in the largest foundries of the world, and even now there are comparatively few where a similar mass of metal could be turned out."

* * *

> "Analyses of the iron have been made both by Dr. Percy, late of the Royal School of Mines, and Dr. Murray Thompson of Rurki College, who have found that it consists of pure malleable iron without any alloy. It has been suggested that this pillar must have been formed by gradually welding pieces together ; if so, it has been done very skilfully, since no marks of such welding are to be seen."

ধারা ও অন্যান্য স্থানের লৌহস্তম্ভ : মালবের প্রাচীন রাজধানী ধারার বিরাট লৌহ স্তম্ভটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উচ্চতা ছিল প্রায় ৫০ ফুট। ধারা হইতে ২২ মাইল দূরে মাণ্ডুতে ইহা প্রথম নির্মিত হয় আনুমানিক ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমান আক্রমণকারীরা এই স্তম্ভকে দ্বিখণ্ডিত করে। এই ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে বৃহত্তম খণ্ডটি ধারায় স্থাপিত হয়; মুসলমানেরা পরে ইহাকেও দ্বিখণ্ডিত করে। ধারা স্তম্ভের তিনটি টুকরা এখন বিদ্যমান,—প্রথমটির দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, দ্বিতীয়টির ১১ ফুট ৭ ইঞ্চি, তৃতীয়টির ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি; চতুর্থ খণ্ডটি নিখোঁজ। সমগ্র স্তম্ভটির ওজন ছিল প্রায় ৭ টন।

আবু পাহাড়ের অচলেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গনে ১২ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ যে লৌহ স্তম্ভটি পাওয়া গিয়াছে তাহাও দিল্লী বা ধারা স্তম্ভের আকারে নির্মিত। স্তম্ভের উপরে একটি বিরাট ত্রিশূল দণ্ডায়মান। উড়িষ্যার কোনারক ও পুরীর মন্দিরে ছোট বড় লোহার বহু কড়ি ও বরগা ব্যবহৃত দেখা যায়। কোনারকে প্রায় ২৯টি বৃহৎ কড়ি এবং পুরীর মন্দিরে ছোট বড় প্রায় ২৩৯টি কড়ি-বরগা আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ৩৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা। সবগুলিই পেটা লোহার তৈরী। ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগীর বিশ্লেষণ অনুসারে ইহাতে লোহার ভাগ ৯৯·৬৪ শতাংশ, ফস্ফরসের ভাগ ০·১৫ শতাংশ, অঙ্গারক ও গন্ধকের ভাগ নামমাত্র, ম্যাঙ্গানীজ একেবারেই নাই।

বন্দুক ও কামান নির্মাণে লোহের ব্যবহার : এ দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চালু হইলে বড় বড় কামান ও বন্দুক নির্মাণ-কার্যে লোহের ব্যবহার সুরু হয়। আমরা দেখিয়াছি, এই কার্যে প্রথম প্রথম তাম্র ও কিছু পরে ব্রোঞ্জ ও কাংস্য ব্যবহৃত হইত। অনতিকালের মধ্যে লোহার বন্দুক ও কামান ভারতের সর্বত্র বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নহে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশের কামানের মত এত বড় ও মজবুত কামান পৃথিবীর আর কোথাও তৈয়ারী হইত কিনা সন্দেহ। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান ও দাক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চল কামান-নির্মাণে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

ঢাকায় এক সময় একটি অতিকায় লৌহ কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ২২ ফুট ১০·৬ ইঞ্চি, ব্যাস সম্মুখভাগে ২৬ ইঞ্চি ও পশ্চাৎভাগে ৩১ ইঞ্চি, এবং ওজন প্রায় ৩০ টন। ভেনিসীয় পর্যটক মানুচ্চি মোগল আমলের কামানের কথাপ্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করেন এবং তিনি ইহার নাম দেন 'কালে খাঁ'। কামানটি পরে নদীগর্ভে পতিত হয়। ঢাকার কামানের পর উল্লেখযোগ্য মুর্শিদাবাদের 'জাহান কোষ'; ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও ব্যাস ২০ ইঞ্চি। ১৬৩৭ খৃীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। বিজাপুরের 'লান্ডা কা সাব' ও হায়দার বুরুজের উপর স্থাপিত 'দূর-পাল্লার' (far flier) কামানদ্বয়ের খ্যাতিও বড় কম ছিল না। ৪৭ টন ওজনের 'লান্ডা কা সাব'-এর দৈর্ঘ্য ছিল ২১ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং ব্যাস পশ্চাতে ও সম্মুখে যথাক্রমে ৫২ ইঞ্চি ও ১৯ ইঞ্চি। সে তুলনায় 'দূর-পাল্লা' ব্যাসে কিছু ছোট হইলেও (১২ ইঞ্চি) ইহা দৈর্ঘ্যে (৩০ ফুট ৮ ইঞ্চি) সে যুগের আর সকল কামানকে হার মানাইয়াছিল। ডাঃ কৃষ্ণাণ তাঞ্জোর দুর্গপ্রাকারে অবস্থিত 'আদিল শাহী' কামানের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।* কামানটি দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, বাহিরের ব্যাস ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি, ভিতরের ব্যাস ১৩ ইঞ্চি, মোট ওজন ৩৫·৪ টন। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ঢালাই করিয়া পরে খণ্ডগুলিকে জুড়িয়া কামানটি নির্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে লৌহশিল্প যে কিরূপ উন্নত ছিল উপরিউক্ত লৌহ-দ্রব্যাদির দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাললিক সমতল অংশটুকু ছাড়া সুপ্রাচীন কাল হইতে এই উপমহাদেশের সর্বত্রই লৌহশিল্পের জন্য খ্যাত ছিল। যেখানেই সামান্য একটু লৌহখনিজ ও অরণ্যসম্পদের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে সেখানেই গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে অসংখ্য বাত্যা-চুল্লী, গড়িয়া উঠিয়াছে নানা ধরনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। এই অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অরণ্যসম্পদ ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু হইলে এবং ইউরোপের বড় বড় কারখানাজাত লৌহ সুলভ মূল্যে এদেশে আমদানি হইতে আরম্ভ করিলে ভারতীয় লৌহশিল্প দ্রুত উৎসন্নের মুখে পতিত হয়। এই ব্যাপক অবনতি ও বিপর্যয়ের সময়ও লৌহ-নিষ্কাশন-পদ্ধতির ও লৌহকারদের দক্ষতার সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা দেখিয়া জন পার্সি (১৮৫৫), এস. এফ. হ্যানে (১৮৫৭), জে. পি. কেনেডি (১৮৫৫), জি. জেকব (১৮৩৮), এফ. বুকানন-হ্যামিল্টন (১৮০৭) প্রমুখ ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ এই প্রাচীন শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, আসাম, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, গোদাবরীর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, মালাবার, মাদ্রাজের সালেম জেলা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রাচীন পদ্ধতিতে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইত। লৌহ-নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে যে ধরনের বাত্যা-চুল্লী ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হইত তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

লৌহ ও ইস্পাত-প্রস্তুত প্রণালী : ক্ষুদ্রায়তনের বাত্যা-চুল্লীগুলি উচ্চতায় সাধারণতঃ ২ হইতে ৪ ফুট হইত। চুল্লীগুলির আকৃতি অনেকটা চোঙের মত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার নাসপাতির মত,—নীচের দিক বড় উপরের দিক ছোট। চোঙের নীচের অংশের ব্যাস ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি, উপরের অংশের ৬ হইতে ১০ ইঞ্চি। চুল্লীর কিছুটা অংশ ভূমিতলের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি হইতে

* M. S. Krishnan, *Iron Ores of India ;* p. 27-28.

এক ফ্‌ুট পর্যন্ত প্রবিষ্ট থাকিত। তলদেশে দ্‌ুই বা ততোধিক ছিদ্রের ব্যবস্থা; একটি ছিদ্রপথে বাঁশের বা মাটির নল প্রবেশ করাইয়া হাপরের সাহায্যে বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হইত; অপর ছিদ্র ধাতুমলের নির্গম-পথ। চুল্লীর দেহ মৃত্তিকা-নির্মিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফায়ার ক্লে বা অগ্নিসহ মৃত্তিকার দ্বারা চুল্লী নির্মিত হইতে দেখা যায়। তারপর লৌহখনিজ ও কাঠকয়লা পর পর কয়েকটি স্তরে চুল্লীর মধ্যে সাজাইয়া অগ্নিসংযোগ করিলে ৪ হইতে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ধাতু-নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হইত। ছোট চুল্লীতে এক এক বারে ৩ সের ও বড় চুল্লীতে ১৫ সের পর্যন্ত লৌহ উৎপন্ন হইত। দক্ষিণ ভারতে এই ধরনের চুল্লীর ব্যবহার ছিল সর্বাধিক।
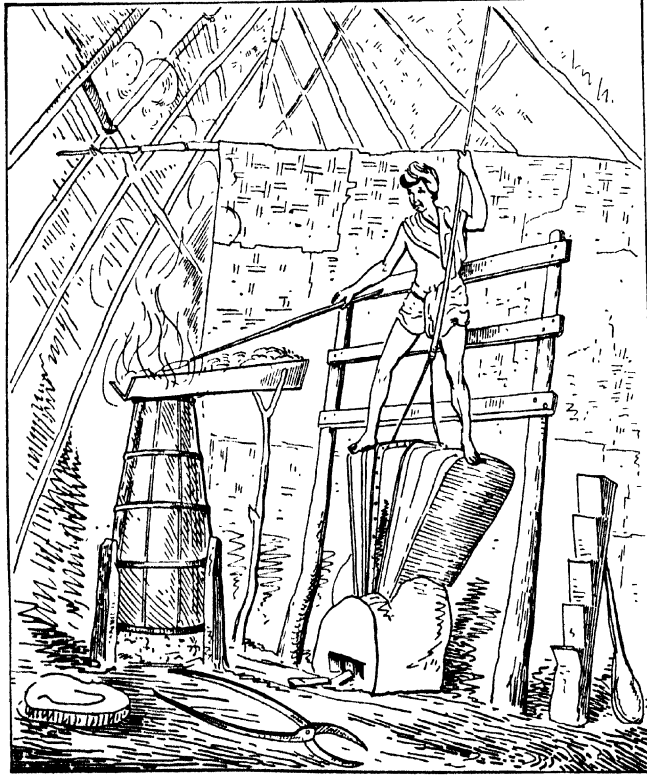
১৫। প্রাচীনকালে খাসিয়া পার্বত্যাঞ্চলে লৌহ-নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি বাত্যা-চুল্লী।

খাসিয়া পার্বত্যাঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল হইতে কি ধরনের বাত্যা-চুল্লীতে লৌহ উৎপন্ন হইত ক্র্যাক্রফ্‌ট্‌ তাহার এক সুন্দর নক্‌সা দিয়াছেন।* তাঁহার নক্‌সাটি ১৫নং চিত্রে প্রদত্ত হইল। চুল্লীটি মাটির কিছু নীচে বসানো; তাহার উপরে অগ্নিসহ মৃত্তিকার এক চোঙ বা চিমনি। চিমনিটি উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুট, নীচের দিকে ইহার ব্যাস দুই ফুটের মত। চিমনির উপরের মুখের কাছে একটি লম্বা বারকোষের মধ্যে কাঠকয়লা ও লৌহখনিজ মজুত থাকে; বারকোষটি এমন ভাবে

* W. Cracroft, 'Smelting of Iron in the Kasya Hills', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. I, 1832; p. 150-51.

রাখা যাহাতে অতি সহজে একটি লম্বা হাতা বা চামচের সাহায্যে কাঠকয়লা ও লৌহখনিজ চিমনির ভিতর দিয়া চুল্লীর মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। চিমনি হইতে প্রায় চার ফুট দূরে এক জোড়া হাপর বসানো; হাপর দুইটি নীচের দিকে একটি নলের সঙ্গে সংযুক্ত, আর এই নল মাটির মধ্য দিয়া সোজা চুল্লীর ভিতর পর্যন্ত গিয়াছে। হাপর চালাইয়া এই নলপথেই চুল্লীর মধ্যে বাতাসের ঝাপ্‌টা দেওয়া হয়। হাপর চালাইবার বিচিত্র ব্যবস্থাটিও বিশেষ লক্ষণীয়। এক ব্যক্তি হাপরদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া এবং ঘরের ছাদ হইতে ঝুলানো দড়ি এক হাতে ধরিয়া দুই পায়ে যুগপৎ হাপর দুইটিকে চালাইয়া থাকে; অন্য হাতে লম্বা হাতার সাহায্যে মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত সে চিমনির মধ্যে বারকোষস্থিত কাঠকয়লা ও লৌহখনিজ ঢালিয়া দেয়। সমগ্র ব্যবস্থাটি এইরূপ সুপরিকল্পিত যে, মাত্র একজন কারিগর বাত্যা-চুল্লীতে লৌহ-নিষ্কাশনের সমস্ত পর্যায় একা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিতে পারে। ১৫নং চিত্রে চুল্লী হইতে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড তুলিবার একটি সাঁড়াশি এবং পরে ইহাকে পিটাইবার জন্য একটি হাতুড়ি দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাত্যা-চুল্লীর ব্যবহার দেখা যায় মধ্যপ্রদেশে। চুল্লীগুলি চতুষ্কোণের আকারে ৮ হইতে ১০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হইত এবং প্রতিবারে ২ হইতে ২½ মণ লৌহ নিষ্কাশনে সমর্থ ছিল। রায়পুরে দুই প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটি চুল্লীর বিবরণ পাওয়া যায়। ১০ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর একটি গর্তের উপর চুল্লীর দুইটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়; প্রতিটি প্রকোষ্ঠের উচ্চতা ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪ ফুট ও ২½ ফুট। প্রতিবারে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে ৯½ মণ লৌহ এই চুল্লীতে উৎপন্ন হইত।

লৌহ শিল্পের জন্য বঙ্গদেশের বীরভূম জেলা এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই জেলার চুল্লীগুলি আকারেও ছিল অনেক বড় এবং ধাতু-নিষ্কাশনের দিক হইতেও ইহাদের কার্যকারিতা ছিল অনেক বেশী। বড় চুল্লীর উত্তাপের প্রাবল্যের ফলে গলিত অবস্থায় লৌহ উৎপন্ন হইত। ইউরোপে আধুনিক কালে puddling বা আলোড়ন পদ্ধতিতে যেমন ইস্পাত তৈয়ারী হয় অনেকটা সেইরূপ পদ্ধতিতে বীরভূমে এই সময় ইস্পাত প্রস্তুত হইত। বড় চুল্লীতে লৌহ গালাইবার সুবিধার জন্য বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে ইস্পাত প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এক একটি চুল্লীতে প্রতিবারে ২৫ মণ এবং সারা বৎসরে ৩৪ টন লৌহ উৎপন্ন হইত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের দেওচা ও অন্যান্য স্থানে প্রায় ৭০টি চুল্লী কার্যকরী ছিল; সুতরাং এই একটি মাত্র অঞ্চল হইতে বৎসরে প্রায় ২৪০০ টন লৌহ উৎপন্ন হইত।* অনুরূপ সময়ে (১৮৫৫) মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত লৌহশিল্পকেন্দ্র অমরপাণির ৮০টি চুল্লীতে বৎসরে উৎপন্ন হইত মাত্র ৪০ টন লৌহ। দরের দিক হইতেও বীরভূমের লৌহ বিক্রয় হইত ১৭৲ টাকায় ২৫ মণ, আর অমরপাণির লৌহ মণ প্রতি ১৲ টাকার কিছু বেশী।

বীরভূমে আলোড়ন পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চল, যেমন হায়দ্রাবাদের কোনাসমুদ্রম, মাদ্রাজের সালেম জেলা উৎকৃষ্ট ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এইসব অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে ইস্পাত প্রস্তুত হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড ও সেই সঙ্গে কিছু কাঠকয়লা মুষার মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর একটি সবুজ পত্র চাপা দিয়া মুষার মুখ মৃত্তিকার দ্বারা বন্ধ করা হইত। এইভাবে প্রস্তুত ২০ হইতে ২৪টি মুষা বাত্যা-চুল্লীর মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল রাখিলে মুষার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈয়ারী হয়। হায়দ্রাবাদের স্থানীয় অধিবাসীরা এই ইস্পাতের নাম দিয়াছিল 'উৎজ' বা 'ভুৎজ' (wootz)। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ও বিদেশে এই নামেই ভারতীয় ইস্পাত পরিচিত ছিল।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা প্রত্যেক ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী হইতে বিদেশে ভারতীয় ইস্পাতের খ্যাতি ও চাহিদার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরু আলেকজান্দারকে প্রায় ৩০ পাউণ্ড ওজনের ইস্পাত উপহার দিয়াছিলেন। পারস্যের রাজসভায় অবস্থানকালে

* Krishnan, *Iron Ores of India,* p. 33.

টিসিয়াস পারস্যরাজের নিকট হইতে ভারতীয় ইস্পাতের তৈয়ারী দুইটি তরবারি উপহার পান। আরিয়ান ভারতীয় ইস্পাতকে *sideros indicos* নামে উল্লেখ করিয়াছেন; এই ইস্পাত আবিসিনিয়ার বন্দরে আমদানি হইয়া সেখান হইতে মিশরের পথে ইউরোপে চালান যাইত। ইউরোপে ভারতীয় ইস্পাত রপ্তানির কথা *Periplus*-এও উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দামাস্কাস তরবারির ইস্পাত আসিত ভারতবর্ষ হইতে। ইস্পাহানের ব্যবসায়ীরা কোনা-সমুদ্রমের লৌহকারদের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট 'ভুৎজ' ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর এদেশে আগমন করিত। মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র তৈয়ারীর বিখ্যাত কারখানাগুলিতে দামাস্কাস তরবারি নির্মাণের একমাত্র উপাদান ছিল এই 'ভুৎজ'। স্যার জর্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন :—

> "Indian steel was celebrated from the earliest antiquity and the blades of Damascus which maintained their pre-eminence even after the blades of Toledo became celebrated, were in fact made of Indian iron. Ctesias mentions two wonderful Indian blades which were presented to him by the King of Persia and his mother. The *Ondanique* of Marco Polo's travels refers originally, as Col. Yule has shown, to Indian steel, the word being a corruption of the Persian *Hundwanty,* i.e., Indian steel. The same word found its way into Spanish in the shapes of *Alhinde* and *Alfinde* first with the meaning of steel and then of a steel mirror, and finally of the metal foil of a glass mirror. . . . Arrian mentions Indian steel '*Sideros indicos*' imported into Abyssinian ports."

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইউরোপ ভারতবর্ষের মত উৎকৃষ্ট লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী করিতে পারিত না। ডাঃ কৃষ্ণাণ লিখিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছুরি, কাটা, চামচ ইত্যাদি দ্রব্য নির্মাণের উপযোগী ইস্পাত ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত হইত না; অথচ এই জাতীয় ইস্পাত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংল্যাণ্ডে ব্রিটানিয়া টিউবুলার পুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ইংরেজ ইঞ্জিনীয়রগণ ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, এই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ভারতবর্ষই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পিছনে।

৩·৫। পরমাণুতত্ত্ব, বস্তুর গঠন ও বলবিদ্যা

চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, ধাতুনিষ্কাশনবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইতে ফলিত বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতীয়দের প্রতিভার ও অগ্রগামিতার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্তু ও পদার্থের সার্থক প্রয়োগের দ্বারা এদেশে এক অতি উচ্চ ও সুমহান সভ্যতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল সেই বস্তু ও পদার্থের স্বরূপ ও বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তাধারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, পদার্থ সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় আলোচনা প্রধানতঃ দর্শনের অন্তর্ভূত। এই বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাইতে হইলে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

একান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় দর্শন পদার্থ সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। বৈশেষিক-ন্যায়, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পরমাণুবাদ ও পরমাণুবাদের ভিত্তিতে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এমন কি বিশ্বসৃষ্টি ও তাহার বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদানের

প্রচেষ্টা, বস্তুর গুরুত্ব, গতি, বল ও তাহার কারণ, অভিকর্ষ, ধ্বনি ও ধ্বনি-সৃষ্টির কারণ ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ বস্তু ও পদার্থের অন্তর্নিহিত ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর এই ধরনের আলোচনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অর্থাৎ কি উপায়ে অগ্রসর হইলে বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় তাহার সুস্পষ্ট আভাস বর্তমান। বলা বাহুল্য, বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বীয় জ্ঞানের একটি বিস্তৃত পটভূমিকা তৈয়ারী না হইলে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে চিকিৎসা, রসায়ন, ধাতুনিষ্কাশন, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয়দের পক্ষে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হইত না। ইহার অভাবে গণিত পরিমিতির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত না, রসায়ন ও অন্যান্য ফলিত বিদ্যা পড়িয়া থাকিত নিম্নশ্রেণীর কারিগরিবিদ্যার স্তরে। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন :—

> "Apart from this rigorous scientific method, Hindu Chemistry, for example, would be all practical recipe, or all unverified speculation. This, however, would be a very inadequate and indeed erroneous view of this early achievement of the human mind. . . . the whole movement was genuinely and *positively* scientific, though arrested at an early age. . . ."*

গ্রীক ও ভারতীয় পরমাণুবাদের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন

পদার্থের মৌলিক উপাদান-তত্ত্ব ও পরমাণুবাদ এবং বস্তুর জরত্ব, গতি, বল ইত্যাদি পদার্থ-বিদ্যা সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানের বিশদ আলোচনা দেখা যায় বৈশেষিক-ন্যায় দর্শনে। বৌদ্ধরাও পদার্থের কণিকাবাদে বিশ্বাসী ছিল; জৈন দর্শনে বস্তুর পরমাণুবাদ আরও অনেক উন্নত। এ বিষয়ে ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা মিল পরিলক্ষিত হওয়ায় অনেক সময় এইসব মতবাদের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। চারি মৌলিক উপাদান ও পরমাণুতত্ত্ব গ্রীকরাই যে প্রথম উদ্ভাবন করে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ও লেখকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, আর্থার কাইথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি পরমাণুবাদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাধারার উপর গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব সমর্থন করিয়াছেন।† এইরূপ মত যে গ্রহণযোগ্য নহে ষড়দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রাচীনত্ব বিচার করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য সর্ববাদিসম্মত কোন একক মতে পৌঁছান এখনও সম্ভবপর হয় নাই। সাধারণভাবে গ্রাহ্য অভিমত অনুসারে ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক ও ন্যায় সূত্রের রচনাকাল প্রাচীনতম এবং সাংখ্য সূত্র রচিত হয় সব শেষে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিভিন্ন দার্শনিক সূত্র রচনার যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ.—বৈশেষিক ও ন্যায় সূত্র—প্রাক্-বৌদ্ধ যুগ, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে; পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত সূত্র—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০; যোগ সূত্র—খ্রীঃ পূঃ ১৪৭; সাংখ্য সূত্র—খ্রীষ্টাব্দ ৯০০।‡ অধ্যাপক কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী মনে করেন, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বৈশেষিক ও ন্যায় সূত্র শেষবারের মত প্রতিসংস্কৃত হয়,—প্রথমে বৈশেষিক সূত্র ও পরে ন্যায়। অধ্যাপক হিরিয়ন্ন পূর্ব-মীমাংসার রচনা-কাল নির্ধারণ করিয়াছেন আনুমানিক

* *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, p. 244.

† Arthur B. Keith, *Indian Logic and Atomism—An Exposition of the Nyāya and Vaiçesika Systems*, Oxford, 1921; p. 17-18.

‡ S. N. Das Gupta, *History of Indian Philosophy*, 5 vols., Cambridge.

২০০ খ্রীষ্টাব্দ, বেদান্ত সূত্রের ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ এবং সাংখ্য সূত্রের ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ।* বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, পদার্থের মৌলিক উপাদান ও পরমাণবিক তত্ত্বের আলোচনার দিক হইতে যেই দার্শনিক সূত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেই বৈশেষিক-ন্যায় সূত্রের সুপ্রাচীনত্ব এখন অধিকাংশ পণ্ডিত কর্তৃক স্বীকৃত।

গ্রীক দার্শনিকগণের মধ্যে এম্পিডক্লেসের (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪-৪৩৪) রচনায় প্রথম পদার্থের চারি মৌলিক উপাদান-তত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। অ্যারিষ্টটলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) হাতে এই তত্ত্ব আরও সম্প্রসারিত ও পরিবর্ধিত হয়। গ্রীক পরমাণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাস্ উভয়েই খ্রীষ্টপূর্বে পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের বৈজ্ঞানিক রচনার অসংলগ্ন কয়েকটি লাইন মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মতবাদের কথা জানা যায় প্রধানতঃ অ্যারিষ্টটল, এপিকিউরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪১-২৭০) ও লুক্রেটিয়াসের (খ্রীঃ পূঃ ৯৮-৫৫) রচনা হইতে। এপিকিউরাস্ এই পরমাণুবাদের ভিত্তির উপরই তাঁহার নামে সুপরিচিত এপিকিউরীয় দর্শনের কাঠামো রচনা করেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন এবং গ্রীসে ও আয়োনিয়ায় এম্পিডক্লেস্, লিউসিপ্পাস্, ডিমোক্রিটাস্, এপিকিউরাস প্রমুখ পরমাণুবাদী দার্শনিকগণের উপরিউক্ত কাল বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রায় সমসময়ে এই দুই বিভিন্ন অঞ্চলের একদল দার্শনিক পদার্থের উপাদান, বস্তুর গঠন ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে একভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে আয়োনিয়ায় ও ভারতবর্ষে স্বাধীনভাবে পরমাণুবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। তারপর বাহিরের স্থূল মিল বাদ দিলে পরমাণুদের ব্যবহার, পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার ক্ষমতা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় এই দুই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভেদও কিছুটা মতবাদদ্বয়ের স্বাধীন উৎপত্তির নির্দেশক।

কয়েকজন নৈয়ায়িক ভাষ্যকার

এই প্রসঙ্গে মূল বৈশেষিক-ন্যায় সূত্রের ভাষ্যকারদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মূল সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যকারদিগের প্রধান লক্ষ্য হইলেও এই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহারা অনেক সময় গভীর প্রজ্ঞা ও দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় ও নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। বৈশেষিক-ন্যায়ের ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রশস্তপাদ, বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহে'র রচয়িতা প্রশস্তপাদ ভাষ্য রচনা করিলেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীল দার্শনিক ছিলেন। তিনি কণাদের ১৭টি গুণের পরিবর্তে ২৪টি গুণের উল্লেখ করেন; তাঁহার রচনায় পরমাণুবাদের ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায়; এবং বর্ণবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দেন। প্রশস্তপাদ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন; কাইথের মতে তিনি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগের (৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্তী। বাৎস্যায়নের খ্যাতি 'ন্যায়ভাষ্যে'র রচয়িতা হিসাবে। 'ন্যায়ভাষ্য' প্রশস্তপাদের 'ভাষ্য' অপেক্ষা নিকৃষ্ট। দিঙনাগ তাঁহার রচনার উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি দিঙনাগের ও প্রশস্তপাদের পূর্ববর্তী। উদ্দ্যোতকর সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের সময় জীবিত ছিলেন এবং হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁহার প্রধান ভাষ্য-গ্রন্থ 'ন্যায়বার্ত্তিক'। বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাব্দীর একজন বহুমুখী ভাষ্যকার। 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ', 'ন্যায়সূত্রোদ্ধার' প্রভৃতি ভাষ্য ছাড়া তিনি উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়বার্ত্তিকে'র উপর

* R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, *The History and Culture of the Indian People,* Vol. II ; p. 477.

এক টীকা রচনা করেন। আনুমানিক ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'লক্ষণাবলী', 'কিরণাবলী' প্রভৃতি ভাষ্যের রচয়িতা হিসাবে উদয়ন খ্যাতি লাভ করেন। প্রশস্ত-পাদের উপর তাঁহার একটি ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য। উদয়ন বায়ুর ওজন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বায়ুর ওজনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। 'কিরণাবলী'তে বায়ুনিরূপণম্ অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আনুমানিক ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

বৌদ্ধ দর্শনে পরমাণুবাদ

বৌদ্ধ দর্শনে, বিশেষতঃ বৈভাষিক* ও সৌত্রান্তিক* বৌদ্ধ দার্শনিকগণের রচনায়, বস্তুর পরমাণুতত্ত্বের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা পদার্থের চারিটি প্রধান বা বিশেষ গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন; এই গুণ চতুষ্টয় হইল—ব্যাপ্তি, সংলগ্নতা, উত্তাপ ও চাপ। এ ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আরও চারিটি ধর্ম পদার্থের আছে, যেমন বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদ। পদার্থ মূলতঃ চারিপ্রকার—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু; প্রত্যেক ক্ষেত্রে পদার্থ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এই চারি প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের গুণ ও ধর্ম বিভিন্ন। ক্ষিতি-পরমাণুরা গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ ও স্পর্শ গুণের অধিকারী; এতদ্ভিন্ন ইহারা শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া থাকে। অপ-পরমাণুরা স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ ও সান্দ্রতা (viscosity) গুণের অধিকারী। তেজ-পরমাণুদের স্বধর্ম উত্তাপ; ইহারা বর্ণ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট। সবশেষে বায়ু-পরমাণুরা কেবল স্পর্শ গুণের অধিকারী, চাপ ইহাদের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমগুণবিশিষ্ট পরমাণুরা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক একটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

জৈন দর্শনে পরমাণুবাদ

জৈন দর্শনে পদার্থকে বলা হইয়াছে 'পুদ্গল'। পুদ্গলই শক্তির একমাত্র আধার। ইহা অবস্থান করে দুইভাবে—আণবিক অথবা যৌগিক অবস্থায়। অনু পুদ্গলের ক্ষুদ্রতম অংশ; ইহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, ইহা অবিভাজ্য, অনন্ত, অবিনশ্বর। জৈন গ্রন্থে অ্যাটম অর্থে অণু ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা এই শব্দটিকেই এখানে ব্যবহার করিলাম। জৈন সাহিত্যে একাধিক অণুর সংযোগে উৎপন্ন পুদ্গলের যৌগিক অবস্থার নাম 'স্কন্ধ'। দুই হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তসংখ্যক অণুর সংযোগে স্কন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে; দুই অণুবিশিষ্ট স্কন্ধ বা যৌগিকের নাম 'দ্ব্যণুক', অনন্তসংখ্যক অণুবিশিষ্ট স্কন্ধের নাম 'অনন্তাণুক'।

পদার্থ-সৃষ্টির আদিতে সর্বত্র পুদ্গলের একই অবস্থা ছিল এবং ইহা সমভাবে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। বিবর্তন সুরু হইলে ইহা ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার অণুতে পর্যবসিত হয় এবং পারস্পরিক ভেদ ও সংঘাতের বশে অণুরা মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার স্কন্ধ উৎপন্ন করে। আদিম অবস্থায় পুদ্গলের গুণাবলী অনির্ণেয় ছিল। বিবর্তন ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানা ধর্ম ও গুণ একে একে প্রকট হয়, যেমন স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ, কাঠিন্য, কোমলতা, গুরুত্ব, লঘুত্ব, উষ্ণতা, শীতলতা, রুক্ষতা, মসৃণতা, আয়তন, আকৃতি, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। আণবিক অবস্থায় স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, রুক্ষতা বা স্নিগ্ধতা, উষ্ণতা বা শীতলতা এই কয়েকটি গুণ পুদ্গলে অনুভূত হয়, অবশিষ্ট গুণাবলী পুদ্গলের যৌগিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য।

যৌগিক-সৃষ্টির ব্যাপারে অণুদের পারস্পরিক সংযুতির পশ্চাতে কিরূপ ধরনের বল কাজ করিয়া থাকে তাহার আলোচনা জৈন পরমাণুতত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব। অণুরা পরস্পরের সান্নিধ্যে

---

* বৌদ্ধদের মধ্যে চারিটি প্রধান দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত—(১) মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ, (২) যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ, (৩) সৌত্রান্তিক, এবং (৪) বৈভাষিক। প্রথম দুইটি মতবাদ মহাযান বৌদ্ধদার্শনিকগণ প্রচার করেন, শেষোক্ত দুইটির উদ্যোক্তা হীনযান বৌদ্ধগণ।

আসিলেই কি সংযুক্ত হয়? যদি বিশেষ কোন আকর্ষণবলে ইহারা সংযুক্ত হয়, তবে এই আকর্ষণের স্বরূপ কি? খ্যাতনামা জৈন দার্শনিক উমাস্বাতী (খৃষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথমার্ধে ইঁনি জীবিত ছিলেন) 'তত্ত্বার্থাধিগমে' এরূপ কয়েকটি অতি মৌলিক প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, কেবলমাত্র সংযোগের দ্বারা যৌগিক পদার্থের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নহে। যৌগিক উৎপন্ন হইবার পূর্বে দেখা যায়, যেন এক প্রকার অদৃশ্য শিকলের দ্বারা অণুরা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অণুরা এইভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিপরীতধর্মী দুইটি অণু,—যেমন একটির গুণ রুক্ষত্ব অপরটির স্নিগ্ধত্ব, সহজে এই ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গুণগুলি আবার সবসময় বিপরীতধর্মী হইলেই হয় না, ইহাদের যথেষ্ট প্রবল হওয়াও দরকার। বিপরীতধর্মী দুর্বল গুণ সংযুতির সহায়ক নয়। উমাস্বাতী আরও বলিয়াছেন, সমধর্মী দুইটি অণু সাধারণতঃ সংযুক্ত না হইলেও যখন একটি অণুর গুণ অপরটির অপেক্ষা দ্বিগুণ বা তাহারও বেশী প্রবল থাকে তখন সমধর্মী অণুরাও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সংযুক্ত হয়।

উমাস্বাতীর এই ব্যাখ্যার সহিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বার্জেলিয়াস্ (১৭৭৯-১৮৪৮) কর্তৃক প্রদত্ত পরমাণুর সংযোগে অণুর উদ্ভবের ব্যাখ্যার মিল লক্ষণীয়। বার্জেলিয়াস্ মনে করিতেন, প্রত্যেক পরমাণু হয় ধন তড়িদন্বিত নয় ঋণ তড়িদন্বিত। বিপরীত তড়িৎ বিশিষ্ট পরমাণুরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অণুর এবং এই অণুর সমন্বয়ে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে।

বৈশেষিক-ন্যায়ের পরমাণুবাদ ও রাসায়নিক সংযুতির ব্যাখ্যা

বৈশেষিক-ন্যায়ে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন চারিপ্রকার মৌলিক পরমাণুর কথা বলা হইয়াছে। ইহারা হইল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু পরমাণু; অর্থাৎ চারি ভূত বা মৌলিক পদার্থের জন্য চারিপ্রকার পরমাণু। আকাশের (মরুৎ) কোন পরমাণবিক গঠন হয় না, ইহা নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয়। রাসায়নিক সংযুতি বা বিশ্লেষণের ব্যাপারে চারি ভূতের চারিপ্রকার পরমাণুরাই কেবল অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরমাণুরা অদৃশ্য, অবিভাজ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—ভূতের সর্বশেষ অবস্থা: ইহারা অনন্ত, অবিনশ্বর ও সর্বদা গতিশীল; এই গতির স্বরূপ আবর্তন অথবা পরিস্পন্দন। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর, ওজন, প্লাবিতা, সান্দ্রতা, বেগ ইত্যাদি কতকগুলি মৌলিক গুণ পরমাণুতে বর্তমান। এছাড়া অন্যান্য যেসব গুণ পদার্থের মধ্যে দেখা যায়, তাহা উত্তাপের প্রভাবে রাসায়নিক সংযুতির কালে আত্মপ্রকাশ করে।

একমাত্র বায়ু-পরমাণু ছাড়া আর সব পরমাণু সংযুক্তভাবে অবস্থান করে। পরমাণুরা কিভাবে সংযুক্ত হয়, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এবিষয়ে বৈশেষিক-ন্যায়ে দুইটি ভিন্ন মতের আলোচনা দেখা যায়। প্রথম মত অনুযায়ী পরমাণুরা দুই, তিন, চার অথবা আরও বেশী সংখ্যায় সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, চতুরণুক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অণুর সৃষ্টি করে। উৎপল ও শ্রীধরের ভাষ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী পরমাণুরা তাহাদের স্বাভাবিক আবর্তন অথবা পরিস্পন্দন গতি-প্রভাবে আপনা হইতে এক এক জোড়ায় মিলিত হয়, অর্থাৎ দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে। এইভাবে উৎপন্ন দ্ব্যণুকে অবশ্য পরমাণুর সকল মৌলিক গুণ অব্যাহত থাকে। এইবার এই দ্ব্যণুকরা তিন বা ততোধিক সংখ্যায় মিলিত হইলে ত্র্যণুক, চতুরণুক ইত্যাদি বড় বড় অণু উৎপন্ন হয়। সুতরাং একটি ত্র্যণুক আসলে তিনটি দ্ব্যণুকের অর্থাৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগে গঠিত, একটি চতুরণুকে আটটি পরমাণু থাকে, ইত্যাদি। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদ এই দ্বিতীয় অভিমত প্রথম প্রস্তাব করিয়া থাকিবেন।

একাধিক দ্ব্যণুকের সমন্বয়ে বড় বড় অণু-সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রশস্তপাদ একই ভূতের অন্তর্গত বিচিত্র গুণসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তির এক অতি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংখ্যায় দ্ব্যণুকের রাসায়নিক সংযুতির ফলে বড় বড় অণু সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন দ্রব্যাদিরও উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ একই ভূতের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে

গুণ ও ধর্মের যে প্রভেদ দেখা যায়, তাহার মূল কারণ বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন আয়তনের অণুর সমন্বয়ে উদ্ভূত,—কোন দ্রব্য ত্র্যণুকের সমষ্টি, কোন দ্রব্য চতুরণুকের দ্বারা গঠিত, ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন, অণুর আয়তনের (সংখ্যার) প্রভেদের জন্য কিরূপে দ্রব্যের গুণাবলীর পার্থক্য ঘটিয়া থাকে? বৈশেষিকে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এইরূপ : প্রথমে উত্তাপের প্রভাবে অর্থাৎ তেজ-পরমাণুর সংঘাতে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি অণুরা পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর তেজ-পরমাণুর ক্রমাগত সংঘাতে উপরিউক্ত পরমাণুদের গুণ অল্প-বিস্তর বদলাইয়া যায়। এইভাবে গুণের পরিবর্তনের পর পরমাণুরা আবার সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদিতে পর্যবসিত হইলে যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহাদের গুণেরও অনুরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে।* ন্যায় দর্শনের ব্যাখ্যা অনেকটা এইরূপ হইলেও উত্তাপের প্রভাবে দ্ব্যণুকদের প্রথমে পরমাণুতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার প্রয়োজনীয়তা ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। উত্তাপের প্রভাবে বড় বড় অণু তৈয়ারী হইবার সময়ই যে ইহাদের গুণ ও ধর্মের পরিবর্তন ঘটে, সহজভাবে এই কথা ন্যায় দর্শনে বলা হইয়াছে।

বৈশেষিক-ন্যায়ে রাসায়নিক সংযুতিকে বলা হইয়াছে 'সম্ভূয়ক্রিয়া' বা 'সংহতক্রিয়া'। অণু-পরমাণুর বিভিন্ন সংযুতির ফলে একই ভূতের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্রব্যের উদ্ভবের যে পদ্ধতি আমরা আলোচনা করিলাম, প্রায় সেই একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা সম্ভূয়-ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। একভৌতিক যৌগিকের (mono-bhautic compound) উৎপাদন এইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একটি সহজ দৃষ্টান্ত। এক ভূতের অন্তর্ভুক্ত দুই বা ততোধিক দ্রব্য রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মিলিত হইলে একভৌতিক যৌগিকের উদ্ভব হয়। এইরূপ দুইটি দ্রব্য রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলে উত্তাপের প্রভাবে প্রথমে দ্রব্য দুইটির অণুরা পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়। এই বিশ্লেষণের সময় উভয় দ্রব্যই তাহাদের বিশিষ্ট গুণ ও ধর্ম হারাইয়া ফেলে। পরবর্তী পর্যায়ে উত্তাপের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট পরমাণুরা নূতন গুণ লাভ করিলে ধীরে ধীরে তাহারা আবার যুক্ত হইয়া প্রথমে দ্ব্যণুকে ও পরে দ্ব্যণুকের সমন্বয়ে বড় বড় অণুতে দানা বাঁধে। দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইবার সময় উভয় দ্রব্যের একটি করিয়া পরমাণু পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়, ভাষ্যকাররা সাধারণতঃ একথা বলিয়াছেন। ইহা নিরর্থক, কারণ পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হইবার সময় উভয় দ্রব্যই তাহাদের পূর্ব গুণ হারাইয়া ফেলে। নূতন উৎপন্ন যৌগিকের গুণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উত্তাপের তীব্রতা ও সমগ্র প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বের উপর।

সর্বপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় উত্তাপের অপরিহার্যতা বিশেষ লক্ষণীয়। উত্তাপের মধ্যস্থতা ছাড়া কোনরূপ রাসায়নিক সংযোগ বা বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। কোন কোন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বাহির হইতে উত্তাপের প্রয়োগ দরকার হয় না। বাৎস্যায়ন দেখাইয়াছেন, দ্রব্যের অন্তর্নিহিত উত্তাপ এই জাতীয় প্রক্রিয়া সম্ভবপর করিয়া থাকে। কাষ্ঠখণ্ড দাহ্য হইবার সময় কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত লীন উত্তাপ (latent heat) ছাড়া পাইয়া অগ্নির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে উদয়নের একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, পৃথিবীতে বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন তাহার উৎস সূর্য। এই সৌর উত্তাপই পদার্থের মধ্যে নানাভাবে সঞ্চিত হইয়া আছে।

প্রাচীন হিন্দুদের বলবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান

বৈশেষিক-ন্যায়ের পরমাণুবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে পরমাণুদের আবর্তন ও পরি-স্পন্দন গতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পদার্থের গতি, এই গতির স্বরূপ, কারণ ইত্যাদি

---

* 'The Vaiśeshika holds that there is decomposition into homogeneous atoms, transformation of atomic qualities, and finally recombination, all under the influence of heat,"—Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus,* p. 102-3.

প্রশ্ন পরমাণুতত্ত্বের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এজন্য বৈশেষিক-ন্যায় সূত্রে ও তাহার বিভিন্ন ভাষ্যে গতির আলোচনা যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রশস্তপাদ তাঁহার 'ভাষ্যে' 'কর্মগ্রন্থ' নামে একটি সমগ্র অধ্যায়ে শুধু বস্তুর গতির কথাই আলোচনা করিয়াছেন। 'কর্ম' শব্দের অর্থ গতি। বস্তুর যে অবস্থার জন্য ইহার স্থান-পরিবর্তন সম্ভবপর হয় তাহাই গতি। বিশেষ ক্ষণে সংঘটিত বস্তুর গতির নাম 'ক্ষণিক গতি' (instantaneous motion)। প্রশস্তপাদ বলেন, বিশেষ একটি ক্ষণে একই বস্তুর কেবলমাত্র একটি গতিই হইতে পারে—'একদা একস্মিন্ দ্রব্যে একমেব কর্ম্ম বর্ত্ততে'।

সব সময়ই গতির কোন না কোন একটি বিশেষ দিক থাকে। যে গতিতে বস্তুর স্থান-পরিবর্তন বরাবর একই দিকে অর্থাৎ সরল রেখায় সংঘটিত হয় তাহা সরলগামী গতি (rectilinear motion)। উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি সরলগামী গতির দৃষ্টান্ত। ইহার অন্যথা ঘটিলে অর্থাৎ গতির দিক পরিবর্তন হইতে থাকিলে সেই গতিকে বলা হয় 'গমন' (curvilinear motion)। 'ভ্রমণ (rotatory motion), স্পন্দন (vibratory motion) ইত্যাদি এই জাতীয় গতি।

বিবিধ কারণে বস্তু গতিশীল হয়; এজন্য বস্তুর গতিও বহুপ্রকার। এই কারণগুলিকে প্রধানতঃ দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অন্য বস্তুর সংস্পর্শ অপরিহার্য, অর্থাৎ একটি বস্তুকে গতিশীল হইতে হইলে অপর একটি বস্তুর সহিত তাহার সংযোগ স্থাপিত হওয়া দরকার। নোদন, অভিঘাত, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি কারণ প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নোদনের অর্থ চাপ। এক বস্তু যখন অপর একটি বস্তুকে চাপ দেয়, অর্থাৎ ইহাকে টানে বা ঠেলে, তখন গতির সৃষ্টি হয়। ধনুকের ছিলার চাপেই তীর সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়; ধূলিরাশি, মেঘ ও পালতোলা নৌকায় গতি-সঞ্চারের কারণ বায়ুর চাপ বা প্রবাহ। অভিঘাত (impact) হইল এক বস্তুর উপর আর এক বস্তুর আঘাত; ইহাতে ক্ষণিকের জন্য বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং গতি সৃষ্টির জন্য তাহাই যথেষ্ট। দণ্ডাঘাতে কুম্ভকারের চাকায় যে আবর্তের সৃষ্টি হয় তাহা অভিঘাতজনিত গতির দৃষ্টান্ত।

বস্তুকে গতিশীল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কারণগুলিতে অন্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শ দরকার হয় না। প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও অদৃষ্ট এজাতীয় কয়েকটি প্রধান কারণ। প্রাণিদেহের গতি, যেমন হস্তসঞ্চালন, প্রযত্ন (volition) হইতে উদ্ভূত। গাছ হইতে পাতা পড়া, অর্থাৎ ভারী বস্তুর উপর হইতে নীচে পড়ার কারণ গুরুত্ব (gravity)। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর তাঁহাদের জ্যোতিষীয় গ্রন্থে এজাতীয় পতনের কারণ যে বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ, এরূপ কথা বলিয়াছেন।* ঢালু ক্ষেত্রের উপর তরল পদার্থের নিম্নগামী গতির কারণ দ্রবত্ব (fluidity)। এই দ্রবত্ব সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। দ্রবত্ব তরল পদার্থের পরমাণুদের স্বাভাবিক ধর্ম, এরূপ কথা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্কর মিশ্র তাঁহার বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, এজাতীয় গতির আসল কারণ বা নিমিত্তকারণ হইল গুরুত্ব। এছাড়া বস্তুর আরও কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের গতি দেখা যায়, যেমন বাষ্পীভবনের ফলে জলকণার ঊর্ধ্বমুখী গতি, চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের গতি, সরু নলের মধ্যে (তলটানের প্রভাবে) তরল পদার্থের ঊর্ধ্বমুখী গতি, ইত্যাদি। এইসব গতির কোন প্রত্যক্ষ কারণ দর্শানো কঠিন। তাই এই কারণগুলিকে বলা হইয়াছে 'অদৃষ্ট'।

আমরা এখন জানি, বল (force) গতিসৃষ্টির কারণ এবং ইহার জন্য গতির ত্বরণ

---

* "Movement as of a falling body. This is caused by gravity (গুরুত্ব), which in the astronomical treatises of Āryabhata, Brahmagupta, and Bhāskara is ascribed to the attraction (আকর্ষণ, pulling force) exercised by the earth on a material body."—Seal, *Positive Sciences of the Ancient Hindus,* p. 131-32.

(acceleration) হইয়া থাকে। বল ও ত্বরণের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে আধুনিক বলবিদ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ভরবেগ (momentum) ব্যবহৃত হয়। গতিশীল বস্তুর ভর (mass) ও বেগের (velocity) গুণফল এই ভরবেগ। বস্তুর উপর বল প্রয়োগ হইতে থাকিলে এই ভরবেগেরই ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে এবং যেহেতু বস্তুর ভর নির্দিষ্ট, তাহার বেগই ত্বরিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন তাঁহার বিখ্যাত সূত্রগুলির মধ্য দিয়া বল ও গতি সংক্রান্ত এই মৌলিক সত্যই ব্যক্ত করেন। বলই যে ত্বরণের কারণ, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অবশ্য প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও।

বৈশেষিক-ন্যায়ে প্রদত্ত বলের প্রকারভেদ ও ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বল গতিসৃষ্টির কারণ এই সত্য হিন্দুরা বেশ প্রাচীন কাল হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিল। এমন কি গুরুত্বের কারণ যে পৃথিবীর আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণের জন্যই ভারী বস্তু উপর হইতে নীচে পড়ে, এই আবিষ্কারও হিন্দুদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে ত্বরণের স্বরূপ কি, বল হইতে ত্বরণের উদ্ভব হয় কিনা, এ সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভরবেগ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা নৈয়ায়িকদের ব্যবহৃত 'বেগ' শব্দটির মধ্যে পাওয়া যায়। বেগ শব্দের দ্বারা এখন আমরা একটি নির্দিষ্ট দিকে গতির হার বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকে ইহার অর্থ ছিল ভিন্নরূপ। ইহার দ্বারা গতিশীল বস্তুর এক বিশেষ সংস্কারকে বুঝানো হইয়াছে; বস্তু একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে এই সংস্কারবশে ইহা গতিশীল অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করে। বাধা পাইলে অর্থাৎ বিপরীতমুখী কোন বল বস্তুর উপর কাজ করিলে এই সংস্কার ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত বস্তুর অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। তীর নিক্ষিপ্ত হইলে ছিলার চাপে প্রথমে ইহা গতিশীল হয় এবং সেই সঙ্গে ইহাতে এক সংস্কার বা বেগের সঞ্চার হয়। ক্রমাগত বাতাসের বাধা পাইয়া এই সংস্কার মন্দীভূত হইয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইলে গুরুত্বের টানে তীরটি ভূপতিত হয়।

উপর হইতে নীচে পড়িবার সময় বস্তুর গতি কিরূপ হইয়া থাকে ন্যায়-বৈশেষিকের সে আলোচনাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুটি পড়িতে সুরু করিবার প্রথম মুহূর্তে গুরুত্বের টানে ইহাতে গতির সঞ্চার হয়। গতির সঞ্চার হইলেই বস্তুটি বেগ বা সংস্কার প্রাপ্ত হয় এবং এই সংস্কারবশে ইহা পড়িতে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রথম মুহূর্তে একবার শুধু গতি সঞ্চার করিয়াই তাহার কাজ শেষ করে না, ইহা বস্তুটি মাটিতে না পড়া পর্যন্ত বরাবর ইহার উপর কাজ করিয়া যায়। ফলে দ্বিতীয় মুহূর্ত হইতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একযোগে গুরুত্ব ও সংস্কারের প্রভাবে বস্তুটি বেগবান থাকে, অর্থাৎ ইহার গতি এই দ্বিবিধ কারণের মিলিত ফল। গুরুত্ব ও সংস্কারের সংযোগে বস্তুর গতি ক্রমশঃ ত্বরিত হয় কিনা সে বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ অবশ্য নির্বাক; সম্ভবতঃ এ প্রশ্ন তাঁহাদের মনে আদৌ জাগে নাই। তবে এজাতীয় আলোচনার দ্বারা ত্বরণের স্বরূপ এবং বল ও ত্বরণের সম্পর্ক আবিষ্কার করিবার পথ তাহারা যে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলবিদ্যার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের আবিষ্কার গ্যালিলিওর প্রতিভায় সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির সার্থক সমন্বয় ও সহযোগিতা। গ্যালিলিও বস্তুর গতি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল হাতে কলমে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া অতীব মূল্যবান সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ এইরূপ পরীক্ষার ধার দিয়াও যান নাই, শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও স্বজ্ঞার দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে বেদোত্তর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের তৎপরতার একটা মোটামুটি পরিচয় উপরিউক্ত আলোচনা হইতে পাওয়া যাইবে। গুপ্ত ও উত্তর-গুপ্ত যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে এই চর্চার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। গুপ্তযুগের প্রথমভাগেই সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ রচিত হয়; আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্গণ এই সময় আবির্ভূত হন। নাগার্জুন, বাগভট, নাবনীতকের রচয়িতা, মাধবকর, বৃন্দ ও অন্যান্য খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানিগণের তৎপরতায় ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মান আরও উন্নীত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার এই ঊর্ধ্বমুখী গতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের প্রাধান্য লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের অধোগতিও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই নিষ্ক্রিয়তার সূত্রপাত;* ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের নূতন কোন অবদানের কথা আর শুনা যায় না।

এই অধঃপতনের কারণ-বিশ্লেষণ সহজ নহে। নানা রাজনৈতিক গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা ও শেষ পর্যন্ত বিদেশী আক্রমণকারীদের নিকট বশ্যতা-স্বীকার, কারিগরিবিদ্যার অমর্যাদা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এরূপ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, সে কথা সাধারণভাবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। অর্থাৎ যেসব মৌলিক কারণে যুগে যুগে সর্ব দেশে উচ্চতর মননশীলতার পথ রুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে, প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব হইয়াছে, অল্প-বিস্তর সেইসব কারণে ভারতবর্ষের জ্ঞান-চর্চাতেও ছেদ পড়িয়াছিল।

* "Hindu activity was also at a standstill (2nd half of the ninth century). Was this due to the eclipse of Buddhism and Jaina progress?" —Sarton, *Introduction to the History of Science*, vol. I; p. 589.

আরব্য বিজ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

৪·১। আরব্য বিজ্ঞানের পটভূমিকা — আরবদের অভ্যুত্থানের পূর্বে নেস্টোরীয়, মনোফিজাইট প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্মসম্প্রদায়ের জ্ঞান-চর্চা

আরব জাতির রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এবং সাধারণভাবে মানব-সভ্যতার উন্নয়নে এই জাতির বিরাট অবদান রীতিমত বিস্ময়কর। একেশ্বরবাদের মন্ত্রশক্তিবলে প্রবুদ্ধ শুষ্ক মরুভূমির ছন্নছাড়া ক্ষুধার্থ বেদুইন আরবদের ঐক্যবদ্ধ পরাক্রমশালী জাতিরূপে পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সহসা আবির্ভাব ও প্রধান ভূমিকা গ্রহণের ইতিহাস বাস্তবিকই চমকপ্রদ। তেমনই বিস্ময়কর তাহাদের অত্যল্পকালের মধ্যে মরুভূমির আদিম বর্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণের বিচিত্র ইতিহাস। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয় এক বৈপ্লবিক ঘটনা, এক বিরাট বিস্ফোরণ বিশেষ। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদের উদাত্ত বাণীতে জাগ্রত অল্প সংখ্যক আরব্য মুসলমানদের যুগান্তকারী কার্যকলাপ আমরা আরবদেশের কয়েকটি নগণ্য সহরে সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস মহম্মদের হিজরা বা মক্কা হইতে মদিনা যাত্রার তারিখ। এই ঘটনার মাত্র ১৭ বৎসরের মধ্যেই ইসলামধর্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটে। খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটিতে লাগিয়াছিল পাঁচ শত হইতে এক হাজার বৎসর!

এই বিস্ফোরণের ব্যাপার প্রথমে কেহ বিশ্বাস করে নাই। বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা মহম্মদের আবির্ভাব ও বৈপ্লবিক প্রচারকার্যের কথা লোকমুখে শুনিলেও বর্বর আরবদের ধর্মান্দোলনকে উপেক্ষা করিয়াছিল, অথবা ইহার গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অচিরে ভুল ভাঙ্গিল। দেখিতে দেখিতে এই ক্ষুদ্র জলস্রোতের ভৈরব মূর্তি আত্মপ্রকাশ করিল। ইসলামের মহাপ্লাবনের মুখে পুরাতন রোমক, পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু বনিয়াদ ধসিয়া তলাইয়া গেল। আরবদের সামরিক সম্প্রসারণের ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। তবে কিরূপ দ্রুতগতিতে ইসলামের এই সম্প্রসারণ সাধিত হইয়াছিল তাহা কয়েকটি তারিখ হইতে প্রতীয়মান হইবে। মার্চ, ৬৩৫—দামাস্কাসের পতন; জানুয়ারী, ৬৩৭—জেরুজালেমের পতন; মার্চ, ৬৩৭—পারস্যের রাজধানী আল্-মাদাইনের পতন; ৬৩৮—মেসোপোটেমিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল আরবদের অধিকৃত; ৬৪০-৪১—আরবসাম্রাজ্যে মিশরের অন্তর্ভুক্তি; ৬৪২-৪৩—আরবদের পারস্য-বিজয় সম্পূর্ণ। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ মহম্মদের মৃত্যুর ১১৮ বৎসর পরের ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে পশ্চিমে স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত প্রাচীন পৃথিবীর বিস্তীর্ণ লোকালয়ের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়া ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান।

আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে এই সাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাজনৈতিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এমন কথা বলা চলে না বটে, কিন্তু এক ধর্ম ও কৃষ্টির অনিবার্য আকর্ষণে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতিরা আপনা হইতেই যে একরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে এক প্রকার জাতীয়তাবোধও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সৌভ্রাত্র ও জাতীয়তাবোধের উৎস মক্কা। বাগদাদ এই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরূপ

এইখানে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরবদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ আরবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা বুঝাইবে না। ইসলামের ভিত্তিতে আরবরা এক নূতন সভ্যতার ও কৃষ্টির এবং এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতি, এমন কি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় এই সভ্যতা ও কৃষ্টির ছায়ায় বাস করিয়া নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার দ্বারা এই সভ্যতাকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছিল। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য বা সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় প্রকৃতপক্ষে তাহা এইসব বিভিন্ন জাতির ও ধর্মসম্প্রদায়ের মিলিত সাধনার ফল। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আল্-খোয়ারিজ্মি ছিলেন খিভার অধিবাসী; আল্-ফার্ঘানির জন্মভূমি ছিল ট্রান্স্-অক্সানিয়ায়; আল্-ফাজারি, আবুল ওয়েফা, আল্-বাত্তানি ও ওমর খৈয়ামের দেশ পারস্য; প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক ফারাবি ছিলেন তুর্ক; আভেরস্ ও আর্জাচেল উভয়ই ছিলেন স্পেনদেশীয় 'আরব'; আবার আল্-কিন্দি, কাদি আবু ইউসুফ, ইব্‌ন্ ইশাক, খালিল ইব্‌ন্ আহ্মদ ছিলেন খাঁটী আরব। ধর্মের দিক হইতে দেখিলে হুনায়েন ইব্‌ন্ ইশাক, কুস্তা ইব্‌ন্ লুকা প্রমুখ অনুবাদকেরা ছিলেন খৃীষ্টান; গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ থাবিত ইব্‌ন্ কুরা ও আল্-বাত্তানি ছিলেন নক্ষত্রের উপাসক প্রাচীন সাবীয় ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত; জ্যোতির্বিদ্ মাশা আল্লাহ্ ছিলেন মিশরীয় ইহুদী।
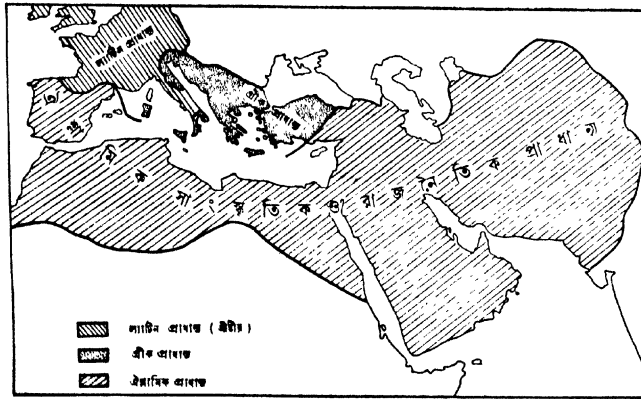
১৬। ঐস্লামিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ আন্তর্জাতিকতা মধ্যযুগে আরব-প্রাধান্যের এক প্রধান কারণ। আব্বাসীয় খলিফাদের সভায় পারসীক, ইহুদী ও নেষ্টোরীয় খৃীষ্টান পণ্ডিতগণ সম্মান মর্যাদা পাইতেন। অবশ্য পারসীকদের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। ইরাণীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার ফলে আরবরা সৌন্দর্যপ্রিয়তা, মননশীলতা, উচ্চতর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ইত্যাদি নানা গুণ যে অর্জন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পারসীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরবদের

একরূপ সম্পূর্ণভাবেই জয় করিয়াছিল একথা অতিশয়োক্তি নহে। এই ব্যাপার অনেকাংশে গ্রীক সভ্যতার নিকট বিজয়ী রোমকদের বশ্যতা স্বীকারের সঙ্গে তুলনীয়। বিজ্ঞানের বেলায় ইহা খুবই সত্য। আরব্য বিজ্ঞানকে যাঁহারা পুষ্ট ও বিশ্ববিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন তাঁহারা অধিকাংশই আসিয়াছিলেন পারস্য হইতে। জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক নূতন সভ্যতার স্থপতি হিসাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং এই সভ্যতার প্রধান বাহক হিসাবে প্রত্যেকেই আরবী ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এক পারসী বৈয়াকরণ। এই অন্তর্নিহিত স্বাজাতিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উৎস ছিল ইসলাম ধর্ম। অধ্যাপক সার্টন লিখিয়াছেন :—

> "The great racial and cultural complexity of Islam, even in those early days, is a very curious spectacle. How strong must the religious bond have been to keep together such disparate elements."

ইসলাম সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ইহার দ্বারা এক বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক বিপ্লব সূচিত হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, জরাজীর্ণ, অচল ও মুমূর্ষু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে মানবাধিকারের ভিত্তিতে যে স্বাধীন ও সুস্থ জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনীয়তা ইসলাম তুলিয়া ধরিয়াছিল, আরবদের জয়যাত্রার ইহাই ছিল মূল কারণ। কেবল তরবারির জোরে আরবদের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শুধু আরব সৈন্যের ভয়ে স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের বীর জাতিরা আরবদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার মত ভুল আর কিছুতে হইতে পারে না।

ইসলামের উর্বর সামাজিক মৃত্তিকায় বিজ্ঞান নূতনরূপে অঙ্কুরিত হইল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের যে দুর্দিন ও অধোগতি দেখা দিয়াছিল, আরবদের অভ্যুত্থানে সে দুর্দিনের অবসান ঘটিল। একদিন এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোম বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে উচ্চ আদর্শ ও গৌরবের জন্য পৃথিবীর সুধিবৃন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র বাগদাদ, টলেডো, করডোভা সেই আদর্শ ও গৌরবের যোগ্য উত্তরাধিকার লাভ করে।

আরব্য বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণার উৎস

আরবদের পূর্বে রোমক ও পারসীকদের মত এবং রোমক ও পারসীকদেরও পূর্বে গ্রীকদের মত আরবদের বিজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল পূর্ববর্তী প্রাচীনতর জাতিদের কাছে। একদিকে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার ইহুদী এবং খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখাসম্প্রদায়ভুক্ত নেষ্টোরীয় ও মনোফিজাইট পণ্ডিতগণ এবং অন্যদিকে পারসীক ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে আরবদের আদি গুরু। ইহুদী, নেষ্টোরীয় ও মনোফিজাইট পণ্ডিতদের তৎপরতায় গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য আরবদের নিকট প্রথম উন্মুক্ত হয়; ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রথমে পারসীক ও পরে ভারতীয় পণ্ডিতরা নিজেরাই আরবদের মধ্যে প্রচার করে। এই শেষোক্ত তৎপরতা সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এইসব বিদেশী পণ্ডিত গ্রীক ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাজি আরবী ভাষায় তর্জমা করিয়া আরবদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চা, এমন কি সর্ব বিষয়ে উচ্চতর মননশীলতার পথ সুগম করে। এই প্রাথমিক শিক্ষানবিসির পর্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরব্য প্রতিভার

আশ্চর্য বিকাশ লক্ষ্য করি। জাবির ইব্‌ন্ হাইয়ান, আল্-রাজি, আল্-কিন্দি, আল্-হাজেন, আভিসেনা, আল্-খোয়ারিজ্‌মি, আল্-বাত্তানি, আল্-বীরূণী, ওমর খৈয়াম প্রমুখ প্রথিতযশা আরব্য রাসায়নিক, চিকিৎসাবিদ্, পদার্থবিদ্, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের আবির্ভাবের মূলে রহিয়াছে এই নেস্টোরীয়, ইহুদী ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। আরব্য বিজ্ঞানের ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ নেস্টোরীয়, মনোফিজাইট ও ইহুদী পণ্ডিতগণের কার্যকলাপ এবং আরবদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিম এসিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

আমরা দেখিয়াছি, খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন ও ডায়োফ্যান্টাসের পর হইতে গ্রীক বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার আর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পর যে দুই-চারিজন বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন টীকাকার বা সমালোচক মাত্র। এই টীকাকার ও সমালোচকগণ হিপোক্রেটিস্, অ্যারিষ্টটল, আর্কিমিডিস্, গ্যালেন, টলেমী প্রমুখ প্রাচীন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের গ্রন্থরাজির বহু প্রতিলিপি প্রণয়ন করেন এবং সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নানা ভাষ্য ও টীকাও রচিত হয়। ২০০ খ্রীষ্টাব্দে লাইসিয়ামের অধ্যক্ষ আলেকজান্দার অব আফ্রোডিসিয়াস্ অ্যারিষ্টটলের শিক্ষা ও আদর্শের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পেরিপ্যাটেটিক বিদ্যাপীঠের সঙ্কলিত নানা গ্রন্থের পরিশ্রমসাধ্য এক বিরাট ভাষ্য রচনা করেন। অ্যারিষ্টটলীয় মতবাদের বহুল প্রচারের ব্যাপারে আলেকজান্দ্রীয় পণ্ডিত জোহানেস্ ফিলোপোনাসের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্যাল্‌সিডিয়াস্ প্লেটোর *Timaeus*-এর এক ল্যাটিন ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মধ্যযুগে এই ল্যাটিন ভাষ্যই ছিল প্লেটো সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এবং ইহা হইতেই নানারূপ উদ্ভট ও অলীক মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে প্লেটোর একাডেমীর অধ্যাপক বিখ্যাত দার্শনিক প্রোক্লাস সাধারণভাবে বিদ্যোৎসাহিতা ও বিজ্ঞান-চর্চার আবহাওয়া বজায় রাখিতে কিছুদিন চেষ্টা করেন। সেইরূপ হিপোক্রেটীয় ও গ্যালেনীয় গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ও প্রতিপত্তি আমিডার এটিয়াস্ (আনুমানিক ৫৫০), ঈজীনার পল (আনুমানিক ৬২৫), কনস্তান্তিনোপলের থিওফিলাস প্রোটোস্‌পাথারিয়াস্ (আনুমানিক ৬৪০) প্রমুখ চিকিৎসাবিদ্‌গণের চেষ্টায় অব্যাহত থাকে। আলেকজান্দ্রিয়ার পরবর্তীকালের চিকিৎসকগণও সাধারণ বিদ্যার্থীর পাঠের উপযুক্ত হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

এইভাবে বাইজান্‌টাইন ও আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক পণ্ডিতগণ সামগ্রিকভাবে বিদ্যাচর্চার একটা পরিবেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেও বহু কারণে আরবরা বাইজান্‌টাইন জগৎ ও আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবর্তে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের অন্তর্গত এডেসা, নিসিবিস্, জুন্ডিশাপুর প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করে। আরবদের অভ্যুত্থানের কিছু পূর্বে গোঁড়া খ্রীষ্টানদের প্ররোচনায় বাইজান্‌টাইন হইতে বিতাড়িত খ্রীষ্টধর্মের কয়েকটি শাখাসম্প্রদায়ভুক্ত নেস্টোরীয় ও মনোফিজাইট পণ্ডিতগণ এইসব অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার, বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার, কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রতিকূল নানা রাজনৈতিক অবস্থা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও এই পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথিপত্র সযত্নে রক্ষা করেন। এডেসা, নিসিবিস, জুন্ডিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নেস্টোরীয় ও মনোফিজাইট পণ্ডিতগণই বলিতে গেলে আরবদের আদি ও প্রধান শিক্ষক।

নেস্টোরীয়, মনোফিজাইট প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্মসম্প্রদায়ের জ্ঞান-চর্চা

নেস্টোরিয়াস্ ও নেস্টোরীয় খ্রীষ্টধর্মসম্প্রদায় : নেস্টোরীয় খ্রীষ্টধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নেস্টোরিয়াস্ ছিলেন সিরীয় (জন্ম—জার্মানাসিয়ায়)। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

কনস্তান্তিনোপলের প্রধান ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন। ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মবিরুদ্ধ শিক্ষা ও প্রচারকার্যের জন্য কাউন্সিল অব ইপিশাস কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া তিনি পদচ্যুত হন। নেস্টোরিয়াসের শিক্ষার নীতিগত বিভেদ ছাড়াও বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের হিংসা, বিদ্বেষ ও নীচ চক্রান্ত ছিল তাঁহার পদচ্যুতির প্রধান কারণ। যাহা হউক নেস্টোরিয়াস্ কনস্তান্তিনোপল পরিত্যাগ করিয়া এণ্টিওকের এক খ্রীষ্টীয় আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে আসিয়াও তিনি অব্যাহতি পান নাই; ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশের পেট্রো নামক স্থানে তিনি নির্বাসিত হন এবং তথা হইতে আবার উত্তর মিশরের বৃহৎ মরুদ্যানে। এইভাবে নানা দুর্দশা ও দুর্বিপাকের মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে।

নেস্টোরিয়াসের সঙ্গে তাঁহার মতাবলম্বী খ্রীষ্টানরাও সিরিয়ায় পলাইয়া আসে। এডেসার বিখ্যাত চিকিৎসাকেন্দ্রের সঙ্গে এই নেস্টোরীয় খ্রীষ্টানগণ বহুদিন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জেনো এডেসার চিকিৎসাকেন্দ্রের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে নেস্টোরীয়রা আবার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই ধর্মসম্প্রদায়ের মিশনারী উদ্দীপনার প্রাবল্য কিছুতেই তাহাদের দাবাইতে পারে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পূর্বদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এসিয়ার সর্বত্র, এমন কি সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত তাহাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচার করিয়া বেড়ায়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে নেস্টোরীয়দের প্রভাব মার্ভ ও হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; পরবর্তী শতাব্দীতে এই প্রভাব মধ্য-এসিয়ায় ও চীন পযন্ত বিস্তৃত হয়। ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি নেস্টোরীয় গির্জার ধ্বংসাবশেষ চীনদেশে পাওয়া গিয়াছে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্কীস্তানে প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জার্মানরা যে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের আয়োজন করে, তাহাতে সমগ্র মধ্য-এসিয়ায় এরূপ বহু নেস্টোরীয় গির্জার এবং সিরীয়, পারসীক, চৈনিক ইত্যাদি ভাষায় লিখিত নানা পাণ্ডুলিপির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু দূরবর্তী এইসব গির্জার নেস্টোরীয় ধর্মযাজকদের সহিত সিরিয়ার যাজকদের যে নিয়মিত চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান ছিল, তাহার অনেক প্রমাণও এই অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো মধ্য-এসিয়ার প্রধান প্রধান পথের ধারে সুদূর পিকিং পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই নেস্টোরীয় গির্জার উল্লেখ করেন। এইরূপ ব্যাপক বিস্তৃতি ও গতিবিধির ফলে নেস্টোরীয় খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন দেশের ও জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করে এবং একান্ত স্বাভাবিক কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উচ্চতর মননশীলতার ব্যাপারে একপ্রকার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে। ইহার ফল শুভ হইয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত নেস্টোরীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেতুস্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন।

এডেসা : এডেসার চিকিৎসাকেন্দ্র সক্রিয় থাকাকালীন নেস্টোরীয় পণ্ডিতগণ গ্রীক হইতে সিরীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ধর্মগ্রন্থই এই সময় অনূদিত হয় সবচেয়ে বেশী; তবে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থও অনূদিত হয়। তন্মধ্যে অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। হিভা নামে এক পণ্ডিত সিরীয় ভাষায় অ্যারিস্টটলের *Hermeneutica* ও *Analytica Priora* অনুবাদ করিয়া সিরীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা উৎসাহিত করেন।†

নির্সিবিস : এডেসার চিকিৎসাকেন্দ্রের দ্বার রুদ্ধ হইলে নির্সিবিসে অনুরূপ একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং অনতিকালের মধ্যে ইহার তৎপরতা নানা দেশের বিদ্যোৎসাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত নির্সিবিস তখন পারসীক শাশানিদ সম্রাটদের শাসনাধীনে। ক্যাসিওডোরাস্ নির্সিবিস চিকিৎসাকেন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* T. C. Carter, *Invention of Printing in China*; 1925.

† Lacy O'Leary, *How Greek Science Passed to the Arabs,* London; 1948, p. 52.

জ্বন্দিশাপুর : কিন্তু এইসব বিদ্যাপীঠ ও চিকিৎসাকেন্দ্রের তৎপরতাকে বহুগুণ অতিক্রম করিয়াছিল জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠের তৎপরতা। গ্রীক ও রোমক আমলে জুন্দিশাপুরে একটি বন্দীশিবির ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ছিল না। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল গ্রীকভাষী। কালসহকারে এইসব অঞ্চলে গ্রীক ভাষার পরিবর্তে সিরীয় ভাষা প্রাধান্য লাভ করিলে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমে সিরীয় ভাষায় হয়। এই কারণেই গ্যালেন, হিপোক্রেটিস্, অ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক মনীষিগণের গ্রন্থগুলি সিরীয় ভাষায় তর্জমা করিবার প্রয়োজন
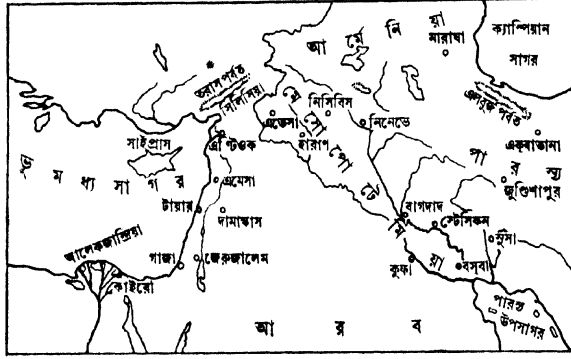
১৭। ইসলামের আবির্ভাবের সময় সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার কয়েকটি প্রাচীন কেন্দ্র।

হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এইরূপ প্রয়োজন হইতেই জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা যায় না। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তবে ৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এডেসা হইতে বিতাড়িত একদল নেষ্টোরীয় পাদরীর জুন্দিশাপুরে আগমনের পর হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত তৎপরতা সুরু হয়। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের বিদ্যাপীঠ (প্লেটোর একাডেমী) বন্ধ করিয়া দিলে জুন্দিশাপুরে আর এক দফা পণ্ডিত সমাগম ঘটে। ইঁহারা অধিকাংশই ছিলেন নিওপ্লেটোনিষ্ট দার্শনিক।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহী শাশানিদ সম্রাট খুস্রো নাসিরভানের (৫৩১-৭৯) কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রাজত্বকালেই জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় সুরু হয়। তিনি শরণার্থী নেষ্টোরীয় পণ্ডিত ও গ্রীক দার্শনিকদের শুধু সাদরে অভ্যর্থনাই করেন নাই, জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চার সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা তিনি করিয়া দেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া নেষ্টোরীয় পণ্ডিতগণ গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বহু গ্রীক গ্রন্থ সিরীয় ভাষায় তর্জমা এবং পূর্বে অনূদিত চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের প্রচার করেন। গ্রীক নিও-প্লেটোনিষ্টরাও তাঁহাদের জ্ঞান ও দর্শন পারসীক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচার করিতে যত্নবান হন। পরবর্তী পারসীক মায়াবাদে নিও-প্লেটোনিজ্মের প্রভাব সুপরিস্ফুট। নাসিরভানের এক আদেশে পারসী ভাষায় প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজির তর্জমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নেষ্টোরীয় ও নিওপ্লেটোনিষ্ট গ্রীক পণ্ডিত ছাড়া ইহুদী, ভারতীয় ও পারসীক পণ্ডিতগণও জুন্দিশাপুর বিদ্যাপীঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খুস্রো ভারতীয় বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

ভারতীয় বনৌষধি ও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বুধ নামে এক চিকিৎসককে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। এই চিকিৎসক বহু গাছ-গাছড়া ও ঔষধের সঙ্গে ভারতীয় চিনি সংগ্রহ করিয়া আনেন। ভারতীয় চিনির সহিত পশ্চিম এসিয়ার ও পরে ইউরোপের পরিচয় ঘটিবার ইহাই সম্ভবতঃ প্রথম সূচনা। তখনকার দিনে একমাত্র ঔষধ হিসাবে চিনির ব্যবহার ছিল। বুধ *Alef Migin* নাম দিয়া অ্যারিষ্টটলের অধুনা অবলুপ্ত *Physica* গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। খুসরোর আহ্বানে এক ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্‌ও নাকি জুণ্ডিশাপুরের বিদ্যাপীঠে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণের এইরূপ সহযোগিতা ও তৎপরতার ফলে জুণ্ডিশাপুর একপ্রকার আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকিলেও জুণ্ডিশাপুর বিদ্যাপীঠে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য ও উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই আলোচনা ও গবেষণা প্রধানতঃ গ্রীক পদ্ধতিতে সংঘটিত হইলেও ভারতীয়, সিরীয় ও পারসীক পদ্ধতিও এই বিদ্যাপীঠে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত জুণ্ডিশাপুরের চিকিৎসাবিদ্যার খ্যাতি ও উচ্চ মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয় ও চারিদিকে রাজনৈতিক গোলযোগ ও পরিবর্তনের মধ্যেও ইহার কার্যে ছেদ পড়ে নাই। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরবদের মধ্যে জুণ্ডিশাপুর বিদ্যাপীঠের প্রভাব ধীরে ধীরে অনুভূত হইতে আরম্ভ করে এবং ইহার কিছু পর হইতেই সিরীয় গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এই শেষোক্ত অনুবাদের কার্যেও নেস্টোরীয় খ্রীষ্টানগণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সার্জিয়াস্ রাসায়েন : নেস্টোরীয়দের মত মনোফিজাইট নামে খ্রীষ্টানদের আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের তৎপরতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের নানা স্থানে মনোফিজাইটরা সক্রিয় ছিল। মনোফিজাইট পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সার্জিয়াস্ রাসায়েনের (আনুমানিক ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) নাম। দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে রাসায়েনের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ছিল, তিনি গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন, এবং গ্রীক হইতে সিরীয় ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ তর্জমা করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; সেই সূত্রে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, পোর্ফিরি, হিপোক্রেটিস, ও গ্যালেনের গ্রন্থ তিনি প্রধানতঃ অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত সিরীয় ভাষায় ন্যায়শাস্ত্রের উপর তাঁহার কয়েকটি মৌলিক রচনাও উল্লেখযোগ্য। হুনায়েন ইবন্ ইশাকের মতে, সার্জিয়াসের তর্জমা খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই তর্জমাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সিরীয় ভাষায় চিকিৎসা, জ্যোতিষ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয় আয়ত্ত ও আলোচনা করিবার পথ সুগম করিয়া দেয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে সার্জিয়াসের কয়েকখানি গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে।

সেভেরাস্ সেবক্ত : সেভেরাস্ সেবক্ত (আনুমানিক ৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) সিরীয় মনোফিজাইট পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান নিসিবিস। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কর্মজীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেভেরাস্ উত্তর ইউফ্রেটিসের উপর অবস্থিত কেন্-নেসরের বিশপ ছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় ও নেতৃত্বে কেন্-নেসরে সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম সিরিয়ার গ্রীক পাণ্ডিত্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেবক্ত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। অ্যারিষ্টটলের *De interpretatione*-র উপর তিনি এক ভাষ্য রচনা করেন। ভূগোল ও জ্যোতিষের উপর রচিত তাঁহার গ্রন্থগুলি মধ্যযুগে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সমতল আস্তরলাব (plane astrolabe)—ইহা প্রধানতঃ গ্রীক গ্রন্থে বর্ণিত আস্তরলাব অবলম্বনে রচিত, ও হিন্দু অঙ্ক-পাতন-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত রচনাদিতে তিনি হিন্দুদের নয়টি সংখ্যার কথা উল্লেখ

করেন। ভারতবর্ষের বাহিরে হিন্দু অঙ্ক-পাতন-প্রণালীর ইহাই সম্ভবতঃ প্রথম ও প্রাচীনতম উল্লেখ।* যতদূর মনে হয়, সেবক্তের রচনার মাধ্যমেই আরব পণ্ডিতদের মধ্যে গ্রীক আস্তরলাব ও হিন্দু অঙ্ক-পাতন-প্রণালীর জ্ঞান ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেবক্তের রচনায় ও গ্রন্থাদিতে এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিজ্ঞান জাতিবিশেষের একচেটিয়া কোন প্রয়াস নহে, এই প্রয়াস ও ইহার স্বরূপ আন্তর্জাতিক, এবং এই মত তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এডেসার জেকভ : এডেসার জেকভ (৬৩৩-৭০৮) ছিলেন সিরীয় মনোফিজাইট বৈয়াকরণ। তাঁহার জন্ম এণ্টিওকে এবং তিনি সেবক্তের শিষ্য ছিলেন। সিরীয় ভাষায় বিজ্ঞান-সম্মত এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তৎকৃত *Hexaëmeron* বা খ্রীষ্টীয় সৃষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে সাত খণ্ডে সমাপ্ত এক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ভূগোলের আলোচনা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার বিভিন্ন দেশের নেষ্টোরীয় ও মনোফিজাইট খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র, ন্যায় ও দর্শনের অধ্যয়ন ও গবেষণাতেই উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের তর্জমায় এই জাতীয় গ্রন্থের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাদি তাঁহারা যে একেবারেই অনুবাদ করেন নাই তাহা নহে। এইসব অনুবাদের মধ্যে অ্যারিষ্টটলের *Parva naturalia*, ও কৃষি, পশুপালন, ধাতুনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি গ্রীক গ্রন্থের সিরীয় তর্জমা উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ ছাড়া কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আহ্‌রণের বিখ্যাত গ্রন্থ *Pandects*-এর নাম করা যাইতে পারে। ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ; বসন্ত রোগের এক প্রামাণিক বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৪·২। আরব্য বিজ্ঞানে অনুবাদের যুগ

আরব্য বিদ্যোৎসাহিতার প্রথম বাস্তব প্রকাশ ঘটে অনুবাদ-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া। আরবী ভাষায় ভারতীয়, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য জাতির বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থরাজি সুলভ না হইলে আরবদের পক্ষে নূতন গবেষণার দ্বার যে উন্মোচিত হইবে না, খলিফারা ইহা অনুধাবন করেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তরবারির শক্তিতে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মিশর, আরব, সিরিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলব্যাপী অর্ধেক পৃথিবীকে পদানত করিয়া সামরিক শক্তির এরূপ অভূতপূর্ব বিজয়-ঘোষণা তাঁহাদের অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল থাকিয়া যাইবে যদি সেই সঙ্গে পরাজিত প্রাচীন সভ্য জাতিদের জ্ঞানরাজ্যকেও তাঁহারা ততোধিক তৎপরতার সহিত জয় করিতে না পারেন। এই জয়লাভের প্রথম সোপান হিসাবে আরবরা অপূর্ব দক্ষতা ও অসীম ধৈর্যসহকারে ব্রহ্মগুপ্ত, ইউক্লিড্, টলেমী, অ্যারিষ্টট্ল, আর্কিমিডিস্, হিপোক্রেটিস্, থিওফ্রেস্টাস্ প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের গ্রন্থ প্রথমে সিরীয় ও পরে মূল গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় তর্জমা করে। এরূপ অনুবাদ-প্রচেষ্টার আর একটি সুফল এই ফলিয়াছিল যে, মূল গ্রন্থগুলিকে খুঁজিতে গিয়া লুপ্তপ্রায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের অস্তিত্ব নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয়। ইউরোপের অন্ধকার যুগে আরবরা এইভাবে গ্রীক বৈজ্ঞানিক গবেষণার অমূল্য সম্পদকে নিশ্চিত বিস্মৃতি ও ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইয়া সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে স্বকীয় গবেষণার দ্বারা রসায়নে, চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যায়, গণিতে, জ্যোতিষে ও পদার্থবিজ্ঞানে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের আলোক-

---

* *Introduction to the History of Science*, vol. I; p. 493.

বর্তিকা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল। রোমক ও পারসীক সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারও তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নেষ্টোরীয় বখ্‌তিশু ও মার্ভের বার্মাক বংশীয় পণ্ডিতদের তৎপরতা

আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে হারুণ অর্‌-রসিদের সময় হইতে তর্জমা-কার্যের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীয়রা উমায়দ্‌দের পরাস্ত করিয়া বলপূর্বক খিলাফৎ দখল করে। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল্‌-মানসুর ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ সহর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হারুণ অর্‌-রসিদের খলিফার পদে অভিষিক্ত হইবার বৎসর। হারুণ অর্‌-রসিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের তর্জমা-কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেও তাঁহার পূর্ব হইতেই এই কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরবরা ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। দুইটি পৃথক সূত্র হইতে তর্জমা-কার্যের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আসে,—(১) বাগদাদের অনতিদূরে নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মূল ঘাঁটি জুণ্ডিশাপুর ও (২) পূর্বে পারসীকদের অন্যতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র খোরাসানের রাজধানী মার্ভ। এই দুইটি কেন্দ্রেই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব বহুদিন ধরিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তারপর খোরাসানের পারসীকদের সঙ্গে আব্বাসীয় খলিফাদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক যোগ ছিল। বস্তুতঃ পারসীকদের গোপন চক্রান্তে ও সাহায্যে আব্বাসীয়রা উমায়দ্‌দের বিতাড়িত করিয়া খিলাফৎ দখল করিতে সক্ষম হয়। হারুণ আর্‌-রসিদ নিজে মার্ভে বিদ্যাশিক্ষা করেন। জুণ্ডিশাপুরের বিখ্যাত চিকিৎসক বংশ নেষ্টোরীয় বখ্‌তিশুরা এবং মার্ভের বার্মাকবংশীয় পণ্ডিতরা আব্বাসীয় খলিফাদের তর্জমার কার্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।

নেষ্টোরীয় বখ্‌তিশু বংশ : ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌-মান্‌সুর সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে জুণ্ডিশাপুর বিদ্যাপীঠ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নেষ্টোরীয় চিকিৎসক জির্জিস্‌ ইব্‌ন্‌ বখ্‌তিশু* খলিফার চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাগদাদে আসেন এবং তাঁহার দক্ষতার পুরস্কার-স্বরূপ রাজচিকিৎসক হিসাবে বাগদাদেই থাকিয়া যান। বাগদাদে তাঁহার আগমন আরব্য বিজ্ঞানের উন্নতির দিক হইতে বিশেষ শুভ হইয়াছিল। তিনি আরবী ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। জির্জিস্‌ অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার পুত্র ও জুণ্ডিশাপুর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ দ্বিতীয় বখ্‌তিশু রাজচিকিৎসক হিসাবে বাগদাদে আহূত হন। তিনি প্রথমে আল্‌-মান্‌সুরের ও পরে হারুণ অর্‌-রসিদের সভায় ছিলেন। দ্বিতীয় বখ্‌তিশুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জিব্রাইল্‌ রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই জিব্রাইলই গ্রীক বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যার, গ্রন্থগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার নিজের অনুবাদ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। সিরীয় ভাষায় *Kunnash* নামে চিকিৎসা-বিদ্যার এক বিরাট গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।†

এই গ্রন্থের বহু অংশ হিপোক্রেটিস্‌ ও গ্যালেন হইতে গৃহীত। বহুদিন পর্যন্ত সিরীয়ভাষী চিকিৎসকদের মধ্যে *Kunnash* প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তা আরবদের মধ্যে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উদ্রেক করিতে বিশেষ সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত জিব্রাইলের পরামর্শমত হারুণ নানা বিষয়ে মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের রোমক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ এবং তর্জমার জন্য অভিজ্ঞ অনুবাদকদের নিযুক্ত করেন।

---

* বখ্‌তিশু—১
† Lacy O'Leary, *How Greek Science Passed to the Arabs*, p. 160.

মার্ভের বার্মাক বংশ : আব্বাসীয় খিলাফতের গোড়াপত্তন হইতেই পারসীক বার্মাক বংশীয় রাজপুরুষদের সঙ্গে খলিফাদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্বন্ধের ইতিহাস পাওয়া যায়। বাক্ট্রিয়ায় বাল্‌খ্‌ নামক স্থানে বার্মাক বংশীয়দের আদিবাস ছিল। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা পুরুষানুক্রমে বাল্‌খের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার 'নববিহারে'র মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। মুসলমান ধর্ম প্রচারের প্রথম-দিকেই বার্মাক বংশ ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করে। এই বংশের খালিদ ইব্‌ন্‌ বার্মাক আব্বাসীয় খলিফা আস্‌-শাফার সময় অর্থসচিব ছিলেন এবং আল্‌-মানসুরের রাজত্বকালে মেসোপোটেমিয়ার শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। খালিদের পুত্র ইয়াহিয়া হারুণ অর্‌-রসিদের শিক্ষকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; হারুণ খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়া ইয়াহিয়াকে সমগ্র সাম্রাজ্যের উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার এক পুত্র জাফার বার্মাক পিতার উজিরের পদ প্রাপ্ত হন।

জুণ্ডিশাপুরের নেস্টোরীয় বুখ্‌তিশুদের মত মার্ভের বার্মাকদের মধ্যেও গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা ছিল। তদুপরি ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের খ্যাতিও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। গ্রীক গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থের আরবী অনুবাদের ব্যাপারে এই বার্মাক পণ্ডিতরাই মনে হয় প্রথম উদ্যোক্তা। ইউক্লিডের *Elements* ও টলেমীর *Almagest* তর্জমার ব্যাপারে বার্মাক জাফারের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় গণিতের সহিত আরবদের পরিচয়ও সম্ভবতঃ মার্ভের পারসীক পণ্ডিতদের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছিল। বিখ্যাত আরব গণিতজ্ঞ আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির রচনায় গণিতের যেসব বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়, তাহা কোন গ্রীক গ্রন্থে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে সেই সময়ে বা তৎপূর্বে প্রচলিত ভারতীয় গণিতে এইসব বিষয়ের আলোচনা আছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা আরবরা ভারতবর্ষ হইতেই সর্বপ্রথম জ্যোতিষ ও গণিতের জ্ঞান আহরণ করে। মিঃ ল্যাসি ওলিয়ারি লিখিয়াছেন—

> "Certainly the earliest Arab mathematicians, such as al-Khwarizmi, knew a great deal which does not appear in the Greek authors and much of which (but not all) can be traced to Indian workers. There are gaps in the chain of transmission which it is not easy to fill up."*

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, সাধারণভাবে বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার ব্যাপারে বুখ্‌তিশু ও বার্মাক বংশীয়দের মধ্যে বরাবর পূর্ণ সদ্ভাব ও সহযোগিতা ছিল। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় জুণ্ডিশাপুর ও খোরাসান হইতে যেসব বিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও অনুবাদক আহূত হইয়া বাগদাদে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনা হইতেই নিজেদের লইয়া একপ্রকার সমিতি বা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের দ্বারা জ্ঞান-চর্চার একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

প্রাথমিক অনুবাদ-প্রচেষ্টা

ভারতীয় সিদ্ধান্তের অনুবাদ, আল্‌-ফাজারি, ইয়াকুব ইব্‌ন্‌ তারিক : অনুবাদের প্রথম পর্বে যে অল্প কয়েকটি পুস্তকের তর্জমার উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত বা 'সিন্দ্‌-হিন্দ্‌' অন্যতম। ইব্রাহিম আল্‌-ফাজারি ও ইয়াকুব ইব্‌ন্‌ তারিক নামে দুই গণিতজ্ঞ পারসী সংস্করণ হইতে আরবী ভাষায় সিদ্ধান্তের তর্জমা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আল্‌-ফাজারির জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম আস্তরলাব

---

* *How Greek Science Passed to the Arabs*, p. 154.

তৈয়ারী করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। ইয়াকুব ইব্‌ন্‌ তারিক গোলক সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তিনি তথ্যবহুল কতকগুলি জ্যোতিষীয় সারণীও তৈয়ারী করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সার্টনের মতে, সম্ভবতঃ আল্‌-মানসুরের সভায় মঙ্কা (কংখ?) নামে এক হিন্দু জ্যোতির্বিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি যে জ্যোতিষীয় সারণী তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত। আরবী ভাষায় সিদ্ধান্তের সর্বপ্রথম তর্জমার সঠিক তারিখ কিছু পাওয়া যায় না। আল্‌-ফাজারি সিদ্ধান্তের একজন অনুবাদক হইলে খলিফা আল্‌-মানসুরের রাজত্বকালেই এই অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল এইরূপ মনে করিতে হয়। কারণ আল্‌-ফাজারি খলিফার একজন বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তবে ইহা ঠিক যে আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি (৮৩৫-৮৪৪) ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি যেসব জ্যোতিষীয় সারণী প্রণয়ন করেন তাহা মূলতঃ ভারতীয় জ্যোতিষ হইতে গৃহীত। এ সম্পর্কে ইব্রাহিম আল্‌-ফাজারির পুত্র আবু আবদাল্লা মহম্মদ ইব্‌ন্‌ ইব্রাহিম আল্‌-ফাজারির নাম উল্লেখযোগ্য। আল্‌-মানসুর নাকি এই মহম্মদ আল্‌-ফাজারিকেই ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের আরবী সংস্করণ প্রণয়ন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।* সুতরাং আল্‌-ফাজারি পদবীধারী পিতা-পুত্রের মধ্যে কেহ একজন আল্‌-মানসুরের সময় সিদ্ধান্তের প্রথম অনুবাদ প্রণয়নের কার্য যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়।

আল্‌-মানসুরের সময় আবু ইয়াহিয়া আল্‌-বাত্রিক্‌ নামে আর একজন আরব অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। ইনি চিকিৎসক ছিলেন এবং হিপোক্রেটিস্‌ ও গ্যালেনের কয়েকটি গ্রন্থ তর্জমা করেন।

ইউক্লিড ও টলেমীর তর্জমা, আল্‌-হজ্জাজ ও আল্‌-তাবারি : সিদ্ধান্তের পর ইউক্লিডের *Elements* ও টলেমীর *Almagest* সম্ভবতঃ আরবী ভাষায় অনূদিত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। আল্‌-হজ্জাজ ইব্‌ন্‌ ইউসুফ্‌ মাতার (৭৮৬-৮৩৩) গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদক হিসাবে খ্যাত। তিনি ৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে *Almagest* এর অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। ইউক্লিডের *Elements* এর তিনিই প্রথম অনুবাদক এবং দুইবার তিনি এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অ্যাল্‌-মাজেস্টের এক সিরীয় সংস্করণ অবলম্বনে এই আরবী অনুবাদ রচিত হয়। *Elements*-এর দশম খণ্ড ছাড়া আর সব খণ্ডই তিনি তর্জমা করিয়াছিলেন; এই দশম খণ্ড অনুবাদ করেন সৈয়দ আদ্‌-দিমিস্কি। *Almagest* এর অনুবাদ সম্পর্কে সাহ্‌ল্‌ ইব্‌ন্‌ রাবান আল্‌-তাবারি নামে মার্ভনিবাসী এক ইহুদী পণ্ডিতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্‌-তাবারি হারুণের রাজত্বকালে বাগদাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং খলিফার আদেশে টলেমীর এই বিখ্যাত গ্রন্থ নাকি অনুবাদ করিতে উদ্যোগী হন।† কেহ কেহ মনে করেন আল্‌-তাবারি এই ভাবে প্রথমে অ্যাল্‌মাজেস্টের তর্জমা-কার্য সম্পন্ন করিলে আল্‌-হজ্জাজ ইহার পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে আরও উন্নত ও বিশুদ্ধ আরবী সংস্করণ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে হুনায়েন ইব্‌ন্‌ ইশাক, থাবিত ইব্‌ন কুরা, আল্‌-বাত্তানি প্রমুখ বিখ্যাত ভাষাবিদ্‌, অনুবাদক ও বিজ্ঞানিগণ *Almagest*- এর তর্জমার সংশোধন ও জায়গায় জায়গায় সম্পূর্ণ নূতন করিয়া তর্জমা করেন। নিখুঁত, নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রণয়ন করিতে আরবদের মত এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। আল্‌-হজ্জাজ কর্তৃক অনূদিত *Elements*-এর আরবী সংস্করণ সংশোধন করেন কুস্তা ইব্‌ন্‌ লুকা আনুমানিক ৯১২-৩ খৃষ্টাব্দে।

---

* Sarton, *Introduction to the History of Science*, vol. I, p. 530.

† "The first translator of the Almagest into Arabic"—Sarton, *Introduction to the History of Science*, vol. I ; p. 565.

হারুণ অর্-রসিদের জীবিতকালের মধ্যে অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাজির অনুবাদ-কার্য আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু কিছু গ্রন্থের তর্জমা সিরীয় ভাষা হইতে আরবী ভাষায় এই সময় সম্পাদিত হইয়াছিল।

হুনায়েন ইবন্ ইশাক ও আরবী তর্জমার সুবর্ণ যুগ

হারুণের পরবর্তী খলিফা আল্-মামুনও বিজ্ঞান-চর্চাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর আয়তন নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ইরাটোস্থেনিসের পদ্ধতি অনুসারে এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ আরব অনুবাদক হুনায়েন ইবন্ ইশাক তাঁহার সময় জীবিত ছিলেন। হুনায়েন জুন্ডিশাপুরে ইবন্ মাসাওয়ার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। কথিত আছে, বারংবার হুনায়েনের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া মাসাওয়া তাঁহাকে একবার বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক ইহা সত্য যে হুনায়েন জুন্ডিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক ভাষার প্রধান কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশে গিয়া বহুদিন এই ভাষা শিক্ষা করেন। এইভাবে গ্রীক ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে বস্রার খালিদ ইবন্ আহ্মদের কাছে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। গ্রীক, সিরীয় ও আরবী ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া জিব্রাইল আনুমানিক ৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুনায়েনকে বাগদাদে আহ্বান করেন, এবং এইখানে আসিয়া তিনি প্রথমে গ্যালেনের চিকিৎসাবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে প্রীত হইয়া জিব্রাইল বাগদাদের ধনাঢ্য ও বিদ্যোৎসাহী মুসা পরিবারের সহিত হুনায়েনের পরিচয় করাইয়া দেন। এই মুসা পরিবারের তিন ভাই মুহাম্মদ, আহ্মদ ও হাসান জ্যোতিষ, বলবিদ্যা ও জ্যামিতিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বাগদাদে তাঁহারা এক মানমন্দির স্থাপন করিয়া ৮৫০ হইতে ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করেন। সমতলক্ষেত্র ও গোলক সংক্রান্ত জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের একটি সংগ্রহ ও সাধারণ জ্যামিতির একখানি পুস্তক তাঁহারা রচনা করেন। এই জ্যামিতিকে ভিত্তি করিয়া ক্রেমোনার জেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় *Liber trium fratrum de geometria* নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, মধ্যযুগীয় ইউরোপে তাহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। জ্যোতিষ, গণিত ও জ্যামিতি মুসাভ্রাতৃত্রয়ের প্রধান গবেষণার বিষয় হওয়ায় তাঁহারা চিকিৎসাবিদ্ ও বহু ভাষাবিদ্ হুনায়েনকে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের গবেষণার কাজে লাগাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অন্যভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহারা হুনায়েনের তর্জমা-কাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত খলিফা আল্-মামুনের সহিত পরিচিত হইবার ব্যাপারেও এই পরিবার হুনায়েনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। জিব্রাইলের পরামর্শমত আল্-মামুন 'দার আল্-হিখ্মা' বা জ্ঞানগৃহ নামে এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। এই বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাজি অনুবাদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছিল। আল্-মামুন হুনায়েনকে এই বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আরব্য বিজ্ঞানের বনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার কার্যে আমরা জিব্রাইলের নানাবিধ তৎপরতার যেসব পরিচয় পাই, তন্মধ্যে 'দার আল্-হিখ্মা'র প্রস্তাবনা ও স্থাপনা এবং হুনায়েনের মত প্রতিভাবান পণ্ডিত ও বহু ভাষাবিদ্‌কে অনুবাদ-কার্যে নানা সুযোগ-সুবিধা দান নিঃসন্দেহে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবে।

হুনায়েন ইবন্ ইশাক এই আশাতীত সুযোগ ও রাজানুগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্যালেন, হিপোক্রেটিস্, টলেমী, ইউক্লিড, অ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ প্রখ্যাতনামা গ্রীক বিজ্ঞানিগণের প্রধান গ্রন্থগুলি তিনি মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি হইতে সিরীয় ও আরবী ভাষায় তর্জমা করেন এবং পূর্বে অনূদিত কয়েকটি গ্রন্থের সংশোধন করেন। এক গ্যালেনেরই কুড়িখানি গ্রন্থ সিরীয় ভাষার ও চৌদ্দখানি আরবী ভাষায় তিনি অনুবাদ করেন। এই

ব্যাপক অনুবাদ-সাফল্যের ফলে তাঁহার সময় হইতেই আরব ছাত্ররা আলেকজান্দ্রিয়ায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্য গ্যালেনের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আরবী ভাষায় অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।*

De sectis,
Ars medica,
De pulsibus ad tirones,
Ad Glauconem de medendi methodo,
De ossibus ad tirones,
De musculorum dissectione,
De nervorum dissectione,
De venarum arteriumque dissectione,
De elementis secundum Hippocratem,
De temperamentis,
De facultatibus naturalibus,
De causis et symptomatibus,
De locis affectis,
De pulsibus,
De typis (febrium),
De crisibus,
De diebus decretoriis,
Methodus medendi.

আল্-মামুনের মৃত্যুর (৮৩৩) পর খিলাফৎ লইয়া বিরোধ, নানা গোলযোগ ও হত্যাকান্ড সুরু হইলে জ্ঞান-গৃহের এবং সেই সঙ্গে হুনায়েনের গবেষণা ও তর্জমার কার্যে নানারূপ অসুবিধা ও বাধার সৃষ্টি হয়। সে যুগে খলিফাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিলে তাঁহাদের অনুগৃহীত পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরাও বাদ পড়িতেন না। কোনরূপ রাজনৈতিক দোষ না থাকিলেও কেবলমাত্র বিড়ম্বিত খলিফার সহিত সংস্রবের অপরাধে বহু বিজ্ঞানীকে নির্যাতন ভোগ করিবার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। মুতাওয়াকিল খলিফা হইলে (৮৪৭-৮৬১) একবার এক অতি তুচ্ছ কারণে হুনায়েন তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন এবং ফলে তাঁহাকে কিছুদিন বন্দিজীবন যাপন করিতে হয়। শেষ বয়সে হুনায়েন তাঁহার পুরাতন তর্জমাগুলিকে আরও উন্নত ও মার্জিত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। নূতন অনুবাদের মধ্যে গ্যালেনের *De constitutione artis medicae* উল্লেখযোগ্য। ৮৭৩ অথবা ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হুনায়েনের মৃত্যু হয়।

হুনায়েনের শিষ্যরা : হুনায়েনের কয়েকজন শিষ্যও তর্জমার কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের মধ্যে হুনায়েনের পুত্র ইশাক্ ও ভাগিনেয় হুবায়েশ ইব্‌ন্ আল্-হাসানের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্-হাসান মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি হইতে হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাবিষয়ক রচনা ও ডিওস্কোরিডিসের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থের তর্জমা করেন। ডিওস্কোরিডিসের গ্রন্থাবলীর তর্জমার কার্যে হুনায়েনের আর এক শিষ্য ষ্টাফানোস্ ইব্‌ন্ বেসিলোসের অংশ-গ্রহণের কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ বেসিলোস্ গ্রন্থগুলিকে প্রথমে সিরীয় ভাষায় তর্জমা করেন এবং এই সিরীয় সংস্করণ হইতে আরবী তর্জমা প্রণয়ন করেন হুবায়েশ। গ্রীক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের আর এক বিশিষ্ট অনুবাদক ইশা ইব্‌ন্ ইয়াহিয়া ইব্‌ন্ ইব্রাহিমও হুনায়েনের শিষ্য ছিলেন।

থাবিত ইব্‌ন্ কুরা : হুনায়েনের পর থাবিত ইব্‌ন্ কুরার (মৃত্যু ৯০১) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে গণিতজ্ঞ ছিলেন এবং গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অনুবাদকদের প্রায় অধিকাংশ তর্জমাই তিনি পুনরায় সংশোধন করেন। তিনি গ্রীক, সিরীয় ও আরবী ভাষায় সমধিক সুপণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়, গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে আরবীতে তিনি প্রায় ১৫০ এবং সিরীয় ভাষায় ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। অ্যাপোলো-

* O'Leary, *loc. cit*, p. 167.

নিয়াস্, আর্কিমিডিস্, ইউক্লিড, টলেমী ও থিওডোসিয়াসের অনেক গ্রন্থ তাঁহার অনূদিত। গণিতে ও জ্যোতিষে মৌলিক গবেষণার জন্যও তিনি খ্যাত। সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

আরও কয়েকজন অনুবাদক : আর্কিমিডিসের জ্যামিতি সংক্রান্ত কয়েকখানি গ্রন্থ সিরীয় হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউসুফ আল্-খুড়ি আল্-কাস ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। থাবিত ইব্‌ন্ কুরা এই তর্জমা সংশোধন করেন। গ্যালেনের *De simplicibus temperamentis et facultatibus* তাঁহার অনুবাদ। হুনায়েন এই তর্জমার কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। আল্-কাসের সমসাময়িক সিরীয় খ্রীষ্টান কুস্তা ইব্‌ন্ লুকা গণিতের কতকগুলি পুস্তক তর্জমার জন্য খ্যাত। আল্-হজ্জাজ কৃত ইউক্লিডের *Elements* -এর তর্জমার সংশোধন ছাড়া তিনি থিওডোসিয়াসের *Sphaerica,* হীরোর বলবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ ও থিওফ্রেস্টাসের *meteora* আরবী ভাষায় তর্জমা করেন। আবু জাকারিয়া আল্-মান্তিকি (মৃত্যু ৯৭৪) ও আল্-নাতিলি (মৃত্যু ৯৯০) দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত আরও দুইজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক। দশম শতাব্দীর পর হইতে আরবদের অনুবাদ-তৎপরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। প্রথম যুগের মত অনুবাদের প্রয়োজনও আর ততটা ছিল না। মৌলিক গবেষণার দ্বারা স্বাধীনভাবে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করিবার কার্যে এখন হইতে আরব্য পণ্ডিতগণ অধিকতর মনোযোগী হন।

স্পেনের তৎপরতা : এইত গেল এসিয়ার মুসলমানদের কথা। ঐস্লামিক স্পেনও তর্জমা-কার্যে পশ্চাদপদ ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের খিলাফৎ দখলে রাখার ব্যাপারে আব্বাসীয়দের নিকট উমায়দ্দের পরাভব ঘটিলে এই শেষোক্ত বংশের রাজপুরুষরা ভাগ্যান্বেষণে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উমায়দ্দের এক যুবরাজ আব্দার রহ্মান স্পেনে এক স্বাধীন ঐস্লামিক রাজ্য স্থাপন করেন। ৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের তৃতীয় আব্দার রহ্মান করডোভার খলিফা উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাইজাণ্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্তান্তাইন স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে করডোভায় এক দূত প্রেরণ করেন। এই দূত যেসব মূল্যবান উপহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছিল গ্রীক ভাষায় লিখিত উদ্ভিদ্বিদ্যাসংক্রান্ত ডিওস্কোরিডিসের একখানি গ্রন্থ। করডোভায় তখন কেহ গ্রীক জানিত না। সুতরাং খলিফা বাইজাণ্টাইন সম্রাটকে ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আরবী ও গ্রীক উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত এক ব্যক্তিকে করডোভায় পাঠাইতে অনুরোধ করেন। কনস্তান্তাইন এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পর নিকোলাস নামে এক ধর্মযাজক করডোভায় আসিলেন এবং ডিওস্কোরিডিস্ আরবী ভাষায় অনূদিত হইল। স্পেনের মুসলমান বিদ্বৎ-সমাজ গ্রীক বিজ্ঞানের স্বাদ পাইয়া গ্রীক ভাষা শিক্ষা ও গ্রীক গ্রন্থাদি তর্জমার কার্যে উৎসাহিত হইল। নিকোলাসও আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই; তিনি করডোভাতেই গ্রীক ভাষা শিক্ষার এক কেন্দ্র খুলিয়া মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষা শিক্ষা ও প্রচার কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই প্রাথমিক চেষ্টার ফলে করডোভা অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাচর্চার ও মননশীলতার এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কালক্রমে করডোভায় যে গ্রন্থাগার নির্মিত হয় তাহাতে এক সময় প্রায় ৬,০০,০০০ গ্রন্থ ছিল এবং সমগ্র স্পেনে এই সময় ছোট-বড় প্রায় ৭০টি সাধারণ পাঠাগার গড়িয়া উঠে। দশম শতাব্দীতে জ্ঞান-চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে করডোভা শিক্ষিত ও পণ্ডিত মহলে যেরূপ আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, পাঁচ শত বৎসর পরে অক্সফোর্ড বা প্যারীও সেইরূপ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

৫·১ গণিত, জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা

ইউক্লিড, অ্যাপোলোনিয়াস্ বা আর্কিমিডিসের মত গণিতজ্ঞ, অ্যারিস্টার্কাস্, হিপার্কাস্ বা টলেমীর পর্যায়ের জ্যোতির্বিদ্ আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই বটে, কিন্তু আল্-খোয়ারিজ্‌মি, আল-বাত্তানি ও ওমর খৈয়ামের মত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্, আল্-কিন্দি ও আল্-হাজেনের মত পদার্থবিদ্‌দের উদ্ভব সম্ভবপর করিয়া আরবরা যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহার গুরুত্ব বা মূল্য বড় কম নহে। মূলতঃ ভারতীয় আবিষ্কার হইলেও শূন্য ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির প্রচার এবং এই পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ আরবদের প্রাপ্য। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকরা ডায়োফ্যান্টাস্‌কে লইয়া যতই বাড়াবাড়ি করুন না কেন বীজগণিতকে প্রকৃত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন আল্-খোয়ারিজ্‌মি, আল্-খোজান্দি, আল্-কারখি, ওমর খৈয়াম প্রমুখ আরব্য গণিতজ্ঞগণ। বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির (analytical geometry) বনিয়াদ গড়িয়াছে আরবরা, ত্রিকোণমিতিতেও তাহারা আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। জ্যোতিষে বহু মূল্যবান পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদিত হইয়াছে আরব্য জ্যোতিষীয় মানমন্দিরগুলিতে। আল্-কিন্দি, আল্-বীরুণী ও আল্-হাজেনের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা রীতিমত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পদার্থবিদ্যা দর্শন ও নিছক কল্পনামূলক চিন্তাধারার পথ পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথ বাছিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে পদার্থবিদ্যা, বিশেষতঃ আলোক ও বলবিদ্যা, সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। আরবরা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থরাজি নিজেদের ভাষায় শুধু অনুবাদ করিয়া ক্ষান্ত হইলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিত। এই অনুবাদ-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রাচীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে ও বিজ্ঞানের আদর্শকে তাহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এবং বহু মূল্যবান গবেষণাকে নিশ্চিত বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। অ্যাপোলোনিয়াসের তিনখানি কনিক জ্যামিতির গ্রন্থ, মেনেলাউসের *Sphaerica,* হীরোর *Mechanics,* ফিলোর *Pneumatics,* এবং ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের কয়েকটি পুস্তক একমাত্র আরবী ভাষাতেই সংরক্ষিত হয়; গ্রন্থগুলির মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইয়াছিল। আরবী ভাষায় অনূদিত না হইলে এইসব গ্রন্থে আলোচিত উপরিউক্ত গ্রীক বিজ্ঞানিগণের মূল্যবান গবেষণার কথা জানিবার আর কোন উপায়ই হয়ত থাকিত না। কিন্তু শুধু অনুবাদ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই আরবরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে নাই; স্বকীয় সাধনার বলে তাহারা নূতন জ্ঞানের ও তথ্যের সন্ধান দিয়াছে, বিজ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণতর করিয়াছে, সমগ্রভাবে জ্ঞানরাজ্যের সীমা বহুদিকে বিস্তৃত করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গণিত, জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিদ্যায় আরব্য গবেষণার উৎকর্ষ সহজেই প্রতিভাত হইবে।

নাওবখ্‌ত্ ও মাশাল্লাহ্ : খলিফা আল্-মানসুরের সময় হইতেই গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চায় আরবদের তৎপরতা আরম্ভ হয়। আল্-মান্‌সুরের সভাসদ্‌দের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, পূর্তবিদ্যাবিশারদ্ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্ নাওবখ্‌ত্ ও মাশাল্লাহ্ ইবন্ আথারির নাম উল্লেখযোগ্য। বাগদাদ সহর পরিকল্পনা-ব্যাপারে নাওবখ্‌ত্ ও মাশাল্লাহ্ খলিফা আল্-মান্‌সুরকে পরামর্শ দেন বলিয়া জানা যায়। নাওবখ্‌ত্ একটি জ্যোতিষীয় তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মাশাল্লাহ্ জ্যোতির্বিদ্যার উপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন; আস্তরলাব ও আবহবিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ লেখেন। *De mercibus*

নামে মূল্য-নিরূপণ সম্বন্ধে রচিত তাঁহার একটি গ্রন্থের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। জোহানেস্ দ্য লুনা হিস্‌পালেন্‌সিস্ তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় তর্জমা করেন। ক্রেমোনার জেরার্ড কর্তৃক অনূদিত *De scientia motus orbis* ছিল মধ্যযুগে মাশাল্লাহ্‌র আর একটি বহুল প্রচলিত গ্রন্থ।

ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত বা সিন্দ হিন্দ আরবী ভাষায় অনূদিত হইবার পর হইতে আরবরা সাধারণভাবে গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চায় উৎসাহিত হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তের সহিত আরব্য পণ্ডিতদের কিভাবে প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল সে বিষয় নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি লিখিয়াছেন, ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক হিন্দু জ্যোতিষী আল্-মান্সুরের সভায় আসেন এবং হিন্দুদের সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষীয় তালিকা ও গণনার কথা খলিফার নিকট জ্ঞাপন করেন।* খলিফা হিন্দুদের এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া আরবী ভাষায় সিদ্ধান্ত তর্জমা করিবার আদেশ দেন। আরব্য গণিতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কারা দ্য ভো-ও বাগদাদে খলিফার সভায় এক হিন্দু জ্যোতিষীর উপস্থিতির কথা সমর্থন করিয়াছেন; তিনি এই জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন মঙ্কা।†

মিঃ ল্যাসি ওলিয়ারি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।‡ আরবরা সিন্ধু-প্রদেশ জয় করিয়া সেইখানে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আব্বাসীয়রা ক্ষমতা হস্তগত করিবার কালে যে সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সিন্ধুর ঔপনিবেশিক আরবরা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। আল্-মান্সুর এই ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া। বেগতিক দেখিয়া সিন্ধুর আরবরা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বাগদাদে এক দৌত্য প্রেরণ করে। এই দৌত্যের সঙ্গে বাগদাদে আসেন কঙ্কা (মঙ্কা?) নামে এক ভারতীয় পণ্ডিত। এই পণ্ডিত খলিফার সভায় ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের কথা ব্যক্ত করেন। কঙ্কা আরবী ভাষা জানিতেন না; দোভাষীর সাহায্যে প্রথমে পারসী এবং পরে আবার পারসী হইতে আরবী ভাষায় তর্জমা করিয়া কঙ্কার ভাষণ খলিফাকে শুনানো হয়। আল্-বীরুণী এই গল্পের কথা জানিতেন, তবে ইহা (ওলিয়ারির মতে) তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। আরবী ভাষায় সিদ্ধান্তের ত্রুটীবহুল তর্জমার কারণ নির্দেশের জন্য হয়ত এইরূপ গল্পের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, মিঃ ওলিয়ারি এই বলিয়া গল্পের উপসংহার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে সরাসরি আরবী ভাষায় অনূদিত হয় নাই, ইহা প্রথমে অনূদিত হয় পারসী ভাষায়। এইরূপ এক পারসী সংস্করণ সম্ভবতঃ বহুদিন হইতে জুণ্ডিশাপুর প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রে প্রচলিত ছিল এবং পারসী হইতে পরে আরবী ভাষায় সিদ্ধান্ত অনূদিত হয়। সিদ্ধান্ত সিরীয় ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদক ইব্রাহিম আল্-ফাজারি ও ইয়াকুব ইব্‌ন্ তারিকের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এইভাবে ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের সহিত পরিচয় ঘটিবার ফলে আরবরা দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের নিয়ম ও শূন্যের আবিষ্কার অবগত হয়। আরবদের সংখ্যা বলিয়া কিছু ছিল না, সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে তাহারা গ্রীক ও কপটিক পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ ও গণনার কাজ চালাইত। পরে গ্রীক দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ২৮টি আরবী অক্ষর পর পর সাজাইয়া তাহারা সংখ্যা নির্দেশ করিবার পদ্ধতি প্রচলন করে। কতদিন এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল এবং ঠিক কোন সময় হইতে আরবরা সাধারণভাবে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের নিয়ম ও শূন্যের ব্যবহার গ্রহণ করে, তাহা জানা যায় না; তবে ইহা ঠিক যে, ভারতীয় সংখ্যার সহিত পরিচিত

* *A History of Mathematics*; p. 99.

† *The Legacy of Islam*, 'Astronomy and Mathematics' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

‡ *How Greek Science Passed to the Arabs*, p. 106.

হইবার অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহারা ইহার সুবিধা ও বিপুল সম্ভাবনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ব্যাপকভাবে গণনা ও হিসাবের কাজে ইহার প্রচলনে মনোযোগী হয়।

আরব্য গণিতজ্ঞরা ভারতীয় নিয়ম ও লিখন পদ্ধতিকে হুবহু নকল করে নাই। এমন কি সংখ্যার জন্মস্থান ভারতবর্ষেও ইহার ব্যবহার ও লিখন পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট অমিল ও পার্থক্য দেখা যায়। আল্-বীরুণীর রচনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত সংখ্যার হরফগুলির মধ্যে এই পার্থক্যের উল্লেখ আছে। আরবরা এইসব হরফ হইতে নিজেদের সুবিধামত সংখ্যা বাছিয়া লয় এবং তাহারই মধ্যে আবার নানারূপ পরিবর্তন সাধন করে। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে আরব্য সংখ্যা-হরফগুলি শেষ পর্যন্ত যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সহিত দেবনাগরী সংখ্যা-হরফের কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পক্ষান্তরে রোমক গণিতজ্ঞ বোয়েথিয়াসের রচনায় সংখ্যা-হরফের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহার সহিত আরবী সংখ্যার কিছু কিছু মিল আছে। তারপর মুসলমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত সংখ্যা-হরফের ছাঁদে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যা-হরফগুলির মধ্যে এই প্রভেদ খুবই প্রকট।

আরব্য অঙ্কপাতনের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। তন্মধ্যে ভোয়েপ্‌কের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভোয়েপ্‌কে বলেন যে, শূন্য আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলেকজান্দ্রীয় গণিতজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ অবহিত হন এবং পরে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রোমে ও পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এই পদ্ধতি অল্প-বিস্তর প্রবর্তিত হয়। শূন্য আবিষ্কৃত হইলে ভারতীয় অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির আবার আমূল পরিবর্তন ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে এই পরিবর্তিত ও সংশোধিত অঙ্কপাতন পদ্ধতির সহিত বাগদাদের আরব্য গণিতজ্ঞগণ পরিচিত হন এবং আরবরা ইহা গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলন করে। ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানেরা কিন্তু শূন্যের ধারণা গ্রহণ করিলেও নয়টি সংখ্যার ভিত্তিতে রচিত সংখ্যাপাতন পদ্ধতি সহজে পরিত্যাগ করে নাই এবং এই প্রাচীন পদ্ধতি যে ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত তাহাও তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। পরিশেষে, অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে ভারতীয় সংখ্যাপাতন পদ্ধতির প্রবর্তনের পর হইতে ভারতবর্ষেও সংখ্যালিখন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আরব্য সংখ্যা-হরফের সহিত দেবনাগরী সংখ্যা-হরফের অমিলের ইহা একটি সম্ভাব্য কারণ হইতে পারে।

ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ, গণিত ও অঙ্কপাতন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইবার কিছু-কালের মধ্যেই গ্রীক জ্যোতিষ ও গণিতের প্রভাব আরবদের মধ্যে অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। কথিত আছে যে, সিদ্ধান্ত অনূদিত হইলেও আরব্য পণ্ডিতগণ জ্যামিতি ও জ্যোতিষসংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবে সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই অসুবিধার কথা উপলব্ধি করিয়া বার্মাক জাফার গ্রীক গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করাইবার জন্য খলিফাকে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শমত হারুণ অর্-রসিদ ইউক্লিডের *Elements* ও টলেমীর *Almagest*-এর আরবী তর্জমা প্রণয়নের আদেশ দিয়াছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় আরব্য পণ্ডিতদের আগ্রহের একটি প্রধান কারণ নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানের সময় নির্ভুলভাবে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা। ধর্মের বিধান অনুসারে কোন সময় উপবাস সুরু বা ভঙ্গ করিতে হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য চন্দ্রের অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তারপর মক্কার অভিমুখে ফিরিয়া মুসলমানদের প্রার্থনা করিবার রীতি। সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার জন্য মক্কার দিঙ্-নির্ণয়েরও প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইল। এজন্য গোড়া হইতেই আরবরা জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। আরব্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ অতীব ধৈর্যসহকারে দীর্ঘকালব্যাপী বহু পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাতন জ্যোতিষীয় তালিকার সংশোধন ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং অধিকতর

নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। বাগদাদ, করডোভা, মারাঘা প্রভৃতি স্থানে এইসব মূল্যবান যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া যেসব মানমন্দির তাহারা স্থাপন করিয়াছিল, পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোথাও তাহাদের জুড়ি পাওয়া যায় না।

মহম্মদ ইব্‌ন্‌ মুসা আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি (মৃত্যু—আনুমানিক ৮৫০)

মহম্মদ ইব্‌ন্‌ মুসা আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি আরবদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গণিতজ্ঞ। খলিফা আল্‌-মামুনের সময় তিনি জীবিত ছিলেন এবং আনুমানিক ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। জ্যোতিষ, হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও বীজগণিত সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আরবদের মধ্যে তিনিই প্রথম বীজগণিতজ্ঞ। জর্জ সার্টন আল্‌-খোয়ারিজ্‌মিকে তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* আদেলার্দ অব বাথ ও জেরার্ড অব ক্রেমোনা তাঁহার গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় তর্জমা করেন।

আল্‌-নাদিমের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কিতাব আল্‌-ফিরহিস্ত' (রচনা-কাল আনুমানিক ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি পারস্যের খিভা প্রদেশে খোয়ারিজ্‌ম্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই খোয়ারিজ্‌ম্‌ হইতেই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি। তিনি খলিফা আল্‌-মামুনের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। খলিফার ইচ্ছানুক্রমে তিনি টলেমীর জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও তালিকা পুনঃপরীক্ষার কার্যে ও ভারতীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা ও ব্যাখ্যা রচনায় মনোযোগী হন। এক বৈজ্ঞানিক মিশনের সহিত সংযুক্ত হইয়া আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি আফগানিস্তান ও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।† ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়ত এই সম্পর্কেই ঘটিয়া থাকিবে।

স্বরচিত গ্রন্থ : আল্‌-খোয়ারিজ্‌মি প্রথমদিকে জ্যোতিষীয় গবেষণায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং এই সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু পাটীগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচনার জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন। হিন্দুদের গণনা ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার 'কিতাবুল হিন্দ' ও পাটীগণিত সম্বন্ধে লিখিত 'আলজাম ওয়াল তাফরিক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদেলার্দ অব বাথ ও রবার্ট অব চেষ্টার এই গ্রন্থগুলির অনুবাদক। 'আল্‌-জেবর ওয়ালমুকাবালা' (*Al-jebr W'almuquabala*) আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির সর্বশ্রেষ্ঠ বীজগণিতীয় গ্রন্থ। ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থ *Ludus Algebrac almucgrabalacque, Gbeba Mutabila* প্রভৃতি নামে অনূদিত হয়। ল্যাটিন ভাষায় আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির গ্রন্থগুলি অনূদিত হইবার সময় গ্রন্থকারের নামও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া 'আল্‌গোরিতমি', 'আল্‌গোরিজ্‌ম্‌', 'আল্‌গোরিদ্‌ম্‌' ইত্যাদিতে দাঁড়ায়। ষোড়শ শতাব্দীতে *Algebra and Almachabel* নামে ইহার এক ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায় এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এফ. রোজেন এই গ্রন্থের আর একটি ইংরেজী তর্জমা প্রণয়ন করেন *Algebra of Mohammed Ben Musa* এই নামে।

বীজগণিত: আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিতের কথাই প্রথমে ধরা যাক। তিনি বীজগণিতে ঋণাত্মক রাশিদের চিহ্ন বদলাইয়া সমীকরণের এক দিক হইতে অপর দিকে লইয়া যাইবার এবং সমচিহ্নবিশিষ্ট রাশিদের যোগ দিবার পদ্ধতির নির্দেশ দেন। আরবী ভাষায় প্রথম পদ্ধতির নাম 'আল্‌জেবর' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'আল্‌মুকাবালা'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, $x^2-2x=5x+6$

* *Introduction to the History of Science*, Vol. I ; p. 563.
† এম. আকবর আলি, 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান', কলিকাতা; ১৯৪৩।

সমীকরণটি 'আল্‌জেবর' নিয়মে দাঁড়াইবে $x^2 = 2x + 5x + 6$; এবং 'আল্‌মুকাবালা'র নিয়মে হইবে $x^2 = 7x + 6$ এইরূপ নিয়মের ভিত্তিতে তিনি একঘাত (linear) ও দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণ সমাধানের নির্দেশ দিয়াছেন। আল্-খোয়ারিজ্‌মি ছয় প্রকার সমীকরণের উল্লেখ করেন :

(১) বর্গ মূলের সহিত সমান,—যেমন, $ax^2 = bx$;
(২) বর্গ সংখ্যার সহিত সমান,—যেমন, $ax^2 = c$;
(৩) মূল সংখ্যার সহিত সমান,—যেমন, $bx = c$;
(৪) বর্গ ও মূলে মিলিতভাবে সংখ্যার সহিত সমান,—যেমন, $ax^2 + bx = c$;
(৫) বর্গ ও সংখ্যা মিলিয়া মূলের সহিত সমান,—যেমন, $ax^2 + c = bx$; এবং
(৬) মূল ও সংখ্যা মিলিয়া বর্গের সমান,—যেমন, $bx + c = x^2$ ।

উপরিউক্ত ছয় প্রকার সমীকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, রাশির চিহ্নের অদল-বদলের জন্য সমীকরণের সমাধান-পদ্ধতির যে পরিবর্তন হয় না সেকথা আরবরা তখনও অবগত হয় নাই। তাই একই রাশির চিহ্ন-পরিবর্তন হওয়ায় অন্যান্য রাশি অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও সমীকরণের পৃথক সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিঘাত সমীকরণের যে দুইটি করিয়া সমাধান হয় এবং তন্মধ্যে একটি সমাধান অমূলদ, আল্-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিতে ইহার আলোচনা দেখা যায়। এখন প্রশ্ন, আরবদের মধ্যে এইরূপ বীজগণিতের উদ্ভব হইল কিরূপে? ইহা পুরাপুরি হিন্দুদের নিকট হইতে ধার করা নহে, কারণ রাশিগুলিকে সুবিধামত সমীকরণের একদিক হইতে অন্যদিকে অপসারণ করিয়া প্রত্যেক রাশিকে ধনাত্মক করিবার চেষ্টা হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায় না। সেইরূপ আল্-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিত ডায়োফ্যাণ্টাস্ প্রমুখ গ্রীক বীজগণিতজ্ঞদিগের গবেষণা হইতেও গৃহীত হয় নাই, কারণ ডায়োফ্যাণ্টাস্ দ্বিঘাত সমীকরণের একটিমাত্র মূল লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং অমূলদ রাশিকে তিনি বরাবরই বাদ দিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ও গ্রীক বীজগণিতের উপর নির্ভরশীল না হইলেও প্রধানতঃ এই দুই জাতির বীজগণিতীয় গবেষণা হইতে আল্-খোয়ারিজ্‌মি যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত।

$$x^2 + 10x = 39,$$
$$x^2 + 21 = 10x,$$
$$3x + 4 = x^2.$$

আল্-খোয়ারিজ্‌মি যেসব সমীকরণের সমাধান দিয়াছেন তন্মধ্যে উপরিউক্ত সমীকরণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমীকরণগুলি পরবর্তীকালে আরব্য বীজগণিতজ্ঞগণের লেখায় বহুবার পুনরালোচিত দেখা যায়। ওমর খৈয়াম ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; আবু কামিল ইহাদের আলোচনায় হুবহু আল্-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিতকে অনুসরণ করিয়াছেন। আল্-খোয়ারিজ্‌মি সমীকরণগুলির সমাধান দিয়াছেন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে। উদাহরণস্বরূপ, উপরিউক্ত প্রথম সমীকরণটি ধরা যাক। ইহাকে তিনি এইভাবে ভাষায় ব্যক্ত করেন,—কোন বর্গের (x^2) সহিত তাহার মূলের (x) দশগুণ যোগ করিলে যোগফল হইবে ৩৯। মনে করা যাক $ABCD$ বর্গক্ষেত্রের মূল অর্থাৎ ইহার বাহুর মাপ বাহির করিতে হইবে (১৮নং চিত্র)। এই বর্গক্ষেত্রের চারিটি বাহুর উপর চারিটি আয়তক্ষেত্র এমনভাবে অঙ্কিত করা হউক যাহাতে AE, BG, CI ও KD প্রত্যেকের মান ২·৫ হয়। তাহা হইলে, এই বর্গক্ষেত্র ও চারিটি আয়তক্ষেত্রের সমষ্টির ক্ষেত্রফল হইবে

$$x^2 + (2{\cdot}5 + 2{\cdot}5 + 2{\cdot}5 + 2{\cdot}5)\ x = x^2 + 10x.$$

সমীকরণের নির্দেশ অনুযায়ী এই ফল ৩৯। এইবার EF, GH, IJ ও KL বাহুগুলি দুই দিকে প্রসারিত করিলে $OPQR$ বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন হইবে। এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল
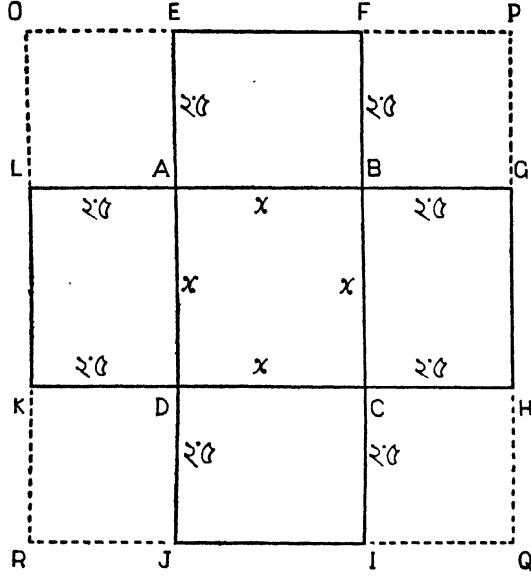
১৮।

৩৯+৪ (২·৫×২·৫)=৬৪। অতএব, PQ বা OP বাহুর মান ৮। সুতরাং AB বা BC বাহুর মান (৮−২×২·৫)=৩; অর্থাৎ x=৩।

সমীকরণের পর বীজগণিতে গুণ ও ভাগ সম্বন্ধে আল্-খোয়ারিজ্‌মি আলোচনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রফলের মাপ-নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা লইয়াও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। তিনি ত্রিভুজ, বৃত্ত ও সামান্তরিকের (parallelogram) ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। এই ক্ষেত্রফল নিরূপণে তিনি π-এর মান ৩$\frac{১}{৭}$ গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে হিন্দুদের কর্তৃক নির্ধারিত $\sqrt{১০}$ ও $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ মানও তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

আল্-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিতের আলোচনা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের অবতারণা দেখা যায়। সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিপাদ্য তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের এক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আল্-খোয়ারিজ্‌মি একটি জ্যোতিষীয় তালিকাও প্রণয়ন করেন; এই তালিকা মাস্‌লামা আল্-মাজরিতি সংশোধন করেন ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই তালিকায় ত্রিকোণমিতির সাইন ও ট্যানজেন্ট কোণানুপাতের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই সাইন কোণানুপাতের ব্যবহার হিন্দু গণিত হইতে গৃহীত; ট্যানজেন্টের ধারণা সম্ভবতঃ প্রখ্যাত আরব্য গণিতজ্ঞ আবুল-ওয়েফা হইতে মাস্‌লামা পরে সংযোজনা করেন।

সমীকরণ সমাধান-ব্যাপারে আরবদের গবেষণা বহু দিন পর্যন্ত এক অতি উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সাধারণভাবে বীজগণিতীয় গবেষণাকে আরবরা যে স্তরে উন্নীত করিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার পর আর বিশেষ কোন উন্নতি সংঘটিত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ল্যাটিন গণিতজ্ঞ লিওনার্দো পিসানো বা ফিবোনাচ্চি আরবদের নিকট তাঁহার বীজগণিত

সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও গবেষণার ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মিশর, লিবিয়া, গ্রীস ও সিসিলি পরিভ্রমণকালে আরব্য বীজগণিত আয়ত্ত করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Liber abaci*- তে আল্-খোয়ারিজ্মির ছয়প্রকার সমীকরণের কথা এবং সাধারণভাবে আরব্য বীজগণিত সংক্রান্ত অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

মূসা ভ্রাতৃত্রয় (নবম শতাব্দীর শেষভাগ)

প্রথিতযশা অনুবাদক ও পণ্ডিত হুনায়েন ইব্ন্ ইশাকের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞানী মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাগদাদে নিজেদের বাসভবনে তাইগ্রিস নদীর পারে বাব্ আত্-তাকে তাঁহারা একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। এই মানমন্দিরে একাদিক্রমে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল তাঁহারা নানাবিধ জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রধানতঃ এই জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্যই তাঁহারা সুপরিচিত। গণিত ও বলবিদ্যাতেও এই তিন ভ্রাতার উচ্চাঙ্গের গবেষণার প্রমাণ আছে। মূসা ভ্রাতাদের কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। তাঁহাদের জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ অপরিজ্ঞাত; যতদূর জানা যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জাফার মুহাম্মদের মৃত্যু হয় আনুমানিক ৮৭২-৩ খৃষ্টাব্দে। ইঁহাদের পিতা মূসা ইব্ন্ শাকির যৌবনে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নাকি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি বিদ্যোৎসাহী খলিফা আল্-মামুনের সহিত পরিচিত হন এবং খলিফার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময় শাকির দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে কাটান। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্র আবু জাফার মুহাম্মদ, আবুল কাসিম আহ্মদ ও আল্-হাসান ইব্ন্ মূসা বিন শাকিরের বিদ্যাশিক্ষার ভার খলিফা আল্-মামুনের উপর অর্পণ করিয়া যান। খলিফা শাকির-পুত্রদের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় পাইয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। ইশাক্ ইব্ন্ ইব্রাহিম, ইয়াহিয়া ইব্ন্ আবি মনসুর প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিকট মূসা ভ্রাতৃত্রয় উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। গ্রীস, বাইজাণ্টিয়াম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করিয়া এবং এইসব দেশে পণ্ডিতদের প্রেরণ করিয়া তাঁহারা বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এইরূপ ভ্রমণের সময়েই হারাণের সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ থাবিত ইব্ন্ কুরার সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে।

মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে তিনজনের নাম প্রায় একই সঙ্গে উল্লিখিত দেখা যায়। ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত গবেষণা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন। তবে যতদূর মনে হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদই সত্যকার প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন এবং জ্যোতিষে ও জ্যামিতিতে বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দেন। তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মধ্যম ভ্রাতা আহ্মদ উৎসাহী ছিলেন বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায়; কনিষ্ঠ আল্-হাসানের প্রিয় বিষয় ছিল জ্যামিতি। পৃথিবীর গোলাকৃতির ভিত্তিতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার কল্পনার দ্বারা এক বিজ্ঞান-সম্মত ভূগোল রচনার চেষ্টা মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের দেখা যায়। জ্যোতিষে ক্রান্তিবৃত্তের তির্যকতা (obliquity of the ecliptic), চক্রবাল হইতে চন্দ্রের তুঙ্গত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁহারা সম্পাদন করেন। একাদশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইব্ন্ ইউনোসের গ্রন্থে তাঁহাদের প্রণীত জ্যোতিষীয় তালিকার ও সূর্যসম্বন্ধীয় নানা তথ্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্যামিতি, কনিক ও পরিমিতি সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক তাঁহারা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলির মধ্যে সমতলক্ষেত্র ও গোলকের জ্যামিতি সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকটি বহুল প্রশংসিত; জেরার্ড অব ক্রেমোনা *Liber trium fratrum de geometria* নাম দিয়া পুস্তকটির এক ল্যাটিন অনুবাদ প্রস্তুত করেন। বলবিদ্যার গবেষণায় মুসলমান বিজ্ঞানিগণের মধ্যে মূসা ভ্রাতৃত্রয়ই অগ্রগণ্য। আর্কিমিডিস্, হীরো ও ফিলোর পর বলবিদ্যায় এই মূসা ভ্রাতৃত্রয়ের কার্যকলাপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং মৌলিকতার

পরিচায়ক। এই অন্তবর্তীকালের মধ্যে এক প্যাপাস্ ছাড়া আর কাহাকেও এই বিদ্যা লইয়া বিশেষ আলোচনাও করিতে দেখা যায় না। তারপর হীরোর গ্রন্থাবলীর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির নানাবিধ কারসাজি; যন্ত্রপাতির বর্ণনা ও আলোচনা প্রসঙ্গে বলবিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বীয় জ্ঞানের যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী আলোচনায় তিনি উৎসাহ দেখান নাই। মুসা ভ্রাতৃত্রয় তাঁহাদের গ্রন্থে বলবিজ্ঞানে ঔপপত্তিক নিয়ম, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির নির্মাণ-কৌশল ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা করেন। এইরূপ একটি গ্রন্থের প্রতিলিপি রোমের ভেটিকানে সংরক্ষিত আছে।* এই পুস্তক রচিত হইবার সম্ভবতঃ কিছু পূর্বে কুস্তা ইব্‌ন্ লুকা হীরোর বলবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন; অনেকের অভিমত, হীরোর গ্রন্থের এই আরবী সংস্করণ মুসা ভ্রাতৃত্রয়কে বলবিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। নানারূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণেও ইঁহারা সুদক্ষ ছিলেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও পূর্তবিদ্যাবিষয়ক দক্ষতার জন্য সাধারণভাবে আরবরা বিখ্যাত। ক্লেপসিড্রা (clepsydra), অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় জলঘড়ি নির্মাণে আরবরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হারুণ অর্-রসিদ এইরূপ একটি জলঘড়ি সম্রাট শার্লেমাইনকে উপহার দিয়াছিলেন।

আল্-কিন্দি (মৃত্যু ৮৭৩)

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন্ ইশাক ইব্‌ন্ আল্-সাব্বাহ্ আল্-কিন্দি, ল্যাটিন আল্-কিন্দাস্, বসরায় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। খলিফা আল্-মামুন ও আল্-মুতাজিমের রাজত্বকালে তাঁহার তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক ৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আল্-কিন্দির মৃত্যু ঘটে।

আল্-কিন্দি আরব্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গ্রীক দর্শনে ও বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। নিওপ্লেটোনিজ্‌মের দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি অ্যারিষ্টটলের দর্শন অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের এমন কোন বিভাগ ছিল না যে সম্বন্ধে তিনি গভীর অধ্যয়ন বা আলোচনা করেন নাই। তিনি প্রায় ২০৭টি (?) ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, ভেষজ, ভূগোল ইত্যাদি প্রায় সব বিদ্যার উপরই তিনি কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু অঙ্কপাতন পদ্ধতি ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি চারিখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কয়েকটি গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার *De aspectibus* শীর্ষক আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। জ্যামিতিক নিয়মে আলোক রেখার গতি, বস্তুদের দৃশ্যমান করিতে চক্ষুর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করেন। রজার বেকন, ভিটেলো প্রমুখ ল্যাটিন ইউরোপীয় বিজ্ঞানিগণ এই গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সঙ্গীতশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা করেন। ধ্বনির উত্থান-পতন নির্দেশ করিবার জন্য তিনি সঙ্কেতের প্রবর্তন করেন।

জেরার্ড অব ক্রেমোনা আল্-কিন্দির অনেকগুলি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় তর্জমা করেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রভাব মধ্যযুগে বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল। কার্দানো বলিতেন, আল্-কিন্দি ছিলেন পৃথিবীর বারজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির একজন।

আল্-ফার্‌ঘানি (আনুমানিক ৮৬১ খৃষ্টাব্দ)

আল্-ফার্‌ঘানি খলিফা আল্-মামুনের সভার একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। তিনি ফার্‌ঘানায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬১ খৃষ্টাব্দেও তাঁহার তৎপরতার কথা জানা যায়।

* *Legacy of Islam*; p. 387.

তিনি পৃথিবীর ব্যাস নির্ধারণ করেন ৬,৫০০ মাইল। গ্রহদের দূরত্ব ও তাহাদের ব্যাস-নির্ণয় তাঁহার আর এক উল্লেখযোগ্য গবেষণা। তিনি টলেমীর মতবাদ ও তাঁহার নির্ণীত ক্রান্তিবিন্দুর অয়নের মান হুবহু গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কিতাব ফি হারাকাত' নামে তাঁহার জ্যোতিষীয় গ্রন্থটি মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদ্‌ মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং রেজিওমণ্টানাসের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় জ্যোতিষ-চর্চার উপর ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। *Divina commedia* য় দান্তে যে জ্যোতিষীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা মুখ্যতঃ আল্‌-ফারঘানি হইতে গৃহীত।

আবু মাশার (নবম শতাব্দী)

নবম শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ্‌ হইলেন বাল্‌খের আবু মাশার। মধ্যযুগে ইউরোপে তিনি আল্‌বুমাশার নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম আনুমানিক ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিনি শতায়ু হইয়াছিলেন। প্রথম জীবন তাঁহার অতিবাহিত হয় প্রধানতঃ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ও আলোচনায়। প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল্‌-কিন্দির সংস্পর্শে আসিয়া প্রৌঢ় বয়সে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁহার চারখানি গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন করেন জোহানেস্‌ হিস্‌পালেন্‌সিস্‌, আদেলার্দ ও হারমানাস্‌ সেকাণ্ডাস্‌। *Introductorium in astronomiam Albumasaris Abalachii octo Continens Libros Partiales* নামে তাঁহার জ্যোতিষীয় গ্রন্থের ল্যাটিন সংস্করণটি মধ্যযুগে ইউরোপে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আউগ্‌স্‌বুর্গ হইতে *Astronomiam Albumasaris* প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৪৯৫ ও ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়। আবু মাশারের *De Conjunctionibus et annorum revolutionibus* পুস্তকটিও বিখ্যাত। হিস্‌পালেন্‌সিস্‌ ও আদেলার্দ ইহা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। অনেকে সন্দেহ করেন, ইহা আল্‌-কিন্দির একটি গ্রন্থের নকল।*

থাবিত ইব্‌ন্‌ কুরা (৮৩৬-৯০১)

সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান জ্যামিতিবিশারদ থাবিত ইব্‌ন্‌ কুরা মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত হারাণে এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। থাবিত ও তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সাবীয়। এই সাবীয় ধর্মসম্প্রদায় নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি জ্যোতিষ্কের উপাসক। প্রাচীন সাবীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি বলিতেন যে, সাবীয়রাই প্রথম কৃষির এবং পরে নগর-সভ্যতার প্রবর্তন করে। আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সাবীয়রাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভবপর করিয়াছিল।

বাইজাণ্টিয়ামে মুসা ভ্রাতৃগণ যখন প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কার্যে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদের সহিত থাবিতের পরিচয় হয়। থাবিতের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয়ে প্রীত হইয়া মুহাম্মদ তাঁহাকে বাগদাদে আসিয়া বিজ্ঞান-চর্চা করিবার জন্য আহ্বান করেন। বলা বাহুল্য এই আহ্বানে থাবিতের জীবনে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। তিনি বাগদাদে আসিয়া নূতন উদ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থাদি তর্জমার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। মুসা ভ্রাতৃগণ তাঁহার জন্য ৫০০ দিনার মাসহারার বন্দোবস্ত করেন এবং খলিফা মুতাজিদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন।

জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতিষে থাবিতের যেমন ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমনি গ্রীক ও সিরীয় ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অনেকগুলি গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থ তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। সেজন্য একজন প্রথম শ্রেণীর অনুবাদক হিসাবেও

* Sarton, *Introduction to the History of Science*, vol. 1 ; p. 568.

থাবিত আরব্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হুনায়েন ইব্‌ন্ ইশাক কর্তৃক অনূদিত ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমীর অ্যাল্‌মাজেস্টের আরবী সংস্করণের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অ্যাপোলোনিয়াসের আট খণ্ডে সমাপ্ত কনিক জ্যামিতির সাত খণ্ড তিনি আরবী ভাষায় তর্জমা করেন; এই আট খণ্ডের মধ্যে তিন খণ্ডের মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি বহুদিন হইতেই নিখোঁজ; একমাত্র কুরার আরবী অনুবাদের কল্যাণেই এই খণ্ডগুলি বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আর্কিমিডিস্ ও থিওডোসিয়াসের কয়েকখানি গ্রন্থও তাঁহার অনূদিত। গণিতে কুরার আরবী অনুবাদগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া থাবিত ন্যায়, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে আরবী ভাষায় প্রায় ১৫০টি পুস্তক এবং সিরীয় ভাষায় প্রায় পনেরটি পুস্তক লেখেন।

মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে গণিতে থাবিত ইব্‌ন্ কুরার কাজ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'Amicable numbers' নামে এক জাতীয় সংখ্যার আবিষ্কারের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি-লাভ করেন। এই আবিষ্কার নাকি এক চৈনিক পরিকল্পনা হইতে উদ্ভূত। সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার একটি অপর আর একটি সংখ্যার গুণকের যোগফল। একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝানো সহজ হইবে। মনে করা যাক,

$$p=3\cdot2^n-1, q=3\cdot2^{n-1}-1,\ \ r=9\cdot2^{2n-1}-1$$

তিনটি মৌলিক সংখ্যা (prime number); n অবশ্য একটি পূর্ণ সংখ্যা। তাহা হইলে, $a=2^n p\,q$ ও $b=2^n r$ এইরূপ যুগ্ম 'অ্যামিকেবল সংখ্যা'। n-এর মান ২ ধরিলে p, q ও r যথাক্রমে ১১, ৫ ও ৭১ হইবে এবং a ও b হইবে যথাক্রমে ২২০ ও ২৮৪। এইরূপ সংখ্যার পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব যে খুব বেশী তাহা নহে, তবে ইহাতে থাবিতের গাণিতিক দক্ষতা সুপরিস্ফুট। মাস্‌লামা আল্-মাজ্‌রিতিও এই ধরনের কিছু গবেষণা পরে করিয়াছিলেন।

'ম্যাজিক স্কোয়ার' বা যাদুবর্গ সম্বন্ধে থাবিতের আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। এই যাদু-বর্গের প্রথম আবিষ্কার ও আলোচনা চীনদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।* চৈনিক ভাষায় ইহার নাম 'লো-শু' (lo-shu)। বিখ্যাত চৈনিক পঞ্চশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত 'আই-কিং'-এ যাদুবর্গের আলোচনা আছে। এক কিংবদন্তী অনুযায়ী সম্রাট ইউ ইহার আবিষ্কর্তা। ইউ পীত নদীতে এক স্বর্গীয় কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশে এইরূপ এক যাদুবর্গ অঙ্কিত দেখিতে পাইয়া ইহার রহস্য সম্বন্ধে অবহিত হন। ১ হইতে ৯ সংখ্যার দ্বারা গঠিত এই যাদুবর্গের একটি নমুনা ১৯নং চিত্রে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থিবদ্ধ কালো বিন্দু বা ক্ষুদ্র বৃত্তের দ্বারা সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যুগ্ম সংখ্যা কালো বিন্দুর দ্বারা এবং অযুগ্ম সংখ্যা বৃত্তের দ্বারা নির্দিষ্ট।

যাদুবর্গের কথা কিরূপে আরবদের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞগণ সম্ভবতঃ যাদুবর্গের কথা জানিতেন; থিওন অব স্মার্ণার রচনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়।† তারপর চীনের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ও গাণিতিক ভাবধারার আদান-প্রদানের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সম্ভবতঃ এই দুই সূত্রের কোন একটি হইতে চৈনিক 'লো-শু'র কথা আরব্য গণিতজ্ঞগণ অবগত হইয়া থাকিবেন।

গণিতে থাবিতের অন্যান্য গবেষণা হইল তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান, প্যারা-বোলয়েডের ঘনফল নির্ণয়, একটি কোণকে সমভাবে ত্রিখণ্ডিত করা ইত্যাদি।

থাবিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও উন্নত ধরনের পর্যবেক্ষণ ও তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সূর্যের উন্নতি বা তুঙ্গত্ব (altitude) ও সৌর বৎসরের দীর্ঘতা তিনি নিরূপণ করেন।

---

* H. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre werke*, 1900.

† Sarton, *Introduction to the History of Science*, vol. I ; p. 272.

জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তাঁহার সূর্যঘড়ি সংক্রান্ত গবেষণা উল্লেখযোগ্য; এই সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার এক গ্রন্থ মধ্যযুগে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।
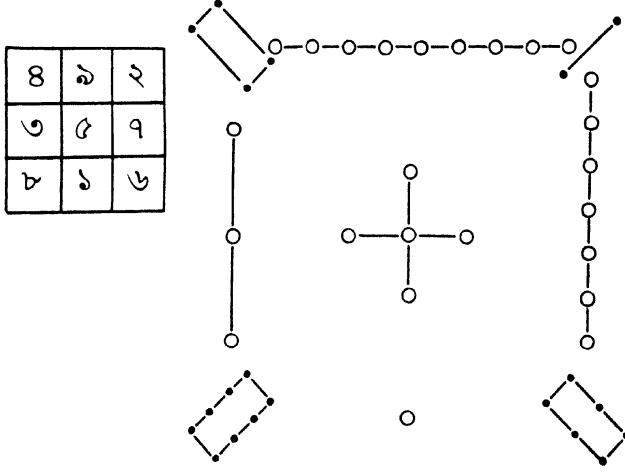
১৯। যাদুবর্গ (লো-শু)।

বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণাতেও থাবিতের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারসাম্য ও তুলাদণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কাজ আছে। উন্নত ধরনের তুলাদণ্ডের উদ্ভাবন ও নির্মাণ তাঁহার এক অন্যতম লক্ষ্য ছিল এবং এ সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ লেখেন, জেরার্ড অব ক্রেমোনা কর্তৃক সম্পাদিত তাহার ল্যাটিন অনুবাদ *Liber carastonis sive de statera* মধ্যযুগীয় ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে তুলাদণ্ড সম্বন্ধে আরব্য বিজ্ঞানিগণ বহু মূল্যবান পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। তুলাদণ্ডের গবেষণার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বস্তুর ভারসাম্য, আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি ধর্ম নির্ণয় ব্যাপারেও আরব্য বিজ্ঞানিগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। থাবিতের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি পরিচয় চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। থাবিতের এক পুত্র আবু সৈয়দ খলিফা আল্-কাহিরের রাজ-চিকিৎসক ছিলেন। থাবিতের বহু শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে খৃষ্টান ইসা ইব্‌ন্ আসাদ সিরীয় ভাষায় লিখিত তাঁহার গ্রন্থগুলির আরবী তর্জমা প্রণয়নের জন্য খ্যাত।

আল্-বাত্তানি (৮৫৮(?)-৯২৯)

নবম শতাব্দীর আরব্য জ্যোতির্বিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য ও মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী মহম্মদ আল্-বাত্তানির জন্ম সিরিয়ার অন্তর্গত বাতানে আনুমানিক ৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। সার্টনের মতে আল্-বাত্তানি ছিলেন, 'the greatest astronomer of his race and time and one of the greatest of Islam.' এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ গণিতেও অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ল্যাটিন ইউরোপে তিনি আল্‌বাতেগ্‌-নিয়াস্ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা মধ্যযুগে এমন কি রেনেশাঁসের

সময়ও ইউরোপের সর্বত্র পণ্ডিত সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং অতীব আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার রচনাবলী অধীত ও আলোচিত হইত। তাঁহার মধ্যে জ্যোতিষ ও গণিতের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে টলেমীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আল্-বাত্তানি টলেমীর জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন, যদিও তাঁহার পদ্ধতি তিনি পুরাপুরি অনুসরণ করেন নাই।

জ্যোতিষ : এণ্টিওকের এক মানমন্দিরে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর তিনি বহু জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদন করেন। এই সকল গবেষণার ফল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *De scientia stellarum* (প্লেটো টিবার্টিনাস্ কর্তৃক ল্যাটিন অনুবাদ), *De numeris stellarum et motibus* প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন তিনি নূতন করিয়া নির্বাচন করেন এবং নব নির্ধারিত মানের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের নির্দেশ দিয়া এক নূতন জ্যোতিষীয় সারণী তিনি প্রস্তুত করেন। এই সারণী আল্-খোয়ারিজ্মি প্রণীত তালিকা হইতে অনেক উন্নততর; গণনা-পদ্ধতিও ভারতীয় পদ্ধতি হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক।* অমাবস্যার প্রারম্ভ, ক্রান্তি-বৃত্তের তির্যকতা, গ্রহণ, নাক্ষত্র বৎসর, লম্বন ইত্যাদি জ্যোতিষীয় মান গণনার ব্যাপারে আল্-বাত্তানির পদ্ধতি যেমন অনেক বেশী জটিল, তাঁহার গণনার ফলও তেমনি আল্-খোয়ারিজ্মির বা অন্যান্য জ্যোতির্বিদের অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল ও নির্ভরশীল।

ত্রিকোণমিতি : গণিতে ত্রিকোণমিতির ঠিক আবিষ্কর্তা না হইলেও ইহার ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রচলনের কৃতিত্ব অবিসংবাদিতভাবে আল্-বাত্তানির প্রাপ্য। সাইন, কোসাইন, ট্যানজেণ্ট, কোট্যানজেণ্ট প্রভৃতি ত্রিকোণমিতির অনুপাতগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া তিনি জ্যোতিষের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 'সাইন' কথাটি ল্যাটিন *sinus* হইতে উদ্ভূত। *Sinus*-এর অর্থ উপসাগর বা উপসাগরবৎ বক্ররেখা; *sinus*-এর অর্থবোধক আরবী শব্দ হইল 'জীব' বা 'জাইব'। এই 'জীব' কথাটি আবার সংস্কৃত 'জ্যা' বা 'জীবা' হইতে উদ্ভূত। টলেমী তাঁহার গণনায় সম্পূর্ণ জ্যা (cord) ব্যবহার করিয়াছেন; আল্-বাত্তানি তৎপরিবর্তে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অর্ধ জ্যা বা 'সাইন' ব্যবহার করেন। সূর্যঘড়ির উপরকার সমতলস্থ ও ঊর্ধ্বতলস্থ ছায়ার ধারণা হইতে তিনি কোট্যানজেণ্ট ও ট্যানজেণ্টের ধারণায় উপনীত হন। ল্যাটিনে এই সমতলস্থ ছায়ার নাম *umbra extensa* ও ঊর্ধ্বতলস্থ ছায়ার নাম *umbra versa*। সূর্যঘড়ির ফলককে তিনি বার ভাগে ভাগ করেন; তাঁহার সমসাময়িক আর একজন জ্যোতির্বিদ্ হাবাশ অবশ্য ইহাকে ৬০ ভাগে ভাগ করেন। যাহা হউক, সূর্যঘড়ির বার ভাগের ভিত্তিতে

$$\text{Cot}\ \theta = 12\frac{\text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$$

নিয়ম প্রয়োগ করিয়া আল্-বাত্তানি কোট্যানজেণ্টের এক তালিকা প্রণয়ন করেন। তারপর সূর্যের উন্নতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহাকে নিম্নোক্ত ত্রিকোণমিতির সূত্র ব্যবহার করিতে দেখি :—

$$\text{Sin}\ (90-\theta) = \frac{\text{Cot}\ \theta.\ 60}{\sqrt{(12^2+\cot^2\theta)}}$$

তিনি ত্রিকোণমিতির আরও যেসব সূত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করেন, তন্মধ্যে

$$\text{Sin}\ \theta = \frac{\tan\ \theta}{\sqrt{(1+\tan^2\theta)}}\ ;\ \text{Cos}\,\theta = \frac{1}{\sqrt{(1+\tan^2\theta)}}$$

* Carra de Vaux, *Legacy of Islam*; p. 388.

উল্লেখযোগ্য। অ্যাল্‌মাজেস্টে প্রদত্ত গোলকের উপরিভাগে অঙ্কিত ত্রিভুজ সংক্রান্ত সমস্ত সূত্রের সহিত তিনি সম্যক্‌ভাবে পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, ত্রিকোণমিতির এইরূপ উন্নতির ফলে বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ জ্যোতিষে, উন্নততর গবেষণার পথ যে কিরূপ সুগম হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে কারা দ্য ভো লিখিয়াছেন, "This brings us very far beyond the point reached by the Greeks and really opens the era of modern science."

দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে নানারূপ রাজনৈতিক গোলযোগের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চায়ও নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সময় আব্বাসীয়রা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়ে এবং পারস্যের বুইয়াইদ্‌রা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাগদাদের শাসনভার হস্তগত করে। সৌভাগ্যবশতঃ বুইয়াইদ্‌রাও বিদ্যার সমাদর করিতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার ব্যাপারে নানাবিধ সুবিধাদানে কার্পণ্য করেন নাই। বুইয়াইদ্‌ আমীর আদুদ-এদ্দৌলা স্বয়ং জ্যোতিষশাস্ত্রে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সারাফ-এদ্দৌলা রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে এক মানমন্দির নির্মাণ করাইয়া সমসময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ ও গণিতজ্ঞদের সেই মানমন্দিরে জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য আহ্বান করেন। আবুল-ওয়েফা, আল্‌-কুহি, আল্‌-সাগানি প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্‌গণ সারাফ-এদ্দৌলার মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেন।

আবুল-ওয়েফা (৯৪০-৯৮)

আল্‌-বাত্তানির গবেষণার ধারা অনুসরণ করেন খোরাসানের আবুল-ওয়েফা। তিনি ডায়োফ্যাণ্টাসের বীজগণিত সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন। বস্তুতঃ আরবদিগের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অনুবাদক। চন্দ্রের অসমতা বা বিভেদ (variation of the moon) আবিষ্কারের সহিত তাঁহার নাম জড়িত। চন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভেদের কথা গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌গণ আলোচনা করিয়াছিলেন, আবুল-ওয়েফা তৃতীয় বিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আবুল-ওয়েফার এই আবিষ্কার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নামজাদা ফরাসী জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে আবুল-ওয়েফা কর্তৃক চন্দ্রের তৃতীয় বিভেদ আবিষ্কার সম্বন্ধে এক দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্যারীর বিজ্ঞান-আকাদেমির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই বিতর্ক ১৮৩৬ হইতে ১৮৭১ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বৎসর চলিয়াছিল এবং বিয়ো, আরাগো, ল্য ভেরিয়ের, জোসেফ বেরত্রাঁ প্রমুখ বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে, আবুল-ওয়েফা সত্যই চন্দ্রের বিভেদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। বর্তমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ চন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভেদের যে পার্থক্য করিয়া থাকেন আরব্য জ্যোতির্বিদ্‌দের সেইরূপ কোন পার্থক্য করিতে দেখা যায় না বলিয়া ওয়েফার আবিষ্কার সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

জ্যোতিষে আবুল-ওয়েফার প্রধান গবেষণা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও গণিতে, বিশেষতঃ ত্রিকোণমিতিতে, তাঁহার মৌলিক অবদান সর্ববাদিসম্মত। তিনি বিভিন্ন কোণের সাইন কোণানুপাত নির্ণয় করিয়া এক সাইন-সারণী প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইহাতে অর্ধ ডিগ্রী কোণের সাইনের মান দশমিকের নয় ঘর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয়। এইভাবে তিনি এক ট্যানজেণ্ট-সারণীও প্রণয়ন করেন। সূর্যঘড়ির ছায়া ত্রিভুজের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি সেকাণ্ট ও কোসেকাণ্ট কোণানুপাত আবিষ্কার করেন। ত্রিকোণমিতিতে তাঁহার সর্বপ্রধান আবিষ্কার—

$$\text{Sin}\,(A+B)=\text{Sin}\,A\cos B+\text{Cos}\,A\,\text{Sin}\,B$$

সূত্রটি। তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্তী ল্যাটিন গণিতজ্ঞগণ এই সূত্রের কথা জানিতেন না।

এমন কি এই সূত্রের তাৎপর্য কোপার্নিকাসেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অধিকতর জটিল পদ্ধতি অবলম্বনে ইহা পুনরাবিষ্কার করেন রেটিকাস্।

জ্যামিতিতেও আবুল-ওয়েফার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অধিবৃত্তের কোয়াড্রেচার (quadrature) সংক্রান্ত নানা জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধান ও প্যারাবোলয়ডের আয়তন নির্ণয় তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণা। জ্যামিতিক অঙ্কন সম্বন্ধে তিনি এক পুস্তক রচনা করেন।

বীজগণিতে ডায়োফ্যাণ্টাসের অনুবাদ তাঁহার প্রধান কাজ। আল্-খোয়ারিজ্মির বীজগণিতের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। আল্-খোয়ারিজ্মির সময় হইতে আবুল-ওয়েফার কাল পর্যন্ত বীজগণিতে মুসলমানদের মধ্যে উন্নত ধরনের গবেষণা বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। ডায়োফ্যাণ্টাসের অনুবাদের ফলে আরবদের মধ্যে নূতন করিয়া বীজগণিতীয় চর্চায় উৎসাহের সঞ্চার হয়।

আল্-কুহি, আল্-সাগানি, আবুল-জুদ, আল্-খোজান্দি ও আল্-কারখি

এই সময়কার অন্যান্য আরব্য গণিতজ্ঞদের মধ্যে আল্-কুহি, আল্-সাগানি, আবুল-জুদ, আবু মহম্মদ আল্-খোজান্দি ও আল্-কারখির নাম উল্লেখযোগ্য। আল্-কুহি ও আল্-সাগানি সারাফ-এদ্দোলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের মানমন্দিরে গবেষণা করেন। এঁরা উভয়েই জ্যামিতিক গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ। আল্-কুহি আর্কিমিডিস্ ও অ্যাপোলোনিয়াসের গণিত ও জ্যামিতি বিশেষ যত্নের সহিত আয়ত্ত করেন। দুইটি বিভিন্ন গোলকের দুইটি অংশ (segment) A ও B দেওয়া থাকিলে A গোলকাংশের ঘনর (volume) সমান এবং B গোলকাংশের পৃষ্ঠের (surface) সমান করিয়া কিভাবে আর একটি গোলকাংশ তৈয়ারী করা যায়, এজাতীয় জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান তিনি করিয়াছেন। আল্-সাগানি একটি নির্দিষ্ট কোণকে সমভাবে ত্রিখণ্ডিত করিবার সাধারণ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইহা জ্যামিতির একটি সুকঠিন সম্পাদ্য ছিল। ইহার সমাধানে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

আবুল-জুদ একাদশ শতকের প্রথম ভাগের লোক। তাঁহার গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল জ্যামিতি। আবু কামিলের (মৃত্যু ৮৫০) অনুসৃত পন্থায় তিনি বহুভুজের নানারূপ সমস্যার সমাধানকল্পে জ্যামিতি প্রয়োগ করেন। বহুভুজের মধ্যে সপ্তভুজ ও নবভুজ সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়; ইহার মধ্যে সুষম সপ্তভুজের (regular heptagon) বাহুর পরিমাণ নির্ধারণের কথা উল্লেখযোগ্য। এই নির্ধারণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়

$$x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$$

সমীকরণটি তিনি সমাধান করেন। ইহা একটি তৃতীয় মাত্রার সমীকরণ। ইহার সমাধানের দ্বারা তিনি উপরিউক্ত সুষম সপ্তভুজের বাহুর পরিমাণ নির্ধারণে সক্ষম হন। তাঁহার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গবেষণা হইল কোণকে ত্রিখণ্ডিত করা। কনিক জ্যামিতির সাহায্যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেন। একটি অধিবৃত্ত (parabola) ও সমবাহু পরাবৃত্তের (equilateral hyperbola) ছেদন দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়।

আবু মহম্মদ আল্-খোজান্দির (মৃত্যু ১০০০) প্রসিদ্ধি প্রধানতঃ বীজগণিতীয় গবেষণার জন্য। তিনি নানা প্রকার সমীকরণের সমাধান করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে, মূলদ সংখ্যার ধারণা অনুসারে দুইটি ত্রিঘাত সংখ্যার যোগফল আর একটি ত্রিঘাত সংখ্যার সমান হইতে পারে না। অর্থাৎ,

$$x^3 + y^3 \neq z^3$$

প্রখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ফেরমা ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার নামানুসারে ইহা ফেরমার সর্বশেষ প্রতিপাদ্য নামে পরিচিত। আল্-খোজান্দির প্রমাণ নিখোঁজ হইয়াছে এবং অনেকের

মতে তাঁহার প্রমাণে কিছু কিছু দোষ ছিল। $x^3+y^3=z^3$ সমীকরণের সমাধান যে অসম্ভব, বাহাউদ্দিন নামে আর একজন মুসলমান গণিতজ্ঞ সে কথা বলিয়াছিলেন। আল্-খোজান্দি জ্যোতিষ সম্বন্ধেও কিছু কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি এক সেক্সটান্ট তৈয়ারী করিয়া তাহার সাহায্যে সূর্যের সর্বাধিক উন্নতি নির্ধারণ করেন। তাঁহার এক পর্যবেক্ষণ অনুসারে ক্রান্তিবৃত্ত ও ভূবিষুববৃত্তের অন্তর্বর্তী কোণের পরিমাণ ২৩° ৩২′ ২১″ নির্ধারিত হইয়াছিল।

বাগদাদের আল্-কার্খি (মৃত্যু ১০২৯) দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বীজগণিতজ্ঞদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি 'আল্-কাফি ফিল্-হিসাব' নামে একটি পাটীগণিতের এবং 'আল্-ফাখ্রি' নামে একটি বীজগণিতের গ্রন্থ রচনা করেন। 'আল্-ফাখ্রি' আরবী ভাষায় বীজগণিতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা মৌলিক। বীজগণিতে তিনি বহুলাংশে ডায়োফ্যান্টাস্কে অনুসরণ করেন এবং তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতি বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করেন। তিনি উচ্চতর মাত্রার বহু সমীকরণের সমাধানের জন্য বিখ্যাত। এইরূপ এক উচ্চমাত্রার সমীকরণ হইতেছে :

$$x^{2n}+ax^n=b$$

এজাতীয় উচ্চমাত্রার সমীকরণের সমাধানকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম। তারপর দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান তিনি দিতেন জ্যামিতি ও পাটীগণিত উভয় পদ্ধতি অবলম্বনে।

বিভিন্ন শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় করিবার কতকগুলি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে একই শক্তির ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় সংক্রান্ত সূত্রগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ

$$1^2+2^2+3^2+.\ .\ .\ .\ .+n^2=(1+2+3+.\ .\ .\ .\ .+n)\frac{2n+1}{3}$$
$$1^3+2^3+3^3+.\ .\ .\ .\ .+n^3=(1+2+3+.\ .\ .\ .\ .+n)^2$$

সূত্রগুলি এবং তাহাদের প্রমাণ আল্-কারখি উদ্ভাবন করেন।

আল্-কারখির বীজগণিতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভারতীয় গণিতজ্ঞগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত অনির্ণেয় সমীকরণের (indeterminate equation) কোন প্রকার আলোচনা বা উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার 'আল্-কাফি ফিল্-হিসাব' পাটীগণিতে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় নাই, সে জায়গায় সংখ্যা লিখিত হইয়াছে পুরাপুরি গ্রীক পদ্ধতি অনুসারে। আবুল-ওয়েফার এক পাটীগণিতের আলোচনাতেও ভারতীয় সংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। একই যুগে একদল আরব্য গণিতজ্ঞের দশমিক স্থানিক এবং অপর একদলের গ্রীক অঙ্কপাতন পদ্ধতির ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মতবাদের অবতারণা এপর্যন্ত হইয়াছে। একই সময়ে দ্বিবিধ সংখ্যা-লিখন প্রথার প্রচলনের কারণ এখনও সঠিক জানা যায় না। ক্যান্টরের অভিমত, সংখ্যা-লিখন ব্যাপারে গণিতজ্ঞরা দুই দলে বিভক্ত ছিল; একদল ছিল গ্রীক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী, আর একদল অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতিকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

৫·২। মিশরের ফাতিমিদ খলিফাদের বিদ্যোৎসাহিতা—ইব্‌ন্ ইউনোস্ ও আল্-হাইথাম

ইব্‌ন্ ইউনোস্ (মৃত্যু ১০০৯)

মুসলমানদের আমলে মিশরও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার দিক হইতে পশ্চাৎপদ ছিল না। এই সময় কায়রো জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বজ্জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেসব মুসলমান পণ্ডিতের তৎপরতায় মিশর এরূপ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিল,

তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন্ ইউনোস্ ও ইব্‌ন্ আল্-হাইথামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উভয়ই একাদশ শতাব্দীর মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন।

হাকিমী ফলক : জ্যোতিষ ও গণিত সম্পর্কিত কতকগুলি ফলক তৈয়ারী করিবার জন্য ইউনোসের প্রসিদ্ধি। এই ফলকগুলি 'হাকেমাইট ফলক' (Hakemite Tables) নামে পরিচিত। মিশরের ফাতিমিদ খলিফা আল্-আজিজ্ (৯৭৫-৯৬) ইউনোসের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া জ্যোতিষীয় ফলক প্রণয়নের কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। আনুমানিক ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনোস্ এই ফলক প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেন এবং ইহা সমাপ্ত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর। আল্-আজিজের পুত্র ও পরবর্তী ফাতিমিদ খলিফা আল্-হাকিমের নামানুসারে ফলকের নামকরণ হইয়াছিল 'আল্-জিজ্ আল-কবির আল-হাকিমী' বা সংক্ষেপে হাকিমী (ইংরেজী 'হাকেমাইট') ফলক। এই ফলক এইরূপ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে, প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্‌গণ সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল ফলক হিসাবে ইহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্‌দের পর্যবেক্ষণ ছাড়া ইউনোস তাঁহার নিজের অনেক পর্যবেক্ষণের ফলও এই ফলকে লিপিবদ্ধ করেন। ত্রিকোণমিতির ব্যবহারেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গোলীয় ত্রিকোণমিতির অন্তর্ভুক্ত বহু জটিল সমস্যার সমাধান নির্ণয়ে তিনি সফলকাম হন। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ আবুল-ওয়েফার তিনি সমসাময়িক ছিলেন। জ্যোতিষে ও গণিতে ইউনোসের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা সম্বন্ধে ওয়েফা বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। এই সম্পর্কে মিশরের ফাতিমিদ খলিফাদের বিদ্যোৎসাহিতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যে কেবল ইউনোস ও আল্-হাইথামের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানিগণের গবেষণার নানা সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের অনুকরণে কায়রোতে একটি জ্ঞান-গৃহ বা 'দার আল্-হিখ্‌মা' তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান-গৃহেরই একাংশে ইউনোসের জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদের পর ইহাই ছিল মুসলিম জগতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ একাডেমী বা বিদ্যাপীঠ। ফাতিমিদ খলিফাদের প্রাধান্যের শেষ ভাগ পর্যন্ত (১১৭১) দেড় শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল এই বিদ্যাপীঠ সক্রিয় ছিল।

ইব্‌ন্ আল্-হাইথাম (৯৬৫-১০৩৯)

ইব্‌ন্ আল্-হাইথামের প্রসিদ্ধি প্রধানতঃ পদার্থবিদ্ হিসাবে। ল্যাটিন ইউরোপে তিনি আল্-হাজেন নামে পরিচিত ছিলেন। আলোক সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আল্-হাজেনের আলোক সংক্রান্ত গবেষণা মধ্যযুগে রজার বেকন এবং রেণেশাঁসের সময় কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। গণিতেও তাঁহার গবেষণা উচ্চশ্রেণীর। তিনি আর্কিমিডিসের নিঃশেষীকরণ পদ্ধতিতে (method of exhaustion) প্যারাবোলয়েডের ঘনফল নির্ণয় করেন। চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি অ্যারিস্টটল ও গ্যালেনের উপর কয়েকটি টীকা লেখেন।

আল-হাজেনের আদি বাস ছিল বস্‌রায়। ফাতিমিদ খলিফা আল্-হাকিম কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি কায়রোতে আসেন। নীলনদের বাৎসরিক বন্যা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই এবং এই অকৃতকার্যতার জন্য স্বভাবতঃই তিনি খলিফার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। শুনা যায়, খলিফার রোষ এড়াইবার জন্য তিনি মস্তিষ্ক-বিকৃতির ভান করিয়া আল্-হাকিমের মৃত্যু পর্যন্ত কোনও রকমে আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

আলোকবিজ্ঞান : আল্-হাইথামের বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক খ্যাতি তাঁহার আলোক সংক্রান্ত

গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'কিতাব আল্‌-মনাজির' নামক গ্রন্থে তাঁহার এইসব গবেষণা লিপিবন্ধ হয়। বহুদিন পর্যন্ত 'কিতাব আল্‌-মনাজিরে'র মূল আরবী সংস্করণের কোন হদিস পাওয়া যায় নাই, ইহাতে বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, হয়ত বা মূল আরবী সংস্করণ একেবারেই হারাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, মূল আরবী সংস্করণের একটি প্রতিলিপি সম্প্রতি ইস্তাম্বুলে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই প্রতিলিপির উপর গবেষণা করিয়া এম. নাজিফ বে আল্‌-হাইথামের উপর একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।* অবশ্য আরবী সংস্করণ বহুদিন পর্যন্ত নিখোঁজ হওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। ল্যাটিন অনুবাদের কল্যাণে তাঁহার গবেষণার প্রতিটি খুঁটিনাটি যথাযথ সংরক্ষিত হইতে পারিয়াছে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাস্‌ল্ হইতে 'কিতাব আল্‌-মনাজিরে'র ল্যাটিন অনুবাদ *Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri septum* প্রথম প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগে আলোকবিজ্ঞানে উৎসাহী ও কৌতূহলী বিজ্ঞানীমাত্রেরই প্রধান অবলম্বন ও অনুপ্রেরণার উৎস ছিল আল্‌-হাইথামের গ্রন্থ। রবার্ট গ্রোসেটেস্ট, জন পেখাম, রজার বেকন, ভিটেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, জোহানেস্ কেপ্‌লার প্রমুখ প্রখ্যাত ইউরোপীয় বিজ্ঞানিগণ এই গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াই আলোকের ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আল্‌-হাইথামের সময় পর্যন্ত আলোকবিজ্ঞানে ইউক্লিড ও টলেমীর ভ্রান্ত মতবাদগুলিই বিনা প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল। আল্‌-হাইথাম সর্বপ্রথম এইসব মতবাদের অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউক্লিড ও টলেমীর ধারণা ছিল, চক্ষু হইতে একপ্রকার দৃশ্যমান রশ্মি নির্গত হইয়া বস্তুর উপর পতিত হইলে বস্তু প্রকট হয়।† তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন, বস্তু হইতে নির্গত রশ্মি চক্ষুর উপর পতিত হইয়া বস্তুকে দৃশ্যমান করিয়া থাকে। বহুদিনের এক বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা তিনি দূর করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার এই মত অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হয় নাই। আরব্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে আল্‌-বীরুণী, ইব্‌ন্ সিনা প্রমুখ অল্প কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ছাড়া সমসময়ের অধিকাংশ পণ্ডিতই তাঁহার মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আলোক-প্রবাহ, আলোকের সহিত বিভিন্ন রং-এর সম্পর্ক, আলোকের প্রতিসরণ ও প্রতিফলন এবং এই প্রতিসরণ ও প্রতিফলনজনিত নানাবিধ দৃষ্টিভ্রম ও মরীচিকা সম্বন্ধে আল্‌-হাইথাম বহু নূতন পরীক্ষা সম্পাদন ও তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে টলেমী যে সূত্র‡ আবিষ্কার করেন, তাহা যে শুধু অতি ক্ষুদ্র প্রতিসরণ-কোণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বৃহত্তর কোণের বেলায় এই নিয়ম যে খাটে না, তিনি ইহা প্রমাণ করেন। গোলাকৃতি স্বচ্ছ কাচখণ্ড অথবা গোলাকার পাত্রে অবস্থিত জলের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা তিনি করেন। এইভাবে লেন্‌সের সাহায্যে দেখিলে বস্তুর আকৃতির ও আয়তনের যে আপাত-পরিবর্তন ঘটে, তাহার নিয়ম তিনি প্রায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

একটি হাল্‌কা স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অপেক্ষাকৃত ভারী আর একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময় আলোকের যে প্রতিসরণ বা দিক্‌পরিবর্তন হয়, তাহার কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে আল্‌-হাইথাম বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমে আলোকের বেগের তারতম্যই আলোক-প্রতিসরণের কারণ। ভারী অপেক্ষা হাল্‌কা মাধ্যমে আলোকের বেগ যে দ্রুততর হইয়া থাকে তিনি ইহা নির্ভুলভাবে আন্দাজ করিয়াছিলেন এবং ইহার ভিত্তিতে এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময় আলোকরশ্মি কোন দিকে কি পরিমাণ বাঁকিয়া যায় তাহাও সঠিকভাবে নির্ণয় করেন।

---

* H. J. J. Winter, 'The Arabic Achievement in Physics', *Endeavour*, April, 1950 ; p. 76-79.

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, ২০৬।

‡ টলেমীর সূত্র : $A = lB - cB^2$; A — আপতন কোণ, B — প্রতিসরণ কোণ, l — প্রতিসরাঙ্ক, এবং c — একটি ধ্রুবক।

আমরা জানি, নিউটনও এবিষয়ে ঠিক কথা বলিতে পারেন নাই। ভারী মাধ্যমে আলোকের বেগ দ্রুততর হইয়া থাকে, তাঁহার এইরূপ প্রত্যয় হইয়াছিল। যে পথে গেলে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে আলোক-প্রবাহ সম্ভবপর হয়, আলোক যে সেই পথেই চলিয়া থাকে, আল্-হাইথাম এই মন্তব্য করেন। আলোকের গতিপথ সম্বন্ধে পরবর্তী-কালে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী ফেরমা যে ন্যূনতম সময়ের সিদ্ধান্ত (principle of least

كما ان الفصل المشترك بينه وبين السطح المقعر هو خط ا ج و وقد كان الفصل
المشترك بين السطح الذي انطبق عليه وصار معه سطحا واحدا وبين السطح
المقعر هو خط ا ح ه فخط ا ب ج ينطبق على خط ا ح ه ويصيران
خطا واحدا ويصير السطح كله مساويا للسطح فخط ا ه
هو قطع مكافئ مساو لقطع ا ب د وسهمه ا د وذلك
ما اردنا ان نبين ه
اكل سطح مقعر تقعير الجسم المكافي ينفصل من طرف سهمه
مثل ربع الضلع القائم للقطع الذي احدثه فان كل خط يخرج موازيا للسهم وينتهي
الى السطح المقعر وينعطف الى تلك النقطة فانه يحيط مع الخط المماس للسطح المقعر

الى جميع بسيط السطح المرئي على خطوط متوازية للسهم فاقول ان جميعها
ينعكس الى نقطة ح ولان سطح ا ر ه ب سطح مقعر تقعير الجسم المكافي

يكون جميع الخطوط الموازية للسهم اذا انتهت اليه وانعكست الى نقطة ح
احاطت مع الخطوط المستقيمة التي تخرج في سطوحها مماسة للسطح المقعر بزوايا
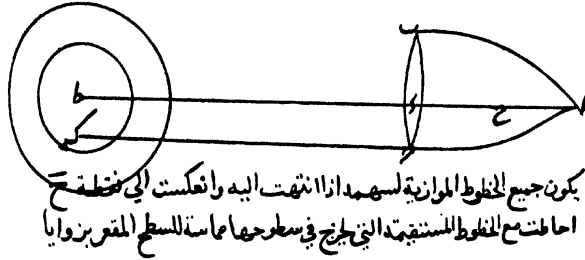
২০। ইব্‌ন্ আল্-হাইথাম রচিত 'কিতাব আল্-মনাজির' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা। নীচের চিত্রে সমান্তরাল সূর্যরশ্মি অধিবৃত্তাকৃতি দর্পণের উপর পতিত হইয়া কিভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা দেখানো হইয়াছে।

time) প্রস্তাব করেন, আল্-হাইথামের উপরিউক্ত মন্তব্যে সে আভাস সুপরিস্ফুট। তারপর আলোকের আপতন ও প্রতিসরণপথ এবং দুই মাধ্যমের অন্তর্বর্তী সমতলের উপর অঙ্কিত সরল রেখা যে একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থান করে, তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এতদূর অগ্রসর হইয়াও আল্-হাইথাম অবশ্য আপতন ও প্রতিসরণ কোণের মধ্যে সাইন কোণানুপাতের সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লাইডেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ওলন্দাজ ভিলব্রোর্ড স্নেল (১৫৯১-১৬২৬) এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অবিষ্কার করেন। আল্-হাইথামের এইসব পরীক্ষার গুরুত্ব ও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা আমরা তখনই যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারি যখন দেখা যায়, তাঁহার তিনশত বৎসর পরে অনুরূপ পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া স্নেল, দেকার্ত প্রমুখ ইউরোপীয় বিজ্ঞানিগণ আলোক প্রতিসরণের প্রকৃত নিয়ম, লেন্সের ব্যবহারে বস্তুর আয়তন-পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গোলাকৃতি প্রতিফলক হইতে আলোক প্রতিফলনের নিয়ম এবং বস্তু ও তাহার প্রতিকৃতির সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত সমস্যাটি প্রস্তাব করেন। "একটি গোলকের অবতল (concave) অথবা উত্তল (convex) পৃষ্ঠ কিংবা একটি সিলিণ্ডারের বা শঙ্কুর বহির্ভাগ প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে; এখন এমন একটি বিন্দু বাহির করা হউক যেখানে একটি বস্তু সংস্থাপন করিলে একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে এই বস্তুর প্রতিকৃতি দেখা যাইবে।" সমস্যাটির নাম 'আল্-হাজেন সমস্যা'। ইহার সমাধান করিতে হইলে চতুর্ঘাত সমীকরণের (equation of the fourth degree) সমাধান প্রয়োজন। আল্-হাইথাম পরাবৃত্তের (hyperbola) সাহায্যে এইরূপ সমীকরণের সমাধান বাহির করিয়া উপরিউক্ত সমস্যার সমাধান করেন।

আলোকের বাহ্যিক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আরও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। একপ্রকার অগ্নির সহিত তিনি আলোকের তুলনা করেন; এই অগ্নি বৃত্তাকার বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের শেষ সীমা হইতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। *On Twilight Phenomena* পুস্তকে* বায়ুমণ্ডল ঊর্ধ্বে দশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন। রামধনু, বস্তুর ছায়াপাত, গ্রহণ প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। *On the Burning of Glass* পুস্তকে ডাই-অপ্ট্রী প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনায় আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ ও তাহার নানা দোষ, যেমন গোলাপেরণ (spherical aberration), বর্ণাপেরণ (chromatic aberration), প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। ইউক্লিড ও টলেমীর আলোক সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা, অ্যারিষ্টটলের *Physics*-এর উপর লিখিত এক ভাষ্য আল্-হাইথামের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আল্-হাইথামের গবেষণায় ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সময়কার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিগণের গবেষণার ধারা পরিলক্ষিত হয়। যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচ্ছন্নভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সম্পাদনের ব্যাপারে তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পরীক্ষালব্ধ তথ্যরাজি আলোচনার সময় তিনি তেমনই আবার গণিতের নির্ভুল পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই বীজগণিত ও জ্যামিতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িলে মনে হইবে, ইহা যেন সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কোন বিখ্যাত ইউরোপীয় পদার্থবিদের রচনা। বস্তুতঃ গ্যালিলিওর গবেষণা ও রচনা-পদ্ধতির সহিত আল্-হাইথামের বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ও রচনার সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়।

আল্-বীরূণী (৯৭৩-১০৪৮)

গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্, চিকিৎসাবিশারদ, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আবু রৈহান মহম্মদ ইব্‌ন্ আহ্‌মদ আল্-বীরূণী আরব্য প্রতিভার আর এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম মনীষীর কথা আমরা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি। দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রথিতযশা

---

* জেরার্ড অব ক্রেমোনা কর্তৃক অনূদিত এই গ্রন্থের ল্যাটিন নাম *De crepusculis et nubium ascensionibus*; ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে লিসবন হইতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

মুসলমান বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের তিনি অন্যতম, সম্ভবতঃ অগ্রগণ্য। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আল্-বীরূণীর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।*

খারিজ্মের (বর্তমান খিভা) উপকণ্ঠে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ৩৬২) আল্-বীরূণীর জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যাবস্থা ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয় পারস্যের নানারূপ রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে। জন্মভূমি খারিজ্ম ছাড়া জুরজান, গজনী ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার কর্মময় জীবনের ছাপ পড়িয়াছে। পারস্যের মুসলমান শাসকগণ ও গজনীর সুলতানদের নিকট হইতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সৌভাগ্য ঘটিলেও বিজ্ঞান-সাধনার পথে আল্-বীরূণীকে সময় সময় নানারূপ আর্থিক অসুবিধাও যে ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার রচনার অনেক জায়গায় ইহার আভাস পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কি কি গুণ ও অবস্থার যোগাযোগ আবশ্যক সেই সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "বাল্যাবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ, নানা ভাষার জ্ঞান, দীর্ঘজীবন, এবং নানাদেশে ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন ও প্রয়োজনমত পুস্তকাদি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার সামর্থ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিদ্ধিলাভের উপায়। এইরূপ উপায় ও অবস্থার একত্র যোগাযোগ কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যে কদাচিৎ সম্ভবপর হয়, বিশেষতঃ আমাদের এই যুগে। আমার তাই মনে হয়, প্রাচীন বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কার্য-কলাপের আলোচনায় এবং তাঁহাদের গবেষণা ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনের চেষ্টায় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। এই ব্যাপারে মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করাই হইবে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ। ইহার অধিক কিছু করিবার চেষ্টা করিলে নিঃস্ব ও বিপন্ন হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।" আল্-বীরূণীর এই উপদেশ সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার সময় হইতেই আরব্য বিজ্ঞানের অধোগতি সুরু হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমশঃই সংকুচিত হইয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা পোষণ এবং সমসাময়িক কালের প্রতিভাকে ছোট করিয়া দেখিবার মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে এই অধোগতির পরিচায়ক। আল্-বীরূণী প্রকারান্তরে ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

আল্-বীরূণী প্রণীত প্রাচীন জাতিদের ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী 'কিতাব আল্-আথার আল্-বাকিয়া অনি-ল-কুরূণ আল্-খালিয়া' (*Chronology of Ancient Nations*) ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'তারিখ আল্-হিন্দ'-এর কথা সুবিদিত। ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ইহাদের তর্জমা ও একাধিক সঙ্কলন বর্তমান। কিন্তু তাঁহার গণিত, জ্যোতিষ, কিংবা পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর তর্জমা ও প্রকাশন এই পর্যন্ত হয় নাই। 'আল্-কানুন আল্-মাসুদি' নামক তাঁহার এক জ্যোতিষীয় বিশ্বকোষে তিনি এইসব গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গণিতে ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত গবেষণাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ০° হইতে ৯০° ডিগ্রী পর্যন্ত প্রতি ১৫′ মিনিট অন্তর বিভিন্ন কোণের সাইন অনুপাত নির্ণয় করিয়া এক সাইন-সারণী প্রণয়ন করেন। সাইনের মান তিনি দশমিকের সপ্তম স্থান পর্যন্ত নির্ভুলভাবে কষিবার চেষ্টা করেন। এইভাবে তিনি এক ট্যানজেন্ট-সারণীও তৈয়ারী করেন। ত্রিকোণমিতির আলোচনা প্রসঙ্গে

$$\frac{\text{Sin } A}{a} = \frac{\text{Sin } B}{b} \quad \text{Cos } A = \text{Cos } a \text{ Sin } B\,; \quad \text{Cos } C = \text{Cot } A \text{ Cot } B$$

প্রভৃতি ত্রিকোণমিতির নানাবিধ সূত্রের ব্যবহার তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। মারাঘার নাসির আল্-দিন আত্-তুসিও এই জাতীয় বহু সূত্র ব্যবহার করেন। আত্-তুসির ত্রিকোণমিতির

* Al-Beruni was the greatest intellect that ever lived on this earth"—E. Sachau, *Al-Beruni's India*.

বহুল প্রকাশ ও প্রচারের ফলে এইসব সূত্রের আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রধানতঃ তাঁহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। এই সূত্রগুলি উদ্ভাবনে আল্-বীরুণীর কৃতিত্ব কতদূর তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই।

জ্যামিতিতে কোণকে ত্রিখণ্ডিত করিবার সমস্যা লইয়াও আল্-বীরুণী গবেষণা করেন। ভারতীয় সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার রচনা মধ্যযুগের লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

পদার্থবিজ্ঞানে আল্-বীরুণীর শ্রেষ্ঠ গবেষণা আঠারটি মূল্যবান প্রস্তর ও ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) নির্ধারণ। নির্ভুলভাবে তিনি এই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন। খনিজ সম্বন্ধীয় গবেষণায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। নানা দেশ হইতে প্রস্তরখণ্ড, ধাতু ও খনিজ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদের বর্ণনা, বাহ্যিক ধর্ম, বাণিজ্যিক মূল্য ও ঔষধ হিসাবে সম্ভাব্য ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে তিনি নানা পরীক্ষা ও পরিমাপ গ্রহণ করেন। অক্ষাংশ ও দেশান্তরের নির্ভুল পরিমাপ গ্রহণ ছিল এইসব পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন অঞ্চলের অক্ষাংশ ও দেশান্তর লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি কয়েকটি মূল্যবান তালিকা প্রস্তুত করেন। স্বাভাবিক প্রস্রবণের উৎপত্তি, নদী, নালা ও খালের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন।

ভেষজ ও মেটিরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে 'কিতাব-ই-সায়দানা' নামে আল্-বীরুণী এক গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগে এই গ্রন্থের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহাতে ভারতীয় ও চৈনিক ভেষজের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

ওমর খৈয়াম (১০৪৫-১১২৩)

ওমর খৈয়ামের পুরা নাম উমর ইব্‌ন্ ইব্রাহিম আল্-খায়ামি। বিশ্ববিশ্রুত কবি ও সাহিত্যিক ওমর খৈয়ামের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ব্যাপার রীতিমত বিস্ময়কর। একই ব্যক্তিতে এরূপ কবি-প্রতিভার সহিত এরূপ অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আরব্য বীজগণিত ওমরের প্রতিভার স্পর্শে উন্নতির চরম শিখরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল; জ্যামিতির প্রয়োগেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। বীজগণিতীয় ও জ্যামিতিক গবেষণায় তিনি যে উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়া যান, তাঁহার পরবর্তী আরব্য গণিতজ্ঞদের পক্ষে সেই উচ্চ মান রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। বস্তুতঃ আল্-কারখি ও ওমরের পর হইতে আরব্য গাণিতিক গবেষণা পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে।

ওমর খৈয়ামের বীজগণিত* আল্-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিত অপেক্ষা বহু বিষয়ে অনেক উন্নত ধরনের। আল্-খোয়ারিজ্‌মি ও ওমরের অন্তর্বর্তীকালে আরব্য বীজগণিতের যে কি পরিমাণ উৎকর্ষ সাধন ঘটিয়াছিল, এই গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। তারপর গণিতের এই বিভাগে গ্রীকদের তুলনায় আরবরা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ওমরের বীজগণিতের পর্যালোচনা করিলে সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। কারা দ্য ভো প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, যথেষ্ট মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নাকি ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

বীজগণিত : ওমর খৈয়ামের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয়। ত্রিঘাত সমীকরণগুলিকে তিনি মোট ২৭টি শ্রেণীতে ভাগ করেন; এক একটি শ্রেণীকে আবার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়। সমীকরণে কয়টি করিয়া পদ (term) থাকিবে সেই হিসাবে শ্রেণী-

---

*এই বীজগণিত ভোয়েপ্‌কে কর্তৃক ফরাসী ভাষায় *L'algèbre d'Omar Alkhayyami* নামে অনূদিত ও সঙ্কলিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে।

বিভাগ করা হইত, যেমন ত্রিপদ (trinomial), চতুষ্পদ (quadrinomial) সমীকরণ ইত্যাদি। চতুষ্পদ সমীকরণের কয়েকটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

$$x^3 + bx^2 = cx + d$$
$$x^3 + cx = bx^2 + d$$
$$x^3 + d = bx^2 + cx$$

এই জাতীয় সমীকরণের সমাধানকল্পে ওমরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রধানতঃ জ্যামিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যামিতির প্রয়োগের দ্বারা নানা বীজগণিতীয় সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা অবশ্য সাধারণভাবে আরব্য গণিতজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য। এই প্রচেষ্টায় ওমর আবার তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এরূপ প্রচেষ্টা হইতে একপ্রকার বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির উদ্ভব ঘটে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক দেকার্ত কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি হইতে ইহা নানা বিষয়ে পৃথক হইলেও, এরূপ জ্যামিতির প্রথম আলোচনার কৃতিত্ব আরবদের প্রাপ্য।

ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানের জন্য কনিক রেখার অবতারণা করিতে হয়। উপরিউক্ত সমীকরণ-গুলির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুইটি পরাবৃত্তের (hyperbola) সাহায্য লইতে হয়। পরাবৃত্ত দুইটির প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ হইবে এবং তাহারা পরস্পরকে ছেদ করিবে কিনা, ইহা নির্ভর করে x^2 এর গুণক bর মানের উপর।

কনিক জ্যামিতির সাহায্যে ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা গ্রীক গণিতজ্ঞ মেনেকমাসের মধ্যেও কিছুটা দেখা যায়। তিনি $x^3 - 2a^3 = 0$ এই সমীকরণে x-এর মূল নির্ধারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ। একটি ঘনর দ্বিগুণ আয়তনের আর একটি ঘন কিরূপে রচনা করা যায়, ইহাই ছিল তাঁহার সমাধানের আসল উদ্দেশ্য, সাধারণভাবে বীজগণিতের কোন ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান-নির্ণয় নহে। যাহা হউক, কনিক জ্যামিতির সাহায্যে ওমর যেরূপ দুরূহ ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করিতেন তাহাতে এই জ্যামিতির উপর তাঁহার যে পরিপূর্ণ দখল ছিল, বিশেষতঃ অ্যাপোলোনিয়াস প্রমুখ গ্রীক গণিতজ্ঞদের উদ্ভাবিত কনিক জ্যামিতিতে তিনি যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ইহা সন্দেহাতীত। দেকার্ত তাঁহার *Géométrie* গ্রন্থে ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের উদ্দেশ্যে ওমর খৈয়ামের পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। রেনেশাঁসের সময়ের গণিতজ্ঞ সিপিওন দেল্ ফেরো, তার্তাগুলিয়া ও কার্দানোর পূর্বে ত্রিঘাত সমীকরণের বিশুদ্ধ আঙ্কিক সমাধানের চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। জ্যামিতির সাহায্যে ঢালিয়া সাজাইলেও বীজগণিতে ওমরের গবেষণা গণিতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় এবং আরব্য গাণিতিক প্রতিভার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

জ্যোতিষ ও পঞ্জিকা-সংস্কার : জ্যোতিষেও ওমর খৈয়াম বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১০৭৪-৭৫ খৃীষ্টাব্দে সালিজুক সুলতান মালিকশাহ জালাল আল্-দিন পুরাতন পারসী পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ওমরকে তাঁহার নবনির্মিত রে-র (সম্ভবতঃ নিশাবুর বা ইস্পাহানের) মানমন্দিরে আহ্বান করেন। এইখানে ওমর সুলতানের নামে উৎসর্গীকৃত তাঁহার বিখ্যাত পঞ্জিকা 'আল্-তারিখ আল্-জালালি' বা সংক্ষেপে জালালি পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। এই পঞ্জিকা অতি নিখুঁত ও নির্ভুল হইয়াছিল এবং এবিষয়ে ইহা গ্রেগরীয় পঞ্জিকা হইতেও অধিকতর উন্নত।

৫·৩। গণিত ও জ্যোতিষে ঐস্লামিক স্পেনের তৎপরতা

আল্-জারকালি (১০২৯-১০৮৭)

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানদের মধ্যেও গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গবেষণায় বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কার প্রধান গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্দের

মধ্যে করডোভার আল্-জারকালির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ল্যাটিন ইউরোপে তিনি আর্জাচেল নামে সুপরিচিত। আল্-জারকালির প্রসিদ্ধি জ্যোতিষীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির নির্মাতা হিসাবে। 'সাফিহা' নাম দিয়া তিনি এক আস্তরলাব তৈয়ারী করেন; এই যন্ত্রের প্রণয়ন ও ব্যবহার বর্ণনা করিয়া তিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মংপেলিয়ের এক ইহুদী জ্যোতির্বিদ্ এই পুস্তকের এক ল্যাটিন অনুবাদ (*Saphaea Arzachelis*) প্রস্তুত করেন; ইহা হিব্রু ও অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়। কাস্তিলরাজ আল্ফন্সো ইহার এক স্প্যানিস অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেজিওমণ্টানাস্ 'সাফিহা' যন্ত্র সংক্রান্ত নানা সমস্যার এক সংগ্রহ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। কোপার্নিকাস্ তাঁহার *De revolutionibus orbium coelestium* গ্রন্থে আল্-জারকালির গবেষণার উল্লেখ করিয়াছেন।

আস্তরলাব : প্রসঙ্গতঃ আস্তরলাবের কথা প্রণিধানযোগ্য। এই জ্যোতিষীয় যন্ত্রটি মধ্যযুগে, বিশেষতঃ আরব্য ও পারসী জ্যোতির্বিদ্গণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। যন্ত্রটি একটি গ্রীক আবিষ্কার। টলেমী তাঁহার 'অ্যাল্‌মাজেস্টে'র পঞ্চম খণ্ডে আস্তরলাবের কথা আলোচনা করেন;* টলেমীর টীকাকার আলেকজান্দ্রিয়ার থিওনের লেখাতেও ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রীক আবিষ্কার হইলেও মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ ও সুদক্ষ কারিগরদের হাতে পড়িয়াই ইহা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষীয় যন্ত্রে উন্নীত হয়। আনুমানিক ১২২৩ খৃীষ্টাব্দে মহম্মদ আল্-রসিদি কর্তৃক নির্মিত আস্তরলাবের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। যন্ত্রটি অক্সফোর্ডের হিস্ট্রি অব সায়েন্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

আস্তরলাবের প্রান্তবর্তী বলয় বা নেমি ৩৬০° ডিগ্রীতে বিভক্ত। বলয়ের অভ্যন্তরে অনেকটা মাকড়সার মত দেখিতে অদ্ভুত আকৃতির একটি চাকতি থাকে। এই চাকতির গ্রীক নাম *arachne*, ইংরেজী spider; বাংলায় তাই আমরাও ইহাকে বলিব 'মাকড়সা'। মাকড়সার দেহ হইতে অনেকগুলি ছুঁচলো কাঁটা বাহির হইয়াছে; কাঁটাগুলি আকাশের প্রধান প্রধান নক্ষত্রকে নির্দেশ করে এবং এক একটি তারার নাম এক একটি কাঁটার গায়ে উৎকীর্ণ। মাকড়সার অন্তর্ভুক্ত উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তটিও লক্ষণীয়। এই বৃত্তটির দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং মাকড়সাটি আসলে নক্ষত্রখচিত আকাশের একটি প্রতিকৃতি বিশেষ।

মাকড়সার ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়া দেখিলে ভিতরে আর একটি গোলাকার চাকতি নজরে পড়িবে। এই চাকতির উপর অনেকগুলি বৃত্ত ও বৃত্তাংশ উৎকীর্ণ। ইহার মধ্যে একটি বৃত্ত হইল ক্ষিতিজ, অপরগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় ক্ষিতিজের সমান্তরাল। যে স্থানে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইবে সেই স্থানের অক্ষাংশ অনুযায়ী বৃত্তগুলি উৎকীর্ণ হয়; সুতরাং বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন চাকতির ব্যবহার আবশ্যক। চাকতিটিকে অবশ্য ঘুরানো যায় না; মাকড়সাই ইহার উপর আবর্তিত হয়। আস্তরলাবের অপর পৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে একটি শলাকা বা 'এলিডেড' সন্নিবিষ্ট। এই এলিডেডের সাহায্যে যে কোন নক্ষত্রের বা সূর্যের উন্নতি অতি সহজে বাহির করা যায়।

আস্তরলাবের একটি প্রধান ব্যবহার সময়-নিরূপণ। দিনের বেলায় সময় ঠিক করিতে হইলে সূর্যের এবং রাত্রিকালে কোন একটি প্রধান নক্ষত্রের উন্নতি (altitude) প্রথমে এলিডেডের সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়। তারপর মাকড়সাটিকে ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুতে সূর্যের অবস্থিতি সেই বিন্দুটিকে সূর্যের উন্নতি নির্দেশক ক্ষিতিজের বিশেষ সমান্তরাল বৃত্তটির সহিত মিলানো দরকার। এজন্য মাকড়সাকে কতখানি ঘুরাইতে হয়, প্রান্তবর্তী বলয়ের ডিগ্রীর সাহায্যে তাহা মাপিয়া দিনের বেলার সময় নির্ণয় করা যায়।

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।

সেইরূপ মাকড়সাকে ঘুরাইয়া নক্ষত্রের উন্নতি নির্দেশক ক্ষিতিজের সমান্তরালের সহিত সেই নক্ষত্রের জন্য নির্দিষ্ট কাঁটাটি মিলাইয়া এবং ইহার জন্য মাকড়সাটিকে কতখানি ঘুরাইবার প্রয়োজন হইল তাহা মাপিয়া রাত্রি বেলার সময় নির্ণীত হইত।

জ্যোতিষে আন্তরলাব সংক্রান্ত গবেষণা ব্যতীত সূর্যের এবং সূর্যের অপভূর গতি, ক্রান্তি-বৃত্তের তির্যকতা, নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের অপভূর অস্থিরত্ব সংক্রান্ত আল্-জারকালির নানা গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের অপভূর আপেক্ষিক গতির পরিমাণ গণনা করিয়া তিনি বাহির করেন বৎসরে ১২·০৪″ সেকেন্ড; বর্তমানে ইহার নির্ণীত মান ১১·৮″ সেকেন্ড। ক্রান্তিবৃত্তের তির্যকতা তাঁহার হিসাবে দাঁড়াইয়াছিল ২৩°৩৩′ ও ২৩°৫৩′ এর মধ্যে। গ্রহরা বৃত্তের পরিবর্তে যে উপবৃত্ত-পথে সঞ্চারণ করিয়া থাকে, আল্-জার-কালি এরূপ মত পোষণ করিতেন। তাঁহার এই মত অবশ্য তদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্ মহলে সমাদৃত হয় নাই, কারণ ইহা ছিল টলেমীর মতবিরুদ্ধ। "He suggested that the planets moved in ellipses but his contemporaries with scientific intolerances declined to argue a statement which was contrary to that made by Ptolemy in the *Almagest*."—(Ball, *A Short History of Mathematics*; p. 170.)

বিখ্যাত টলেডীয় জ্যোতিষীয় তালিকা (Toledean Table) আল্-জারকালির তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় রচিত হয়। টলেডোর মুসলমান ও ইহুদী জ্যোতির্বিদ্দের পর্যবেক্ষণ ও গণনার ফল একত্র সংবলিত করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। টলেডো হইতে পর্যবেক্ষণ গ্রহণ এবং জ্যোতিষীয় গণনার সুবিধার্থ এই তালিকার পরিকল্পনা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্রা টলেডীয় তালিকার ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন। জেরার্ড অব ক্রেমোনো এই তালিকার ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন করেন। স্টাইনস্নাইডের এই তালিকার প্রায় ৪৮টি পাণ্ডুলিপির সন্ধান দিয়াছেন।

টলেডোর রাজকীয় প্রমোদ উদ্যানে আল্-জারকালি দুইটি চৌবাচ্চার সাহায্যে একটি জলঘড়ি (clepsydra) এইরূপ সুকৌশলে নির্মাণ করেন যে, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চৌবাচ্চার জলও নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রথম দিকে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে চৌবাচ্চায় জল প্রবেশ করিত এবং চৌদ্দ দিনের দিন চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হইত; তারপর চন্দ্রকলা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলে চৌবাচ্চার জলও কমিতে থাকিত এবং আটাশ দিনের দিন ইহার জল সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাইত। এই জাতীয় আরও অনেক যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কার আল্-জারকালির বিশেষত্ব ছিল।

গণিতের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ত্রিকোণমিতিতে আল্-জারকালির তৎপরতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাইন ও ভার্সসাইনের এক তালিকা প্রণয়ন করেন। স্পেনদেশে ত্রিকোণ-মিতির চর্চা সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন।

আল্-বিত্রুজি (দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ)

আবু ইশাক আল্-বিত্রুজি,—ল্যাটিন আল্-পেত্রাজিয়াস্, ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট মুসলমান জ্যোতির্বিদ্। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল করডোভা। টলেমীর জ্যোতিষীয় মতবাদ ও বিশ্ব-পরিকল্পনার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া অনেকটা অ্যারিষ্টটলীয় পদ্ধতিতে তিনি এক বিকল্প বিশ্ব-পরিকল্পনা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। টলেমীর তুলনায় আল্-বিত্রুজির জ্যোতিষীয় মতবাদ অবশ্য নিম্নস্তরের। কিন্তু এক সময় তাঁহার মতবাদ জ্যোতির্বিদ্ মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল এবং ল্যাটিন ইউরোপে, ঐস্লামিক স্পেনে ও মধ্যপ্রাচ্যে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ্ তাঁহার বিশ্ব-পরিকল্পনার আস্থা স্থাপন করিয়া-

আনুমানিক ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আল্-রসিদি কর্তৃক নির্মিত আস্তরলাবের একটি চিত্র। যন্ত্রটি অক্সফোর্ডের হিস্ট্রি অব সায়েন্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। আলোচনা ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
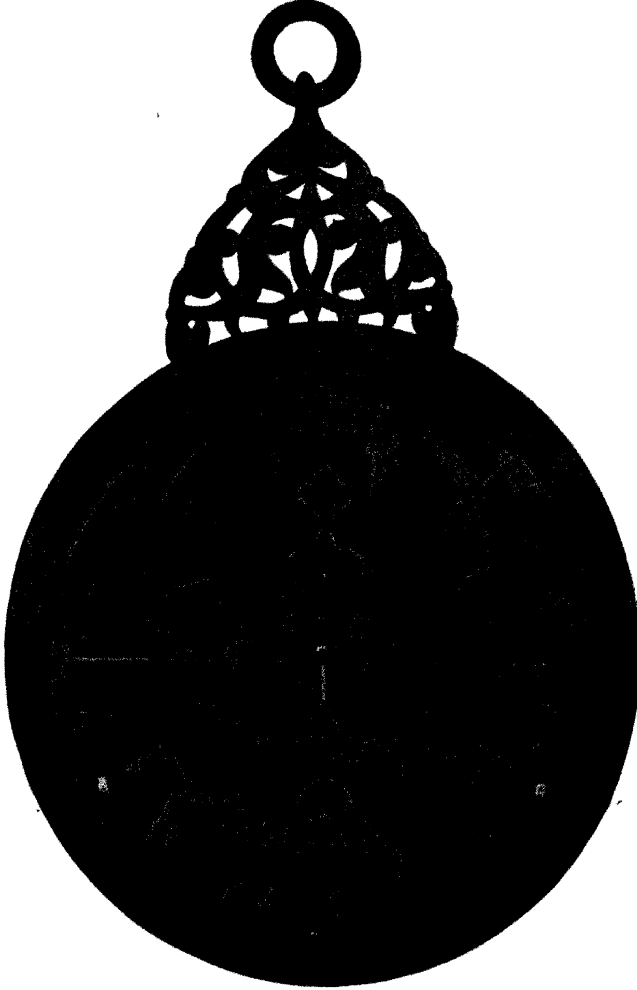
By kind permission of Messrs. Erven P. Noordhoff Ltd., Groningen.

LATE IV
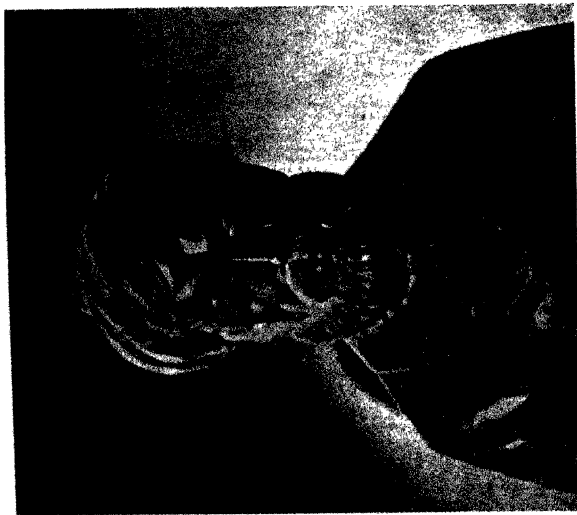
উপরে—মাইমোনিডিস (১১৩৫-১২০৪)। জেরুজালেমের ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মূর্তি সংরক্ষিত। পৃষ্ঠা ১৬৬।

বামে—শারীরস্থান সম্বন্ধে বক্তৃতারত ইব্‌ন্‌ সিনা (৯৮০-১০৩৭)। শারীরস্থানের উপর পারসী ভাষায় লিখিত ষোড়শ শতাব্দীর এক গ্রন্থে এই চিত্রটি পাওয়া গিয়াছে (ডাঃ এম. মেয়েরহফের সংগ্রহ)। পৃষ্ঠা ১৬১।

By kind permission of Messrs. Alfred A. Knopf, Inc., New York.
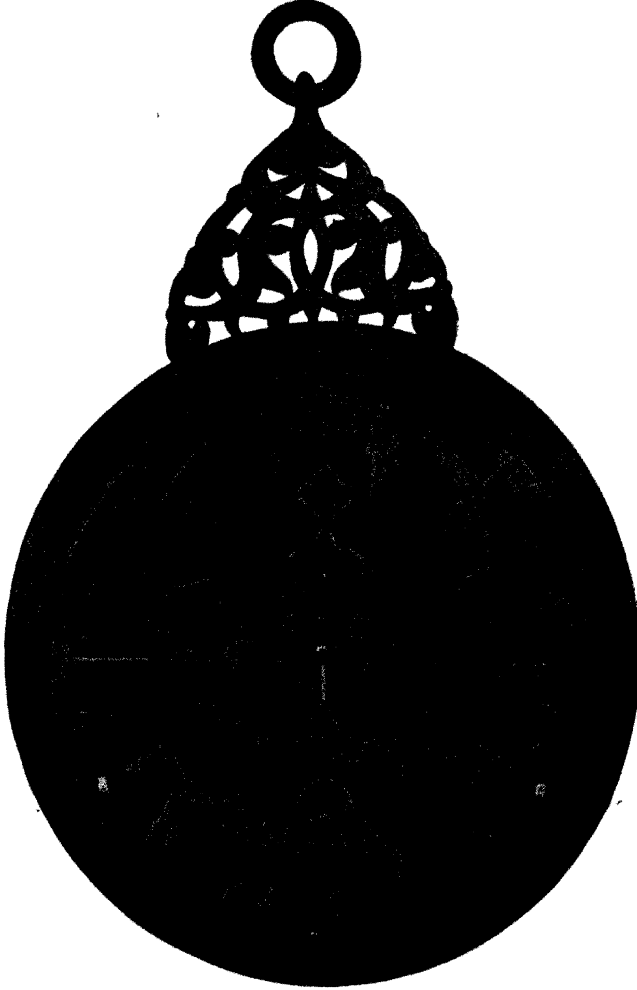
আনুমানিক ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আল্-রসিদি কর্তৃক নির্মিত আস্তরলাবের একটি চিত্র। যন্ত্রটি অক্সফোর্ডের হিস্ট্রি অব সায়েন্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। আলোচনা ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

By kind permission of Messrs. Erven P. Noordhoff Ltd., Groningen.

মঙ্গোলদের এই সংঘর্ষের ফল ভালই হইয়াছিল। হুলাগু পরাজিত আরবদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে নানাভাবে সাহায্য করেন। মারাঘার বিখ্যাত জ্যোতিষীয় মানমন্দির তাঁহার নির্দেশক্রমে স্থাপিত হয়। খোরাসানের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ নাসির আল্-দিন আত্-তুসিকে তিনি মারাঘার মানমন্দির স্থাপন এবং ইহাকে জ্যোতিষীয় গবেষণার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করিবার কার্যে নিয়োগ করেন।

নাসির আল্-দিন আত্-তুসি (১২০১-১২৭৪)

পারসীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্ ও মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নাসির আল্-দিন আত্-তুসি খোরাসানের তুস্ নামক স্থানে ১২০১ খৃীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কামাল আল্-দিন ইব্‌ন্ ইউনাসের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি কুহিস্তানের ইস্‌মাইলী শাসনকর্তা কর্তৃক অপহৃত হইয়া ইস্‌মাইলীদের প্রধান ঘাঁটি আলামুটে ১২৫৬ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক প্রকার বন্দী-জীবন যাপন করেন। ১২৫৬ খৃীষ্টাব্দে হুলাগু ইস্‌মাইলীদের এইসব ঘাঁটি দখল করিলে নাসির আল্-দিন মুক্তিলাভ করিয়া এই মঙ্গোল-বিজয়ীর দলে যোগদান করেন। হুলাগু তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতির কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন এবং নাসির আল্-দিনকে সাদরে তাঁহার শিবিরে আহ্বান করেন। বাগদাদ আক্রমণের সময় নাসির হুলাগুর সঙ্গে ছিলেন। এই কয়েক বৎসরে নাসিরের পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও গভীর জ্যোতিষীয় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া হুলাগু তাঁহার গুণে বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হন। শুনা যায়, শেষের দিকে নাসিরের পরামর্শ ব্যতীত তিনি বড় রকমের কোনও অভিযানে হাত দিতেন না। নাসির হুলাগুর অধীনে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। মারাঘার এক বিরাট মানমন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে হুলাগু এই সুবৃহৎ কর্মের ভার নাসির আল্-দিনের উপর অর্পণ করেন। ১২৫৯ হইতে ১২৭৪ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মারাঘায় অবস্থান করেন। শেষোক্ত বৎসরে তিনি একবার বাগদাদে যান এবং সেই বৎসর সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মারাঘার মানমন্দির : উত্তর-পশ্চিম পারস্যের আধারবাইজানে উর্মীয়া হ্রদের পূর্বে তাব্রিজের দক্ষিণে মারাঘা অবস্থিত। হুলাগু পারস্যের সম্রাট বা 'ইলখান' আখ্যা গ্রহণ করিবার পর মারাঘায় তাঁহার প্রিয় নিবাস স্থাপন করেন। এজন্য মানমন্দির নির্মাণের জন্য একান্ত সঙ্গত কারণে মারাঘা নির্বাচিত হইয়াছিল। তাছাড়া জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের উপযোগী আবহাওয়া ও জলবায়ুর দিক হইতেও মারাঘা ছিল আদর্শস্থানীয়। সহরের পশ্চিমে একটি সুরক্ষিত পাহাড়ের উপর মানমন্দিরটি নির্মিত হয় ১২৫৯ খৃীষ্টাব্দে। মারাঘার যন্ত্রসজ্জা ও গ্রন্থসম্পদ ছিল অতুলনীয়। বাগদাদ, আলামুট প্রভৃতি নানা স্থান হইতে জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। সাম্রাজ্যের নানা স্থান হইতে সুদক্ষ কারিগরদের আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে অতি নিখুঁত ও চমৎকার সব যন্ত্রপাতি এখানে তৈয়ারী করানো হইয়াছিল। সমসাময়িক কালের আর কোন মানমন্দিরে মারাঘার মত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি ছিল না। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীতে টাইকো ব্রাহের য়ুরাণিবোর্গ মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও মারাঘার যন্ত্রপাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে আর্মিলারি গোলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম উপায়ে খগোল (celestial sphere) নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিকল্পনা। মধ্যরেখা, ক্রান্তিবৃত্ত প্রভৃতি বুঝাইতে এই গোলকে কয়েকটি বলয়ের বন্দোবস্ত থাকিত। কাস্তিলরাজ আল্‌ফন্‌সো এইরূপ একটি আর্মিলারি গোলক নির্মাণ করাইবার জন্য আরব্য কারিগরদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে বৃত্তপাদ (quadrant), আস্তর-লাব, ডাই-অপ্‌ট্রা, দুই বৃত্তপাদাবিশিষ্ট যন্ত্র, সাইন, ভার্স-সাইন ইত্যাদি কোণানুপাত মাপিবার যন্ত্র উল্লেখযোগ্য। আল্-উর্দি আল্-দিমিস্কি নামে এক সিরীয় ইঞ্জিনীয়র ও জ্যোতির্বিদ্

(তিনি কিছুদিন মারাঘার মানমন্দিরে কাজ করেন) এইসব যন্ত্রপাতির বর্ণনা, নির্মাণ-কৌশল ও ব্যবহার আলোচনা করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করেন।* নাসির আল্-দিন নিজেও কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেন; তন্মধ্যে 'তুর্কে' (turquet) যন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য। দুইটি চিহ্নিত বৃত্ত একটি অপরটির উপর লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া ইহা নির্মিত। সাইন-বৃত্তপাদ নামে আর একটি যন্ত্র তাঁহার পরিকল্পিত।

মারাঘা মানমন্দিরের গ্রন্থাগারে চার লক্ষের উপর গ্রন্থ ছিল। সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার উজার করিয়া বিজয়ী মঙ্গোল সৈন্যরা এইসব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। এইভাবে মারাঘায় যে বিরাট ও মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে তাহা প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়ার এবং সমসময়ে করডোভার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনীয়।

নাসির আল্-দিন এই মানমন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময় আরও যেসব জ্যোতির্বিদ্ এখানে কাজ করেন তাঁহাদের মধ্যে টিফ্লিসের আল্-খালাতি, মসুলের আল্-মারাঘী, আল্-মাঘ্রিবি, আবু-ল্-ফারাজ, ইব্ন্ আল্-ফুতি, এবং আল্-দিমিস্কির নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হুলাগু চীনদেশ হইতে কয়েকজন চৈনিক জ্যোতির্বিদ্কেও মারাঘায় আনাইয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ফাও-মুন-জি। এই সূত্রে চৈনিক জ্যোতিষের কথা আরব্য ও পরে ল্যাটিন জ্যোতির্বিদ্দের মধ্যে অল্প-বিস্তর প্রচারিত হয়।

জ্যোতিষীয় তালিকা : জ্যোতিষে মারাঘার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'আল্-জিজ্ আল্-ইল্খানি' নামে কতকগুলি জ্যোতিষীয় তালিকার প্রণয়ন। মঙ্গোল ইল্খানদের সম্মানার্থে তালিকাগুলি প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের এইরূপ নামকরণ। নাসির আল্-দিনের নেতৃত্বে বার বৎসরের (১২৬০-৭২) মধ্যে ইহার কাজ সম্পূর্ণ হয়। 'আল্-ইল্খানি' সম্ভবতঃ প্রথমে পারসী ভাষায় রচিত হইয়াছিল; পরে আল্-হালাবি, আল্-হুসাইনি প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণ ইহার আরবী সংস্করণ প্রণয়ন করেন। হিপার্কাস্, টলেমী, আল্-বাত্তানি এবং ইউনোসের জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এবং প্রধানতঃ ইউনোসের 'আল্-হাকিমী'র পদ্ধতি অবলম্বনে ইহা সঙ্কলিত হয়। অবশ্য মারাঘার সুযোগ্য জ্যোতির্বিদ্গণের অনেক উন্নত পর্যবেক্ষণের ফলও ইহাতে যথাযথ সংবলিত হইয়াছিল। গ্রহদের অবস্থান ও গতি নির্দেশ করিবার জন্য সাধারণ তালিকা ছাড়া যে বিশেষ নাক্ষত্র তালিকাটি 'আল্-ইল্খানি'তে স্থান পাইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ রচিত হইয়াছিল মারাঘা মানমন্দিরের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। নক্ষত্রদের অবস্থান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ হইতে মারাঘার জ্যোতির্বিদ্গণ ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের মান নির্ণয় করেন ৫১″ সেকেন্ড।

নাসির আল্-দিন ও তাঁহার সহযোগী জ্যোতির্বিদ্গণ টলেমীর জ্যোতিষের তীব্র সমালোচক ছিলেন। 'আল্-তাধ্কির' নামে নাসির আল্-দিনের একটি জ্যোতিষীয় গ্রন্থে টলেমীর সমালোচনা এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতবাদ আলোচিত হইয়াছে।

জ্যামিতি ও গণিত : জ্যামিতি ও গণিতেও নাসির আল্-দিনের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি প্রখ্যাত প্রাচীন গ্রীক ও আরব্য গণিতজ্ঞগণের প্রধান প্রধান প্রায় সব গ্রন্থই সঙ্কলন করেন। ত্রিকোণমিতিতে তিনি বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দেন। গণিতের এই বিভাগকে জ্যোতিষ হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার কৃতিত্ব নাসির আল্-দিনের প্রাপ্য। তৎকৃত 'কিতাব শাক্ল্ আল্-কাট্টা' মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিকোণমিতির গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল্ হইতে কারাথিওডোরী পাশা ইহার এক ফরাসী তর্জমা, *Traité du quadrilatère,* প্রকাশ করেন। প্রাঞ্জল ভাষায় অনবদ্য

---

* Sarton, *Introduction to the History of Sciences,* Vol. II, part II; p. 1013.

শৃঙ্খলার সহিত এই গ্রন্থ রচিত হয়। মেনেলাউস্ ও টলেমীর পদ্ধতি প্রথম প্রথম অনুসৃত হইলেও তাঁহার উদ্ভাবিত বহু মৌলিক পদ্ধতির বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে।

$$\frac{\text{Sin } A}{\text{Sin } a} = \frac{\text{Sin } B}{\text{Sin } b} = \frac{\text{Sin } C}{\text{Sin } c}$$

অর্থাৎ, কোণগুলির সাইন বাহুগুলির সাইনের সমানুপাত, ইহা তিনি প্রমাণ করেন। এই প্রসঙ্গে

$$\text{Sin } b = \frac{\tan c}{\tan C}$$

সূত্রটিও নাসির আল্-দিনের আবিষ্কার। নাসির আল্-দিন ত্রিকোণমিতিকে যে স্তরে উন্নীত করেন, বহুদিন পর্যন্ত তাহা অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই।

উলুগ বেগ (১৩৯৩-১৪৪৯)

সমরকন্দের মানমন্দির : মধ্য-এসিয়ার গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চার পৃষ্ঠপোষকরূপে হুলাগু খাঁর পর উলুগ বেগের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। হুলাগু মারাঘাকে মধ্য-এসিয়ার এক বিখ্যাত বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহা দুই পুরুষের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, বড় জোর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পর হইতে মারাঘার মানমন্দিরের কথা আর শুনা যায় না। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে ১৪২০ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এসিয়ার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীয় মানমন্দির সমরকন্দে স্থাপন করেন তৈমুর লঙের প্রপৌত্র আর একজন বিদ্যোৎসাহী তাতার উলুগ বেগ। হুলাগুর মত তিনিও মধ্য-প্রাচ্য ও মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ্‌দের সমরকন্দের মানমন্দিরে আহ্বান করেন। ইব্‌ন্ মাসুদ, আল্-রুমী, আল্-কুশ্‌চি ও আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদ্ এইখানে গবেষণা করিয়া 'জিজ্ উলুগ বেগ' নামে যে জ্যোতিষীয় তালিকা প্রণয়ন করেন, তাহাই জ্যোতিষে মুসলমানদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। 'আল্-ইলখানি'র মত ইহাও প্রথমে পারসী ভাষায় প্রণীত হইয়া পরে আরবীতে অনূদিত হয়। গ্রিভ্‌স্ ও হাইড ইহার পারসী ও ল্যাটিন সংস্করণ লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন ১৬৫০ ও ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সেদিলো 'জিজ্ উলুগ বেগে'র এক ফরাসী তর্জমা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬·১। রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভেষজ-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানকে পৃথকভাবে আলোচনা করা কঠিন। এইসব বিদ্যার পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের জন্য প্রায়শঃ একই ব্যক্তিকে রসায়নে, চিকিৎসাবিদ্যায় ও ভেষজবিজ্ঞানে পারদর্শী দেখা যায়। ভারতবর্ষে বাগভট, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত, শার্ঙ্গধর ও ভাবমিশ্র একাধারে যেমন সুচিকিৎসক ছিলেন, তেমনি রসায়নে মৌলিক গবেষণার জন্যও তাঁহারা খ্যাতিলাভ করেন। ইহা আরব্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্য। জাবির ইব্‌ন্‌ হাইয়ান, আল্‌-রাজি, ইব্‌ন্‌ সিনা প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ একই কালে আরব্য কিমিয়ার ও চিকিৎসাবিদ্যার গোড়াপত্তন করেন।

গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাব : সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের নেস্টোরীয় খৃীষ্টান, ইহুদী ও পারসী চিকিৎসকগণের তৎপরতা প্রধানতঃ আরব্য চিকিৎসাবিদ্যাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সে কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এডেসা, নির্সিবিস ও জুণ্ডিশাপুরের চিকিৎসা-বিদ্যালয়গুলির নিবিড় প্রভাব অনস্বীকার্য। এখানকার চিকিৎসাবিদ্‌গণের চেষ্টায় গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থগুলি সিরীয় হইতে আরবী ভাষায় প্রথম অনূদিত হইতে আরম্ভ হয়। হুনায়েন ইব্‌ন্‌ ইশাক হিপোক্রেটিস্‌ ও গ্যালেনের অধিকাংশ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ প্রণয়ন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা ও চর্চার পথ প্রশস্ত করেন। আরব্য বিদ্যোৎসাহিতার প্রথম পর্বে গণিত ও জ্যোতিষের ন্যায় চিকিৎসা-বিদ্যায়ও ভারতীয় অবদানের কথা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-কার্যে পারসীক পণ্ডিতগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। বিদ্যোৎসাহী শাশানিদ সম্রাট খুস্‌রো ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি ও চিকিৎসকগণ সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে জুণ্ডিশাপুর বিদ্যাপীঠে ও হাসপাতালে একাধিক ভারতীয় চিকিৎসক নিয়োগের কথা জানা যায়। চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রথমে পারসীক ও সিরীয় ভাষায় এবং পরে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। বাগদাদের রাজ-সভায় একাধিক হিন্দু চিকিৎসকের উপস্থিতির কথা আল্‌-বীরুণী উল্লেখ করিয়াছেন।

আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়ার প্রভাব : আরব্য রসায়নের উৎস ও অনুপ্রেরণা আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া। আমরা দেখিয়াছি, খৃীষ্টীয় প্রথম শতকের অনুরূপ সময়ে বা তাহারও কিছু পূর্ব হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় কিমিয়ার চর্চা সুরু হইয়া থাকিবে।* খৃীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়ার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নকল ডিমোক্রিটাস্‌, ইহুদী মহিলা কিমিয়াবিদ্‌ মারিয়া, জোসিমোস্‌ প্রমুখ প্রাচীনকালের কয়েকজন খ্যাতনামা কিমিয়াবিদ্‌ এই সময় তৎপর ছিলেন। লাইডেন ও স্টকহোম রাসায়নিক প্যাপিরাস্‌দ্বয়ও খৃীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার পর আরব্য কিমিয়াবিদ্‌দের আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসর সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কিমিয়া সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ রচিত বা সামান্য যা কিছু গবেষণা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার প্রধান অবলম্বন ছিল মারিয়া, জোসিমোস্‌ প্রমুখ আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়াবিদ্‌দের গ্রন্থাবলী। এইসব গ্রন্থ সিরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়; জোসিমোসের সিরীয় অনুবাদের কিছু কিছু অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া-

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৪৬-৪৯।

গ্রন্থাবলীর এই জাতীয় সিরীয় অনুবাদ নিঃসন্দেহে আরবদের মধ্যে কিমিয়ার আলোচনা ও চর্চা উৎসাহিত করিয়াছিল।
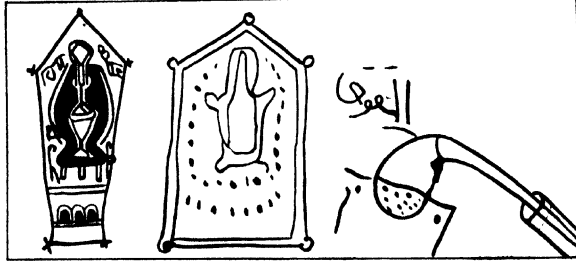
(১) (২) (৩)

২১। এক সিরীয় রাসায়নিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির নমুনা; (১) পরিপাক-যন্ত্র, (২) ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে রক্ষিত পরিপাক-যন্ত্র, (৩) বকযন্ত্র।

চৈনিক কিমিয়ার প্রভাব : বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে চৈনিক কিমিয়ার জ্ঞানও আরব্য কিমিয়ার গবেষণাকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করিয়াছিল। চৈনিক কিমিয়ার সুপ্রাচীনত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, আলেকজান্দ্রীয় তৎপরতা সুরু হইবার অন্ততঃ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব হইতেই চীনদেশে এই বিদ্যার চর্চা রীতিমত এক অতি উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল। হিঙ্গুল ও পারদের অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে চৈনিকরা সেই প্রাচীনকাল হইতেই সম্যক অবহিত। চৈনিক কিমিয়া ঠিক কখন কি ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছে তাহা জানা না গেলেও অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব্য পর্যটক, নাবিক ও ব্যবসায়ীদের মারফত আরব-চীন সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইবার সুযোগে এই জ্ঞান যে ঐস্লামিক জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। স্টেপ্‌ল্‌টন আল্‌-রাজির গবেষণায় চৈনিক কিমিয়ার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করেন। তাঁহার রচনায় চৈনিক কিমিয়ার যেসব বিষয় আলোচিত দেখা যায় তাহা অবশ্য কোন চৈনিক গ্রন্থের আরবী সংস্করণ হইতে সরাসরি গৃহীত হয় নাই; উত্তর মেসোপোটেমিয়ার হারাণ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ব্যাবিলনীয় মন্দিরে প্রাপ্ত এক ধরনের কিমিয়া-গ্রন্থ হইতে আল্‌-রাজি এই তথ্য সংগ্রহ করেন। সুতরাং আরবদের অভ্যুত্থানের বহু পূর্বেই চৈনিক কিমিয়ার জ্ঞান যে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, স্টেপ্‌ল্‌টন এরূপ মনে করেন। তাঁহার নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

> "In addition to the Greek knowledge of Chemistry, which reached him through Jābir, ar-Rāzi also drew—in all probability through the Temple-priests of Harrān in northern Mesopotamia—on the considerable body of knowledge at the disposal of the ancient Babylonian and Egyptian priests.
>
> "The former inhabitants of Mesopotamia, in their turn, *may* have drawn on China for their knowledge. Whether this be the case or not, it is certain from a study of Ko-Hung's *Pao po tsz'* that Greek and Chinese alchemy must have had some common source of origin; and as the Chinese could hardly

have drawn directly on Greek (or Egyptian) sources for this knowledge, China must either have discovered the facts for herself, and passed them on to some intermediary, like Babylonia, or acquired the knowledge from the same (or some other) intermediary."*

বৈজ্ঞানিক রসায়নের উদ্ভব : কিমিয়ার জ্ঞান যে ভাবেই আসিয়া থাকুক, আরবদের হাতে পড়িয়াই এই জ্ঞান যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। বলিতে গেলে আরবরাই 'বৈজ্ঞানিক রসায়নে'র প্রথম প্রবর্তক। আরবদের পূর্বে রসায়নে নানাবিধ তথ্য বড় কম জমা হয় নাই। মারিয়া, জোসিমোস্‌ প্রমুখ আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়াবিদ্‌রা উন্নত ধরনের রাসায়নিক যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবিধ রাসায়নিক
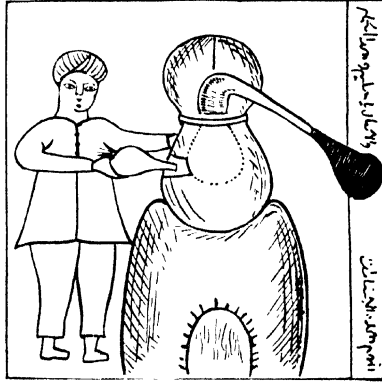
২২। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি আরবী রাসায়নিক পাণ্ডুলিপিতে রাসায়নিক যন্ত্রের এই চিত্রটি পাওয়া যায়।

প্রক্রিয়ার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কিরূপ, ধাতুদের উৎপত্তির কারণ কি, এজাতীয় মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন কৌতূহল আরবদের পূর্বে দেখা যায় না। আরবরা অতীব দক্ষতার সহিত প্রচলিত রাসায়নিক যন্ত্রপাতির এবং নিজেদের উদ্ভাবিত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই সঙ্গে এইসব তথ্যের ও প্রক্রিয়ার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল অদৃষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার রহস্য-ভেদেও আরব্য মনীষার একটা বড় অংশকে সচেষ্ট দেখা যায়। কিমিয়াকে আশ্রয় করিয়া যেসব যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি ও এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সেই জঞ্জাল হইতে আরবরা আসল রসায়নকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জাবির, আল্‌-রাজি, ইব্‌ন্‌ সিনার কিমিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ ও রচনা পড়িলে মনে হইবে, ইহা যেন সপ্তদশ শতাব্দীর কোন বিখ্যাত রাসায়নিকের লেখা। অধ্যাপক বার্ণাল তাই বলিয়াছেন,

---

* H. E. Stapleton, R. F. Azo and M. Hidāyat Husain, "Chemistry in Iraq and Persia in the Tenth Century A.D.", *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 8, No. 6, 1927 ; p. 340—43.

"Chemistry, to a different degree from astronomy and mechanics, depends on widespread experience of large numbers of substances and processes. It can only become a science if these can be brought together and transmitted as a graspable whole, and provided with some general principles. This is what the Arabs did, and what justifies their claim to be the founders of chemistry.

* * * *

"It was the Arabs who elaborated a system of chemical ideas that was to stand as the foundation of the subject until the great revolution in chemistry in the eighteenth century. . . ."*

জাবির ইব্‌ন্‌ হাইয়ান (৭২০-৮১৩)

আরব্য কিমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আবু মুসা জাবির ইব্‌ন্‌ হাইয়ানের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খলিফা হারুণ অর্‌-রসিদের রাজত্বকালে। তিনি সম্ভবতঃ সাবীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয় কুফায়। মুসলিম বিশ্বকোষ 'কিতাব আল্‌-ফিহ্‌রিস্ট' অনুযায়ী জাবির ক্ষুদ্র-বৃহৎ অন্ততঃ পাঁচ শত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশখানি গ্রন্থ এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে এবং বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান হয়ত মিলিতে পারে।

তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু হইতে মনে হয়, তিনি একাধারে দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ্‌, কিমিয়াবিদ্‌ ও জ্যোতির্বিদ্‌, অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদ্‌ ছিলেন। অবশ্য কিমিয়ার উপর রচিত গ্রন্থাদির খ্যাতির জন্যই ইতিহাসে জাবিরের প্রসিদ্ধি। এই কিমিয়া-গ্রন্থগুলির মধ্যে *Book of the Kingdom, Little Book of the Balances, Book of Mercy, Book of Concentration, Book of the Seventy, Book of the Composition of Alchemy,* ও *Book of Eastern Mercury* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরমীবাদের উপরও জাবির কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বের্থেলো কিমিয়া ও মরমীবাদের উপর রচিত জাবিরের কয়েকখানি নিকৃষ্ট গ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে তাঁহার মৌলিকতা ও প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই।† বের্থেলোর পর জাবিরের আরও কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; ই. জে. হল্‌ম্‌ইয়ার্ড,‡ জুলিয়াস রুস্‌কা§ প্রমুখ রসায়নের ঐতিহাসিকগণ জাবির সম্বন্ধে নূতন করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণা হইতে এখন দেখা গিয়াছে, জাবির বাস্তবিকই একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার প্রচেষ্টাতেই আরব্য রসায়নের বনিয়াদ স্থাপিত হইয়াছিল। "Even on the slender basis of our knowledge, Jābir appears already as a very great personality, one of the greatest in mediaeval science."—(Sarton, *Introduction,* Vol. I, p. 532.)

---

* J. D. Bernal. *Science in History,* Watts, 1954 ; p. 202—3.

† M. Berthelot, *La chimie au moyen âge* (Vol. 3, *L'alchimie arabe*), Paris, 1893.

‡ E. J. Holmyard, Jābir ibn Hayyān, *Proc. Roy. Soc. Medicine,* Vol. 16, 1923 ; p. 46—57.

§ Julius Ruska, *Arabische Alchemisten,* 2 vols., Heidelberg, 1924.

মরমীবাদের প্রভাবে জাবিরের রচনার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব খর্ব হইয়াছিল, বের্থেলোর এই অভিযোগ বহুলাংশে সত্য হইলেও, বহু গ্রন্থে ও রচনায় তিনি আবার খাঁটী বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। *Book of Balances* গ্রন্থের এক জায়গায় জাবির স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, প্রমাণ ছাড়া কোন মত গ্রাহ্য নহে; যে মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ নাই তাহা সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, কিন্তু প্রমাণ থাকিলে আমরা সেই মতের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। *Book of Properties*-এ তিনি লিখিয়াছেন, 'এই গ্রন্থে আমরা যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি তাহা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি; অপরের মুখে শুনিয়া বা গ্রন্থ পড়িয়া ইহা আমরা লিখি নাই'। রাসায়নিক গবেষণায় পরীক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তিনি বরাবর সজাগ ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই ইহার প্রতি তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে তোমার প্রথম কর্তব্য হইবে হাতে-কলমে কাজ করা ও পরীক্ষা সম্পাদন করা; কারণ হাতে-কলমে কাজ ও পরীক্ষা না করিলে (এই বিদ্যায়) ক্ষুদ্রতম অধিকার-লাভও সম্ভবপর হইবে না। অতএব, হে পুত্র! পরীক্ষা কর, তবেই জ্ঞানার্জনে সক্ষম হইবে। তথ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে বিজ্ঞানীর আনন্দ নাই; তাহার প্রকৃত আনন্দ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চমৎকারিত্বের মধ্যে।"

জাবিরের মৌলিক গবেষণার মধ্যে সীস-শ্বেত বা লেড কার্বনেট প্রস্তুত-বিধি, সাল্‌ফাইড লবণ হইতে অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক নিষ্কাশনের উপায়, সির্কার পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে সির্কাম্ল বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রস্তুতি, ইস্পাত উৎপাদন প্রণালী ও ধাতুশোধন পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বস্ত্র ও চামড়া রাঙাইবার উদ্দেশ্যে বিবিধ রঞ্জক দ্রব্যের ব্যবহার, কাচশিল্পে ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার ইত্যাদি ফলিত রসায়নের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি আলোচনা করেন। এম্পিডক্‌লেস্‌-অ্যারিস্টটল প্রস্তাবিত চারি মৌলিক পদার্থের সহিত তিনি আরও দুইটি মৌলিক পদার্থ যোগ করেন; ইহারা হইল পারদ ও গন্ধক। পরবর্তী মুসলমান রাসায়নিকগণ লবণকেও মৌলিক পদার্থরূপে জ্ঞান করেন।

পারদ-গন্ধক মতবাদ : বিবিধ বস্তুর উদ্ভব ব্যাখ্যাকল্পে মধ্যযুগের অতীব জনপ্রিয় পারদ-গন্ধক মতবাদের প্রথম আলোচনা দেখা যায় জাবিরের রচনায়। অ্যারিস্টটল মনে করিতেন, জলীয় ও মৃত্তিকাবৎ নিশ্বাস-মোচনের যোগাযোগে ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাঁহার এই মতবাদ বহু শত বৎসর যাবৎ পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত ছিল। জাবির সর্বপ্রথম এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, অ্যারিস্টটল-পরিকল্পিত ভূগর্ভের দ্বিবিধ নিশ্বাস সংযুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই ধাতুর উৎপত্তি সম্ভবপর করে না, ইহারা প্রথমে অন্তবর্তী দুইটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকাবৎ নিশ্বাস-মোচন হইতে গন্ধক এবং জলীয় নিশ্বাস-মোচন হইতে পারদ উৎপন্ন হয়। পরে বিভিন্ন মাত্রায় এই গন্ধক ও পারদের সংমিশ্রণে বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হয়। জাবির আরও বলেন, স্বর্ণ বিশুদ্ধ গন্ধক ও পারদের সংমিশ্রণের ফল। এই দুই মৌলিক পদার্থে অল্প-বিস্তর খাদ থাকিলে তাহাদের সংযুতির ফলে রৌপ্য, তাম্র, সীসক ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইবে। এই মতবাদের ভিত্তিতে জাবির প্রচার করেন যে, নিকৃষ্ট ধাতুর খাদ সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিতে পারিলে ইহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। তিনি ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ গন্ধকের সহিত বিশুদ্ধ পারদ যৌগিক উপায়ে মিশ্রিত করেন; কিন্তু তাহাতে স্বর্ণ উৎপন্ন হইল না, হইল হিঙ্গুল বা মার্কারি সাল্‌ফাইড। এই অভিজ্ঞতার পরও জাবির তাঁহার পারদ-গন্ধক মতবাদ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ইহার সংশোধন করিয়া বলেন, ধাতুসৃষ্টিতে যে দুই মৌলিক পদার্থ অংশ গ্রহণ করে তাহারা অবিকল ঠিক সাধারণ পারদ ও গন্ধক নহে, এই দুই ধাতুর গুণসম্পন্ন দুইটি কাল্পনিক মৌলিক পদার্থ মাত্র।

জাবিরের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যযুগে এই পারদ-গন্ধক মতবাদ রাসায়নিক

চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই মতবাদের ব্যাপক সমর্থন কিমিয়ার অগ্রগতির এক প্রধান কারণ। মধ্যযুগে ইউরোপে এই মত কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং ইহাতে সেদেশে কিমিয়ার চর্চা কিভাবে উৎসাহিত হইয়াছিল, সেকথা পরে আলোচিত হইবে।

জাবির-গেবের প্রশ্ন : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ইউরোপে গেবের নামে এক রাসায়নিকের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিমিয়া-গ্রন্থের কথা জানা যায়। *Summa perfectionis, Liber de investigatione perfectionis* ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি কিমিয়া সম্বন্ধে লেখেন এবং তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থ, বিশেষতঃ *Summa*, ল্যাটিন ইউরোপে কিমিয়াবিদ্‌দের মধ্যে ব্যাপক সমাদর লাভ করে। জাবিরের রচনার সহিত গেবেরের রচনার বহু মিল লক্ষ্য করিয়া এক সময় পণ্ডিতদের ধারণা হইয়াছিল, গেবেরের নামে প্রচলিত কিমিয়া-গ্রন্থগুলি আসলে জাবির অথবা অন্য কোন মুসলমানের আরবী রচনার ল্যাটিন তর্জমা। শুধু তাহাই নহে, গেবের নামটাও হয়ত আরবী জাবিরের ল্যাটিন অপভ্রংশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রসায়নের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গেবেরের নামে প্রচলিত কিমিয়া সংক্রান্ত ল্যাটিন রচনাবলী যে জাবিরের তর্জমা, কপ সে বিষয়ে প্রথম সন্দেহ পোষণ করেন এবং বের্থেলো জাবিরের কয়েকটি মূল আরবী পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া কপের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। বের্থেলোর অভিমত, অষ্টম শতাব্দীর জাবির ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর গেবের এক ব্যক্তি নহেন, বিজ্ঞানী হিসাবে জাবির গেবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, সুতরাং গেবেরের গ্রন্থাবলী যে জাবিরের রচনার অনুবাদ, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বের্থেলোর পর এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আর কোন গবেষণা না হওয়ায় তাঁহার মতই এতদিন পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি জাবির ও গেবেরের প্রশ্ন লইয়া নূতন যেসব গবেষণা সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে বের্থেলোর সিদ্ধান্ত এখন আর পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ই. জে. হল্‌ম্‌ইয়ার্ড জাবিরের অপরীক্ষিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন, জাবির বাস্তবিকই একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান রাসায়নিক ছিলেন এবং তাঁহার রচনার সহিত গেবেরের রচনার মিল এতই আশ্চর্য যে গেবেরের কিমিয়া-গ্রন্থগুলিকে জাবিরের আরবী রচনার ল্যাটিন তর্জমা মনে করিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।* তবে এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেঁাছানো সম্ভবপর হয় নাই।

আল্‌-রাজি (৮৬৬-৯২৫)

এল্‌বুর্জ পর্বতের দক্ষিণে তেহেরাণের অনতিদূরে রে নামক স্থানে আল্‌-রাজি জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন্‌ জাকারিয়া আল্‌-রাজি। মধ্যযুগে ল্যাটিন ইউরোপে তিনি রাজেস্‌ নামে পরিচিত। আল্‌-রাজি সমগ্র মুসলিম জগতের, বলিতে গেলে, সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্‌ ও কিমিয়াবিদ্‌ ছিলেন। চিকিৎসা, ভেষজ ও কিমিয়া তাঁহার গবেষণার প্রধান বিষয় হইলেও বিজ্ঞানের প্রায় সর্ব বিভাগেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্‌-বীরুণীর রচনা-পাঠে জানা যায়, প্রথম জীবনে আল্‌-রাজি সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, ম্যানিকেইজ্‌ম্‌, যাদুবিদ্যা ও কিমিয়া অধ্যয়ন করেন। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে বাগদাদ প্রথম পরিদর্শন করেন এবং এখানে সাহ্‌ল্‌ ইব্‌ন্‌ রাবাণ নামে এক খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে মনোযোগী হন। চিকিৎসাবিদ্যার অভ্যাস ও চর্চাও তাঁহার সুরু হয় এই রাবাণের নিকট। প্রসঙ্গতঃ রাবাণ ছিলেন হুনায়েনের এক শিষ্য।

---

* E. J. Holmyard, 'The Identity of Geber', *Nature,* Vol. 111, No. 2780, 1923; p. 191—3.

আল্-রাজি অতি অল্পকালের মধ্যেই চিকিৎসাবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চিকিৎসা ও ভেষজ সম্বন্ধে এক শতের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ-সংখ্যা বড় কম ছিল না। দর্শন, ন্যায় ও ধর্মতত্ত্বের উপর তিনি ৪৫টি, গণিত ও জ্যোতিষের উপর ১১টি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ৩৩টি এবং কিমিয়ার উপর বিশ্ব-কোষের মত কয়েকটি বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ইহা সর্ববিদ্যায় তাঁহার শুধু অসাধারণ পান্ডিত্যেরই পরিচায়ক নহে, ইহা তাঁহার অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়েরও ইংগিত দিয়া থাকে। অনবরত লেখাপড়া লইয়া থাকায় দৃষ্টিশক্তি তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া যান।

চিকিৎসাবিদ্যা : চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে আল্-রাজির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল 'কিতাব আল্-হাওয়াই'। কুড়ি বা তাহারও বেশী খন্ডে 'আল্-হাওয়াই' সম্পূর্ণ। দুঃখের বিষয় মূল পান্ডুলিপির মাত্র দশ খন্ড এ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে; অবশিষ্ট খন্ডগুলি বহুদিন হইতেই নিখোঁজ। গ্রন্থের মূল আরবী সংস্করণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা ইহার ল্যাটিন তর্জমা *Liber Continens*। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে আঁজুর প্রথম চার্লসের নির্দেশে সিসিলির ইহুদী চিকিৎসক ফারাজ ইব্‌ন্ সালিম 'আল্-হাওয়াই'-এর ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই অনুবাদ প্রথম ব্রেসিয়া হইতে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ও পরে ভেনিস হইতে মুদ্রিত হয়। *Liber Continens* মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

'আল্-হাওয়াই'তে প্রাচীন গ্রীক, ভারতীয় ও সিরীয় চিকিৎসা-প্রণালী আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেন প্রদর্শিত গ্রীক পদ্ধতির আলোচনাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেই সংগে বহু রোগ সম্বন্ধে আল্-রাজির নিজের চিকিৎসক-জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোচনাতেও গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। 'আল্-হাওয়াই' চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি বিরাট বিশ্বকোষ বিশেষ। এজন্য 'কিতাব আল্-মানসুরী' নামে ছোট করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার আর একটি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ইহা 'আল্-হাওয়াই'-এর তুলনায় ছোট বটে, আসলে দশ খন্ডে সমাপ্ত ইহাও একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে মিলান হইতে 'আল্-মানসুরী'র প্রথম ল্যাটিন সংস্করণ *Liber ad Almansorem* প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের সর্বত্র আল্-রাজির এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী-কালে ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় 'আল্-মানসুরী'র অনুবাদও এই জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

বিভিন্ন রোগের উপর পৃথক পৃথক ভাবে রচিত আল্-রাজির কয়েকটি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূত্রাশয় ও বৃক্কের প্রস্তরজনিত রোগের চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া এজাতীয় কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বসন্ত ও হামের উপর লিখিত তাঁহার 'কিতাব আল্-জাদারী ওয়াল্-হাস্‌বা' গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। অধ্যাপক সার্টন ইহাকে মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। *De variolis et morbiliis* নামে প্রথমে ল্যাটিন ও পরে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় 'কিতাব আল্-জাদারী ওয়াল্-হাস্‌বা' অনূদিত হয় এবং ১৪৯৮ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটির প্রায় চল্লিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বসন্ত ও হাম রোগ এই গ্রন্থেই প্রথম আলোচিত দেখা যায়। নমুনাস্বরূপ কিছুটা অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বসন্ত রোগ আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে রোগীর ক্রমাগত জ্বরভোগ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নাসিকার চুলকানি, ঘুমের মধ্যে শিহরণ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হইল—জ্বর ও পৃষ্ঠবেদনা, সর্বাংগে দারুণ ব্যথা, মুখমন্ডলে রক্তাধিক্য, কখনও কখনও কুঞ্চন, গন্ডদ্বয় ও চক্ষুর অস্বাভাবিক রক্তিম বর্ণ ধারণ, দেহে চাপবোধ, মাংসপেশীর কুঞ্চন, গলায় ও বুকে ব্যথা এবং সেই সংগে শ্বাসকষ্ট, কাশি, মুখে শুষ্কভাব, ঘন ঘন থুথুর উদ্রেক, স্বর-

বিকৃতি, মাথাধরা, মাথায় চাপবোধ, উত্তেজনা, বমিভাব ও অস্থিরতা। বসন্ত অপেক্ষা হামে উত্তেজনা, বমিভাব ও অস্থিরতা বেশী হয়; আবার হাম অপেক্ষা বসন্ত রোগে পৃষ্ঠবেদনা অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।"

রসায়ন, কিমিয়া : আল্-রাজি তাঁহার গবেষণা-জীবনের প্রথম হইতেই কিমিয়া-চর্চায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার সাফল্য এবং তৎলিখিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তাঁহার কিমিয়া-চর্চাকে কিছুটা নিষ্প্রভ করিলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আল্-রাজি মুসলিম জগতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ্ ছিলেন। এবিষয়ে জাবির ইব্‌ন্ হাইয়ান ছিলেন তাঁহার গুরু। কিমিয়া-চর্চায় তিনি প্রধানতঃ জাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী, রচনা ও আলোচনার ধারা অনেক বেশী বিজ্ঞান-সম্মত ও প্রণালীবদ্ধ। জাবিরের রচনায় যাদুবিদ্যা ও অনুরূপ কুসংস্কারের যেসব প্রভাব দেখা যায়, আল্-রাজির রচনা সেই দিক দিয়া আশ্চর্যরূপে নির্দোষ। তাঁহার এরূপ পরিচ্ছন্ন সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া স্টেপ্‌ল্‌টন আল্-রাজিকে রবার্ট বয়েলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

আল্-রাজি কিমিয়া সম্বন্ধে বারখানির উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'মাদ্‌খাল আত-তালিমী' (*Instructive Introduction*) ও 'কিতাব আল্-আস্‌রার' (*Book of Secrets*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মাদ্‌খাল' রচিত হয় আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। মূল পাণ্ডুলিপির একটি প্রতিলিপির অস্তিত্ব সম্প্রতি রামপুরের নবাবের গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হয়; স্টেপ্‌ল্‌টন ও তাঁহার সহযোগিগণ এই পাণ্ডুলিপির এক ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়ন করেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।* 'কিতাব আল্-আস্‌রার' কিমিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহা তাঁহার শেষ জীবনের রচনা; আনুমানিক ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রণীত হয়। গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ ল্যাটিন ভাষায় *Liber secretorum bubacaris* নামে অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থের সটীক জার্মান অনুবাদ সম্প্রতি বার্লিন হইতে প্রণয়ন করেন ডাঃ জুলিয়াস্ রুস্‌কা (১৯৩৭)।

আল্-রাজি কিমিয়ার আলোচনাকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) স্বাভাবিক দ্রব্য, (২) কৃত্রিম দ্রব্য, (৩) রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, ও (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তাঁহার প্রস্তাবিত দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্বাভাবিক দ্রব্যকে তিনভাগে ভাগ করেন—মৃত্তিকাবৎ, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব। মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য আবার ছয়প্রকার—স্পিরিট, ধাতু, প্রস্তর, ভিট্রিয়ল বা গন্ধকদ্রাবক, সোহাগা ও লবণ। পারদ, নিশাদল, হরিতাল, মনঃশিলা, গন্ধক ইত্যাদি স্পিরিট-জাতীয় দ্রব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, সীসক ও খার্ষীণী এই সাতপ্রকার দ্রব্যকে ধাতু বলা হইয়াছে। খার্ষীণী সম্ভবতঃ দস্তা বা জসদের আরবী প্রতিশব্দ। প্রস্তর তের প্রকার। মাক্ষিক (আরবী—মার্কশীশা), লৌহ-অক্সাইড, হিমাটাইট (আরবী—শাদঞ্জ), ম্যালাকাইট (আরবী—দহ্‌নজ), তুতিয়া (হাল্‌কা রং-এর বিবিধ খনিজ বুঝাইতে ইহা একটি আরবী শব্দ) ইত্যাদি প্রস্তরের অন্তর্ভুক্ত। ভিট্রিয়ল ও সোহাগা প্রত্যেকে ছয় প্রকার, লবণ এগার প্রকার। মিষ্ট ও তিক্ত উভয়বিধ লবণ উল্লিখিত। সাজিমাটি (আরবী—আল্-কিলী) ও পটাশ কার্বনেট লবণ হিসাবে বর্ণিত।

মূলতঃ জাবিরকে অনুসরণ করিলেও ধাতুর উৎপত্তির 'পারদ-গন্ধক' মতবাদ সম্বন্ধে আল্-রাজি সম্পূর্ণ নির্বাক। ইহাতে মনে হয়, গুরুর এই মতবাদ তাঁহার পুরাপুরি মনঃপুত হয় নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, সকল প্রকার দ্রব্যের সারবস্তু (জওহর) এক। এই সারবস্তুর সহিত বিভিন্ন মাত্রায় স্পিরিট ও অন্যান্য খাদ মিশিয়া বিভিন্ন দ্রব্য সৃষ্টি করে। সুতরাং এই খাদ

* H. E. Stapleton, R. F. Azo and M. H. Husain, *Ar-Rāzī's Al-Madkhal At-Ta'limi* or *Instructive Introduction, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 8, No. 6, 1927; pp. 345—361.

অল্প-বিস্তর তাড়াইতে পারিলে দ্রব্যের রূপান্তরও সম্ভবপর। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হইল এই স্পিরিট ও খাদ ইচ্ছানুযায়ী অপসারণ করা, প্রয়োজনমত বিভিন্ন দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগ সাধন করা ইত্যাদি। তাই একান্ত সংগত কারণে আল্-রাজির বিভিন্ন কিমিয়া-গ্রন্থে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির আলোচনা এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া : আরবী কিমিয়া-গ্রন্থে দুই প্রকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আলোচনা দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রপাতির ব্যবহার ধাতু গলাইবার কাজে নিবন্ধ। এরূপ কয়েকটি প্রধান যন্ত্রপাতি হইল :

কূর—চুল্লী, furnace ;
জিক বা মিনফাক—হাপর, bellow ;
বুটাকা—মুষা, মুচি, crucible ;
বুট-বর-বুট—সচ্ছিদ্র দুইটি মুষা, একটির উপর আর একটি স্থাপন করিয়া ইহা নির্মিত, descensory ;
মাশু—হাতা, ladle ;
মাসিক বা কলবতান—চিমটা, tong ;
মুকসির—হাতুড়ি, hammer ;
মিবরদ—উখা, file ;
রাট—অর্ধ-সিলিণ্ডার আকৃতি লোহার ছাঁচ, semi-cylindrical iron mould.

কামারশালায় ধাতুর কাজে নিযুক্ত কারিগররা সাধারণতঃ এইসব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করিত।
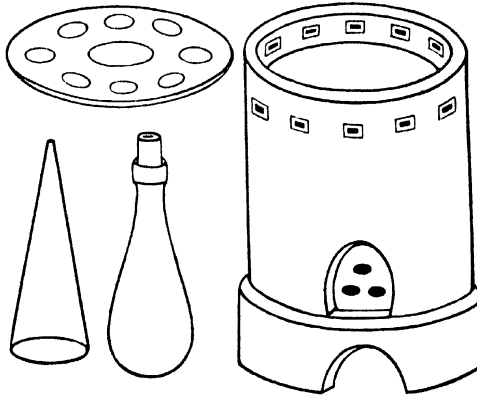
২৩। ঊর্ধ্বপাতনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চুল্লী ও অন্যান্য সরঞ্জাম। (*Liber Fornacum Gebri* শীর্ষক ষোড়শ শতাব্দীর একটি কিমিয়া-গ্রন্থ হইতে গৃহীত।)

দ্রব্যের রূপান্তর সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা বলিত 'তদ্‌বীর'। এরূপ কয়েকটি তদ্‌বীর ও তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

পাতন : এই প্রক্রিয়ার আরবী নাম 'তকটীর'। যে কোন মিশ্রণ বা দ্রবণ হইতে বাড়তি জলীয় ভাগ তাড়াইবার ব্যবস্থার নাম তকটীর। পাতন ছাড়া আস্রাবণ (decantation), ও পরিস্রাবণ বুঝাইতেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হইত। পাতনযন্ত্রের মূল পাত্রটি দুইটি অংশে

নির্মিত; নীচের অংশের নাম 'কর' (cucurbit), উপরের অংশের নাম 'অম্বিক' (alembic)। পাতনের সময় জলীয় ভাগ ঘনীভূত হইয়া যে গ্রাহক-পাত্রে আসিয়া জমা হয় তাহার নাম 'কাবিলা'।

ঊর্ধ্বপাতন : আরবীতে এই প্রক্রিয়াকে 'তশীদ' বলে। অনেক সময় আবার তকটীর শব্দের দ্বারাও ঊর্ধ্বপাতন বুঝানো হইয়াছে। ঊর্ধ্বপাতনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম 'উঠাল' (aludel)। সহজে ঊর্ধ্বপাতিত হয় এরূপ দ্রব্যের জন্য শুধু কাচকুপী (flask), আরবী 'কম্নানী', ব্যবহৃত হইত। কম্নানীর সাহায্যে সহজ ঊর্ধ্বপাতনকে বলা হইত 'তখনীক'।
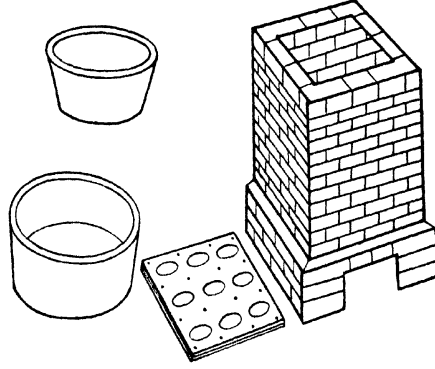
২৪। ধাতুর ভস্মীকরণ ও বন্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চুল্লী ও অন্যান্য সরঞ্জাম; এরূপ চুল্লীর আরবী নাম 'তান্নুর'। (*Liber Fornacum Gebri.*)

গলন : ধাতু গালাইবার কাজে সাধারণতঃ মুষার ব্যবহার। সছিদ্র দুইটি মুষা একটির উপর আর একটি বসাইয়া বুট-বর-বুট নামে একটি যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি। এই যন্ত্রের সাহায্যে খনিজ গালাইয়া শোধন করিবার পদ্ধতির নাম 'ইস্তিঞ্জাল'।

পারদমিশ্রকরণ : কোন কোন ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বপাতন বা ভস্মীকরণের পূর্বে ধাতুর সহিত পারদ মিশাইয়া পারদমিশ্র বা অ্যামালগাম তৈয়ারী করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'ইলঘাম' বা 'তলঘীম'।

ভস্মীকরণ, জারণ : ধাতুনিষ্কাশণ ও খনিজ গালাইবার কাজে এই দুইটি প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ভস্মীকরণের আরবী প্রতিশব্দ 'তকলীস', জারণের 'তশবিয়া'। এই দুই কাজেই 'সলাইয়া' নামে প্রস্তরনির্মিত একপ্রকার খল ব্যবহৃত হইত। সলাইয়ার সাহায্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ইত্যাদি ধাতুর খনিজ কিভাবে জারিত করা হইত তাহার বিশদ বিবরণ আল্-রাজি 'মাদ্খাল', 'আল্-আস্‌রা'র প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

দ্রবণ : দ্রবণের আরবী প্রতিশব্দ 'হল' বা 'তহ্‌লীল'। একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে বিবিধ লবণ দ্রবীভূত করিবার উপায় আল্-রাজি আলোচনা করিয়াছেন। উত্তাপের প্রয়োগে দ্রবণ ত্বরিত হয়, ইহা তিনি লক্ষ্য করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আল্-রাজি ভিট্রিয়লজাতীয় দ্রব্যের দ্রবণকে পাতিত করিয়া সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড বা গন্ধকাম্ল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে তিনি ঠিক চিনিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অবশ্য বলেন, তিনি সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড, এমন কি নাইট্রিক অ্যাসিড পর্যন্ত তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এইরূপ অ্যাসিড তৈয়ারীর প্রথম নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর ল্যাটিন কিমিয়াবিদ্‌দের রচনায়।

আইজাক জ্‌ডিয়াস্‌ (৮৫৫-৯৫৫)

আরব্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনায় আল্‌-রাজির সমসাময়িক মিশরীয় ইহুদী বিজ্ঞানী ও লেখক আইজাক জ্‌ডিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *On Fevers, On the Elements, On Simple Drugs and Nutriments,* ও *On Urine* প্রধান। *Guide of the Physicians* নামে আর একটি গ্রন্থে তিনি চিকিৎসকদের কর্তব্য-বোধ সম্বন্ধে চমৎকার কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। "চিকিৎসকের যদি দুর্দিন আসে, কাহারও উপর দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিও না, তোমারও সুদিন আসিবে।" "দরিদ্রের কুটীরে গিয়া চিকিৎসা করিতে অবহেলা করিও না, কারণ ইহা অপেক্ষা মহৎ কাজ আর নাই।" "আরোগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলেও রোগ নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়া রোগীকে প্রবোধ দিবে, কারণ ইহাতে হয়ত রোগীর স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধির সাহায্য হইতে পারে।"

আফ্রিকার কনস্তান্তাইন কর্তৃক জ্‌ডিয়াসের গ্রন্থগুলি অনূদিত হয় আনুমানিক ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ল্যাটিন ভাষায় আরবী গ্রন্থের ইহাই প্রথম অনুবাদ। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জ্‌ডিয়াসের পুস্তকের ব্যবহার দেখা যায়। রবার্ট বার্টন (১৫৭৭-১৬৪০) তাঁহার *Anatomy of Melancholy* নামক পুস্তকে জ্‌ডিয়াসের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হ্যালি আব্বাস্‌ (মৃত্যু—৯৯৪)

পারসীক মুসলমান হ্যালি আব্বাস্‌ বিখ্যাত চিকিৎসা-গ্রন্থ 'আল্‌-কিতাব আল্‌-মালিকী'র রচয়িতা। এই গ্রন্থের ল্যাটিন নাম *Liber regius* ও ইংরেজী নাম *The whole Medical Art*। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহা এক বিশ্বকোষ বিশেষ, এবং এই পুস্তকে ব্যবহারিক ও যুক্তিমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। 'কিতাব আল্‌-মালিকী' আল্‌-রাজির 'কিতাব আল্‌-হাওয়াই' অপেক্ষা অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ, এবং আলোচনাগুলিও অনেক সংক্ষিপ্ত।

ইব্‌ন্‌ সিনা (৯৮০-১০৩৭)

আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আবু আলি আল্‌-হুসেইন ইব্‌ন্‌ আবদাল্লা ইব্‌ন্‌ সিনার খ্যাতি প্রধানতঃ তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'কানুন ফিল্‌-টিব'-এর (*Canon of Medicine*) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপে ইব্‌ন্‌ সিনা আভিসেনা নামেই সুপরিচিত। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই বিরাট বিশ্বকোষে সে যুগের পরিচিত সর্বপ্রকার ঔষধের বর্ণনা ও গুণাগুণ, মানবদেহের নানাবিধ ব্যাধি ও তাহাদের চিকিৎসা-প্রণালীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকে সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার আরব্য দক্ষতার ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সেই দিক দিয়া তাঁহার এই বিরাট প্রচেষ্টা গ্যালেনের সঙ্গে তুলনীয়। 'কানুন' প্রকাশিত হইবার পর 'আল্‌-হাওয়াই,' 'আল্‌-মালিকী' প্রভৃতি চিকিৎসা-গ্রন্থের প্রয়োজন প্রায় ফুরাইয়া যায়। এমন কি এই বিশ্বকোষ গ্যালেনের গ্রন্থরাজিকেও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। ইব্‌ন্‌ সিনার পর প্রায় ছয় শত বৎসর পর্যন্ত 'কানুন' সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জেরার্ড অব ক্রেমোনা এই বিশ্বকোষের ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করেন। বহু বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থ ইউরোপীয় চিকিৎসকদের মধ্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতকের শেষ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহার অন্যূন ষোল সংস্করণের এবং ষোড়শ শতকে কুড়িরও অধিক সংস্করণের প্রকাশ তাহার অকাট্য প্রমাণ। ল্যাটিন, হিব্রু এবং ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়ার বিভিন্ন ভাষায় 'কানুনে'র তর্জমা, অগণিত টীকা ও ভাষ্য রচিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও অপ্রতিহত জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। টমাস আর্নোল্ড ও আলফ্রেড গীয়োমের মতে, 'probably no medical work ever written has been so much studied, and it is still in current use in the Orient.'

'কানুন ফিল্-টিব' ছাড়া ছোট বড় আরও পনেরখানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ ইব্‌ন্ সিনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই নিবন্ধ ছিল না। দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও শতাধিকের উপর গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি 'কিতাব আল্-শিফা' নামে দর্শনের এক বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ঐস্লামিক ধর্মতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রধানতঃ অ্যারিস্টটলের দর্শনের আলোচনা ও ব্যাখ্যা ছিল এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটলীয় যুক্তি অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা, গণিত ও অধিবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গতি, বল, শূন্যতা, অনন্ত, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য কি সে সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। আলোকরশ্মি যে বস্তু হইতে নির্গত বা প্রতিফলিত হয় আল্-হাজেনের এই মত সমর্থন করিয়া তিনি দেখান যে, আলোকের একটি নির্দিষ্ট বেগ আছে। বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধেও তিনি নিজে নানা পরীক্ষা করেন। সঙ্গীত সম্বন্ধেও আভিসেনার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আল্-শিফা'য় এ সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেন তাহা আরব্য সঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ আল্-ফারাবির রচনা হইতেও শ্রেষ্ঠ।

আবু মনসুর মুবাফাক, আল্-মারিদিনি, আলি ইব্‌ন্ ইশা, ও আলি ইব্‌ন্ রিদওয়ান

দশম ও একাদশ শতকের অন্যান্য আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবু মনসুর মুবাফাক (৯৭৫), মাসাওয়ে আল্-মারিদিনি (মৃত্যু—১০১৫), আলি ইব্‌ন্ ইশা (১০০০) ও আলি ইব্‌ন্ রিদওয়ানের (মৃত্যু—১০৬৭) নাম উল্লেখযোগ্য। পারস্য দেশীয় আবু মনসুর তাঁহার *The Foundations of the True Properties of Remedies* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ৫৮৫ ঔষধের গুণাগুণ, প্রাপ্তি, প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থ পারসী ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে গ্রীক ও সিরীয় চিকিৎসা-প্রণালী ছাড়া ভারতীয় ও পারসীক চিকিৎসা-প্রণালীরও বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে ইহার গুরুত্ব ছাড়া লেখকের সুললিত গদ্য এই গ্রন্থকে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিয়াছে। পারসীক গদ্য-সাহিত্যে মুবাফাকের রচনাবলীকে অনেকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন। ঠিক এই জাতীয় কয়েকখানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বাগদাদের মাসাওয়ে আল্-মারিদিনি ও স্পেনের ইব্‌ন্ আল্-ওয়াফিদ্ (মৃত্যু—১০৭৪)। ইঁহাদের গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ *De medicinis universalibus et particularibus* ও *De medicamentis simplicibus* মধ্যযুগীয় ইউরোপে বহুল প্রচার লাভ করে। ল্যাটিন ইউরোপে মাসাওয়ে 'মেসু' ও আল্-ওয়াফিদ্ 'আবেনগেফিট' নামে পরিচিত।

বাগদাদের আলি ইব্‌ন্ ইশা (ল্যাটিন—জেসু হ্যালি) ও মসুলের আম্মার ইব্‌ন্ আলি আল্-মাওসিলি (ল্যাটিন-কানামুসালি) চক্ষুরোগ-চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করেন। চক্ষু-রোগ সম্বন্ধে গ্রীকদের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ও চক্ষু সংক্রান্ত নানাবিধ রোগের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করিয়া সমগ্র বিষয়কে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগে পর্যবসিত করিবার কৃতিত্ব এই দুই আরব্য চক্ষু চিকিৎসকের প্রাপ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইব্‌ন্ ইশার ও আল্-মাওসিলির গ্রন্থের ল্যাটিন সংস্করণগুলি চক্ষুরোগের সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হইত।

কায়রোর আলি ইব্‌ন্‌ রিদওয়ান (ল্যাটিন—হ্যালি রোদান) প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকদের ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, একমাত্র হিপোক্রেটিস্‌, গ্যালেন প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকদের গ্রন্থ ভালরূপে শিক্ষা করিতে পারিলেই সুচিকিৎসক হওয়া সম্ভব। তিনি গ্যালেনের *Ars Parva*-র এক উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন; ল্যাটিন ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। ইব্‌ন্‌ রিদওয়ানের সমসাময়িক বাগদাদের চিকিৎসক ইব্‌ন্‌ বাত্‌লানের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার *Synoptic Tables of Medicine* একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ।

৬·২। স্পেনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও দর্শন-চর্চা

স্পেনে খলিফা তৃতীয় আব্‌দার রহ্‌মানের কাল হইতে বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বাইজাণ্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্তান্তাইন কর্তৃক প্রেরিত ডিওস্কোরিডিসের আরবী অনুবাদের পর হইতে স্পেনের মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহের সঞ্চার হয়। প্রথম যুগের মুর চিকিৎসকদের মধ্যে হাস্‌দে বেন্‌শাপ্রুত (মৃত্যু-৯৯০) অন্যতম। তিনি রাজচিকিৎসক, কিছুকালের জন্য মন্ত্রী ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যৌবনে তিনি নিকোলাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার সাহায্যে ডিওস্কোরিডিসের গ্রন্থ আরবী ভাষায় তর্জমা করেন।

করডোভার আর এক রাজচিকিৎসক আবুল কাসিম (মৃত্যু-১০১৩) 'আল্‌-তস্‌রীফ,' ল্যাটিন *Medical vade mecum*, নামে ত্রিশখণ্ডে সমাপ্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের শেষের তিনখণ্ডে শল্য-চিকিৎসার আলোচনা আছে। আরব্য চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শল্য-চিকিৎসার প্রবর্তন করেন; তাঁহার পূর্বে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আরব্য চিকিৎসকগণ একরূপ উদাসীন ছিলেন। আবুল কাসিমের পর হইতে আরব্য চিকিৎসকদের মধ্যে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ উপলব্ধ হয় এবং এই সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। আবুল কাসিমের 'আল্‌-তস্‌রীফ' ইউরোপীয় শল্য-চিকিৎসাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইব্‌ন্‌ জুর (১০৯১-১১৬১)

আবু মারওয়ান ইব্‌ন্‌ জুর ল্যাটিন ও ইউরোপীয় লেখকদের কল্যাণে আভেঞ্জোয়ার নামেই সুপরিচিত। তিনি তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্‌ ছিলেন; সম্ভবতঃ সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁহার স্থান আল্‌-রাজি ও ইব্‌ন্‌ সিনার পরেই। আভেরসের মতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্যালেনের পর তাঁহার মত এতবড় চিকিৎসাবিজ্ঞানী আর জন্মায় নাই। ইহা অবশ্য কিছুটা অতিশয়োক্তি।

স্পেনদেশে সেভিলের এক সম্ভ্রান্ত চিকিৎসকপরিবারে আবু মারওয়ানের জন্ম হয় আনুমানিক ১০৯১ খৃষ্টাব্দে। জুর বংশের পূর্বপুরুষেরা খাঁটী আরব ছিলেন; দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে এই বংশ স্পেনে নূতন করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। আভেঞ্জোয়ারের পিতা আবুল আলাজুর ও পিতামহ আবু মারওয়ান আব্‌দাল মালিক উভয়ই খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ইব্‌ন্‌ জুরই অবশ্য এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তাঁহার পরেও কয়েক পুরুষ ধরিয়া জুরবংশীয় চিকিৎসকদের খ্যাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক ১১৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ইব্‌ন্‌ জুরের মৃত্যু হয়।

ইব্‌ন্‌ জুর কমপক্ষে ছয়খানি সুবৃহৎ চিকিৎসার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মাত্র তিনখানি গ্রন্থ এপর্যন্ত সংরক্ষিত হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি বহুদিন হইতে নিখোঁজ। সংরক্ষিত গ্রন্থত্রয় হইল : 'কিতাব আল্‌-ইক্‌তিশাদ্‌', 'কিতাব আল্‌-তৈসীর' ও 'কিতাব আল্‌-আঘধিয়া'। স্বাস্থ্যবিধি ও ঔষধব্যবহারবিদ্যা 'আল্‌-ইক্‌তিশাদে'র প্রধান আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য লিখিত; গৃহচিকিৎসার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে ইহার জনপ্রিয়তা বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

'আল্-তৈসীর' ইব্‌ন্ জুরের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থেরও প্রধান আলোচ্য বিষয় আরোগ্য-শাস্ত্র ও ঔষধব্যবহারবিদ্যা; তবে ইহা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং সেজন্য ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক বেশী। এই গ্রন্থে নানা ধরনের টিউমার, অন্ত্রের যক্ষ্মা, হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লীময় থলির প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, কণ্ডুরোগ (scabies) ইত্যাদি কয়েকটি কঠিন ব্যাধির বর্ণনা আছে। রোগবিশেষে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য-গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়িলে ইব্‌ন্ জুর গ্রাসনালী (gullet) ও মলনালী পথে কৃত্রিম উপায়ে দেহে খাদ্য প্রবেশ করাইবার পরামর্শ দিতেন। যেসব রোগে রক্তমোক্ষণ বিধেয় সেখানে তিনি শিরা ছেদন করিয়া রক্তমোক্ষণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

'আল্-তৈসীর' হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। গ্রন্থের মূল আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার এক হিব্রু সংস্করণ ইতালী হইতে প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে। পারাভিচি ইহার প্রথম ল্যাটিন তর্জমা *Adjumentum de medela et regimine* প্রণয়ন করেন ১২৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে।

'আল্-আঘাধিয়া' প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। ইব্‌ন্ জুরের গ্রন্থাবলী, বিশেষতঃ 'আল্-তৈসীর', পরবর্তীকালে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ (১১২৬-১১৯৮)

ঐস্লামিক স্পেনের আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হইলেন ইব্‌ন্ রুস্‌দ্, ল্যাটিন আভেরস। তাঁহার পুরা নাম আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন্ আহ্‌মদ ইব্‌ন্ মুহাম্মদ ইব্‌ন্ রুস্‌দ্। করডোভার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতামহ করডোভার প্রধান মসজিদের কাজী ও ইমাম ছিলেন। প্রথমে তিনি আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পরে দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। অ্যারিষ্টটলীয় দর্শন ছিল তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয়। সমগ্র মুস্‌লিম জগতে, বলিতে গেলে সমগ্র মধ্যযুগে, অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার।

'কিতাব আল্-কুলীয়াৎ ফিল্-টিব' নামে বিশ্বকোষটি তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি স্বাস্থ্যবিধি, শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত, বিবিধ রোগ ও তাহার চিকিৎসাবিধি ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বসন্ত রোগে কেহ দুইবার আক্রান্ত হয় না। চক্ষুর শারীরস্থান সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী হন। চক্ষু সংক্রান্ত গবেষণার ফলে তিনি অক্ষিপটের (retina) প্রকৃত কার্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রথম নির্ভুল-ভাবে উপলব্ধি করেন। 'কুলীয়াৎ' চিকিৎসাবিদ্যার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে ইহা ইব্‌ন্ সিনার 'কানুন' অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বোনাকোসা নামে পাদুয়ার এক ইহুদী চিকিৎসাবিজ্ঞানী 'কুলীয়াৎ' ল্যাটিন ভাষায় (*Colliget*) প্রথম অনুবাদ করেন ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরে এই গ্রন্থের আরও উৎকৃষ্ট তর্জমা প্রণীত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। হিব্রু ভাষাতেও 'কুলীয়াৎ' অন্ততঃ দুইবার অনূদিত হইয়াছিল।

ইব্‌ন্ রুস্‌দের দর্শন, আভেরইজ্‌ম্ : 'কুলীয়াৎ'-এর রচয়িতা অপেক্ষাও অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ অনেক বেশী সুপরিচিত। মধ্যযুগে প্লেটোর বিশেষতঃ নিওপ্লেটোনিক দর্শনের প্রাধান্যের কালে অ্যারিষ্টটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারা চাপা পড়িয়া যায় এবং বিকৃত রূপ ধারণ করে। ক্রমে অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থরাজি আরবী ভাষায় অনূদিত হইতে আরম্ভ করিলে এই সুপ্রাচীন গ্রীক মহামনীষীর চিন্তাধারার অপূর্ব ঐশ্বর্য মুসলমান

পণ্ডিতদের নিকট প্রতিভাত হয়। আল্‌-কিন্দি হইতে সুরু করিয়া ইব্‌ন্‌ সিনা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট মুসলমান দার্শনিক অ্যারিষ্টটলকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্যে তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, প্রথমতঃ অ্যারিষ্টটলের সমগ্র দার্শনিক রচনার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ইঁহারা অনেকেই পান নাই; দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু নিওপ্লেটোনিক দার্শনিক রচনাকে ইঁহারা আসল পেরিপ্যাটেটিক বিদ্যাপীঠের রচনা বলিয়া ভুল বুঝিয়াছিলেন। ইব্‌ন্‌ রুস্‌দের সময় অ্যারিষ্টটলের প্রায় সমস্ত দার্শনিক রচনারই আরবী তর্জমা সুলভ হইয়াছিল এবং পূর্বগামী দার্শনিকগণের চেষ্টায় নিওপ্লেটোনিজ্‌ম্‌ ও অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের মৌলিক প্রভেদটাও ধরা পড়িয়াছিল।

ইব্‌ন্‌ রুস্‌দ্‌ এইসব রচনা ও সমালোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব তিনটি টীকার—'জামি', 'তলখীস' ও 'তফসীর', মাধ্যমে অতি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি দেখান, বস্তু নিত্য ও সৃষ্টিবাদ মিথ্যা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সুসংবদ্ধ নীতি ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। ইহার একটি নীতি হইল সক্রিয় বুদ্ধি (Active Intelligence)। এই বুদ্ধি মানুষের সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে ক্রমাগত প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই বুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে অবিনশ্বর। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ মতবাদ ঐস্লামিক সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই অসংহতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অ্যারিষ্টটলীয় দার্শনিক সত্যের সহিত ঐস্লামিক ধর্মতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি যেসব যুক্তিতর্কের ও ব্যাখ্যার অবতারণা করেন তাহাতে তাঁহার অপূর্ব ধীশক্তি ও মননশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টি উভয়ই চিরন্তন। ঈশ্বর কাল ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, তবে ইহা তিনি করিয়াছেন অনন্ত কালের জন্য। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন কোন কারণ হইতে উদ্ভূত নহেন, তাঁহার সৃষ্টিরও কোন কারণ বা নির্দিষ্ট কাল থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অ্যারিষ্টটল-প্রস্তাবিত বস্তুর ও ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যতাবাদের সহিত ঐস্লামিক সৃষ্টিতত্ত্বের কোন মৌলিক বিরোধ নাই।

কিন্তু এত সহজে এই বিতর্কের নিষ্পত্তি হয় নাই। মায়াবাদী আল্‌-ঘাজ্জালীপন্থী মুসলমান পণ্ডিতরা ইব্‌ন্‌ রুস্‌দের মতবাদকে কোরাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করে। শুধু তাহাই নহে, ধর্মবিরুদ্ধ বিপজ্জনক মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও উত্থাপিত হয়। ইব্‌ন্‌ রুস্‌দ্‌ও ছাড়িবার পাত্র নন। ইহার প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়াশীল আল্‌-ঘাজ্জালীর প্রতিবাদকে নস্যাৎ করিয়া তিনি তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'তহাফুৎ আল্‌-তহাফুৎ' (*The Destruction of the Destruction*) রচনা করেন। দুঃখের বিষয় ঐস্লামিক মনীষার দুর্দিন ইতিপূর্বেই সুরু হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের বদলে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার রাজত্বই তখন চলিতেছে। আল্‌-ঘাজ্জালীই সে সময়কার মুসলিম দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। সুতরাং খলিফা ইয়াকুব আল্‌-মানসুরের আদেশে ইব্‌ন্‌ রুস্‌দ্‌ করডোভা হইতে নির্বাসিত হন এবং তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থগুলি প্রকাশ্যভাবে ভস্মীভূত করা হয়।

ঐস্লামিক মনীষা ও পাণ্ডিত্যের অবনতির যুগে মুসলমান পণ্ডিতসমাজ ইব্‌ন্‌ রুস্‌দের যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্যত্র তাঁহার প্রভাব গভীর-ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ইহুদী দার্শনিকগণ তাঁহার রচনার অভিনবত্বে চমৎকৃত হইলেন এবং ক্ষিপ্রতার সহিত ইব্‌ন্‌ রুস্‌দের গ্রন্থরাজির হিব্রু সংস্করণ প্রণীত হইল। ইহুদী পণ্ডিতদের কল্যাণে আভেরইজ্‌মের ঢেউ ল্যাটিন ইউরোপে আসিয়া পৌঁছিতেও বিলম্ব হইল না। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজে আভেরসের দার্শনিক মতবাদের চর্চাকে আমরা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে দেখি। মাইকেল স্কট টলেডো হইতে আভেরসের গ্রন্থাবলীর ল্যাটিন তর্জমা সিসিলিতে আনিবার ব্যবস্থা করেন; তাঁহার নিজের ও সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের চেষ্টায় অচিরে আভেরইজ্‌ম্‌ ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে গভীর প্রভাব বিস্তার

করে। অ্যারিস্টটলপন্থী ইব্‌ন্ রুস্‌দের দার্শনিক মতবাদের দ্রুত বর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া কায়েমী খ্রীষ্টধর্মসংস্থা প্রমাদ গণিল। আভেরইজ্‌ম্ খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বিরোধিতা করিতেছে এই রব তুলিয়া গোঁড়া খ্রীষ্টানরা ইব্‌ন্ রুস্‌দের প্রভাব সংকুচিত করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে আভেরইজ্‌মের সর্বপ্রকার চর্চা নিষিদ্ধ হয়। শুধু তাহাই নহে, ইব্‌ন্ রুস্‌দের যুক্তিতর্ককে অসার প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টটলপন্থী দার্শনিক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসকে এই জেহাদের পুরোভাগে রাখিয়া খ্রীষ্টধর্মসংস্থা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে। সে কথা আবার যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

৬·৩। আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধোগতি

প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধোগতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই অধোগতির অন্যতম কারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধতার ক্রমবৃদ্ধি। ইসলামের অভ্যুত্থানের প্রথমযুগে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল বটে; কিন্তু সেই গোঁড়ামির সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার স্বাধীনতার কোন বিরোধ ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান সমাদৃত হইয়াছিল, রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সদ্ভাব দীর্ঘ-স্থায়ী হইতে পারে নাই। ধর্মান্ধতার ভিত্তি বিশ্বাস; ইহাতে সমালোচনার স্থান নাই, যুক্তি-তর্ক ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাব ইহার প্রধান শত্রু। এই সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাবই আবার বিজ্ঞানীর প্রধান ও অপরিহার্য গুণ। সুতরাং ধর্মান্ধতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইল; বিজ্ঞান রাজানুগত্য হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইল ও সন্দেহ ও নিপীড়নের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চাঙ্গের গবেষণার নিদর্শন পাওয়া যায় না; জাবির, আল্-রাজি ও আভিসেনার মত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরও আর উদ্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অল্প যে কয়জন বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা এই প্রাচীন মনীষিগণের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া, টীকা ও সরল সংস্করণ রচনা করিয়া এই বিজ্ঞানকে কিছুদিনের জন্য কোনও রকমে জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন মাত্র।

মাইমোনিডিস (১১৩৫-১২০৪)

আরব্য বিজ্ঞানের এই অধোগতির যুগে ইহুদীরা আবার প্রধান হইয়া উঠে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা ইহাদের মধ্যেই ক্রমশঃ অধিকতর নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই সময় কায়রো ও বাগদাদের রাজসভার চিকিৎসকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিলেন ইহুদী। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহুদী রাজ-চিকিৎসকদের মধ্যে মাইমোনিডিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাইমো-নিডিস ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক ও ধর্মশিক্ষক। সালাদিন সুলতানদের আমলে কায়রোতে তিনি কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ গ্যালেনকে অনুসরণ করেন; তবে আল্-রাজি, আভিসেনা, ইব্‌ন্ ওয়াফিদ্ প্রমুখ আরব্য চিকিৎসকগণের প্রভাবও সুপরিস্ফুট। 'কিতাব আল্-ফুসুল ফিল্-টিব' তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অ্যারিস্টটলীয় দর্শনেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাইমোনিডিসের সমসাময়িক আব্‌দ্ আল্-লতিফ নামে এক মুসলমান চিকিৎসক ও শারীরবিদ্ মানবদেহের অস্থিতন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন। গ্যালেন কর্তৃক বর্ণিত নিম্ন চোয়াল ও বস্তির অস্থি লইয়া তিনি অনেক পরীক্ষা করেন। ঐস্লামিক আইন-ব্যবস্থায় শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় আব্‌দ্ আল্-লতিফ গোরস্থানে গিয়া পুরাতন কবরস্থিত মানবদেহের অস্থি

লইয়া গবেষণা করিতেন। তিনি ১২০০-২ খৃীষ্টাব্দে সংঘটিত কায়রোর দুর্ভিক্ষ ও ভূকম্পনের এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভেষজতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

ইব্‌ন্‌ আল্‌-বেইতার : দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঔষধ ও ভেষজ-বিজ্ঞানে আরবদের কিছু তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ ইব্‌ন্‌ আল্‌-বেইতার (মৃত্যু-১২৪৮) তাঁহার এক পুস্তকে ১৪০০-র উপর বনৌষধির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্পেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বহু দেশ পর্যটন করিয়া এবং সেইসব দেশের উদ্ভিদ্‌ সংগ্রহ করিয়া বনৌষধি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। লেবুজাতীয় ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার এক পুস্তকের ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন করেন অ'দ্রে আল্‌পাগো; ইহা ১৫৮৩ খৃীষ্টাব্দে ভেনিস হইতে এবং ১৬০২ খৃীষ্টাব্দে প্যারী হইতে প্রকাশিত হয়।

আরব্য ভৈষজ্যতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় আল্‌-বেইতারের বিখ্যাত সংগ্রহ, গবেষণা ও রচনাবলী ছাড়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন আরব্য বিজ্ঞানীর কার্যকলাপ ও রচনাবলীর উল্লেখ প্রয়োজন। প্রায় অষ্টম শতাব্দী হইতেই প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও কৃষিবিদ্যায় আরবদের নানা গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বসরার আল্‌-আস্‌মাই (৭৪০-৮২৮) অশ্ব ও উট, দ্রাক্ষালতা, খর্জুর বৃক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ্‌ এবং মনুষ্য-সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।* কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রণীত ইব্‌ন্‌ ওয়াশিয়ার (ইনি আনুমানিক ৮০০ খৃীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন) এক গ্রন্থে প্রাণীদের ব্যবহার, উদ্ভিদের গুণাগুণ ও উৎপাদন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্পেন দেশে প্রচলিত কৃষি সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন আবু সেচারজাহ্‌ ইব্‌ন্‌ আল্‌-ওয়াম।

আবু মনসুর মুবাফাক : বনৌষধি সম্বন্ধে দশম শতাব্দীতে আবু মনসুর মুবাফাক কর্তৃক লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে মুবাফাকের সহিত আমাদের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। বনৌষধির আলোচনায় তিনি প্রধানতঃ ডিওস্কোরিডিসের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। উদ্ভিদ্‌ ও ঔষধের বর্ণনায় বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও বনৌষধির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কুলজাতীয় ফল (আরব্য, Idschas) সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "নানা রকমের কুল আছে। বাগানে উৎপন্ন কুলই তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহারা নরম ও মাংসল হয়। টক অবস্থায় খাইলে ইহা দেহ হইতে হরিদ্রাবর্ণের পিত্ত নিষ্কাশনে সহায়তা করে এবং দেহে পিত্তের ভাগ কমায়। গরমের সময় ইহা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ লাঘব করে। যৌন ইচ্ছা সংযত করিতেও ইহা সক্ষম।...মদের মধ্যে ইহার পাতা ফুটাইয়া সেই মদের সাহায্যে কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইলে গলা, গ্রীবা ও বক্ষের শ্লেষ্মা-জনিত নানাবিধ পীড়ায় উপকার হয়। কুলগাছের আঠা চর্মরোগে উপকারী।" ভারতীয় তেঁতুল, *Tamarindus indica,* আরবী 'তাম্‌র্‌ উল্‌-হিন্দী' সম্বন্ধে তাঁহার এক বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "কুলের মত ভারতীয় তেঁতুল আর্দ্র, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক। ইহার আঁশ ও বিচি আছে এবং ইহা মাংসল। গরমের সময় ইহা দেহ ঠাণ্ডা রাখে, তৃষ্ণা দূর করে, বমির ভাব কমায় ও পিত্তক্ষরণে সাহায্য করে। ইহা পিত্তজ্বর নিবারণ করে বটে, কিন্তু ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর।"*

কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার উন্নতিকল্পে আরবদের প্রচেষ্টা বিশেষ কৃতিত্ব-পূর্ণ। কৃষির উন্নতি সম্ভব করিতে হইলে প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থারও যে আমূল সংস্কার ও

---

* Howard S. Reed, *A Short History of the Plant Sciences,* Chronica Botanica, p. 53.

উন্নতি প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাহারা বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছিল। পাম্প, জলচাকা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপযোগী নানারূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্পেনদেশে তাহারাই প্রথম সেচ-ব্যবস্থা চালু করে। স্পেনের যেসব অঞ্চল এখন অনুর্বর ও অনাবাদী জমি হিসাবে পড়িয়া রহিয়াছে, মুসলমানদের আমলে এককালে সেখানে বড় বড় জলপাইয়ের খেত শোভা পাইত। আমীর আলি লিখিয়াছেন, এক সেভিলে ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু সহস্র জলপাইয়ের তেলের কারখানা ছিল। আল্‌ফাল্‌ফা, আল্‌মণ্ড প্রভৃতি বহু উদ্ভিদ্ এখনও তাহাদের সাবেক আরবী নামেই পরিচিত। পারস্য ও পশ্চিম এসিয়ার বাগানে উৎপন্ন নানাবিধ ফল ও লতার চাষ আরবরা প্রথমে স্পেনে ও পর্তুগালে এবং পরে তথা হইতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবর্তন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে স্প্যানিস ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকরা এইসব ফল ও লতার চাষ আবার প্রবর্তন করে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উর্বর মৃত্তিকায়।

৬·৪ কারিগরিবিদ্যায় মুসলমানদের অবদান

তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ন্যায় কারিগরিবিদ্যাতেও মুসলমানদের অবদান বিশেষ প্রশংসনীয়। যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনে আরবদের এক স্বাভাবিক স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নত ধরনের আস্তরলাব ও অন্যান্য জ্যোতিষীয় যন্ত্র উদ্ভাবনে তাহাদের এই দক্ষতার কিছু পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। মূসা ভ্রাতৃত্রয় বলবিদ্যায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; *Book of Artifices* নামে যে গ্রন্থ তাঁহারা রচনা করেন তাহা জলচাকা, জলঘড়ি, তুলাদণ্ড ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রের আলোচনায় সমৃদ্ধ।

জলচাকা : আরবরা জলচাকার প্রভূত উন্নতি সাধন করে। জলচাকা অবশ্য একটি অতি প্রাচীন আবিষ্কার। ইহার সাহায্যে জলশক্তিকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করিবার ব্যাপারে রোমকরা আরবদের বহু পূর্বে অগ্রণী হইয়াছিল; কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নির্মিত জলচাকা ও জলচাকা-চালিত কারখানাগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আরবরা এই সুপ্রাচীন কৌশলটিকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করে নাই, তাহাদের দক্ষতায় ও সুপরিচালনায় জলচাকা শক্তি সরবরাহের একটি প্রধানতম উপায়ের মর্যাদা লাভ করে এবং ইহার গঠনকৌশলের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলশক্তির ব্যবহারও বহুগুণ বর্ধিত হয়। মেসোপোটেমিয়ায় তাইগ্রিস নদীবক্ষে একটি বিরাট ভাসমান জলচাকা নির্মাণ করিয়া আরব্য ইঞ্জিনীয়রগণ গম পেষাই-এর, কাগজ প্রস্তুতের ও ছোট বড় অন্যান্য কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহের পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

পবনচক্র : জলচাকার মত মধ্যযুগে পবনচক্রের ব্যাপক প্রচলনও আরব্য কারিগর ও ইঞ্জিনীয়রদের কল্যাণে সম্ভবপর হইয়াছিল। বায়ু-প্রবাহকে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানা কাজে নিয়োজিত করিবার ধারণা সুপ্রাচীন। হীরো যান্ত্রিক উপায়ে হাপর চালাইবার উদ্দেশ্যে এক ধরনের পবনচক্রের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন; তবে তিনি এরূপ কোন চাকা সত্যই তৈয়ারী করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তারপর পবনচক্রের আবিষ্কারক কে তাহাও অপরিজ্ঞাত। আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে মধ্য-এসিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বাত্যা-চালিত ঘূর্ণমান অক্ষদণ্ডের কথা চৈনিক পরিব্রাজকদের রচনা হইতে জানা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে এইরূপ ঘূর্ণমান অক্ষদণ্ডের প্রয়োজন হইত। এইসব অঞ্চলের বৌদ্ধদের প্রার্থনা-চক্রও নাকি বায়ুর সাহায্যে চালানো হইত। সম্ভবতঃ মধ্য-এসিয়া হইতেই আরবরা পবনচক্রের ব্যবহার জানিয়া থাকিবে। এক আরব্য কিংবদন্তী অনুসারে খলিফা ওমরের জনৈক ক্রীতদাস আবু লুলুয়া সর্বপ্রথম একটি পবনচক্র নির্মাণ করে।*

* R. J. Forbes, *Man the Maker—A History of Technology and Engineering*, Schuman, New York, 1950; p. 93-4.

ঐস্লামিক প্রাধান্যের কালে পবনচক্রের সর্বাধিক প্রচলন ঘটে আফগানিস্তানে ও পারস্যে। আফগানিস্তানে উত্তর হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা যেমন জোরালো তাহার বেগও সেইরূপ বরাবর প্রায় সমান থাকে। পবনচক্রের পক্ষে ইহা খুবই অনুকূল অবস্থা। এজন্য সেদেশে অতি অল্পকালের মধ্যে পবনচক্রের বহুল প্রচলন সম্ভবপর হইয়াছিল। সেযুগের এক মুসলমান ঐতিহাসিক আফগানিস্তানের পবনচক্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—এই যন্ত্রে সারিবদ্ধ-ভাবে অনেকগুলি খড়খড়ি থাকে। প্রয়োজনমত এক বা একাধিক খড়খড়ি খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া পবনচক্রের মধ্যে বায়ুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ বায়ুপ্রবাহ খুব জোরালো হইলে আর তাহা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকিলে পবনচক্র-চালিত জাঁতায় গম পেষাই এত দ্রুত হয় যে, তাহা অনেক সময় পুড়িয়া কাল হইয়া যায়; এমন কি কখনও কখনও জাঁতাশুদ্ধ অসম্ভব গরম হইয়া ফাটিয়া চৌচির হয়।

দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ আফগানিস্তানে ও পারস্যে পবনচক্রের ব্যবহার নিবদ্ধ ছিল। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে এই যন্ত্রের ব্যবহার অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগতের সর্বত্রই ইহার ব্যবহার দেখা যায়। আরব দেশগুলির দেখাদেখি ক্রমে চীনে ও ভারতবর্ষেও পবনচক্রের ব্যবহার চালু হয়। ইউরোপীয়রা আরবদের এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের কথা প্রথম জানিতে পারে ধর্মযুদ্ধের সময়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই আরবদের অনুকরণে ছোট বড় নানা ধরনের পবনচক্র হল্যান্ডে, ইংল্যান্ডে ও উত্তর-পশ্চিম জার্মানীতে স্থাপিত হয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যে এই যন্ত্র শক্তি সরবরাহের একটি প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত হয়। বাষ্পশক্তির ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে এই সেদিন পর্যন্ত ইউরোপে পবনচক্রের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু পবনচক্রের জন্মভূমি আফগানিস্তান ও পারস্য হইতে বহুদিন হইতেই ইহার পাট উঠিয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য অবশ্য তুর্কী ও মঙ্গোলদের ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযান অনেকাংশে দায়ী।

সেচ : কৃষির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পূর্তবিদ্যাতেও আরবরা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। আরবদের অভ্যুত্থানের পূর্বে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার ব্যাবিলনীয় ও রোমক আমলের প্রাচীন খালগুলি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া একেবারে অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সঙ্গে এই খালের সাহায্যে একদা যে এক অতি উন্নত সেচ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। আরবরা এই খালগুলিকে সংস্কার করিয়া এবং প্রয়োজনমত জায়গায় জায়গায় নূতন খাল কাটিয়া প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থাকে আবার চালু করিয়াছিল। যেসব অঞ্চলে নদী বা জলাশয়ের অভাবে খাল কাটিয়া সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই,—যেমন উত্তর আফ্রিকায়, সেখানে তাহারা অসংখ্য নলকূপ খনন করিয়া সেচের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরবদের অন্তর্জলোৎস কূপ খনন উল্লেখযোগ্য। এইরূপ অন্তর্জলোৎস কূপ (artesian well) ফরাসীরা সর্বপ্রথম পা দ্য কালে, আর্তোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে খনন করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। আরবরা এই আবিষ্কারের কথা জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এজাতীয় কূপ খননে অগ্রণী হয়। আরবদের নিজস্ব আবিষ্কারের পুঁজি হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশীদের নূতন আবিষ্কার, নূতন পদ্ধতি ও টেকনিকের কথা জানিবামাত্র সাগ্রহে তাহা অনুকরণ করিয়া সেইসব আবিষ্কার ও টেকনিকের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে তাহারাই প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে। কাগজ, কম্পাস ইত্যাদি যন্ত্রের বেলায়ও আমরা আরবদের এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখি। এইভাবে নানা আবিষ্কারকে ব্যবহারিক কাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আরবরা যেভাবে সাহায্য করিয়াছে, সমগ্র মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

রসায়নশিল্প : রসায়নে আরবদের তৎপরতার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। জাবির, আল্-রাজি প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের হাতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ও যন্ত্রপাতির উদ্ভব

হয়। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, গলন, ভস্মীকরণ, জারণ, কেলাসন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ও তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নতির ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্পেরও পত্তন হয়। রসায়নে আরব্য সাফল্যের এক প্রধান কারণ হইল মসৃণ মৃৎপাত্র ও কাচপাত্রের ব্যবহার। গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় আমলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ সাধারণ অমসৃণ মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইত। আরব্য মৃৎশিল্পীরা কারুকার্যখচিত রঙ্গীন মৃৎপাত্র নির্মাণে প্রথম হইতেই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। মসৃণ মৃৎপাত্র গড়িবার কাজে তাহারা ছিল অদ্বিতীয়। এইরূপ মৃৎপাত্র এত নিখুঁত ও সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইত যে তাহাদের ধাতব বা রঙ্গীন কাচপাত্র বলিয়া ভ্রম হইত। প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের ফলে মসৃণ মৃৎপাত্রের যেসব নমুনা মুসলমানপ্রধান দেশগুলি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী কি তাহারও পূর্ব হইতে পারস্যে, মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরব্য মৃৎশিল্পীরা বিশেষ ধরনের এক প্রকার অগ্নিসহ মৃৎপাত্রও তৈয়ারী করিয়াছিল।

২৫। মণ্ড-চুল্লীর নক্সা (প্রাচীন আরবী পাণ্ডুলিপি হইতে)।

মসৃণ ও অগ্নিসহ মৃৎপাত্র সুলভ হইলে ইহাদের সাহায্যে এককালে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হইল। এই কাজে আরব্য রাসায়নিকরা সিলিণ্ডার বা শঙ্কু আকৃতির সুবৃহৎ চুল্লী নির্মাণ করে; এই চুল্লীর ভিতর সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলি 'কর' ও 'অমবিক' অর্থাৎ পাতনযন্ত্র পর পর সাজানো থাকিত। সারিবদ্ধভাবে পাতনযন্ত্রে সজ্জিত এরূপ চুল্লীর নাম gallery-oven বা মণ্ড-চুল্লী। ইহাতে এককালে প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থের পাতন সম্ভবপর হয় এবং এইভাবে আরব্য রাসায়নিকরা গোলাপ-জল ও গ্যাসোলিন তৈল উৎপাদন করিত। গোলাপজল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি পাতনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল দামাস্কাস। এখানকার এক একটি মণ্ড-চুল্লীতে বহু শত টন দ্রব্য পাতিত হইত। ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে কায়রোর দুর্গে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় দুর্গস্থ তৈল-

গুদামে প্রায় ৩০০ টন গ্যাসোলিন জ্বলিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র মণ্ড-চুল্লীতেই এত অধিক পরিমাণ গ্যাসোলিন পাতিত করা সম্ভবপর ছিল।

শর্করা-শোধন আর একটি উল্লেখযোগ্য আরব্য আবিষ্কার। ভারতবর্ষ হইতে পারস্যের মধ্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যে ইক্ষুর চালান সুরু হয় আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। প্রথমে লোকে কেবল ইক্ষুরসই ব্যবহার করিত। আরবরা এই রস শোধন করিবার এক প্রণালী আবিষ্কার করে। এই প্রণালী অনুযায়ী প্রথমে ইক্ষুরসের সহিত কিছুটা দুগ্ধ মিশানো হইত; ইহাতে রসের ময়লা অংশ নীচে থিতাইয়া পড়ে, তখন উপরের পরিষ্কার তরল অংশ আস্রাবণ-পদ্ধতিতে পৃথক করিয়া লইলেই হইল। একাদশ শতাব্দীতে মিশরীয় মুসলমান রাসায়নিকরা চূণ ও ভস্মের সাহায্যে ইক্ষুরস শোধন করিবার আর একটি উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করে। চূণ ও ভস্মের দ্বারা রসের ময়লা অংশকে প্রথমে পৃথক করিয়া থিতাইতে দেওয়া হয়; পরে আস্রাবণের দ্বারা পরিষ্কার রসকে পৃথক করিয়া বাষ্পীভূত করিলে চিনি পাওয়া যায়। কালক্রমে এই মিশরীয় পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মার্কো পোলো লিখিয়াছেন, চীনদেশের চিনির কারখানার প্রধান কারিগরদের অধিকাংশই ছিল মিশরীয়। পশ্চিম ইউরোপে ইক্ষুর চাষ সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুর চাষ প্রবর্তন করিলে সেখানেও মিশরীয় পদ্ধতিতে চিনির উৎপাদন সুরু হইয়াছিল। এমন কি কারখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামগুলিও ছিল অবিকল মিশরীয় চিনির কলের নকল।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির এরূপ উন্নত জ্ঞান এবং ফলিত রসায়নে এরূপ উৎসাহ সত্ত্বেও আরবরা কোহল পাতন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মণ্ড-চুল্লী আবিষ্কারের দ্বারা যাহারা প্রচুর পরিমাণে গোলাপজল, গন্ধদ্রব্য, গ্যাসোলিন ইত্যাদি উৎপাদনে আশ্চর্য সাফল্যলাভ করিয়াছিল তাহাদের কাছে কোহল পাতন-পদ্ধতির আবিষ্কার আশা করা খুবই সঙ্গত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব ল্যাটিন ইউরোপীয়দের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। অধ্যাপক বার্ণাল মনে করেন, মদ্যপান কোরাণ-নিষিদ্ধ হওয়ায় কোহল পাতন ব্যাপারে মুসলমান রাসায়নিকরা কখনই তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে নাই; এরূপ নিষেধ না থাকিলে সম্ভবতঃ মুসলমান রাসায়নিকদের হাতেই এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইত। "If it had not been for the Koranic prohibition of wine they (the Arab chemists) might have made the next crucial advance and distilled alcohol, but that was apparently left for the Christians."*

কাগজ : খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাগজ আবিষ্কৃত হয় চীন মহাদেশে। সাই লুন নামে এক চৈনিক রাজপুরুষ তুঁত গাছের ছাল, শণ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদির মণ্ড হইতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত করেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই আবিষ্কার চীনের সর্বত্র এমন কি সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। তবে চৈনিকরা সযত্নে এই আবিষ্কার গোপন রাখিয়াছিল; চৈনিক কাগজ বিদেশে রপ্তানি হইলেও কাগজ প্রস্তুতবিদ্যা যাহাতে চীনের বাহিরে প্রকাশ না পায় তজ্জন্য তাহারা সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বনে কসুর করে নাই। তুর্কীস্তানের নেস্টোরীয় খৃষ্টানরা আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দী হইতে চৈনিক কাগজে বাইবেল লিখিতে আরম্ভ করে। এইরূপ বাইবেলের কিছু কিছু ছিন্নপত্র স্যার অরেল স্টাইন তুর্কীস্তানে আবিষ্কার করেন।

রেশম প্রস্তুতবিদ্যার মত কাগজ প্রস্তুতবিদ্যাও চৈনিকরা শেষ পর্যন্ত বিদেশীদের নিকট হইতে গোপন রাখিতে পারে নাই। আনুমানিক ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চৈনিক কারিগরদের সাহায্যে

* J. D. Bernal, *Science in History*, Watts, London, 1954 ; p. 202.

সমরকন্দে একটি কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। চীনের বাহিরে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম কাগজের কারখানা। পর বৎসর সমরকন্দ আরবদের অধিকারে আসিলে এখানকার কাগজ কলের সুদক্ষ চৈনিক কারিগরদের বন্দী করিয়া বাগদাদে লইয়া যাইতে খলিফা ভোলেন নাই। এই চৈনিক কারিগরদের মারফত আরব্য কারিগররা কাগজ প্রস্তুতবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং অল্প কালের মধ্যেই সমরকন্দের অনুকরণে বাগদাদে কাগজ প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপিত হয় (৭৯৩)। চীনের বাহিরে ইহাই সম্ভবতঃ দ্বিতীয় প্রাচীনতম কাগজের কারখানা। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে প্রথমে মিশর ও পরে মুসলিম স্পেন কাগজশিল্পের প্রধান কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্পেনের ফাসে ও শাতিবায় এই শিল্পের এরূপ উন্নতি ও প্রসার ঘটে যে, এককালে এই দুই স্থান হইতে সমগ্র মুসলিম জগতে কাগজ সরবরাহ হইত। ১২৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানরা শাতিবা দখল করিলে কাগজ প্রস্তুতবিদ্যার গুপ্ত টেকনিক ইউরোপীয়দের আয়ত্তে আসে এবং তাহার পর হইতেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কাগজশিল্পের পত্তন হয়। সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

চৈনিক আবিষ্কার হইলেও কাগজ প্রস্তুতবিদ্যার উন্নয়নে ও কাগজশিল্পের দ্রুত প্রসারে মুসলমানরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। লিখিবার কাগজ ছাড়া মোড়ক হিসাবে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী নানা ধরনের কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যাপারেও মুসলিম দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি উল্লেখযোগ্য। কাগজশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-বাঁধাই সম্পর্কিত এক বড় শিল্পও মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে গড়িয়া উঠে। পুস্তক-বাঁধাই কার্যে মুসলমান কারিগররা ছিল অদ্বিতীয়। অতি সুন্দর সোনার কাজ করা চামড়ার বাঁধাই-এর কাজে মুসলমান কারিগররা যে দক্ষতা ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে সমসময়ে অন্যত্র তাহার কোন তুলনা মেলে না। এই শিল্পে তাহাদের দক্ষতা আজও অম্লান।

কম্পাস : চুম্বকের দিগ্‌দর্শন ধর্ম আবিষ্কৃত হয় চীনে। কিন্তু এই ধর্মের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া চৈনিকরা প্রথম কম্পাস আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অনেকে ইতালীর আমাল্‌ফি নিবাসী নাবিক ফ্লাভিও গিয়োজাকে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) কম্পাসের আবিষ্কর্তা মনে করেন। এই মতের এখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ফ্লাভিওর অনেক পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই গিয়ো (১২০৫), আলেকজান্দার নেকাম (১২১৭), জেম্‌স্ অব ভিত্রি (১২১৯) প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের রচনায় কম্পাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ফরাসী বিজ্ঞানী পেত্রাস পেরেগ্রিনাসের চুম্বক সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ *Epistola*-য় কম্পাসের এক বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ। মুসলমান গ্রন্থকারদের মধ্যে 'জওয়ামি আল্-হিকায়াৎ' গ্রন্থের (১২৩১) রচয়িতা মহম্মদ আল্-আওফি সর্বপ্রথম কম্পাসের কথা উল্লেখ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ল্যাটিন ইউরোপীয় ও মুসলমান বিজ্ঞানীদের রচনায় কম্পাসের উল্লেখ ও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও ইহার দুই এক শত বৎসর পূর্বেই যে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। কাগজের মত কম্পাস আবিষ্কৃত হইবার পর সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সুদূর-প্রসারী প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া খুব সম্ভব এই যন্ত্রের আবিষ্কারের কথা বহুদিন পর্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছিল। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে মুসলমান নাবিকগণ যখন ভূমধ্য সাগর হইতে চীন সাগর পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্র-পথের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তা সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে কোন নাবিক তখন জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে চুম্বকের দিগ্‌দর্শন ধর্মের প্রয়োগের কথা চিন্তা করিয়া থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, কম্পাস যে শেষ পর্যন্ত এক আরব্য নাবিকের আবিষ্কার এই অনুমান অমূলক মনে হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর ঐস্লামিক সৃষ্টিশীল মনীষা একরূপ অব্যাহত ছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে এই মনীষা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বিজ্ঞানে ঐস্লামিক স্বকীয়তার অবনতি সুস্পষ্ট। অবশ্য ইহার পরও কয়েক শত বৎসর ইসলামের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যেমন ইব্‌ন্ জুর, ইব্‌ন্ রুস্‌দ্, আল্-বিত্রুজি, নাসির আল্-দিন আত-তুসি, ইব্‌ন্ খালদুন এবং আরও অনেকে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের গবেষণা প্রথম শ্রেণীর হইলেও বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, পূর্বে স্পেন হইতে পারস্য পর্যন্ত সমগ্র ইসলামখণ্ডে বিজ্ঞান-চর্চা মননশীলতার যেমন এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তেমনটি আর দেখা যায় না। নূতন আবিষ্কার, নূতন সত্য ও জ্ঞানার্জনের যে অদম্য স্পৃহা ও ব্যাকুলতা মুসলিম বিদ্বজ্জনসমাজকে এক সময় আলোড়িত করিয়াছিল, একাদশ শতাব্দীর পর হইতে দেখা যায় তাহার উৎস ধীরে ধীরে কেমন যেন শুকাইয়া গেল।

ঐস্লামিক মনীষার এই অধঃপতনের কারণ একাধিক। মধ্য-এসিয়ার অর্ধসভ্য তুর্কী ও মঙ্গোলদের আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্যের ঐস্লামিক সভ্যতা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তাহাতে সর্ববিধ জ্ঞানচর্চা একান্ত স্বাভাবিক কারণেই ব্যাহত হয়। মঙ্গোল অভিযানে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক ক্ষতিও হইয়াছিল যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, সামরিক তৎপরতা ও স্থানীয় অব্যবস্থার ফলে সমগ্র মেসোপোটেমিয়ার সেচ-নির্ভর কৃষি-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমরা দেখিয়াছি, খলিফাদের উৎসাহে ও মুসলমান ইঞ্জিনীয়রদের চেষ্টায় সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছিল। ইহাতে কৃষির প্রভূত উন্নতি সম্ভবপর হয়। সেই সেচ-ব্যবস্থা পুনরায় অচল হইলে কৃষির অনিবার্য অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। মঙ্গোলদের হাতে পারস্য ও আফগানিস্তানের পবনচক্রগুলির ধ্বংসের দ্বারাও এই দুই দেশে অনুরূপ অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল।

ঐস্লামিক ধর্মসংস্থার এবং তাহার ধারক ও বাহক মৌলবী-মোল্লাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি বিজ্ঞান ও দর্শন-চর্চায় আর এক দফা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। ধর্মসংস্থা চির-দিনই রক্ষণশীলতার প্রধান প্রতিভূ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাহিরে আর কোন নূতন সত্য থাকা সম্ভবপর নয়, এরূপ মত সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিলে উচ্চতর মননশীলতার কপাট বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্যথা বিরোধ, বিপদ ও বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। অ্যারিষ্টটলপন্থী ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ ও গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান দার্শনিক আল্-ঘাজ্জালীর মধ্যে মতবিরোধের পরিণাম আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। মায়াবাদী আল্-ঘাজ্জালীপন্থী গোঁড়া মুসলমান পণ্ডিতের দল যেদিন হইতে বিদ্বৎসভায় উচ্চ আসন পাইতে লাগিল সেদিন হইতে মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-চর্চার সকল আশা-ভরসা নির্মূল হইল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের এই বিরাট প্রয়াস অবশ্য বৃথা যায় নাই। চারিশত বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার শেষ ফসল নিজেদের গোলায় তুলিতে না পারিলেও সে কাজ অসম্পূর্ণ রহিল না। দীর্ঘ সুপ্তির পর খৃষ্টান ইউরোপের নবজাগ্রত মনীষা সে কাজ সুসম্পন্ন করিল। এবার হইতে বিজ্ঞানের পতাকা বহন করিবার ভার ইউরোপের।

ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জ্জন্ম : পণ্ডিতীয় যুগ
(১০০০—১৪০০)

সপ্তম অধ্যায়

৭·১। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম

আমরা প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার যে অবনতি ও অধোগতি ঘটে তাহার স্বরূপ ও কারণ আলোচনা করিয়াছি।* এই অবনতি ও অধোগতির অবস্থা, চিন্তাশক্তির দৈন্য, সাধারণভাবে সর্বপ্রকার বিদ্যোৎসাহিতার একান্ত অভাব আমরা দশম শতাব্দী পর্যন্ত একরূপ সমভাবেই ইউরোপের সর্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাই। এই পাঁচশত বৎসরই ইউরোপের প্রকৃত অন্ধকার যুগ। এই যুগের অবসান ঘটিবার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। খ্রীষ্টানদের অতি সাংঘাতিক ও ভয়াবহ বৎসর ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ নিরুপদ্রবে পার হইবার সহিত চিন্তাজগতের এই পরিবর্তনের যে কিছুটা সম্বন্ধ আছে তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল যে, খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর বা এক মিলেনিয়াম পূর্ণ হইবার দিন মানুষের মহাবিচার সুরু হইবে; সেই দিন যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং সশরীরে মর্ত্যে আবির্ভূত হইয়া এই বিচার পরিচালনা করিবেন, দুষ্কৃতদের কঠিন শাস্তি দিবেন, সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবেন এবং পৃথিবীতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই মহাপ্রলয়ের দিনে এতটুকু স্খলন ঘটিয়াছে এইরূপ কাহারও পরিত্রাণ নাই। যুগের পর যুগ ভয়ার্ত চিত্তে খ্রীষ্টানরা এই ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের অপেক্ষা করিয়াছে, এক দুর্জ্ঞেয় উৎকণ্ঠায় বৎসরের পর বৎসর গুণিয়াছে। অবশেষে এই বৎসর আসিল এবং চলিয়াও গেল। কিন্তু কোন মহাপ্রলয় ঘটিল না, উল্কাপাতও হইল না, দুষ্কৃতদের শাস্তি দিবার জন্য স্বর্গ হইতে বহু প্রত্যাশিত রোষদৃপ্ত যীশুর আবির্ভাব ঘটিল না, কোন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল না, মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখের জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ নিতান্তই সাধারণ ও বিশেষত্বহীনভাবে কাটিয়া গেল।

অত্যাশ্চর্য কোন নৈসর্গিক অঘটন, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ কোন দারুণ ও ব্যাপক দুর্যোগ এই বিশিষ্ট বৎসরটিকে স্মরণীয় করিয়া না রাখিলেও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিবার পর হইতে ইউরোপীয় চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন সুরু হয়, চারিদিকে নূতন উৎসাহ, উদ্যম ও আশার লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশ্চাতের পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আকাঙ্খা মূর্ত হইয়া উঠে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ইহা ইউরোপীয় চিন্তাজগতের অরুণোদয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে যেমন রাত্রি প্রভাত হয় না, রাত্রির অন্ধকার তরল হইতে তরলতর হইয়া ধীরে ধীরে যেমন সবার অলক্ষ্যে প্রভাতের আলোকে বিলীন হইয়া যায়, ইউরোপের নবজাগরণের প্রভাতও আসিয়াছিল সেইরূপ চুপে চুপে ধীর পদক্ষেপে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ঠিক কখন ইহা আসিয়াছিল তাহা কেহ টের পায় নাই, যখন পাইল তখন ইহা অনেকক্ষণ আসিয়া গিয়াছে। র‍্যাসডাল লিখিয়াছেন :—

> "The eleventh century forms the transition between one of the darkest and what was in many respects the brightest of all the centuries generally included in 'the Middle Age': but in the main it belongs to the second—to the period of progress, not to the period of stagnation or retrogression. It cannot be

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-২৭।

> too emphatically stated that there is no historical evidence for the theory which connects the new birth of Europe with the passing away of the fateful millennial year and with it of the aweful dread of a coming end of all things. Yet although there was no breach of historical continuity at the year 1000, the date will serve as well as any other that could be assigned to represent the turning point of European history, separating an age of religious terror and theological pessimism from an age of hope and vigour and active religious enthusiasm."*

একাদশ শতাব্দীর বিদ্যোৎসাহিতার নবজন্মের সহিত খ্রীষ্টীয় প্রথম মিলেনিয়ামের নিরুপদ্রবে অতিক্রান্ত হইবার সম্বন্ধ আংশিকভাবে সত্যমাত্র। বস্তুতঃ এই নবজন্মের একাধিক কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলি কারণ আবার পূর্ববর্তী অন্ধকার যুগের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন। অজ্ঞানতার এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে জ্ঞান-চর্চার আদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বেনেডিক্টিন কর্তৃক খ্রীষ্টীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, অষ্টম শতাব্দীতে শার্লেমাইনের শিক্ষা-সংস্কার, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতিদের ভৌগোলিক তৎপরতা, দশম শতাব্দীতে ক্লুনির সংস্কার-সাধন, সালের্ণোর বিদ্যালয়ের তৎপরতা, আরব্য বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় (প্রধানতঃ ইহুদী পণ্ডিতদের মাধ্যমে) ইত্যাদি নানা কারণ একাদশ শতাব্দীর এই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য দায়ী। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব্য বিজ্ঞান ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার প্রধান অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল; আরব্য বিজ্ঞানের মধ্যস্থতায় ইউরোপ গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের লুপ্ত ঐশ্বর্য খুঁজিয়া পায়, নৈয়ায়িক অ্যারিষ্টটলের পরিবর্তে তাহারা বিজ্ঞানী অ্যারিষ্টটলকে চিনিতে পারে। নানা-দিকে ও নানাভাবে এই বিদ্যোৎসাহিতার আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমে আরবী ও পরে মূল গ্রীক হইতে প্রাচীন বিজ্ঞানীদের অমূল্য গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইল; এই অনুবাদের ফলে অ্যারিষ্টটল প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানিগণের বিজ্ঞান ও দর্শন ধীরে ধীরে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সহিত গ্রথিত করা হইল। খ্রীষ্টান ইউরোপ গ্রীক বিজ্ঞানের তাৎপর্য ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিল, আর বুঝিতে শিখিল মানুষের প্রগতির জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অপরিহার্যতা।

দ্রুত বর্ধমান বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য ইউরোপের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। একাদশ শতাব্দীতে ইতালীতে সালের্ণো ও বোলোনা, দ্বাদশ শতাব্দীতে রেগ্‌গিও, প্যারী, মঁপেলিয়ে ও অক্সফোর্ড, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীতে ভিসেন্‌জা, আরেজ্জো, পাদুয়া সিয়েনা ও নেপ্‌ল্‌স্‌, ফ্রান্সে অর্লিয়াঁ, তুলুজ্‌, ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ, স্পেন ও পর্তুগালে ভাল্লাদোলিদ, প্যালেন্‌সিয়া, সালামান্‌সা, সেভিল, লিস্‌বন-কোয়াম্ব্রা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মননশীলতার ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা মধ্যযুগীয় ইউরোপের এক বিশিষ্ট অবদান। বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কার্য ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একরূপ অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। এই কার্যে প্রথম অগ্রণী হয় ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেন, পরে জার্মানী, বোহেমিয়া, হল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশ। কোন মৌলিক গবেষণা, কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া মধ্যযুগের নামে যে অপবাদ ও কলঙ্ক আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা ও পরিকল্পনা তাহা অনেকটা মুছিয়া দিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করিয়াই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় যুগ ও ষোড়শ শতাব্দী হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ সুরু হইতে পারিয়াছিল।

---

* Hastings Rashdall, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, Vol. I, Oxford at the Clarendon Press, 1895; p. 31.

ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের নবজন্মের মূলে আরও একটি কারণ ছিল। তাহা হইল কারিগরি ও যান্ত্রিক বিদ্যার উন্নতি। দশম শতাব্দীতে জলপ্রবাহচালিত যন্ত্র, লৌহনির্মিত ঘোড়ার নাল, অশ্বসজ্জা, একাদশ শতাব্দীতে লেনস ও চলন্ত হরফ, দ্বাদশ শতাব্দীতে বারুদের সামরিক ব্যবহার, বাত্যাচালিত যন্ত্র, কাগজ, কম্পাস ইত্যাদির আবিষ্কার ইউরোপে এক গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, এইসব যান্ত্রিক আবিষ্কারের অধিকাংশই ইউরোপের বাহিরে সংঘটিত হইয়াছিল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক পূর্বে। উল্লিখিত শতাব্দীতে ইউরোপে এই আবিষ্কারগুলির প্রয়োগ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র। আবিষ্কারের অপেক্ষা এই প্রয়োগের ব্যাপারই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এইরূপ প্রয়োগের ফলেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই পরিবর্তন সম্ভব করিয়া যান্ত্রিক আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবজন্মকেও সম্ভবপর করিয়াছিল। অবশ্য এইসব যান্ত্রিক আবিষ্কার ও তাহাদের প্রয়োগের প্রভাব ঠিকমত অনুভূত হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সময়; সে কথা বিশদভাবে পরে আলোচিত হইবে। আপাততঃ একাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতা ও বিজ্ঞান-চর্চার মূলে উপরিউক্ত অন্যান্য যেসব কারণ বিদ্যমান ছিল আমরা তাহার কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করিব।

৭·২। বেনেডিক্টিন আশ্রম-ধর্ম—শিক্ষা-সংস্কার—ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম

বিজ্ঞানের প্রতি প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। ধর্মমত ও বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে বিজ্ঞানকে বিচার করিতে যাইয়া খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকরা বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানকে বহু দেবদেবীর উপাসক বিধর্মী জাতি ও সম্প্রদায়ের দুষ্ট মস্তিষ্কের জঞ্জাল জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। একথা যেমন সত্য তেমনই ইহাও সত্য যে, বর্বর জাতিদের ব্যাপক আক্রমণে রোমক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ায় ইউরোপীয় সভ্যতা যখন বর্বরতার বন্যায় ভাসিয়া তলাইয়া যাইবার উপক্রম, তখন সেই বর্বরতার সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে এই সভ্যতাকে খ্রীষ্টধর্মই আংশিকভাবে রক্ষা করিয়াছিল। রোমক সভ্যতা ও কৃষ্টি খ্রীষ্টধর্মকে আশ্রয় করিয়াই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।* অন্ধকার যুগে সাধারণভাবে জ্ঞান-চর্চা লোপ পাইলেও কোথাও যদি এতটুকু জ্ঞান-চর্চা হইয়া থাকে, অথবা এই চর্চার উদ্দেশ্যে সামান্য উৎসাহও প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলিতেই হইয়াছিল। এরূপ নানা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সেন্ট বেনেডিক্ট প্রবর্তিত আশ্রমগুলির তৎপরতাই সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

সেন্ট বেনেডিক্ট-প্রবর্তিত আশ্রমধর্ম

সেন্ট বেনেডিক্ট, (জন্ম—আনুমানিক ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) ইউরোপে আশ্রমধর্ম বা মোনাস্টি-সিজ্‌ম্‌-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই আশ্রমগুলি ছিল ইউরোপে অন্ধকার রাত্রির একমাত্র আলোক-বর্তিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সর্বপ্রকার মননশীলতার একমাত্র ভরসা, এক কথায় সভ্যতার একমাত্র বাহক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই আশ্রমগুলিই ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান ও একক কেন্দ্র। আনুমানিক ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বৎসর সম্রাট জাস্টিনিয়ান এথেন্সের

---

* ". . . it is at least certain that so much of the culture of the old Roman world as survived into medieval Europe survived by virtue of its association with Christianity."—Rashdall, Vol. I, p. 26.

বিদ্যাপীঠ বন্ধ করিয়া দেন, সেই বৎসরই বেনেডিক্ট মণ্টেকাসিনোতে এক নূতন আশ্রম ও আশ্রমধর্মের পত্তন করিয়া ইউরোপকে সভ্যতার সঙ্কটের হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। মণ্টেকাসিনোর এই আশ্রম অত্যল্পকালের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং ইহার আদর্শে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এইরূপ আশ্রম আত্মপ্রকাশ করে। নবম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসর বেনেডিক্টিন আশ্রমগুলিই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান প্রতীক ও রক্ষাকর্তা। "During the sixth, seventh, eighth and ninth centuries the benedictine monasteries were the chief civilizing agencies in Western Europe." (Sarton, *Introduction,* Vol. I ; p. 419).

শার্লেমাইনের শিক্ষা-সংস্কার

আশ্রমধর্মের সহিত শিক্ষার আদর্শের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করেন ফ্রাঙ্ক সম্রাট মহামান্য চার্লস বা শার্লেমাইন। প্রত্যেক আশ্রম ও গির্জার সহিত বাধ্যতামূলকভাবে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নির্দেশ দিয়া শার্লেমাইন যে বিখ্যাত শিক্ষা-সনদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। এই সনদের বলে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের সর্বত্র আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, প্রত্যেক গির্জার সহিত গড়িয়া উঠে এক একটি বিদ্যায়তন। প্রথমোক্ত ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; শেষোক্ত ধরনের বিদ্যালয়-গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর পাদরী ও ধর্মপ্রচারক উৎপাদন করা। তাঁহার এই বিরাট শিক্ষা-সংস্কার ও সংগঠনের কার্যে যিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত সেই অ্যালকুইনের (৭৩৫-৮০৪) কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।* অ্যালকুইন ছিলেন শার্লেমাইনের অনেকটা শিক্ষামন্ত্রীর মত; এক সময়ে সম্রাটের তিনি শিক্ষকও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অ্যালকুইনই ছিলেন শার্লেমাইনের শিক্ষা-সংস্কারের বা 'ক্যারোলিঙ্গীয় সংস্কারের' প্রধান নীরব নায়ক।

ক্যারোলিঙ্গীয় সংস্কার : ক্যারোলিঙ্গীয় সংস্কার দীর্ঘজীবী হয় নাই। শার্লেমাইনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরে এবং উত্তরে স্ক্যান্ডিনেভীয় জাতিদের দৌরাত্ম্যে ও দক্ষিণে মুসলমানদের আক্রমণে সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে জ্ঞান-চর্চার আবার ছেদ পড়িল। এরূপ রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিপর্যয় সত্ত্বেও শার্লেমাইন ও অ্যালকুইনের প্রচেষ্টা একেবারে বৃথা যায় নাই। আশ্রম ও গির্জার বিদ্যালয়গুলি আগের মত সক্রিয় না রহিলেও এই দারুণ দুর্যোগের সময় ইহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁথিপত্রগুলি, সর্বোপরি অ্যালকুইন প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের আদর্শকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিল। আশ্রম-বিদ্যালয়ের কল্যাণে অন্ততঃ অ্যালকুইনের সময় ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেই স্তর হইতে আর কখনও নিম্নে নামিয়া যায় নাই। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে নানাস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হইয়া উঠিলে, এই আশ্রম ও গির্জার বিদ্যালয়গুলির ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল।

আশ্রম ও গির্জার বিদ্যালয়ের সহিত পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভবের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ থাকায় এইসব বিদ্যায়তনে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হইত, পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তু কিরূপ ছিল তাহা প্রণিধানযোগ্য। শুধু তাহাই নহে, এই শিক্ষার ধরন ও বিষয়বস্তু পরবর্তী-কালের শিক্ষার আদর্শকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, শিক্ষার পথ ও গতিকে বাঁধিয়া

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।

দিয়াছে। শার্লেমাইনের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, ইহা মূলতঃ ধর্মপ্রধান হইলেও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হইয়াছিল। বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিকে সঠিকভাবে বুঝিতে হইলেও শিক্ষার অন্যান্য কতকগুলি বিভাগে কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ন্যায়শাস্ত্র, সঙ্গীত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান যাহার নাই, শত অধ্যবসায় সত্ত্বেও ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় মর্মকথা তাহার পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। এজন্য ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ কয়েকটি বিদ্যার সহিত পরিচয়ের আবশ্যকতা শার্লেমাইন তাঁহার শিক্ষা-সনদে বিধিবন্ধ করেন।

ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম

উপরিউক্ত সাতটি বিষয় লইয়া দুই শ্রেণীর শিক্ষা-তালিকা রচিত হয়;—(১) ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র লইয়া 'ট্রিভিয়াম' বা ত্রিপাঠী; এবং (২) সঙ্গীত, পাটীগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ লইয়া 'কোয়াড্রিভিয়াম' বা চতুষ্পাঠী। এই ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়ামের বিষয়ীভূত সাতপ্রকার বিদ্যার কথা সম্ভবতঃ মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা হইতে গৃহীত। শিক্ষার এরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ক্যাপেলাই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে তাঁহারও পূর্বে ভারোর রচনায় শিক্ষার এজাতীয় স্তরবিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারো সাতটি বিদ্যার সঙ্গে স্থাপত্য ও চিকিৎসাবিদ্যাও যোগ করিয়াছিলেন; ক্যাপেলা বিষয় দুইটিকে বাদ দেন।

ট্রিভিয়াম হইল শিক্ষার সহজ প্রাথমিক পর্যায়; ইহার পাঠ শেষ হইলে উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের পরবর্তী অপেক্ষাকৃত কঠিন পর্যায় কোয়াড্রিভিয়ামের পাঠ সুরু হইত। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে একমাত্র ট্রিভিয়ামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি অর্থাৎ ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায় পড়ানো হইত। কোয়াড্রিভিয়ামের ব্যবস্থা থাকিলেও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের বিশেষতঃ পারদর্শী শিক্ষকের অভাবে বিদ্যার্থীদের কদাচিৎ কোয়াড্রিভিয়ামের বিষয়গুলি পড়িবার সুযোগ ঘটিত। দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই সুযোগ ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। এই সময়ে ব্যাপক অনুবাদ-তৎপরতার ফলে আরবী ও গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় সুলভ হওয়ায় উচ্চশিক্ষাভিলাষীদের পক্ষে কোয়াড্রিভিয়ামের পাঠ গ্রহণ করিতে আর বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বোয়েথিয়াস্, ক্যাপেলা, ক্যাসিওডোরাস্, ক্যাল্‌সিডিয়াস্ প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থগুলিই আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল। এইসব লেখকদের তৎপরতার এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থগুলির কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। দর্শন ও ন্যায় সম্বন্ধীয় রচনার মান সন্তোষজনক হইলেও গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ বা বিজ্ঞানের অন্য বিভাগের উপর রচনাগুলি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অন্ধকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বোয়েথিয়াস্ তাঁহার জ্যামিতিতে ইউক্লিড হইতে কয়েকটি প্রতিপাদ্য ও সম্পাদ্য উদ্ধৃত করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, প্রতিপাদ্য ও সম্পাদ্যগুলির প্রমাণ দিবার কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। সেই তুলনায় তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। অ্যারিস্টটলের *De interpretatione* ও *Categorie* শীর্ষক ন্যায়শাস্ত্রের দুইখানি গ্রন্থের বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ল্যাটিন অনুবাদ তিনি প্রণয়ন করেন; মধ্যযুগে এই দুইখানি গ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অধীত ও অধ্যাপিত হইত। পোরফিরির *Isagoge* বা অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রের উপক্রমণিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ইহা একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। নিও-প্লেটোনিজ্‌ম্-এর উপর লিখিত ক্যাল্‌সিডিয়াসের গ্রন্থগুলি ছিল দর্শন সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে একাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই গ্রন্থগুলিই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানার্জনের প্রধান উপকরণ।

৭·৩। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতিদের ভৌগোলিক অভিযান

ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নর্মানদের ধীরে ধীরে প্রাধান্যলাভ ইউরোপের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় সভ্যতার বিবর্তনেও ইহাদের অংশগ্রহণ সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। রোমক সাম্রাজ্য কোন কালেই বাল্টিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই; সুতরাং গ্রেকো-রোমক সভ্যতার স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকিয়া এই স্বাধীন ও বর্বর নর্মানরা সভ্য জগতের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, রোমকদের নানা গুণ ও দোষ-ত্রুটী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই তিন শত বৎসর স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নর্মানদের প্রধান তৎপরতা ছিল জাহাজ-নির্মাণ, নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের নেশায় বিপদসঙ্কুল উত্তর সমুদ্রের নানা দিকে নৌ-অভিযানে নেতৃত্ব গ্রহণ।
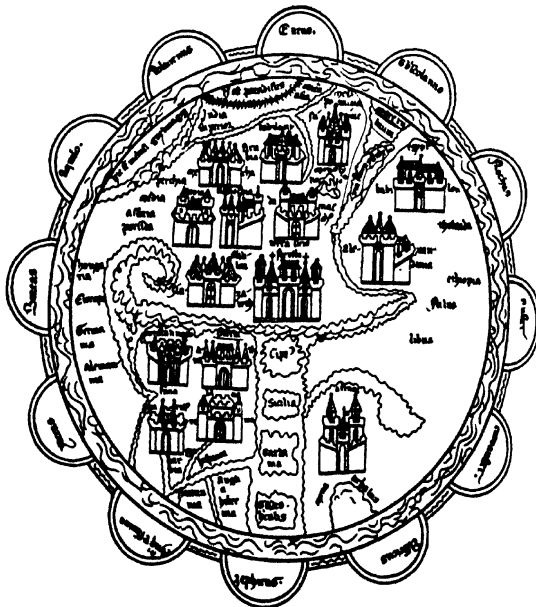
২৬। চতুর্দশ শতাব্দীতে অঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্র। মধ্যে ভূমধ্যসাগর, বামে গ্রীস ও রোম, নিম্নে বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ড এবং উত্তরে জেরুজালেম ও অন্যান্য পবিত্র স্থান দ্রষ্টব্য। পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে মহাসমুদ্র, তাহাকেও আবার বেষ্টন করিয়াছে দ্বাদশ প্রভঞ্জন।
(*Scientific American*, October, 1949, p. 56.)

আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার : নর্মানরাই আইসল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নর্মান ভাইকিংরা* আইসল্যাণ্ড আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কার সম্পর্কে ভাইকিং নাড্‌ডোড্‌ ও দিনেমার গার্ডার স্যাভার্সনের নাম উল্লেখযোগ্য।

* ভাইকিং = Vik-ing; inlet-men. স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভগ্ন তটরেখার বহু স্থানে সমুদ্র স্থলভাগের অনেক দূর পর্যন্ত ফিওর্ড (fiord) রূপে প্রবেশ করিয়াছে। এইসব ফিওর্ডের তটবর্তী স্থান সমূহে প্রধানতঃ স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতিদের বাস ছিল বলিয়া তাহাদের ভাইকিং বলা হইত।

গার্ডার সমুদ্রপথে আইসল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে একবার প্রদক্ষিণ করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে আইসল্যাণ্ডের নাম রাখা হয় 'গার্ডারশোল্‌ম্' (Gardarsholm)—বরফের দেশ। ইন্‌গল্‌ফ আর্নারসন্ এই দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন ৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রীনল্যাণ্ড ও আমেরিকা আবিষ্কার : দশম শতাব্দীতে আর এক স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এরিক রাউডে গ্রীনল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন (৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং এই দ্বীপে তিনি এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। এরিকের পুত্র লাইফ এরিকসন সরাসরি সমুদ্রপথে কোথাও না থামিয়া গ্রীন-ল্যাণ্ড হইতে নরওয়ে যাইবার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছিলেন। মহাসমুদ্রপথে ইহাই সম্ভবতঃ প্রথম পূর্বপরিকল্পিত অভিযান। "This may be considered the first deliberate ocean voyage in history." (Sarton, *Introduction*, Vol. I, p. 676) কোথাও অবতরণ না করিয়া এরিকসন অবশ্য সরাসরি নরওয়ে পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই; পথভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে হেব্রিডিসে যাত্রাভঙ্গ করিতে হয় এবং সেই বৎসরই শেষ পর্যন্ত তিনি নরওয়েতে গিয়া পৌঁছেন। এই বিফলতায় তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি নরওয়ে হইতে গ্রীনল্যাণ্ডের অভিমুখে সমুদ্রপথে কোথাও না থামিয়া পাড়ি দিলেন এবং এবারেও পথভ্রষ্ট হইয়া গ্রীনল্যাণ্ডের পরিবর্তে উত্তর আমেরিকার উপকূলবর্তী ওয়াইনল্যাণ্ড নামক স্থানে উপনীত হইলেন। দুর্জয় অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রান্ত হইল, এবং তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ, নূতন একটি মহাদেশ আবিষ্কৃত হইল। এপর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় নাবিকের ইহাই প্রথম পদার্পণ।

এরিকসনের কয়েক বৎসর পরে (১০০৩-১০০৬) থর্ফিন কার্লসেফ্‌নি ওয়াইনল্যাণ্ডে গিয়া এক উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সঙ্গী ও অনুচর নাবিকরা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড, দক্ষিণ লাব্রাডর, সেণ্ট লরেন্স উপত্যকা, নোভাস্কোশিয়া, নিউ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতির উপকূলভাগ পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের কোন চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। মুহূর্তের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ, নূতন ও পুরাতন পৃথিবী, বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে দৃষ্টিবিনিময় করিল। উভয়েই অবাক হইয়া ভাবিল ইহারা আবার কারা। বিদেশীদের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ ও বৈরীভাবের বশবর্তী হইয়া আমেরিকার আদিম রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ইহার অত্যল্পকাল পরেই শ্বেতকায় স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নাবিকদের সমূলে উৎখাত ও বিতাড়িত করিয়াছিল। তখন তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, পাঁচশত বৎসর পরে এই শ্বেতকায় জাতিরা আবার সদলবলে আবির্ভূত হইয়া তাহাদেরই সাধের জন্মভূমিতে তাহাদের পরবাসী করিবে, সভ্যতার নির্মম প্রহারে সবংশে নিধন করিবে!

নর্মানদের এই উদ্যম শুধু সামুদ্রিক অভিযান ও ভৌগোলিক তৎপরতায় নিঃশেষিত হয় নাই। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বিজয়ীর বেশে তাহারা ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল। পূর্বে রাশিয়ার নভ্‌গোরোড, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাহাদের বিক্রম অনুভূত হইল। নর্মানদের এই রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের ইতিহাস অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। তাহাদের অভ্যুত্থানে, বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তাহাদের তৎপরতায় কয়েক শত বৎসর ইউরোপে সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নব বিকাশ ঘটে, প্রসঙ্গত তাহাই শুধু লক্ষণীয়। র‍্যাসডাল লিখিয়াছেন,

> "The conversion of the Scandinavian pirates into Christian and civilised Normans was one of them (causes of European regeneration). In Germany, under the enlightened rule of the Ottos, the symptoms of a better order of things may already be traced before the middle of the tenth century. To the Ottos, too, was due the regeneration of the Papacy." (*The Universities of Europe in the Middle Ages*, Vol. I, p. 31.)

৭·৪। সালের্ণোর চিকিৎসা-বিদ্যালয়

মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবজন্মে বিজ্ঞানের যে শাখা পৃথকভাবে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইল চিকিৎসা-বিজ্ঞান। এজন্য মধ্যযুগের শেষার্ধে ও রেনেশাঁসের সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুরোভাগে যেসব বিজ্ঞানীদের আমরা দেখি তাহাদের অধিকাংশেরই বিজ্ঞানে হাতে খড়ি হইয়াছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া। অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্নাসের চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা উল্লেখযোগ্য। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যই প্রথম প্রেরিত হইয়াছিলেন। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায় প্রভৃতির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হইয়া শুধু বিজ্ঞানের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিষয় যদি তখন থাকিয়া থাকে তাহা হইল এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান। গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের আর অন্য যে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইলে বিদ্যার্থীদের ট্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়ামের মারফত অগ্রসর হইতে হইত। এইরূপ বিদ্যাচর্চার একমাত্র স্থান ছিল আশ্রম ও গির্জার বিদ্যালয়।

সালের্ণোর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, খ্রীষ্টীয় ইউরোপের ইহাই প্রথম প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়। কোন আশ্রম, গির্জা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই এবং একমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়া আর কোন বিষয়ে এই বিদ্যালয় উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। সালের্ণোর প্রতিষ্ঠার আদি ইতিহাস বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে অবলুপ্ত। সম্ভবতঃ ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় নাই; নানা চিকিৎসকের সান্নিধ্যে ও পারস্পরিক ভাববিনিময়ে আপনা হইতেই এই অঞ্চলের চিকিৎসকেরা এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এক আদেশ জারি করিয়া সরকারীভাবে সালের্ণোর বিদ্যালয়কে চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বীকার করেন। অবশ্য ইহার বহু পূর্বেই এই বিদ্যালয়ের গৌরবের দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল; বোলোনা, পাদুয়া প্রভৃতি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ায় চিকিৎসা ব্যাপারে সালের্ণোর একচেটিয়া প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির অবসান হইয়াছিল।

নেপ্ল্স্ উপসাগরের দক্ষিণে পিস্তাম উপসাগরের উপর সালের্ণোর অবস্থিতি। বহু প্রাচীন কাল হইতে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে দক্ষিণ ইতালীর এই মনোরম স্থানটির প্রসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়। তারপর দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলিতে এককালে গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে প্রভাব ছিল, তাহা বোধ হয় কখনই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে গ্রীক চিকিৎসা-পদ্ধতির অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে সালের্ণোতে চিকিৎসকদের একটি সঙ্ঘ ছিল। দক্ষিণ ইতালীর বিখ্যাত ইহুদী চিকিৎসক ডোম্নোলো (৯১৩-৮২) সম্ভবতঃ সালের্ণোর এই সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডোম্নোলোর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রধানতঃ তাঁহার তৎপরতায় সালের্ণোর চিকিৎসাবিদ্যার খ্যাতি যে বর্ধিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। ডোম্নোলোর পর সালের্ণোর প্রাধান্য-বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন আফ্রিকাবাসী কনস্তান্তাইন। কনস্তান্তাইন মন্টেকাসিনোর আশ্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া আরবী ভাষায় লিখিত হিপোক্রেটিস্ প্রমুখ প্রাচীন চিকিৎসকদিগের গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন; গ্রন্থগুলি বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্থেজ হইতে পলায়ন করিয়া তিনি যখন ইতালীতে আসেন তখন সালের্ণোতেই তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সালের্ণোর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ কনস্তান্তাইনের আগমনের অব্যবহিত পর হইতে সালের্ণোর আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় এই উন্নতির মূলে কনস্তান্তাইন ও তাঁহার শিষ্যবর্গের যে কিছুটা হাত ছিল তাহা মনে করা স্বাভাবিক।

আরব্য বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ইহুদী ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের তৎপরতা একাদশ শতাব্দীতে সালের্ণোর উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান কারণ হইলেও এই চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের আদি প্রতিষ্ঠা যে ঐস্লামিক ভাবধারার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় নাই, ইহাই এখন ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত অভিমত। হেনশেল, দারেম্বার্গ, দ্য রেন্‌জি প্রমুখ পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, প্রাচীন গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভাব হইতেই সালের্ণো প্রথম অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। দশম শতাব্দীতে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্যারিওপণ্টস্ প্রমুখ সালের্ণোর চিকিৎসাবিদ্‌গণের রচনায় আরব্য প্রভাবের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; তাঁহাদের রচনার মূল ভিত্তি গ্রেকো-রোমক চিকিৎসাবিদ্যা। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরব্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থরাজির ল্যাটিন সংস্করণ অধিক সংখ্যায় সুলভ হইতে আরম্ভ করিলে সালের্ণো আরব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার দ্বারা উত্তরোত্তর প্রভাবিত হইয়া পড়ে।

সালের্ণো-বিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এই বিদ্যালয়ের সহিত বহু মহিলা চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ট্রট্‌লা (আনুমানিক ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) নাম্নী এক মহিলা চিকিৎসকের খ্যাতির কথা শুনা যায়। ট্রট্‌লা স্ত্রীরোগে পারদর্শিনী ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই সালের্ণোর প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সালের্ণো বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা শুনা যায়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নাপোলিয়োঁ এক আদেশ জারি করিয়া এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন।

৭·৫। ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার নবজন্মে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব

দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ইউরোপে বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পুনর্জন্মের পশ্চাতে বেনেডিক্ট-প্রবর্তিত আশ্রম-ধর্ম, শার্লেমাইনের শিক্ষা-সংস্কার, নর্মানদের ভৌগোলিক অভিযান ও প্রাধান্য লাভ ইত্যাদি যেসব প্রভাবের কথা আলোচিত হইল সে সমস্তকেই ম্লান করিয়া দিয়াছিল আরব্য বিজ্ঞানের সর্বাত্মক প্রভাব। প্রগতিশীল আরব্য বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া ও এই বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়া ইউরোপ নূতন করিয়া জ্ঞান-চর্চায় উৎসাহিত হইয়া উঠে। বিদ্যোৎসাহিতার এই নবজন্মের জন্য মুসলমানদের কাছে খ্রীষ্টান ইউরোপের ঋণ অপূরণীয়। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখিতেছি, ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোভাগে, সকল প্রকার গবেষণার শীর্ষদেশে। এমন কি কালের পরিবর্তনে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের প্রাধান্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও আজ আমরা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু দশম ও একাদশ শতাব্দীতে অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই বুঝাইত। বিজ্ঞান-চর্চার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনকল্পে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তখন বাগদাদ, টলেডো, করডোভা প্রভৃতি স্থানের মুসলিম বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ-শিক্ষাভিলাষীদের বিদ্যাশিক্ষার উপদেশ দিতেন, যেমন আজ আমরা প্রাচ্য দেশবাসীরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দিয়া থাকি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারী, বার্লিন, জুরিক, হার্ভার্ড, ম্যাসাচুসেট্‌স্, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া অধ্যয়ন করিতে। এমত অবস্থায় আরব্য বিজ্ঞান যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-চর্চাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিবে তাহা স্বাভাবিক।

ডোয়েলো (৯১০-৮২)

খ্রীষ্টান ইউরোপের উপর আরব্য বিজ্ঞানের প্রথম সংঘাত কিরূপে ঘটিয়াছিল, আরব্য বিজ্ঞানের অভিনব বার্তা কে প্রথম ইউরোপে বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যে অল্প কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের রচনায় আরব্য বিজ্ঞানের ও প্রাচ্য ভাবধারার

প্রভাব প্রথম পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে ডোম্নোলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডোম্নোলোর পুরো নাম সাব্বাতাই বেন আব্রাহাম বেন জোয়েল। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। দক্ষিণ ইতালীর রোসানো নামক স্থানে তিনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি একবার স্যারাসেনদের হাতে বন্দী হন এবং পালের্মোতে কিছুকাল আটক থাকেন। পালের্মোয় অবস্থানকালে তাঁহার আরবী ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার সুযোগ ঘটে। গ্রীক, আরব্য, ব্যাবিলনীয় ও ভারতীয় বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার যে পরিচয় ঘটিয়াছিল, ইহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।* রোসানোতে স্থিতিলাভ করিবার পূর্বে ডোম্নোলো ইতালীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং সম্ভবতঃ এই সময় তিনি আরব্য বিজ্ঞানের কথা ইউরোপে প্রচার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ *Book of Creation* বা 'সৃষ্টিতত্ত্বের' রচনা-কাল ৯৪৬ খৃষ্টাব্দ। ইহার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ আরব্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ডোম্নোলোর অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Precious Book* (Sefer ha-yaqar) চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত; ইহাতে ১২০ ভেষজের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

সালের্ণোর বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ডোম্নোলোর প্রভাব ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। তাঁহার মত কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় ও তৎপরতায় কিরূপে ধীরে ধীরে সালের্ণোর বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠে তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

আল্‌হান্দ্রাস্

ডোম্নোলোর সমসাময়িক আল্‌হান্দ্রাস্ ('আলেকজান্দার' কথার অপভ্রংশ) নামে এক অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির ল্যাটিন রচনাতেও হিব্রু ও আরব্য বিজ্ঞানের ছাপ সুপরিস্ফুট। আল্‌হান্দ্রাস্ *Mathematia Alhandrei summi astrologi* শীর্ষক এক জ্যোতিষীয় গ্রন্থের প্রণেতা; ৯৫০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ দক্ষিণ ফ্রান্সে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে ইহার মূল্য অবশ্য এমন কিছুই নহে, তবে ইহার কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। হিব্রু ও আরব্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোচনায় সমৃদ্ধ ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। আল্‌হান্দ্রাস্ সম্ভবতঃ ইহুদী ছিলেন অথবা ইহুদী পণ্ডিতের সহযোগিতায় পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন।

ডোম্নোলো ও আল্‌হান্দ্রাসের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরব্য পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাব ল্যাটিন ইউরোপে উপলব্ধ হইতে আরম্ভ করে এবং এই প্রভাব বিস্তারের কার্যে ইহুদী পণ্ডিতরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই কার্য আরও ব্যাপকভাবে ও অধিকতর সাফল্যের সহিত সম্পাদন করেন গেরবের, খঞ্জ হার্মান, আফ্রিকাবাসী কন্‌স্তান্তাইন প্রমুখ পরবর্তীকালের প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা।

গেরবের, পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার (৯৩০-১০০৩)

ফরাসী গণিতজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী গেরবের স্পেনে বার্সেলোনায় আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। এইখানে আরব্য গণিতের এবং সেইসূত্রে ভারতীয় সংখ্যা-পাতন পদ্ধতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হয় উত্তর ফ্রান্সে র‍্যাঁসে। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় সিলভেস্টার নাম ধারণ করিয়া পোপের পদে অভিষিক্ত হন।

গেরবেরের গাণিতিক প্রতিভা একবাক্যে স্বীকৃত। বোয়েথিয়াসের পর ইউরোপে গণিতের যে অবনতি ঘটিয়াছিল সেই অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাঁহার প্রতিভা অত্যাশ্চর্য

* Sarton, *Introduction*, Vol. I, p. 683.

মনে হইবে। আবাকাস, আস্তরলাব ও জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। একাদশ শতাব্দীতে আস্তরলাব সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ও একুশ খণ্ডে সমাপ্ত এক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই পাণ্ডুলিপিতে আরবী শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য এবং আরব্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ কর্তৃক লিখিত আস্তরলাবের বর্ণনার সহিত আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানি কোন মূল আরবী গ্রন্থের তর্জমা বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রকৃত অনুবাদক কে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা সত্ত্বেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, গেরবের সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের অনুবাদক। তবে এত বড় গ্রন্থ আরবী হইতে ল্যাটিনে তর্জমা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত আরবী ভাষার জ্ঞান ও দখল গেরবেরের ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।*

তাঁহার জ্যামিতি সম্বন্ধে অবশ্য এইরূপ কোন সংশয় নাই। বুভনভ, হ্যাঙ্কেল প্রমুখ গণিতের ঐতিহাসিকগণ গেরবেরের জ্যামিতির উল্লেখ এবং উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। পাটীগণিতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পাটীগণিত সম্বন্ধে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না; তবে তাঁহার বন্ধু ইউট্রেচের বিশপ এডালবোল্ড্‌কে লিখিত চিঠিপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ নানা গাণিতিক সমস্যার অবতারণা ও আলোচনা পাওয়া যায়। সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল; গুবার সংখ্যাপাতন পদ্ধতির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।† স্মরণ থাকিতে পারে যে, বোয়েথিয়াসের জ্যামিতিতে গুবার সংখ্যাপাতন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বোয়েথিয়াসের লেখার সহিত গেরবেরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; বস্তুতঃ, তাঁহার গাণিতিক গবেষণার প্রধান অনুপ্রেরণাও বোয়েথিয়াস্। সুতরাং গুবার সংখ্যাপাতন পদ্ধতির কথা সম্ভবতঃ গেরবের বোয়েথিয়াসের গ্রন্থপাঠে জানিয়া থাকিবেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চা ও মননশীলতা যে নিঃসন্দেহে পুনর্বার উর্ধ্বমুখী গেরবের তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

খঞ্জ হার্মান (১০১৩-৫৪)

সুইট্‌জারল্যান্ডে রাইখেনাউ-এর খ্রীষ্টান পাদরী হার্মানও ছিলেন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। আবাকাস ও আস্তরলাব সম্বন্ধে হার্মানের কয়েকটি গ্রন্থের খ্যাতি পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত অটুট ছিল। *De mensura astrolabii*, ও *De utilitalibus astrolabii* আস্তরলাব সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেই আরব্য বিজ্ঞানের প্রভাব সুপরিস্ফুট। সঙ্গীতশাস্ত্রেও হার্মানের বিশেষ উৎসাহ ছিল। আল্-কিন্দির অনুকরণে ধ্বনির উত্থান-পতন নির্দেশ করিতে তিনি একপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করেন।

গেরবেরের মত স্পেন বা মুসলমানপ্রধান দেশে অবস্থান করিয়া আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ সম্ভবতঃ হার্মানের ঘটে নাই। তবে ডোম্নোলো বা আল্‌ছাদ্রাসের মত আরব্য বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ইহুদীর সংস্পর্শে আসিয়া আরব্য বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

---

* Lynn Thorndike, *History of Magic and Experimental Science;* pp. 698-703.

† 'He was possibly the first Christian to give a scientific account of the ghubar numerals (i.e., the Spanish-Arabic numerals), but without the zero.'—Sarton, *Introduction,* Vol. I, p. 670

টলেডোর ভূমিকা

দশম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ল্যাটিন ইউরোপে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব সূচিত হইলেও এই প্রভাবের প্রকৃত ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও দ্বাদশ শতাব্দীতে। ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের দ্বারা টলেডো ও স্পেনের অন্যান্য মুসলমান-প্রধান জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রগুলির অধিকারলাভ, নর্মানদের দ্বারা সিসিলি-বিজয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ইউরোপের ধর্মযুদ্ধের সূচনা ইত্যাদি নানা ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য কারণে মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার যে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়, ইউরোপে আরব্য বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারলাভের তাহাই অন্যতম কারণ।
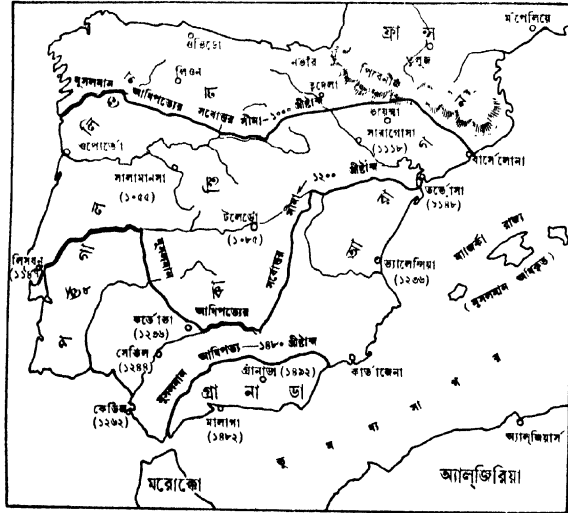
২৭। আইবেরীয় উপদ্বীপের মানচিত্র—মুসলমান প্রাধান্য বিলোপের কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ। বন্ধনীর মধ্যের তারিখ খ্রীষ্টানদের হাতে উক্ত সহরের পতন নির্দেশ করিতেছে।

১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আলফনসোর সৈন্যবাহিনীর নিকট টলেডোর পতন হয়। মুসলমানদের আমলে টলেডো ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। একটি নগর বা রাজ্য জয়ের সামরিক দিক হইতে খ্রীষ্টানদের দ্বারা টলেডো-জয়ের ব্যাপার হয়ত আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু এই জয়ের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টানরা ঐস্লামিক সভ্যতার যে এক অমূল্য দৃষ্টান্ত হাতের কাছে পাইল তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। টলেডোর অতুলনীয় গ্রন্থাগার, বহু বিদ্যালয়, নানা ভাষাভাষী ইহুদী ও মুর পণ্ডিতদের সান্নিধ্য এবং সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার এমন একটি উৎকৃষ্ট পরিবেশের জন্য খ্রীষ্টান ইউরোপের নবজাগ্রত বিদ্যোৎসাহিতা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ইহার পূর্বে বিদ্যোৎসাহী ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের গোপনে ও ছদ্মবেশে মুসলমানদের দেশে গিয়া আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চা করিতে হইত। খ্রীষ্টান ইউরোপ ও মুসলমান দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক শত্রুতা ও ধর্মগত বিরোধের জন্য এরূপ প্রয়াস প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ বিপদসঙ্কুল ছিল। টলেডোর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতে আসিলে ইউরোপীয়দের পক্ষে আরব্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের এক প্রধান অন্তরায় দূর হইল। বিদ্যোৎসাহী

খ্রীষ্টান ছাত্র ও পণ্ডিতরা টলেডোয় আরব্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিবার আশাতীত সুযোগ লাভ করিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আদেলার্দ অব বাথ, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, মার্ক প্রমুখ খ্যাতনামা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ টলেডোতে কালাতিপাত করেন এবং আরবী ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এই তর্জমার কার্যে টলেডো ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরবী হইতে টলেমী, ইউক্লিড, হিপোক্রেটিস্, গ্যালেন, অ্যারিষ্টটল ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলীর ল্যাটিন অনুবাদ প্রধানতঃ এইখানেই সম্পাদিত হয়। একথা আদৌ অত্যুক্তি নহে যে, এই তর্জমার ব্যাপারে নবম শতাব্দীতে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তিনশত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় ইউরোপে টলেডো অবিকল সেই ভূমিকা গ্রহণ করে। তর্জমা-কার্যে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে খলিফা আল্-মামুন বাগদাদে 'দার আল্-হিখ্মা' বা 'জ্ঞানগৃহ' স্থাপন করিয়াছিলেন; আর্কবিশপ রেমণ্ড টলেডোতে ডোমিনিকো গুণ্ডিসালভির তত্ত্বাবধানে যে তর্জমার বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অতীব নিষ্ঠা, যত্ন ও দক্ষতার সহিত বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ রচনায় সাহায্য করিয়া ইতিহাসে এই বিদ্যালয় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তারপর আর একটি বিষয়েও টলেডো ও বাগদাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। বাগদাদে গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় তর্জমার কার্যে প্রথম দিকে বহু ভাষাবিদ্ নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান, ইহুদী ও সাবীয় পণ্ডিতদের তৎপরতা যেমন লক্ষণীয়, টলেডোতেও আরবী হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কার্যে প্রথম প্রথম যাঁহারা সহায়তা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ ইহুদী। আরবী, হিব্রু, স্প্যানিস ও ল্যাটিন ভাষায় এই ইহুদী পণ্ডিতদের সমান দক্ষতা ছিল। উদাহরণস্বরূপ গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বহু আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদক ইহুদী আভেনডেথ বা ইব্‌ন্ দাউদের নাম, অথবা আবুল কাশির *Liber Servitoris* গ্রন্থের অনুবাদ সম্পর্কে টর্টোসার ইহুদী আব্রাহামের নাম উল্লেখযোগ্য।

সিসিলির অবদান

ইউরোপে আরব্য বিজ্ঞানের প্রসারে টলেডোর ন্যায় সিসিলির অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে নর্মানদের আক্রমণের ফলে সিসিলিতে দীর্ঘ ১৩০ বৎসরের মুসলমান আধিপত্যের অবসান ঘটিলে এই দ্বীপের মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার ইউরোপের নিকট নূতন করিয়া উন্মুক্ত হয়। সিসিলির সভ্যতা সুপ্রাচীন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দ্বীপে গ্রীকদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা জানা যায়। নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও এই দ্বীপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুসলমানদের আমলে আরব্য বিজ্ঞানের প্রভাব স্বভাবতঃই প্রবল ছিল; তবে আরবী ভাষাতে শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চা মুখ্যতঃ নিবদ্ধ থাকিলেও, গ্রীক ভাষা ও এই ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর কোন সময়েই সিসিলি হইতে একেবারে লুপ্ত হইতে পারে নাই। এজন্য সিসিলি ইউরোপে শুধু আরব্য বিজ্ঞানের প্রচারক হিসাবেই খ্যাত নহে, মূল গ্রীক পুঁথিপত্র ও পাণ্ডুলিপির সহিত নূতন করিয়া ইউরোপের পরিচয় ঘটাইয়া জ্ঞান-চর্চার পথ ইহা বিশেষভাবে প্রশস্ত করিয়াছিল। টলেডোতে প্রধানতঃ আরবী ভাষা হইতে ল্যাটিন ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির তর্জমা সম্পন্ন হইয়াছিল; সিসিলিতে এই তর্জমা আরবী ও গ্রীক উভয় ভাষা হইতেই সম্পাদিত হয়। "Here, as in Toledo, a troop of learned translators began to make Latin versions from Greek and Arabic."* বলা বাহুল্য, সম্প্রদায় হিসাবে এখানেও ইহুদীরাই এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছিল।

---

* *Legacy of Islam*, p. 348.

ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ঐস্লামিক স্পেন ও সিসিলির সহিত সংঘাত ও সংস্পর্শের ফলে ইউরোপে আরব্য বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তারলাভ করিবার যদি অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, স্যারাসেনদের সহিত প্রায় দুইশত বৎসরের প্রতিনিয়ত ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে সংঘাত ও সংযোগ ঘটে তাহার ফলে কিন্তু আরব্য বিজ্ঞান ইউরোপে আশানুরূপভাবে বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। অনেক সময় ইহা অতি আশ্চর্য বলিয়াই মনে হয়। ম্যাক্স মেয়ারহফ এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "The influence of the Crusades on the transmission of the Islamic science to Europe was surprisingly little."*

১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ধর্মযুদ্ধ সুরু হয় এবং ১০৯০ হইতে ১২৯০-এর মধ্যে প্রায় আটটি ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আমরা পিসার অধিবাসী ষ্টিফেন নামে জনৈক অনুবাদকের উল্লেখ পাই। ষ্টিফেন সালের্ণো ও সিসিলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং আরব্য বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে এন্টিওকে আসেন। এইখানে তিনি হ্যালি আব্বাসের *Liber regulis* গ্রন্থের এক ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করেন ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তবে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মযুদ্ধ ইউরোপে আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক না হইলেও পরোক্ষভাবে ঐস্লামিক মননশীলতার প্রতি সমাদর ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে ইহা যে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্যারাসেনদের দেশে দীর্ঘ পর্যটন ও সেই সূত্রে বিভিন্ন বিদেশী জাতির সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে ঐস্লামিক সভ্যতার বিচিত্র প্রকাশ, তাহার বিলাস-ব্যাসন, প্রাচুর্য ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ইত্যাদি অবলোকন করিয়া ইউরোপ আপনা হইতেই এই সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

ধর্মযুদ্ধের কল্যাণে খ্রীষ্টান ইউরোপের সবচেয়ে বড় লাভ হইয়াছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ায়। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে মুসলমান প্রাধান্যের ফলে সমগ্র ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য মুসলমান রাজ্যগুলির একচেটিয়া ছিল। পশ্চিমে পিরেনীজ পর্বতমালার নিকট চার্লস মার্টেলের বাহিনী ও পূর্বে বাইজানটাইন 'কাবাল্লারি' (অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী) ইউরোপের অভ্যন্তরে আরব সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করিয়া মুসলিম বন্যা হইতে পশ্চিম ইউরোপকে চিরকালের জন্য রক্ষা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভূমধ্যসাগরের এবং উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ইউরোপের অর্থনৈতিক দুর্দশার আর অন্ত ছিল না। মুসলমান নাবিকদের অপ্রতিহত প্রতাপে ভূমধ্যসাগর 'মুসলিম হ্রদে' পরিণত হইয়াছিল। ধর্মযুদ্ধের তৎপরতা অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা ধীরে ধীরে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে ইউরোপীয় বাণিজ্যপোত আবার একে একে দেখা দেয় এবং পিসা, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি বন্দর আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া ইতালীর উপকূলে যেসব নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠে এবং যে এক সওদাগর-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নততর জ্ঞান-চর্চার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে তাহারা এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। মননশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের এরূপ উন্নতির ফল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় নাই, ইহা হইয়াছিল রেণেশাঁসের সময় আরও কয়েক শত বৎসর পরে।

আর একটি বিষয়ে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব সুপরিস্ফুট। তাহা হইল মুসলিম হাসপাতালের বা 'বিমারিস্থানে'র অনুকরণে ইউরোপে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা। দামাস্কাসে সেলজুক শাসনকর্তা নুর আল্-দিনের সময় এবং কায়রোতে মমলুক সুলতান আল্-মানসুর কলায়ুনের শাসনকালে

---

* *Legacy of Islam*, p. 349.

বিমারিস্থানগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয় পর্যটকেরা এইসব বিমারিস্থান পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হয় এবং ইহাদের কথা দেশে ফিরিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট রোমে বিমারিস্থানের অনুকরণে San Spirito নামে এক হাসপাতাল স্থাপন করেন; পরে সমগ্র ইতালীতে এরূপ বহু হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১২৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মযুদ্ধ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফরাসীরাজ নবম লুই প্যারীতে লে ক্যাঁজ-ভ্যাঁ (Les Quinze-Vingt) নামে যে হাসপাতাল ও আশ্রয়শিবির স্থাপন করেন তাহারও অনুপ্রেরণা ছিল মুসলিম বিমারিস্থান।

৭·৬। ল্যাটিন ইউরোপের অনুবাদ-তৎপরতা—কয়েকজন বিশিষ্ট অনুবাদক—বিদ্যোৎসাহিতার নবজন্মে অনুবাদ-সাহিত্যের ভূমিকা

এইভাবে টলেডো ও সিসিলির ঐস্লামিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্পর্শে আসিবার এবং ধর্মযুদ্ধের সূত্র ধরিয়া মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হইবার ফলে আরব্য বিজ্ঞানের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনে যে গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয় তাহা অনুবাদ-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তীব্রভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষতঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনুবাদ-তৎপরতা অসম্ভব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। তিনশত বৎসর পূর্বে নবজাগ্রত মুসলমান দেশগুলিতে সিরীয়, গ্রীক ও সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থের তর্জমার যেমন মরসুম পড়িয়াছিল, দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা তাহারই ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি।

আফ্রিকাবাসী কনস্তান্তাইন (মৃত্যু-১০৮৭)

আরবী হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় আফ্রিকাবাসী কনস্তান্তাইনের (মৃত্যু-১০৮৭) তৎপরতার কথা। টিউনিসিয়াবাসী কনস্তানন্তাইন একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইতালীতে আগমন করেন এবং বহু বৎসর এই দেশে অতিবাহিত করিবার পর মণ্টেকাসিনোর পাদরী নিযুক্ত হন। মণ্টেকাসিনোয় অবস্থানকালে তিনি প্রথম অনুবাদ-কার্য আরম্ভ করেন ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং জীবনের অবশিষ্ট সতেরো বৎসর আরবী চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করিয়াই কাটাইয়া দেন।

কনস্তান্তাইনের তর্জমা নানা দোষে দুষ্ট; ইহা শিথিল, অসংলগ্ন ও আরবী শব্দের অপ-প্রয়োগের বাহুল্যে পরিপূর্ণ। আরবী বা ল্যাটিন কোনটাতেই তাঁহার সন্তোষজনক অধিকার ছিল না। ভাষার এইরূপ ত্রুটী ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাছা বাছা কয়েকজন গ্রীক বিজ্ঞানীর গ্রন্থ আরবী হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইবার ফলে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহীদের এই প্রথম গ্রীক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। মধ্যযুগে ল্যাটিন ইউরোপে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। এজন্য কনস্তান্তাইনের তর্জমা-প্রচেষ্টার গুরুত্ব এত বেশী। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দারেম্বার্গ *Notices et extraits des manuscrits médicaux*-তে কনস্তান্তাইন সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করেন,

> "We owe a great debt of gratitude to Constantinus because he thus opened for Latin lands the treasures of the east and consequently those of Greece. He has received and he deserves from every point of view the title of restorer of medical literature in the west."

কনস্তান্তাইন কর্তৃক অনূদিত গ্রীক গ্রন্থের মধ্যে হিপোক্রেটিসের বচন (aphorism), *Prognostica* ও *Diaeta Acutorum* উল্লেখযোগ্য। হুনায়েন কর্তৃক রচিত আরবী সংস্করণ হইতে হিপোক্রেটিসের বচন তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। *De Oculis* নামে আর একটি গ্রন্থও তাঁহার অনূদিত; ইহা হুনায়েনের চক্ষুরোগ সম্বন্ধে লিখিত *The Ten Treatises on the Eye* গ্রন্থের অনুবাদ। গ্যালেনের কয়েকটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থেরও তিনি ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করেন। এই কার্যে তিনি কেবল গ্রীক বিজ্ঞানীদের গ্রন্থই নির্বাচন করেন নাই; আল্-রাজি, হ্যালি আব্বাস, আইজাক জুডিয়াস প্রমুখ খ্যাতনামা মুসলমান ও ইহুদী বিজ্ঞানীদের গ্রন্থও তাঁহার দীর্ঘ তর্জমার তালিকাভুক্ত। আল্-রাজির কিমিয়া-গ্রন্থ *Liber Experimentorum* ও হ্যালি আব্বাসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব এল মালেকি' তিনি অনুবাদ করেন। আরব্য বিজ্ঞানিগণের গ্রন্থগুলি তর্জমার কার্যে কনস্তান্তাইন মণ্টেকাসিনোর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী পাদরীর সাহায্য লাভ করেন; তাঁহাদের মধ্যে জোহানেস্ অফ্লিসিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব অনুবাদ সম্পর্কে কনস্তান্তাইনের বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ এই যে, তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থের রচয়িতার নাম, বা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্যের প্রকৃত আবিষ্কর্তার নাম উল্লেখ করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, কোন কোন অনুবাদকে তাঁহার নিজস্ব মৌলিক রচনা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন। উদাহরণ-স্বরূপ, হ্যালি আব্বাসের গ্রন্থের আর একজন অনুবাদক পিসার ষ্টিফেন এই অনুবাদ সম্পর্কে কনস্তান্তাইনের রচনা মিলাইতে গিয়া দেখেন, মূল গ্রন্থে উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের নাম যেন ইচ্ছা করিয়াই চাপা দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, বিজ্ঞানের ইতিহাসে কনস্তান্তাইনের নাম প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসাবে নহে; আরবী গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে ল্যাটিন জাতিদের মধ্যে আরব্য ও গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে তিনি যে এক কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য।

কনস্তান্তাইনের সহিত সালের্ণোর বিদ্যাপীঠের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, সালের্ণোর সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল এবং তাঁহার আগমনের পর হইতেই সালের্ণোর চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রধান হইয়া উঠে। সালের্ণোর খ্যাতির পশ্চাতে খাঁটী ল্যাটিন বিজ্ঞানীদের তৎপরতাই প্রধান ছিল, এই মত প্রতিপন্ন করিতে ব্যাগ্র আর একদল ঐতিহাসিক সালের্ণোর সহিত আফ্রিকাবাসী কনস্তান্তাইনের সংস্রব ও সংযোগ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, কনস্তান্তাইন মণ্টেকাসিনোতেই অধিকাংশকাল অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার সমস্ত তর্জমা-কার্য এইখানেই সম্পাদিত হয়; সুতরাং সালের্ণোর সহিত তাঁহার সংস্রব কল্পনামূলক। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কনস্তান্তাইন প্রথমে কিছুকাল সালের্ণোতে বাস করেন এবং সেই সময় একবার সালের্ণোর আর্কবিশপের পাকস্থলীর পীড়ার চিকিৎসা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও সুনাম ছিল তাহাতে সালের্ণোর সহিত তাঁহার যোগ ও এই বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের পশ্চাতে তাঁহার প্রভাব অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক সার্টন নিঃসংকোচে এই মত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন, "At the beginning, Muslim influences were accidental and limited, but later they were considerably increased by the activity of Constantine the African."*

আদেলার্দ অব বাথ (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)

ইংরেজ আদেলার্দ অব বাথ ছিলেন অনুবাদক, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। প্রধানতঃ অনুবাদক হিসাবেই আদেলার্দের খ্যাতি; তবে বিজ্ঞানী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার নানা গ্রন্থে ও রচনায় মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। আদেলার্দের জন্ম

---

* *Introduction,* Vol. I, p. 725.

বা মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে কর্মবহুল সময় ১১১৬ হইতে ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দ; তাঁহার প্রায় সব অনুবাদ ও মৌলিক রচনা এই সময়ে সম্পাদিত হয়। তিনি ইংল্যান্ড হইতে ফ্রান্সে আসেন এবং এইখানে নানা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার পর ইতালী এবং তথা হইতে স্পেন, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি মুসলমানপ্রধান দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞান-চর্চার জন্য দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তিনি বলিতেন, নানা দেশের বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংস্রবে আসা উচিত; প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু নূতন শিখিবার আছে। গলের (ফ্রান্সের) শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যাহা জানে না আল্‌প্‌স্‌ পর্বতপারের দেশে তাহা জানা যাইবে; ল্যাটিন জাতিদের মধ্যে যাহা জানা যায় না আরও পূর্বে গ্রীস দেশে তাহা জানা যাইবে, ইত্যাদি। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং গণিত ও জ্যোতিষের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদও হইয়াছিল অনেক বেশী উন্নত ধরনের। সম্ভবতঃ টলেডোয় অবস্থানকালে তিনি অনুবাদ-কার্যে উৎসাহী হন।

গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থের অনুবাদ : আবাকাস সম্বন্ধে *Regule abaci* নামে গ্রন্থটি তাঁহার গোড়ার দিকের রচনা। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ বোয়েথিয়াস ও গেরবেরের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; ইহাতে আরব্য বিজ্ঞানের প্রভাব বড় বেশী দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়, তিনি অনেক পরে আরব্য বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আরবী হইতে ইউক্লিডের *Elements*-এর ল্যাটিন অনুবাদ প্রণয়ন আদেলার্দের প্রথম বড় কাজ; ইউক্লিডের জ্যামিতির ইহাই প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ। ইহার কিছু পরে *Liber Ezich* নাম দিয়া তিনি আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির জ্যোতিষীয় তালিকার এক অনুবাদ প্রণয়ন করেন। করডোভার বিজ্ঞানী মাস্‌লামা কর্তৃক প্রণীত আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির জ্যোতিষীয় তালিকার এক সংশোধিত সংস্করণ অবলম্বনে আদেলার্দের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের লাইব্রেরীতে আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির গণিতের এক ল্যাটিন তর্জমা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ইহাও আদেলার্দের অনুবাদ। তাঁহার অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে আল্‌-বাত্তানির জ্যোতিষ, থিওডোসিয়াসের *Sphaerica,* আবু মাশার ও থাবিত্‌ ইবন্‌ কুরার কয়েকটি জ্যোতিষীয় (ভাগ্যগণনা সম্বন্ধীয়) গ্রন্থের তর্জমা উল্লেখযোগ্য।

মৌলিক রচনা : আদেলার্দের নিজস্ব মৌলিক রচনার মধ্যে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ,—*Questiones naturales* (প্রকৃতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন) ও *De eodem et diverso* (ভেদাভেদ)। কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে গ্রন্থ দুইটি রচিত। সমসাময়িক কালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানের প্রতি আদেলার্দের উৎসাহ ও অনুরাগ বুঝিবার পক্ষে এই দুইখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। *Questiones naturales*-এ আলোচিত কতকগুলি প্রশ্নের নমুনা হইতে সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন জন্তু রোমন্থন করে, কোন কোন জন্তুর পাকস্থলী নাই, আবার এমন অনেক জন্তু আছে যাহারা জলপান সত্ত্বেও মূত্র ত্যাগ করে না; এইরূপ পার্থক্যের কারণ কি? মানুষের মাথার সামনের দিকে কেন টাক পড়ে? কোন কোন জন্তু কেন দিন অপেক্ষা রাত্রিকালেই ভাল দেখিতে পায়? কেন আমরা অন্ধকার স্থান হইতে আলোকোজ্জ্বল স্থানে রক্ষিত বস্তুদের দেখিতে পাই, অথচ আলোকোজ্জ্বল স্থান হইতে অন্ধকার স্থানে রক্ষিত বস্তুদের দেখিতে পাই না? মানুষের পাঁচ আঙ্গুল কেন অসমান এবং কেন কেবলমাত্র হাতের পাতার দিক মুঠ করিতে পারা যায়? শিশুরা জন্মিয়াই কেন হাঁটে না? মৃতদেহকে কেন আমরা ভয় করি?—ইত্যাদি।

আলোকতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব : আদেলার্দের আলোকতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আলোককে তিনি দৃশ্যমান ভূত বা visible spirit বলিয়াছেন। এই দৃশ্যমান ভূত মস্তিষ্ক হইতে অপটিক নার্ভের সাহায্যে চক্ষুতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে নির্গত হইয়া বস্তুর উপর পতিত হয়; তখন আমরা বস্তুকে দেখিতে পাই। ইহা *Timaeus*-এ

বর্ণিত প্লেটোর আলোকতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আরব্য বিজ্ঞানী কুস্তা ইব্‌ন্ লুকা *De differentia spiritus et animae* গ্রন্থে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন জন অব সেভিল আদেলার্দের অনেক পরে। আদেলার্দ সম্ভবতঃ আরব্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের সময় কুস্তা ইব্‌ন্ লুকার অভিমতের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকিবেন। আল্-হাজেন বা টলেমীর আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত তাঁহার নিশ্চয়ই পরিচয় ঘটে নাই।

শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আদেলার্দের মত অনেক বেশী আধুনিক। শব্দপ্রবাহ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, কথা বলিবার সময় মুখ-গহ্বরে সঞ্চিত বায়ু জিহ্বার দ্বারা সম্মুখে চালিত হয়। এইভাবে সম্মুখে চালিত বায়ু বাহিরের বায়ুকে আঘাত দিয়া তাহাকে আবার চালিত করে, সেই বায়ু তখন চালিত করে পরবর্তী স্তরের বায়ুকে এবং এই ব্যাপার পুনঃপুন সংঘটিত হইয়া শেষে কর্ণপটাহে আসিয়া আঘাত করিলে তাহা মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জন্মায়। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জলের উপর পাথরের নুড়ি ফেলিলে যেমন এক কেন্দ্রীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয় বাতাসেও এইরূপ শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শব্দতরঙ্গের এই ব্যাখ্যা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ হইলেও ইহা আদেলার্দের নিজস্ব নহে; ভিট্রুভিয়াস *De architectura*-তে বহু পূর্বেই এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

বস্তুর অবিনশ্বরতা : *Questiones naturales*-এর আরও কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পৃথিবী গোল। ইহার এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত সরাসরি কেন্দ্রের মধ্য দিয়া একটি গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে যদি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, প্রস্তরটি কোথায় গিয়া পড়িবে? আদেলার্দের নির্ভুল উত্তর হইল, প্রস্তরটি গিয়া থামিবে পৃথিবীর কেন্দ্রদেশে। বস্তুর অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে আদেলার্দের নিম্নলিখিত অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "আমার বিচার-বুদ্ধিতে ইহাই নিশ্চয় বলিয়া মনে হয় যে, এই অনুভূতির জগতে কিছুই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় না; সৃষ্টির প্রথমে ইহা যতটুকু ছিল এখন তাহা অপেক্ষা এতটুকুও কম নাই। কোন এক একক বস্তুর কিছুটা অংশ যদি মিলাইয়া যাইতে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা আর একটি দলের সঙ্গে গিয়া ভিড়িয়াছে মাত্র।"

> "And certainly in my judgement nothing in this world of sense ever perishes utterly, or is less today than when it was created. If any part is dissolved from one union, it does not perish but is joined to some other group."*

বস্তুর অবিনশ্বরতার ইহা অতি চমৎকার ও নির্ভুল সংজ্ঞা। আদেলার্দ অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তাঁহার আটশত বৎসর পরে জোসেফ ব্ল্যাক প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর রাসায়নিকদের পরীক্ষায় বস্তুর অবিনশ্বরতার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সন্দেহ যে সুপ্রাচীন, আদেলার্দের উপরিউক্ত লেখাই তাহার প্রমাণ।

জন অব সেভিল

মধ্যযুগীয় বহু পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদের প্রণেতা হিসাবে একাধিক জনের নাম পাওয়া যায়, যেমন, জন অব সেভিল অথবা টলেডো, জন আভেনডেথ (বা ইব্‌ন্ দাউদ), জোহানেস্

---

* Et meo certo indicio in hoc sensibili mundo nihil omnino moritur nec minor est hodie quam cum creatus est. Si qua pars ab una coniunctione solvitur, non perit sed ad aliam societatem transit."—*Questiones naturales*, cap. 4.

হিস্‌পালেন্‌সিস্‌ ইত্যাদি। ইঁহারা সবাই দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তর্জমা-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ 'জন' নামধারী এই পণ্ডিতেরা এক ব্যক্তি ছিলেন না। জোহানেস্‌ হিস্‌পালেনসিস্‌ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। অ্যালবার্টাস্‌ ম্যাগ্‌নাস্‌ তাঁহার *Speculum astronomiae*তে জন অব সেভিলকে জোহানেস্‌ হিস্‌পালেনসিস্‌ নামে উল্লেখ করিয়াছেন।* চার্লস সিঙ্গারের লেখায় দেখা যায়, আভেনডেথ ও হিস্‌পালেন্‌সিস্‌ একই ব্যক্তি।†

জন অব সেভিল টলেডোতে আর্কবিশপ রেমন্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় তর্জমার কার্যে অনুপ্রাণিত হন। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে আল্‌-ফারঘানির 'কিতাব ফী হারাকাৎ', *Rudimenta astronomica* অনুবাদ করেন। নানা মুসলমান গণিতজ্ঞদের গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি *Liber alghoarismi* নামে এক গণিতের গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভগ্নাংশের ভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মটি পাওয়া যায় :—

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \div \frac{bc}{bd} = \frac{ad}{bc}$$

ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্মান গণিতজ্ঞ জোর্দানাস্‌ নেমোরারিয়াস্‌ অনুরূপ নিয়মের উল্লেখ করেন। আভেনডেথ্‌ কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

রবার্ট অব চেস্টার (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

দ্বাদশ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত অনুবাদক রবার্ট অব চেস্টার ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। তাঁহার তর্জমার প্রধান বিষয় আরব্য গণিত ও জ্যোতিষ। তিনি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণের এক ল্যাটিন তর্জমা রচনা করিয়াছিলেন ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে। গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে আল্‌-কিন্দির *Judicia,* আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির বীজগণিত, আস্তরলাব সম্বন্ধে টলেমীর একখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি মুসলিম জ্যোতিষীয় তালিকা উল্লেখযোগ্য। আদেলার্দ কর্তৃক অনূদিত আল্‌-খোয়ারিজ্‌মির জ্যোতিষীয় তালিকার এক সংশোধিত সংস্করণও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রবার্ট কর্তৃক আরব্য কিমিয়ার এক গ্রন্থের অনুবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি, *Liber de compositione alchemiae,* আরবী ভাষায় প্রথম লেখেন জেরুজালেমের পাদরী মোরিনাস্‌ রোমানাস্‌; কাহারও কাহারও মতে মিশরের খালিদ ইব্‌ন্‌ ইয়াজিদ (সপ্তম শতাব্দী) এই গ্রন্থের প্রণেতা।

রবার্টের সমসাময়িক ও বন্ধু ডালমেশিয়াবাসী হার্মানও একজন বিচক্ষণ অনুবাদক ছিলেন। তিনি টলেমীর *Planisphere* ও আবু মাশারের 'কিতাব আল্‌-মাদখালে'র (*Introductorium in astronomiam*) (আট খণ্ডে সমাপ্ত) অনুবাদ প্রণয়ন করেন। আরব্য জ্যোতিষে ব্যবহৃত শব্দের একটি ল্যাটিন পরিভাষাও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জেরার্ড অব ক্রেমোনা (১১১৪-৮৭)

জেরার্ড অব ক্রেমোনা ল্যাটিন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক। তর্জমা-তৎপরতায় হুনায়েন ইব্‌ন্‌ ইশাক ও জেরার্ড সমপর্যায়ভুক্ত। উভয় মনীষীই তর্জমা-কার্যে আজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। হুনায়েন আরবী ভাষায় গ্রীক বিজ্ঞানকে সুলভ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, জেরার্ড হুনায়েনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ল্যাটিন

* Thorndike, Vol. II, p. 74.
† F. S.. Marvin (ed.), *Science and Civilization,* Oxford, 1923; সিঙ্গার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৩১।

ভাষায় গ্রীক ও আরব্য বিজ্ঞানের বার্তা বহন করিয়া ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, প্রভৃতি কোন বিদ্যাই জেরার্ডের অনুবাদ-তৎপরতা হইতে বাদ পড়ে নাই। তাঁহার এই বিরাট ও ব্যাপক চেষ্টার ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ইউরোপের নিকট একদিকে যেমন টলেমী, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস্, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস্, গ্যালেন, অ্যাপোলোনিয়াস্, থিওডোসিয়াস্ প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের অমূল্য রচনা-পুষ্ট গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য উন্মুক্ত হয়, তেমনি আবার আল্-কিন্দি, আল্-ফারাবি, আবুল কাসিম, আল্-ফারঘানি, মাশা আল্লাহ্, থাবিত ইব্‌ন্ কুরা, জাবির, ইব্‌ন্ আল্-হাইথাম, আল্-রাজি, ইব্‌ন্ সিনা, আইজাক জুডিয়াস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির মারফত ইউরোপ আরব্য মনীষার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। আরবী হইতে ল্যাটিনে জেরার্ড প্রায় ৯০ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জেরার্ডের প্রধান কর্মস্থল ছিল টলেডো। টলেমীর 'অ্যাল্‌মাজেস্টে'র একটি আরব্য সংস্করণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম টলেডোয় আসেন। এইখানে তিনি মুসলিম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া এইরূপ অভিভূত ও বিস্মিত হন যে, সমগ্র জীবন এইসব গ্রন্থের ল্যাটিন সংস্করণ প্রণয়নের কার্যে অতিবাহিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় তাঁহার অতুলনীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের জীবন। বৎসরের পর বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এই সংকল্প পালনে সফলকাম হইয়াছিলেন। এক 'অ্যাল্‌মাজেস্ট' ও 'কানুনে'র বিরাট বিরাট খণ্ডগুলি তর্জমা করিতেই বহু বৎসর কাটিয়া যাইবার কথা। উপরিউক্ত যে বিজ্ঞানীদের কথা বলা হইল তাঁহারা প্রত্যেকেই রাশি রাশি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাটকায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বিভিন্ন বিষয়ে এতজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর রচনাবলীর তর্জমার পশ্চাতে যে উদ্যম ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রয়োজন তাহা সত্যই বিস্ময়কর ও অলৌকিক। তিনি সব অনুবাদই একা করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না; কিছু কিছু গ্রন্থ তাঁহার তত্ত্বাবধানে অপরে তর্জমা করে এবং পরে তিনি তাহা সংশোধন করেন, এরূপ মনে হয়। সম্ভবতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি অনুবাদ-চক্রও স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তথাপি এই সমগ্র প্রচেষ্টার তিনিই যে প্রধান নায়ক ও প্রেরণা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

জেরার্ড কর্তৃক সম্পাদিত 'অ্যাল্‌মাজেস্টে'র তর্জমা অবশ্য ল্যাটিন ভাষায় প্রথম নহে। তিনি এই তর্জমা সম্পূর্ণ করেন ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১১৬০ খৃষ্টাব্দে জনৈক অজ্ঞাতনামা সিসিলীয় অনুবাদক গ্রীক সংস্করণ হইতে 'অ্যাল্-মাজেস্টে'র ল্যাটিন তর্জমা প্রস্তুত করেন। এই অনুবাদ জেরার্ডের অনুবাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু জেরার্ডের অনুবাদই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং প্রধানতঃ এই গ্রন্থের মারফত ইউরোপে টলেমীর জ্যোতিষের আলোচনা ও চর্চা সুরু হয়। সিসিলীয় অনুবাদক 'অ্যাল্‌মাজেস্টে'র আরবী সংস্করণের কথাও জানিতেন। এই কার্যে তিনি টলেমীর *Optics*-এর সিসিলীয় অনুবাদক ইউজেনের সাহায্য পান। ইউজেন গ্রীক ও আরবী ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন এবং ল্যাটিন ভাষাতেও তাঁহার বেশ দখল ছিল।

থাবিত ইব্‌ন্ কুরা কর্তৃক সংকলিত আরবী সংস্করণ হইতে জেরার্ড *Elements*-এর ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করেন। তাঁহার পূর্বে আদেলার্দ এরূপ এক অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; জেরার্ডের অনুবাদই অনেক প্রাঞ্জল হইয়াছিল।

---

* Gerard himself, unassisted could not possibly have made all the translations ascribed to him. It is probable that he himself was tremendously active and that he actually completed many translations alone, but that many others were made under his direction and corrected by him."—Sarton, *Introduction*, Vol. II, pt. I; p. 338.

মার্ক, রুফিনো, আর্নাল্ড অব্ ভিল্লানোভা

টলেডোর খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ও জেরার্ডের সমসাময়িক মার্ক অনেকগুলি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। হুবায়েশ ও হুনায়েন কর্তৃক অনূদিত আরবী সংস্করণ হইতে তিনি হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেনের পুস্তকগুলির ল্যাটিন অনুবাদ রচনা করেন। হুনায়েনের বিখ্যাত গ্রন্থ *Quaestiones medicae*-এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন ইতালীয় রুফিনো। তিনি স্পেনের মুর্সিয়া নামক স্থানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। টর্টোসার (স্পেন) এক ইহুদীর সহায়তায় ও সহযোগিতায় জেনোয়ানিবাসী সাইমন আল্বুকাশির *Liber Servitoris* ও সেরাপিওনের *De Simplicibus* অনুবাদ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্পেন দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী অনুবাদ-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আর্নাল্ড ভিল্লানোভার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্নাল্ড নিজেও একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও কিমিয়াবিদ্ ছিলেন; তাঁহার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার কথা পরে আলোচিত হইবে; এইখানে তাঁহার তর্জমার কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আভিসেনা, আল্-কিন্দি, ইব্ন্ জুর, কুস্তা ইব্ন্ লুকা প্রমুখ বিখ্যাত আরব্য বিজ্ঞানিগণের গ্রন্থ তাঁহার অনূদিত।

সিসিলির অনুবাদ-তৎপরতা

ল্যাটিন ইউরোপে গ্রীক ও আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের এক অন্যতম উৎস হিসাবে আমরা সিসিলির কথা আগেই বলিয়াছি। নর্মান-বিজয়ের পর হইতে সিসিলির মুসলমান ও ইহুদী পণ্ডিতদের সহিত খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে টলেডোর ন্যায় এখানেও তর্জমার কার্যের এক মরসুম পড়িয়া যায়। প্রথম রোজার হইতে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, অ্যাঁজুর প্রথম চার্লস্ প্রমুখ সিসিলির রাজারা প্রায় প্রত্যেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং দরাজ হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পালের্মো ছিল এই অনুবাদ-তৎপরতার প্রধান কেন্দ্র; এখানে নানা ধর্মের ও নানা ভাষাভাষী পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ হয় এবং তাঁহাদের তৎপরতায় বহু গ্রীক ও আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন সংস্করণ প্রস্তুত হয়। 'অ্যাল্মাজেস্টে'র এক উৎকৃষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ সর্বপ্রথম যে সিসিলিতেই প্রণীত হয় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ববিষয়ের গ্রন্থই অনূদিত হয়। চার্লসের রাজত্বকালে (১২৬৬-৮৫) ফারাজ ইব্ন্ সালিম নামে এক ইহুদী চিকিৎসক আল্-রাজির বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল্-হাওয়াই'-এর ল্যাটিন অনুবাদ (*Continens*) সম্পূর্ণ করেন (১২৭৯)। মোজেস্ অব পালের্মো নামে আর এক ইহুদীরও অনুবাদ-তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাইকেল স্কট (মৃত্যু-আনুমানিক ১২৩৫) ও সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী মাইকেল স্কটের অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের অনুবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাইকেল সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন ও বসবাস করেন। তাঁহাকে সিসিলি, দক্ষিণ ও উত্তর ইতালী, জার্মানী এবং স্পেনের টলেডো প্রভৃতি স্থানে জ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত দেখা যায়। আল্-বিত্রুজির জ্যোতিষীয় গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন টলেডোতে ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে। অ্যারিস্টটলের প্রাণিবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অধিকাংশই তাঁহার অনূদিত; তন্মধ্যে ইব্ন্ সিনার টীকাসমেত *Historia animalium* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদখানি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নামে উৎসর্গীকৃত। জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে মাইকেল স্কটের ঔৎসুক্য ও অনুরাগের প্রধান অনুপ্রেরণা স্বয়ং সম্রাট

ফ্রেডারিক। ফ্রেডারিকের নিজস্ব এক বিরাট চিড়িয়াখানা ছিল। হস্তী, সিংহ, চিতাবাঘ ও নানা জাতের পক্ষী এই চিড়িয়াখানার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এইসব জন্তু-জানোয়ার সঙ্গে লইয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণে বাহির হওয়া তাঁহার এক বিচিত্র খেয়াল ছিল। শিকার সম্বন্ধে সম্রাট *De Arte Venandi* নামে একখানি মনোজ্ঞ পুস্তক লিখিয়াছিলেন; মাইকেল স্কট কর্তৃক অনূদিত অ্যারিস্টটলের প্রাণিবিদ্যার ভিত্তিতে এই পুস্তক লিখিত হয়।

প্রসঙ্গত ফ্রেডারিকের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। সৈনিক, রাজনীতিজ্ঞ, কবি, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ফ্রেডারিকের জ্ঞান ও বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সমসময়ের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পৃথিবীর বিস্ময় বা 'Stupor mundi' নামে অভিহিত করিতেন। ফ্রেডারিকের নিজেরও এই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অহঙ্কার ছিল। যীশুখ্রীষ্ট, মোজেস্ ও মহম্মদকে তিনি পৃথিবীর তিন শ্রেষ্ঠ ভণ্ডরূপে

২৮। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতালী ও সিসিলির মানচিত্র।

জ্ঞান করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার জ্ঞানের অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে এরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তি পোপের মনঃপূত হয় নাই। এই উপলক্ষে পোপের সহিত তাঁহার বহু বিবাদ ঘটিয়াছিল। পোপ তাঁহাকে দুইবার খ্রীষ্টসমাজচ্যুত করিয়াছিলেন,—প্রথমবার, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণে পোপের নির্দেশ অমান্য করায়; দ্বিতীয়বার, পোপের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এক ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করায়। এজন্য অনেকে মনে করেন পোপকে বিরক্ত, জব্দ ও হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন।

ফ্রেডারিকের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষের প্রেরণা যাহাই হোক, বিজ্ঞান ইহাতে লাভবান হইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া মাইকেল স্কট প্রমুখ পণ্ডিতরা ইউক্লিড,

আর্কিমিডিস্, অ্যাপোলোনিয়াস্, টলেমী ও অন্যান্য গ্রীক বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি ল্যাটিন ভাষায় তর্জমা করিতে উদ্যোগী হন। শুধু তাহাই নহে, মধ্যযুগের কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ নেপল্‌স্ ও পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার জন্য ফ্রেডারিক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। তারপর নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা বা পণ্ডিতের লড়াই আহ্বান করিতেন। একবার তিনি পিসায় সেখানকার ও সেই সময়ের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিওনার্দো পিসানোর (তাঁহার অপর নাম ফিবোনাচ্চি) গাণিতিক দক্ষতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতার প্রধান প্রশ্নস্বরূপ তিনি প্রস্তাব করেন : এমন একটি সংখ্যার নাম করিতে হইবে, যাহার বর্গের সহিত ৫ যোগ অথবা বিয়োগ করিলে উভয় সংখ্যাই একটি করিয়া বর্গ হইবে। গণিতের ভাষায় x যদি এই সংখ্যা হয়, তবে x^2+5 ও x^2-5 উভয়েই বর্গ; এখন x এর মান কত? লিওনার্দোর নির্ভুল উত্তর হইল, $x=\frac{41}{12}$। এই প্রতিযোগিতার অপর একটি অংশ ছিল, $x^3+2x^2+10x=20$ সমীকরণটির জ্যামিতিক সমাধান নির্ণয় করা। লিওনার্দো দেখাইলেন যে, উপরিউক্ত সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান অসম্ভব, কিন্তু বীজগণিতের সাহায্যে ইহার সমাধান নির্ণয় করা যায়। তাঁহার সমাধান হইল $x=1\cdot3688081075$। দশমিকের নবম স্থান পর্যন্ত এই উত্তর নির্ভুল। অবশ্য একমাত্র লিওনার্দো ছাড়া প্রতিযোগীদের মধ্যে আর কেহ এইসব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই। ইহার দ্বারা যে শুধু লিওনার্দোর আশ্চর্য গাণিতিক প্রতিভাই প্রমাণিত হয় তাহা নহে, গণিতে ফ্রেডারিকের পাণ্ডিত্যেরও একটা মাপকাঠি ইহাতে পাওয়া যায়।

অ্যারিস্টটলের প্রচার : কথায় কথায় আমরা ফ্রেডারিকের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এইবার মাইকেল স্কটের তৎপরতায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। অনেকে মনে করেন, অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি তর্জমা করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিস্টটলকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিবার প্রধান কৃতিত্ব মাইকেল স্কটের প্রাপ্য। রজার বেকন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus maius*-এ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আংশিকভাবে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মাইকেলের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ক্রেমোনার জেরার্ড আরবী সংস্করণ হইতে টলেডোতে অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির ল্যাটিন তর্জমা রচনা করিয়াছিলেন। মাইকেলের পূর্বে ইংরেজ আলেকজান্দার অব নেকাম ও অ্যারিষ্টিপাস্ অ্যারিস্টটলের *De Vegetabilibus, Meteorologica* প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন।* এই অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও, *Historia animalium, De Caelo et mundo, De anima, Metaphysics* প্রভৃতি গ্রন্থ এবং এইসব গ্রন্থের উপর লিখিত ইবন্ রুস্‌দের টীকা ও সমালোচনা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিস্টটল সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে মাইকেল যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য।

কিমিয়া : প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা ও জ্যোতিষ ছাড়া রসায়ন বা কিমিয়াতেও তাঁহার যথেষ্ট তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পালের্মোতে *Liber luminis luminum* ও অক্সফোর্ডে *De alchemia* নামে যে দুইখানি কিমিয়ার গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদকও মাইকেল স্কট। প্রথমোক্তটির মূল রচয়িতা সম্ভবতঃ আল্-রাজি।† এই পুস্তকে তিনি সাতটি গ্রহের সঙ্গে সাতটি ধাতুর সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন; বিজ্ঞান অপেক্ষা নানাবিধ কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও মতই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। শেষোক্ত গ্রন্থের রাসায়নিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। *De alchemia*-য় তিনি লবণ, ফটকিরি, ভিট্রিয়ল, স্পিরিট

* Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*, Vol. II, p. 313.

† Thorndike, Vol. II, p. 313.

ইত্যাদি দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করেন। পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধেও নানা তথ্য ও বর্ণনা আছে। কিমিয়ার আলোচনা মারফত তিনি যাদুবিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, মায়াবাদ ইত্যাদি নানা উদ্ভট অবৈজ্ঞানিক বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন। এইসব তিনি যে একেবারেই বিশ্বাস করিতেন না তাহা নহে। মধ্যযুগের সাহিত্যাদিতে তাঁহাকে অনেক সময় এক অতি কুশলী যাদুকর হিসাবেও উল্লেখ করিতে দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি দান্তেও তাঁহাকে যাদুকর হিসাবেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।*

উত্তর ইতালীর অনুবাদ-তৎপরতা

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ইতালীতেও আরব্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের তর্জমার পরিচয় পাওয়া যায়। পিসার বুর্গুণ্ডীয় গ্রীক সংস্করণ হইতে গ্যালেনের চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন আনুমানিক ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে। পিস্টোরিয়ার অ্যাকার্সিয়াস্ হুবায়েশের আরবী সংস্করণ হইতে গ্যালেনের *De viribus alimentorum* অনুবাদ করেন আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত পাদুয়ার ইহুদী বোনাকোসা ইব্‌ন রুস্‌দের 'কুলীয়াৎ' ল্যাটিন ভাষায় তর্জমা করেন ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভেনিসে ১২৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে পারাভিচি নামে এক খ্রীষ্টান পণ্ডিত ইহুদী জেকবের সাহায্যে ইব্‌ন্ জুরের 'আল্-তৈসীরে'র এক মনোজ্ঞ ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়ন করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরব্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রণয়নের উৎসাহ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতে থাকে। তথাপি এই তর্জমার প্রয়োজনীয়তা একেবারে হ্রাস পায় নাই। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মাঝে মাঝে ইউরোপের কোন না কোন স্থানে আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমার কথা শুনিতে পাই।

৭·৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন

শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট অবদান। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইবার ফলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সর্বত্র যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে, ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজন্ম ও পরবর্তী উন্নয়ন সম্ভবপর করিতে এই প্রতিষ্ঠান বড় কম দায়ী নহে। বিদ্যাচর্চার জন্য ইহার বহু পূর্বে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা ধরনের বিদ্যাপীঠ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ছিল বটে,—যেমন অ্যারিস্টটলের 'লাইসিয়াম', প্লেটোর 'একাডেমী', আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম, বাগদাদ ও কায়রোর 'দার আল্-হিখ্‌মা'; কিন্তু শিক্ষার মান নির্দেশ এবং বিদ্যার্থীর শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিমাপ গ্রহণ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার পূর্বে দেখা যায় নাই। বিদ্যার্থীদের নির্দিষ্টকাল পাঠ্যতালিকা অনুসারে বিদ্যার্জন বাধ্যতামূলক করিয়া এবং যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা ও উপাধি বিতরণের ব্যবস্থার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার যে নব পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার পূর্ণ কৃতিত্ব মধ্যযুগের প্রাপ্য।

বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটাই বড় ছিল। এই সম্বন্ধ ও সান্নিধ্যের ফলে গুরুর পক্ষে শিষ্যের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের স্বরূপ নিরূপণ করা সহজ হইত; তাই গুরুর নিকট হইতে ছাড়পত্র পাইলেই শিষ্যের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত এবং এই ছাড়পত্রবলে সে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষকতা ও অন্যবিধ বিদ্যাচর্চার কাজে লিপ্ত হইতে পারিত। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা অসম্ভব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সহরে সহস্রাধিক

---

* Michele Scotto fu, che veramente
Delle magiche frode seppe il gioco."—Hell, XX, 116.

ছাত্রের কথাও এই সময়ে উল্লিখিত দেখা যায়। প্যারী নগরের প্রায় পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ সহস্র অধিবাসীর মধ্যে সাত সহস্রই ছিল ছাত্র।* অর্থাৎ ছাত্র-সংখ্যা মোট লোক-সংখ্যার প্রায় পাঁচ-ভাগের একভাগ; সেইখানে এই অনুপাত এখন প্রায় পাঁচশতভাগের একভাগ। ছাত্রসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা ও তাহার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তারপর ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে এক ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতাও ধীরে ধীরে দেখা দিল। সুতরাং আগের মত শিক্ষকের ছাড়পত্র ছাত্রের বিদ্যাবত্তার গভীরতা নিরূপণের জন্য আর যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিল না। র‍্যাসডালের অভিমত, এইসব কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি ও তাহার মাধ্যমে মধ্যযুগে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে 'ইউনিভার্সিটি' বা 'ইউনিভার্সিটা' (universita) কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আজকাল 'ইউনিভার্সিটি' বলিতে আমরা যাহা বুঝি একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এই শব্দের দ্বারা তাহা বুঝাইত না। ইহা একটি বহু সংখ্যাবাচক শব্দ; বহু লোকের সমবায়ে গঠিত সমিতি বা সঙ্ঘ নির্দেশ করিতে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হইত। শিক্ষক অথবা ছাত্রদের লইয়া গঠিত সমিতি নির্দেশ করিতে যেমন ইহার ব্যবহার দেখা যায়, তেমন আবার শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন অন্যবিধ সমিতি বা সঙ্ঘ বুঝাইতেও 'ইউনিভার্সিটি' কথাটার প্রয়োগ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পৌর-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। এজন্য ইহা প্রথম যুগে কখনও একা ব্যবহৃত হইত না, সবসময় বলা হইত 'শিক্ষকদের ইউনিভার্সিটি' (university of teachers), 'ছাত্রদের ইউনিভার্সিটি' (university of students), 'পণ্ডিতদের ইউনিভার্সিটি' (university of scholars) ইত্যাদি। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, কোনও প্রকার শিক্ষাগৃহ, বিদ্যালয় বা বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত ভবনকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইত না; এইরূপ বিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বুঝাইবার জন্য যে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা হইল 'স্টুডিয়াম' (studium)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের উল্লেখ করিতে হইলে বলা হইত—'in studio degrere' অথবা 'in 'scholis militare'। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কাছাকাছি প্রতিশব্দ ছিল Studium Generale।

Studium Generale পর্যায়ভুক্ত বিদ্যালয়গুলির তিনটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল: (১) ইহারা নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীদের আকর্ষণ বা আহ্বান করিত; শুধু স্থানীয় ছাত্রদের লইয়া গঠিত হইলে তাহা Studium Generale-পদবাচ্য হইতে পারিত না; ছাত্রগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক রূপটাই ছিল এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচয়; (২) ইহারা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র; উচ্চ শিক্ষার প্রচলিত তিনটি বিভাগের,—ধর্মতত্ত্ব, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা, যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এইখানে থাকা চাই; এবং (৩) একাধিক শিক্ষক কর্তৃক এইসব বিষয়ের অধ্যাপনা আবশ্যকীয় ছিল। উপরিউক্ত বিশেষত্বগুলি বিচার করিয়া কোন একটি বিদ্যালয়কে Studium Generale-এর পর্যায়ভুক্ত করিবার ব্যাপার কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল না; প্রতিষ্ঠা, সুনাম ও ঐতিহ্যের দ্বারা ইহা সাধারণতঃ স্থিরীকৃত হইত। প্যারী, বোলোনো ও সালের্ণো ছিল সর্বপ্রথম Studium Generale,—প্যারীর প্রসিদ্ধি ছিল ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার জন্য, আইনের জন্য বোলোনার এবং চিকিৎসাবিদ্যার জন্য সালের্ণোর। Studium Generale-এর শিক্ষকরা অথবা উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্ররা যে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিত; কিন্তু Studium Generale-র পর্যায়-ভুক্ত নহে এরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের Studium Generale-এ অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত

---

* J. G. Crowther, *The Social Relations of Science, London*, 1941; p. 214.

	ইতালী	ফ্রান্স	ইংল্যাণ্ড	স্পেন ও পর্তুগাল	জার্মানী, বোহেমিয়া, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম	অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ
দ্বাদশ শতাব্দী	সালের্ণো বোলোনা রেগ্‌গিও (১১৮৮)	প্যারী ম'পেলিয়ে	অক্সফোর্ড (১১৬৭-৮)			
ত্রয়োদশ শতাব্দী	ভিসেন্‌জা (১২০৪) আরেজ্জো (১২১৫) পাদুয়া (১২২২) নেপ্‌ল্‌স্ (১২২৪) ভের্সেলি (১২২৮) সিয়েনা (১২৪৬) কিউরিয়া রোমানা (১২৪৪-৫) পিয়াসেন্‌জা (১২৪৮)	অঁজের (১২২৯) তুলুজ্ (১২২৯-৩০) অর্লিয়াঁ (১২৩১)	কেম্ব্রিজ (১২০৯)	প্যালেনসিয়া (১২১২-৪) সালামান্‌সা (১২৩০) ভাল্লাদোলিদ্ (১২৫০) সেভিল (১২৫৪-৬০) লিস্‌বন (১২৯০)		
চতুর্দশ শতাব্দী	রোম (১৩০৩) পেরুজিয়া (১৩০৮) ত্রেভিসো (১৩১৮) পিসা (১৩৪০) ফ্লোরেন্স (১৩৪৯) পাভিয়া (১৩৬১) ফের্‌রারা (১৩৯১)	আভিনো (১৩০৩) কায়োর (১৩৩২) গ্রেনোব্‌ল্ (১৩৩৯) ওরাঁজ্ (১৩৬৫)		লেরিদা (১৩০০) কোয়াম্ব্রা (১৩০৮) পেরপিগ্‌নান (১৩৪৯) হুয়েস্কা (১৩৫৯)	প্রাগ (১৩৪৭-৮) ভিয়েনা (১৩৬৫) এরফুর্ট (১৩৭৯, '৯২) হাইডেল্‌বার্গ (১৩৮৫) কোলোন (১৩৮৮)	ক্রাকাও (পোল্যাণ্ড) (১৩৬৪) ফুনফ্‌কির্শেন (হাঙ্গেরী) (১৩৬৭) বুদা (হাঙ্গেরী) (১৩৮৯)
পঞ্চদশ শতাব্দী	তুরিন (১৪০৫) কাতানিয়া (১৪৪৪)	আই (১৪০৯) দোল্ (১৪২২) পোয়াতিয়ের (১৪৩১) কেন্ (১৪৩৭) বোর্দো (১৪৪১) ভাল'স্ (১৪৫৯) নাঁত্ (১৪৬০) বুর্জ (১৪৬৪) বেসাঁস (১৪৮৫)	সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ (১৪১৩) গ্লাস্‌গো (১৪৫১) এবার্ডীন (১৪৯৪)	বার্সেলোনা (১৪৫০) সারাগোসা (১৪৭৪) পাল্‌মা (মেজর্কা) (১৪৮৩) আভিলা (১৪৮২) সিগুয়েন্জা (১৪৮৯) আল্‌কালা (১৪৯৯) ভ্যালেন্সিয়া (১৫০০)	ভুর্‌ৎজ্‌বুর্গ (১৪০২) লাইপৎজিগ (১৪০৯) রস্টক (১৪১৯) লুভ্যাঁ (১৪২৫) ত্রেভেস্ (১৪৫৪, '৭৩) গ্রাইফ্‌স্‌ভাল্ড (১৪২৮, '৫৬) ফ্রাইবুর্গ-ইম ব্রাইস্‌গাউ (১৪৫৫-৬) বাস্‌ল্ (১৪৫৯) ইনগোল্‌স্টাট (১৪৫৯, '৭২) মাইনৎজ্ (১৪৭৬) টুবিঙ্গেন (১৪৭৬-৭)	পোস্‌জোনি বা প্রেসবুর্গ (হাঙ্গেরী) (১৪৬৫-৭) উপ্‌সালা (সুইডেন) (১৪৭৭) কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক) (১৪৭৭)

২৯। মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ও তাহাদের প্রতিষ্ঠা-কাল।

হইবার পূর্বে এক যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ও বিদ্যাচর্চার উচ্চমানের ইহাই ছিল প্রধান মাপকাঠি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারী, বোলোনা ও সালের্ণো ছাড়া ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেনের কয়েকটি বিদ্যালয়ও নিজেদের Studium Generale-এর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় বা Studium Generale-এর এক তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের আদি ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।

বোলোনা

সালের্ণোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহাই ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। সালের্ণোর পর বোলোনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সালের্ণোর মত বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও কোন নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতেই আইন শিক্ষার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে বোলোনার খ্যাতির কথা ইউরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গিদো প্রমুখ বহু নামকরা বিশপ বোলোনায় আইন অধ্যয়ন করেন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত জন অব সালিসবারি এইখানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন;* সালিসবারি তাঁহার আত্মজীবনীতে আইন ও ন্যায়শাস্ত্রে বোলোনার শিক্ষার উৎকর্ষ অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বোলোনা ইউরোপে আইনশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল।

আইনঘটিত শিক্ষার জন্য বোলোনা প্রধানতঃ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে (১১৫৬) এইখানে চিকিৎসাবিদ্যাতেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষার বিশেষ কোন উচ্চ মান অবশ্য ছিল না। চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমা ছাত্রদের পড়িয়া শুনানো হইত। উন্নত ধরনের কোনরূপ গবেষণা বা আলোচনার পরিচয় তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে একটা বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সাধারণভাবে শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এইরূপ শব-ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বোলোনায় শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন কোনরূপ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের প্রেরণায় ঘটে নাই; কারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা বা শিক্ষাদান বোলোনা কোন সময়েই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে নাই। সিঙ্গারের অভিমত, আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জটিল মামলার সুবিধার্থে শব-ব্যবচ্ছেদ অনুমোদিত ও প্রচলিত হয়। সে যাহাই হউক, শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে বোলোনায় শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থানবিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। উইলিয়ম অব সলিসেটো, থেডিয়াস অব ফ্লোরেন্স, অঁরি দ্য মঁদ্‌ভিল প্রমুখ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ও অ্যানাটমিবিশারদগণ কোন না কোন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। থেডিয়াস, অঁরি দ্য মঁদ্‌ভিল প্রমুখ চিকিৎসকদের অধ্যাপনার গুণে বোলোনার চিকিৎসা-বিভাগের খ্যাতি ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়ে। সালের্ণো ও মঁপেলিয়ের পর মধ্যযুগে বোলোনাই ছিল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র।

প্যারী

মধ্যযুগে ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যাল্‌কুইনের সময় স্থাপিত প্যারীর গির্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয় হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

* Charles Singer, *A Short History of Medicine*, p. 71.
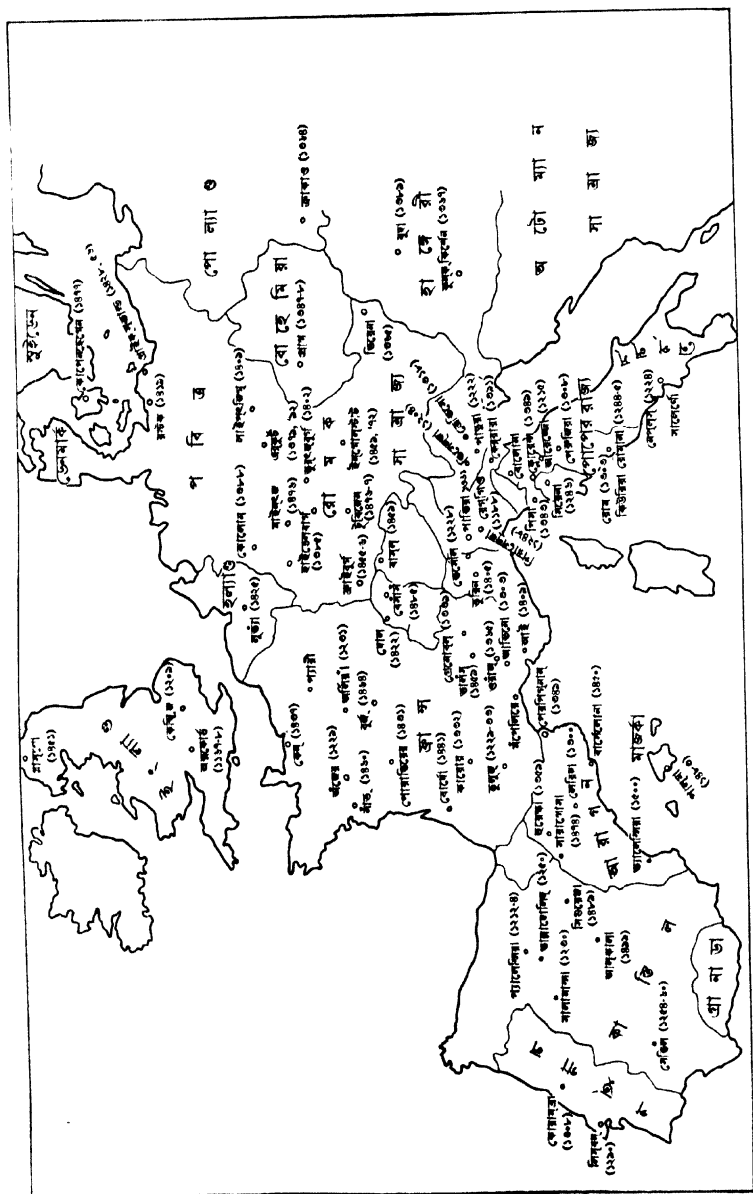
৩০। মধ্যযুগে ইউরোপের যেসব স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা মানচিত্রে দ্রষ্টব্য; বন্ধনীর মধ্যের তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কাল নির্দেশ করিতেছে।

উৎপত্তি। উইলিয়াম অব শাঁপো ও বিখ্যাত পণ্ডিত আবেলার্দের (১০৭৯-১১৪২) সময় হইতে প্যারী শিক্ষিত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্ভবতঃ ১১৫০-১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়। পরবর্তীকালে অ্যারিষ্টটলীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও প্রথম দিকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞান ও দর্শনের তীব্র বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরকারী বা বেসরকারীভাবে অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক দর্শন সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অধ্যাপনা ও আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা বেশী দিন বলবৎ রাখা সম্ভবপর হয় নাই। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় এবং অ্যারিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি শিক্ষা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ম'পেলিয়ে

ম'পেলিয়ের প্রসিদ্ধি চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার জন্য। আনুমানিক ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ম'পেলিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। মাইন্‌ৎজ্‌-এর আর্কবিশপ অ্যাডেল্‌বার্ট এইখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। জন অব সালিস্‌বারির সময় চিকিৎসা ব্যাপারে ম'পেলিয়ের খ্যাতি প্রায় সালের্ণোর বিদ্যালয়ের সমান ছিল। ম'পেলিয়ের এই প্রসিদ্ধির পশ্চাতে মুসলমান ও ইহুদী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের তৎপরতা ও প্রভাব বিদ্যমান। আর্নাল্ড অব ভিল্লানোভা, বের্ণা দ্য গর্দো প্রমুখ মধ্যযুগের প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদ্‌গণ ম'পেলিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইখানে গি দ্য শোলিয়াক শল্য চিকিৎসায় নবযুগের প্রবর্তন করেন। ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এইখানে আইন শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ম'পেলিয়ে ইউরোপের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম ছিল। তাহার পরই ইহার খ্যাতি পড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে ম'পেলিয়ের তৎপরতা ও খ্যাতি আবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা আনুমানিক ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। সরকারীভাবে অবশ্য অক্সফোর্ড স্বীকৃতি লাভ করে ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধান অনুমোদিত হয় পোপ চতুর্থ ইনোসেন্টের সময় ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। অক্সফোর্ড সংগঠিত হইয়াছিল প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। ১২২১ হইতে ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডোমিনিকান ও ফ্রান্সিস্‌কান পণ্ডিতগণ এখানে প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁহাদের তৎপরতায় অল্পকালের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির কারণ কিছুটা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিহিত। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে কোন কারণে অক্সফোর্ড হইতে বিতাড়িত একদল ছাত্র সদলবলে কেম্ব্রিজে আসিয়া বসতি স্থাপন ও এক বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করে। ইহার পাঁচ বৎসর পরে এই ছাত্রদের অনেকেই আবার অক্সফোর্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইয়া কেম্ব্রিজ ত্যাগ করে। ইহাতে বিদ্যালয়ের কার্য ও উন্নতি ব্যাহত হইলেও ইহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। তারপর ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী হইতে একদল ছাত্র কেম্ব্রিজে বিদ্যাচর্চার জন্য আগমন করিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই বৎসরই তৃতীয় হেনরী কেম্ব্রিজে ছাত্রদের বসবাসের নানা সুবন্দোবস্ত করেন এবং নানা ভাবে বিদ্যালয়কে সাহায্য করেন। ১২২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্‌কান ও ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ডোমিনিকানদের আগমনে ও তাঁহাদের তৎপরতায় কেম্ব্রিজ শিক্ষা-জগতে এক বিশিষ্ট বিদ্যায়তনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইতালীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যার্থীদের দলবদ্ধভাবে এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যত্র গমন করিয়া প্রথমে সেখানে শিক্ষার এক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার এবং কালসহকারে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতালীর ভিসেন্‌জা, পাদুয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভবের ইতিহাস অনেকটা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। বোলোনা হইতে একদল ছাত্র ভিসেন্‌জায় আসিয়া বসতি স্থাপন করিলে ক্রমে তাহাদের উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয় ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে বোলোনা হইতে বিখ্যাত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরও উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ বৎসরই ইহা Studium Generale হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল সমারোহের সহিত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল হইল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী; বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী এইখানে গবেষণা করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নেপ্‌ল্‌স্‌ (১২২৪), কিউরিয়া রোমানা (১২৪৪-৪৫), সিয়েনা (১২৪৬-৫৭) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য স্বাধীনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নেপ্‌ল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে স্পেনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ তৎপরতা দৃষ্ট হয়। এই শতাব্দীতে প্যালেন্‌সিয়া, সালামান্‌সা, ভাল্লাদোলিদ্‌ ও সেভিল এই চারিটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে লিস্‌বন বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। ইতালী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই একরূপ আপনা হইতে গড়িয়া উঠে; ইহাদের উদ্ভবের পশ্চাতে সুনির্দিষ্ট কোন রাজকীয় আদেশ বা সনদের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজকীয় সনদের দ্বারা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে স্পেনের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থাপিত হইয়াছিল রাজকীয় উৎসাহে, অর্থ-সাহায্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ রাজকীয় নির্দেশে। প্যালেন্‌সিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন কাস্তিলরাজ অষ্টম আলফনসো ১২১২-১৪ খ্রীষ্টাব্দে। বিদ্যোৎসাহী অষ্টম আলফনসো প্যালেন্‌সিয়ায় একটি উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্যারী, বোলোনা প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষকদের আহ্বান করেন এবং ইঁহাদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন। লিওনরাজ নবম আলফনসো সালামান্‌সা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১২৩০) প্রতিষ্ঠাতা। সালামান্‌সার খ্যাতির জন্য দায়ী প্রধানতঃ দশম আলফনসো। ইনি শুধু বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, জ্যোতির্বিদ্যায় ও কিমিয়ায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, আইনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজকোষ হইতে তিনি বাৎসরিক ২৫০০ মারাভেদিস্‌ (তৎকালীন মুদ্রা) অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করেন; ইহার দ্বারা অধ্যাপকদের মাসহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল।* দশম আলফনসো আবার সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা। আরব্য বিজ্ঞানের বিশেষতঃ জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা ও অধ্যাপনার জন্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন।

---

* H. Rashdall, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, Vol. II, Part I, p. 74.

৭·৮। ফ্রান্সিস্‌কান ও ডোমিনিকান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়

ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবজন্মে আমরা নানা প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ও প্রভাবের কথা আলোচনা করিলাম। এইসব তৎপরতা ও প্রভাব ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে ইউরোপে উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি আমরা ফ্রান্সিস্‌কান ও ডোমিনিকান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের তৎপরতার কথা কিছু উল্লেখ না করি। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই দুইটি সম্প্রদায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিতদের প্রায় প্রত্যেকেই হয় ফ্রান্সিস্‌কান নয় ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আলেকজান্দার অব হালেস্‌, জন অব লা রোশেল, অ্যাডাম মার্শ, রজার বেকন, জন পেকহাম, ডান্‌স্‌ স্কোটাস্‌ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন ফ্রান্সিস্‌কান; আনস্লেম, ভিনসেণ্ট অব বোভে, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস, অ্যালবার্টাস ম্যাগ্‌নাস, উইলিয়ম অব মোয়েরবেক প্রমুখ পণ্ডিতরা ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত। আশ্রমচারী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মত ইঁহারা বাস্তব জগৎ হইতে, জনতার কোলাহল হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে ফ্রান্সিস্‌কান ও ডোমিনিকানদের কার্যকলাপ নিবদ্ধ হইয়াছে বাস্তব জগতের কোলাহলের মধ্যে। তাহারা নগরে, বন্দরে ও লোকবহুল জনপদে গিয়া সংঘ স্থাপন করিয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষার বিস্তার সাধনে তৎপর হইয়াছে। জনসাধারণের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখিয়া তাহারা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে যে, এই কার্যে সফলকাম হইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ প্রচার করা যেরূপ সহজ হইবে এরূপ আর কোন প্রতিষ্ঠানের মারফত সম্ভবপর নয়। তাই তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য সংগ্রহ করা। প্যারী অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করে এবং তাহাদের তৎপরতায় অচিরে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস (জন্ম—১১৮১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল দীন-দরিদ্রের মত জীবনযাপন করিয়া জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করা। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণই ছিল ইহাদের মূলমন্ত্র। কথিত আছে, সেণ্ট ফ্রান্সিস একবার এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পরম স্নেহভরে তাহাকে চুম্বন করেন। কৃচ্ছ্রসাধনের এরূপ আতিশয্য অবশ্য ফ্রান্সিস্‌কান সম্প্রদায় বেশী দিন রক্ষা করিতে পারে নাই। এই লইয়া শীঘ্রই নানা মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সম্প্রদায় বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সেণ্ট ডোমিনিক (জন্ম—১১৭০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডোমিনিকান সম্প্রদায় ভোগ-ঐশ্বর্যের তীব্র বিরুদ্ধতা করিলেও ব্যক্তিগত জীবনে ফ্রান্সিস্‌কানদের মত স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ অনুমোদন করে নাই। এই কারণে ডোমিনিকান সম্প্রদায় অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও প্রসারে ডোমিনিকানদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতালী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহারা প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকে দর্শনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ ডোমিনিকানদের প্রাপ্য। এই কার্যের প্রধান নায়ক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের ব্যাপারে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মননশীলতার দ্বারা বস্তুজগত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের কার্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল। ফ্রান্সিসকানদের উদ্দেশ্য ছিল মন ও হৃদয়ের উপর আধিপত্য-বিস্তার, ডোমিনিকানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মস্তিষ্কের উপর। তাই প্লেটোর দর্শন, ভাবধারা ও শিক্ষা ফ্রান্সিসকানদের অধিকতর প্রিয়; অ্যারিস্টটলের ক্ষুরধার

৩১। মধ্যযুগে বাইজাণ্টিয়াম ও আরব্য প্রাধান্যের কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা এবং ল্যাটিন ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্মে ইহার প্রভাবের চিত্ররূপ।

বুদ্ধি ও যুক্তিমূলক বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা ডোমিনিকানরা সম্মোহিত। খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বকে অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের কাঠামোতে ঢালিয়া সাজাইবার কাজে ডোমিনিকানরা অগ্রণী। তবে সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে ফ্রান্সিস্‌কানরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন না করিলেও সাধারণভাবে মননশীলতার ব্যাপারে তাহারা ডোমিনিকানদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। ডোমিনিকানরা ক্রমে অ্যারিষ্টটলীয় বুদ্ধির জালে এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছিল, অ্যারিষ্টটলের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরবর্তীকালে অ্যারিষ্টটলের সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাহারা অসহিষ্ণু ও মারমুখী হইয়া উঠে। 'ইনকুইজিশন' বা খ্রীষ্টধর্মগ্রাহ্য মতবাদের বিরুদ্ধতার জন্য বিচার ও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ডোমিনিকানরাই প্রথম উদ্ভাবন করে। এককালে ডোমিনিকানরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মননশীলতার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল; এই স্বাধীন মননশীলতার ফলে অর্জিত নূতন মত ও বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাই আবার রক্ষণশীল হইয়া পড়িল, মননশীলতার স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মননশীলতার স্বাধীনতার এই সঙ্কট বার বার দেখা দিয়াছে। মধ্যযুগে ধর্মগত স্বার্থের খাতিরে এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইত; এ যুগে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে মননশীলতার স্বাধীনতা ব্যাহত হইতে দেখা যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়

৮·১। পাণ্ডিতীয় যুগ—খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সহিত গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়-সাধন

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যাপক অনুবাদ-তৎপরতার ফলে আরব্য ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি ল্যাটিন ভাষায় সুলভ হইলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার দ্বারা উচ্চতর মননশীলতার ও গবেষণার বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই নূতন আবিষ্কার, নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান সম্ভবপর হইবে, এইরূপ আশা করাই হয়ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক। মধ্যপ্রাচ্যের ও স্পেনের ঐস্লামিক নবজাগরণের সময় অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষানবিসির পালা শেষ হইবার পর হইতেই আরব্য মনীষা অল্প কালের জন্য হইলেও নূতন সৃষ্টির আবেগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিবিধ কারিগরিবিদ্যায় তাহাদের মুখে অনেক নূতন কথা নূতন মত নূতন ব্যাখ্যা শুনা গিয়াছিল। ল্যাটিন ইউরোপের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম দিকে ঠিক এইরূপ হয় নাই। ইহার পরিবর্তে এক পাণ্ডিতীয় মনোভাবকে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে দেখি। নবাবিষ্কৃত গ্রীক চিন্তা-ধারার বিশেষতঃ অ্যারিষ্টটলের ঐশ্বর্যে অভিভূত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে ক্ষণজন্মা প্রাচীন গ্রীক মনীষিগণ যেসব সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহার পর মানুষের আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। এখন জ্ঞানের সমগ্র বিভাগের বিক্ষিপ্ত তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে একত্র সংবলিত করিয়া সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলিত করিতে পারিলেই এই কাজ সুসম্পন্ন হয়। স্বয়ং অ্যারিষ্টটলের প্রতিভায় এ কাজও যে গ্রীকদের আমলে কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল তাহা নহে। তবে কিনা অ্যারিষ্টটল ছিলেন বিধর্মী পৌত্তলিক গ্রীক। স্বর্গ হইতে মর্ত্যে যে নূতন বার্তা যীশুখ্রীষ্ট বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, যে নূতন আলোকে তিনি মানুষকে পথ দেখাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অ্যারিষ্টটলের হয় নাই। সুতরাং এই নূতন আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে সমগ্র গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়-সাধন হইল নবজাগ্রত ল্যাটিন মনীষার একমাত্র লক্ষ্য। এই মনোভাব কাটাইয়া শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পরিবেশ ও অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইতে আরও দুই তিন শত বৎসর কাটিয়া গেল। তাই রেণেশাঁসের পূর্বে বিজ্ঞানের নূতন পথিকৃৎ হিসাবে ইউরোপের আত্মপ্রকাশ ঠিক সম্ভবপর হয় নাই।

শিক্ষা ও উচ্চতর মননশীলতার ব্যাপারে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার একচেটিয়া কর্তৃত্ব এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমরা দেখিয়াছি, মধ্যযুগের প্রারম্ভে খ্রীষ্টীয় আশ্রম ও গির্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিই ছিল শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র; পরে এই ধরনের বিদ্যালয় হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন পদস্থ ধর্মযাজক অথবা ধর্মসংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, আর যাঁহারা পড়িতেন তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল উত্তরকালে অর্জিত পাণ্ডিত্যবলে ধর্মসংস্থায় কোন উচ্চ পদলাভ। এজন্য ধর্মতত্ত্ব ছিল শিক্ষার প্রধান উপজীব্য। ধর্মতত্ত্বের অনুষঙ্গ ও পরিপূরক হিসাবে দর্শন ও বিজ্ঞান অধীত ও আলোচিত হইত। খ্রীষ্টধর্ম যেসব শাশ্বত সত্যের নির্দেশ দিয়াছে তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল; আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, প্রয়োজন হইয়াছিল অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়ের। অ্যারিষ্টটলীয় ন্যায়ের চমকপ্রদ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের বনিয়াদ সুদৃঢ় করা এবং ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধনের দ্বারা জৈব ও অজৈব জগতের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক পরিকল্পনা রচনা করা ল্যাটিন পণ্ডিতদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাণ্ডিতীয় যুগের বিশিষ্ট প্রতিভূ রবার্ট গ্রোসেটেস্ট, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, রজার বেকন ও সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর এই আদর্শের মধ্যে কাজ করিয়াছেন। গ্রোসেটেস্ট ছিলেন লিনকলনের বিশপ; ডোমিনিকান অ্যালবার্টাস প্রথমে র‍্যাটিসবনের বিশপ ও পরে সমগ্র জার্মানীর ডোমিনিকান খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তার পদে নিযুক্ত হন; সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস ইতালীর বিভিন্ন স্থানে (অর্ভিতো, রোম, ভিতের্বো) পোপের সভায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন; ফ্রান্সিসকান রজার বেকন ছিলেন একজন সাধারণ পাদরী। অর্থাৎ প্রত্যেকেই খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ব্যক্তিগত-ভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সেই প্রতিভাবলে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ও একতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই বহুখণ্ডে সম্পূর্ণ বিপুলকায় এক একটি বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের কঠিন বেড়াজাল ভেদ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এতটুকু আভাস কাহারও চিন্তাধারায় প্রকাশ পায় নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আদর্শের উদ্গাতা রজার বেকন ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম হইলেও ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে সংশয় পোষণের দুঃসাহস তাঁহার দেখা যায় না; ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ জ্ঞানের যে এক বড় উৎস তাহাই তিনি বরাবর স্বীকার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার দিক হইতে গ্রোসেটেস্ট ও অ্যালবার্টাসের রচনা উচ্চাঙ্গের হইলেও পূর্বগামী আরব্য বা গ্রীক বিজ্ঞানিগণকে কোন সময়ই তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানী হিসাবে সেণ্ট টমাস গ্রোসেটেস্ট, অ্যালবার্টাস বা বেকনের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সহিত অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসে তিনিই সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় খৃষ্টীয় ধর্মদর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞানের কল্যাণ সাধিত হয় নাই। বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তাধারার সুযোগ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় পরিণামে বিজ্ঞানের ক্ষতিই হইয়াছিল বেশী।

সুখের বিষয় এই পাণ্ডিতীয় মনোভাব ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে দীর্ঘকাল বিনা প্রতিবাদে প্রভাব বজায় রাখিতে সক্ষম হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ডানস্ স্কোটাস, উইলিয়াম অব ওকাম, জাঁ বুরিদাঁ প্রমুখ আর একদল দার্শনিক সেণ্ট টমাস-প্রবর্তিত পাণ্ডিতীয় মনোভাবের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও স্কোটাস-ওকাম-বুরিদাঁপন্থী দার্শনিকদের ক্ষুরধার সমালোচনার গুরুত্ব শীঘ্রই অনুভূত হইল এবং পাণ্ডিতদের যুক্তিজালের অসারত্ব ক্রমশঃ প্রকট হইতে লাগিল।

৮·২। রবার্ট গ্রোসেটেস্ট (১১৭৫-১২৫৩)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যতম বিশিষ্ট পণ্ডিত রবার্ট গ্রোসেটেস্ট ছিলেন একাধারে দার্শনিক, পদার্থবিদ্, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রজার বেকন গুরুর পাণ্ডিত্যের ও বহুমুখী প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বেকনের মতে সলোমন, অ্যারিষ্টটল ও ইবন্ সিনা তাঁহাদের সময়ে যেরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন রবার্ট গ্রোসেটেস্ট ছিলেন তাঁহার কালের সেইরূপ একজন প্রতিভাবান জ্ঞানী ব্যক্তি।* গুরু সম্বন্ধে শিষ্যের এই প্রশংসা হয়ত কিছুটা অত্যুক্তি, তবে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা অনস্বীকার্য। অক্সফোর্ডে দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা ও গবেষণার তিনিই প্রথম প্রবর্তক এবং প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইংল্যাণ্ডের বিদ্বৎ সমাজে তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের বাহিরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ প্যারীতে, তাঁহার রচনা ও মতবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করে।

---

* Thorndike, Vol. II, p. 437.

গ্রোসেটেস্ট গ্রীক ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি নিজে গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বহু গ্রীক গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ রচনা করেন। অ্যারিষ্টটল, ডায়োনিসিয়াস, জন অব দামাস্কাস প্রমুখ লেখকগণের নানা গ্রন্থ এবং নিকোমেকাসের নীতি-দর্শন তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রোসেটেস্টের এই অনুবাদগুলি সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস প্রমুখ পরবর্তী পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীক ভাষাকে তাঁহার গুরুত্বদান যেরূপ উল্লেখযোগ্য সেরূপ উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা ও গবেষণার কার্যে গণিত ও পরীক্ষার উপর গুরুত্ব-আরোপ। গণিতের প্রয়োগ ও পরীক্ষার অবলম্বন ছাড়া প্রাকৃতিক দর্শনের অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে সম্ভবপর নহে, গ্রোসেটেস্টের এই অভিমতের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, কোন কিছুর বর্ণনা বা কোন বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি সর্বদা অন্যের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করিতেন। গ্রোসেটেস্টের এইরূপ চিন্তা-ধারার প্রভাব রজার বেকনের উপর বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়; বেকন তাঁহার রচনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ আরও জোরালো ভাষায় ও দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন।

আলোক সম্বন্ধীয় গবেষণা : গ্রোসেটেস্টের বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে আলোক সম্বন্ধীয় রচনাগুলি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আলোকের প্রতিসরণ, লেন্স ও লেন্সের সাহায্যে দৃষ্ট বস্তুর আয়তনের আপাতবিকৃতি (আয়তনের বৃদ্ধি বা হ্রাস), রামধনু ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন। এইসব তথ্য গ্রীক ও আরব্য বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে গৃহীত। লেন্সের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণের ফলে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও যে বৃহৎ দেখায় এবং দূরবর্তী বস্তুকেও দেখা সহজসাধ্য হয়, ইহা তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন : "বিষয়টি খুবই জটিল ও কঠিন; আলোক-বিজ্ঞানের (তিনি ইহাকে *Perspective* নামে অভিহিত করিয়াছেন) এই আশ্চর্য বিভাগের সাহায্যে আমরা প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। ইহার সাহায্যে আমরা দেখাইতে পারি, কিরূপে বহু দূরবর্তী বস্তু দেখাইবে যেন অতি নিকটে হাতের কাছেই রহিয়াছে, নিকটবর্তী বৃহৎ বস্তু মনে হইবে অতি ক্ষুদ্র; এমন কি দূরবর্তী বস্তুকে ইচ্ছানুযায়ী বড় করিয়া দেখানও সম্ভবপর। এই আশ্চর্য কৌশলের দ্বারা অবিশ্বাস্য দূরত্বে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম অক্ষরও পাঠ করা অথবা বালুকণা, তৃণখণ্ড বা এইরূপ কোন ক্ষুদ্র বস্তু গণনা করা আমাদের পক্ষে সহজ।"* কিরূপে এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর? গ্রোসেটেস্ট ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, এক বা একাধিক স্বচ্ছ বস্তু বা লেন্সের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণের ফলে ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন, দূরবর্তী বস্তুকে খালি চোখে ক্ষুদ্র দেখাইবার কারণ ইহা আমাদের চোখে অতি ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন করে।

একটি গোলাকার কাচখণ্ড বা আতশী কাচের (burning glass) দ্বারা সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া দাহ্য পদার্থকে যে অতি সহজে জ্বালান যায়, গ্রোসেটেস্ট আলোকের প্রতি-সরণের সাহায্যে তাহার এক নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দেখান, সূর্যরশ্মি কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার সময় প্রতিসরণের নিয়মে দুইবার বাঁকিয়া যায়,—প্রথমবার বাতাসের মাধ্যম হইতে কাচের মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময়, দ্বিতীয়বার কাচের মাধ্যম হইতে আবার বাতাসের মাধ্যমে বাহির হইবার সময়। কেবল যে রশ্মিটি সোজা গোলাকার কাচখণ্ডের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যায় তাহার কোন প্রতিসরণ ও দিক্‌পরিবর্তন হয় না। প্রতিসরণের নিয়ম এই যে,

---

* অধ্যাপক লিন থর্নডাইক কর্তৃক উদ্ধৃত লুডউইগ বাওয়ের-এর *Die philosophischen werke des Robert Grosseteste* গ্রন্থে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ।

আলোকরশ্মি হাল্‌কা মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করিতে গেলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা ছোট হয়; পক্ষান্তরে ঘন মাধ্যম হইতে হাল্‌কা মাধ্যমে আলোকরশ্মির প্রবেশ করিবার বেলায় প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয়। দুই মাধ্যমের সীমারেখার উপর আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত লম্ব হইতে আপতন ও প্রতিসরণ কোণ মাপিবার রীতি। সুতরাং উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি লম্বের অভিমুখে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহা লম্ব হইতে দূরে বাঁকিয়া যাইবে। গোলাকার কাচখণ্ডের অথবা অনুরূপে কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উপরিভাগের যে কোন বিন্দুতে অঙ্কিত ব্যাসার্ধ সেই বিন্দুতে বৃত্তাংশের লম্ব হয়। গোলাকৃতির এই বিশেষত্বের দরুণ একটি বিন্দু হইতে বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিরা আতশী কাচের দুই পৃষ্ঠে দুইবার প্রতিসরণের ফলে এমন-ভাবে বাঁকিয়া যায় যে, তাহাদের পুনর্বার বাতাসের মাধ্যমে প্রবেশ করিবার পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সহজ জ্যামিতিক অঙ্কনের দ্বারা গ্রোসেটেস্ট ইহা কিরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছিলেন, তাহা ৩২নং চিত্রে দেখানো হইল। চিত্রটি আসলে রজার বেকনের *Opus majus*-এর এক পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। বেকন গ্রোসেটেস্টের অঙ্কনই হুবহু তাঁহার গ্রন্থে সংযোজনা করিয়াছিলেন।
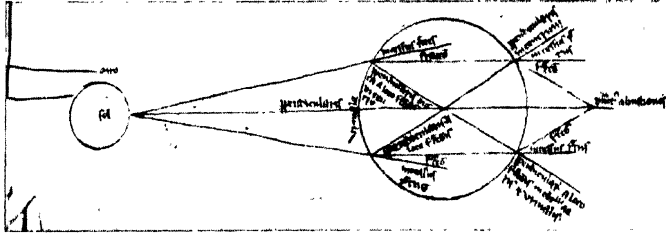
৩২। জ্যামিতিক অঙ্কনের দ্বারা গোলাকার কাচের মধ্যে আলোক প্রতিসরণের ব্যাখ্যা (গ্রোসেটেস্ট)।

পঞ্জিকা-সংস্কার : গ্রোসেটেস্ট জ্যোতিষেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি তখনকার দিনে প্রচলিত জুলিয়ান পঞ্জিকার নানা দোষ-ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারের এক চেষ্টা করেন। এই সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি ক্রান্তিবৃত্তের কম্পনের (trepidation of the ecliptic) কথা উল্লেখ করেন। ক্রান্তিবৃত্তের কম্পনের কথা প্রথম আলোচনা করেন থাবিত ইব্‌ন্ কুরা প্রমুখ মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ। জ্যোতিষীয় জ্ঞানের জন্য তিনি প্রধানতঃ টলেমীর নিকট ঋণী হইলেও আরব্য জ্যোতিষ হইতেও তিনি যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন। পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে *Computus* ও *Sphere* নামক দুই গ্রন্থে। বেকন ও পিয়ের দা'ই এই দুই গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ধূমকেতু : গ্রোসেটেস্ট নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনার অতি চমৎকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে ধূমকেতু এক প্রকার উৎক্ষিপ্ত অগ্নি (sublimated fire)। এই অগ্নি ধূমকেতুরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার সময় পার্থিব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় স্বভাব অর্জন করে। তারপর প্রত্যেক ধূমকেতুর সহিত কোন না কোন একটি নক্ষত্রের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই নক্ষত্র বিশেষের আকর্ষণের ফলেই উর্ধ্বলোকে ধূমকেতুর যাত্রা হইয়া থাকে।

গ্রোসেটেস্ট কিমিয়ার সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ধাতুকেই স্বর্ণরূপে তৈয়ারী করা; কিন্তু দোষ-গুণের তারতম্য হেতু সমস্ত ধাতু শেষ

পর্যন্ত স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে নাই, ইহারা বিভিন্ন ধাতুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিমিয়ার সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতুদের একদিন না একদিন স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে।

Summa philosophiae নামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত বিখ্যাত দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে সাধারণতঃ গ্রোসেটেস্টের নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। লুডউইগ বাওয়ের গ্রোসেটেস্টের দার্শনিক রচনাবলীর মধ্যে *Summa philosophiae* কে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সত্যই তাঁহার রচনা কিনা সে বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে গ্রোসেটেস্টের শিক্ষা ও ভাবধারার সহিত *Summa* র আলোচিত বিষয়ের মিল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি এই গ্রন্থ রচনা সুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত নিজে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; অথবা তাঁহার কোন শিষ্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও মতবাদ জানিবার পক্ষে *Summa* অপরিহার্য। এই গ্রন্থের শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদে আলোকতত্ত্ব, গ্রহলোক, পদার্থের মৌলিক ও যৌগিকতত্ত্ব, আবহতত্ত্ব এবং খনিজ ও ধাতু সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সিসকান, ডোমিনিকান ও অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান এবং বিদ্বজ্জনসমাজে তাহাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও গ্রোসেটেস্ট শেষ পর্যন্ত এরূপ কোন ধর্মীয় দলে যোগ দেন নাই। অক্সফোর্ডে ফ্রান্সিসকানদের বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং নানাভাবে তাহাদের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-চর্চাকে প্রভাবিত করিয়াছেন, কিন্তু কখনও এই সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হন নাই। ধর্মীয় অথবা শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বরাবর নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছেন এবং এক নির্ভীক মনের পরিচয় দিয়াছেন।

৮·৩। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (১১৯৩-১২৮০)

আলব্রেট ফন বলষ্টাট বা অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অন্যতম। সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস ও রজার বেকনকে বাদ দিলে অ্যালবার্টের তুল্য প্রতিভার দৃষ্টান্ত সমগ্র মধ্যযুগে ল্যাটিন ইউরোপে পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার অজস্র গ্রন্থ ও রচনাবলী এবং জ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষকতার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অসাধারণ তৎপরতা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে অ্যালবার্টকে চিরকালের জন্য এক বিশিষ্ট আসন প্রদান করিয়াছে। যে কোন কারণেই হউক, রজার বেকন অ্যালবার্টের গুণগ্রাহী ছিলেন না। কিন্তু তিনিও তাঁহাকে সর্বকালের ও সর্ব-দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন এবং অ্যারিষ্টটল, ইব্‌ন্‌ সিনা, ইব্‌ন্‌ রুস্‌দ্‌ প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার পাণ্ডিত্যের তুলনা করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : সুয়াবিয়ার অন্তর্গত লাউইন্‌গেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ধনী বলষ্টাট বংশে। তাঁহার জন্মসন সম্বন্ধে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। সাধারণভাবে ইহা ১২০৫ কি ১২০৬ খৃষ্টাব্দ হিসাবে নির্ধারিত হইলেও ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর জন্মসনটি (১১৯৩ খৃষ্টাব্দ) অপ্রমাণ করিবার পক্ষে অকাট্য যুক্তি এপর্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। অ্যালবার্ট পাদুয়ায় শিক্ষালাভ করেন। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং ১২২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্মানীর বিভিন্ন ডোমিনিকান বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন ১২৪৫ হইতে ১২৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্যারী হইতে তিনি কলোনে আসেন এবং ১২৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বৎসরকাল তিনি কলোনে অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে প্রায় তিন বৎসরের (১২৬০-৬২) জন্য তিনি র‍্যাটিস্‌বনের বিশপের পদে এবং চারি বৎসরের (১২৫৪-৫৭) জন্য সমগ্র জার্মানীর ডোমিনি-কানদের প্রধান কর্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নিয়োগ ব্যতীত

তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রধানতঃ শিক্ষকতা ও জ্ঞান-চর্চার কাজেই কাটাইয়াছিলেন।

রচনা : অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের অধিকাংশ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনার অনুপ্রেরণা অ্যারিস্টটল। এইসব রচনার তথ্য ও যুক্তিও প্রধানতঃ অ্যারিস্টটল হইতে গৃহীত। তিনি গ্রীক ও আরবী ভাষা জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার সময়ে অ্যারিস্টটলের সমস্ত গ্রন্থই ল্যাটিন ভাষায় সুলভ হইবার ফলে অ্যারিস্টটলের রচনাবলী ও চিন্তাধারার সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হইতে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলির পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন অনেকটা অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিতে। আটটি গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যার আলোচনা করেন। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে রচিত তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের, *De anima* ও *De somno et vigilia,* প্রত্যেকটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত; আবহবিদ্যা ও নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার তিনি আলোচনা করেন *De meteoris* ও *De coelo et mundo* নামক গ্রন্থে; *De causis et procreatione universi, De causis et proprietatibus elementorum et planetarium, De generatione et corruptione* প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যোতিষ ও জীববিদ্যা আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ২৬টি গ্রন্থ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে ৭টি ও ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে ৫টি গ্রন্থ।

অ্যালবার্ট প্রধানতঃ অ্যারিস্টটলকে অনুকরণ করিলেও তাঁহার ভাবধারার নিছক পুনরাবৃত্তি করেন নাই। মুসলমান ও ইহুদী বিজ্ঞানীদের নিকট হইতেও তিনি অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ ও সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ও গ্রন্থাদিতে আল্‌-ফারাবি, ইব্‌ন্‌ সিনা, ইব্‌ন্‌ গেব্রিওল, মাইমোনিডিস প্রমুখ মুসলমান ও ইহুদী পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। তারপর তিনি প্রাচীন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মতবাদ নির্বিচারে গ্রহণ ও আলোচনা করেন নাই; এইসব মত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যথেষ্ট মৌলিকতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। তথাপি অ্যালবার্টের বহু রচনা নানা অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট। তিনি নানা নূতন তথ্যের ও তত্ত্বের সমাবেশ করিলেও অনেক সময় আলোচনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য বিশ্ব-কোষের মত তাঁহার বিপুল রচনা-সম্ভার কেবল সংগ্রহমাত্র বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক সার্টন অ্যালবার্টের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও অদ্ভুত তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। প্রতিভা সৃষ্টি করে। অ্যালবার্টের রচনায় কোন নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত নাই, কোন নূতন জ্ঞানের নির্দেশ নাই, চিন্তা-জগতে ইহা কোনপ্রকার অগ্রগতি সূচিত করে নাই,

> "Inspite of many original judgements, his immense work is thus not a real encyclopaedia, an organic synthesis, but a compilation; it does credit to his enormous energy and his intelligence, but it is not a true creation and does not constitute in itself a real intellectual progress." *

তবে একথাও সত্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় পরিবেশে ও আবহাওয়ায় কাহারও পক্ষে নূতন কিছুর সন্ধান দেওয়া সহজ ছিল না। চিন্তাজগতে বহুদিন নির্বিকার ও সুপ্ত থাকিবার পর হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বর্ধিত হইল, তখনই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখিলেন প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সাম্প্রতিক আরব্য বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত। এই ভাণ্ডার ভাঙ্গাইতেই তাঁহারা তখন ব্যস্ত। তারপর নবাবিষ্কৃত অ্যারিস্টটলের জ্ঞানৈশ্বর্য। এই ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পাইয়া ল্যাটিন পণ্ডিতগণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অ্যারিস্টটলকে বুঝিবার মত উচ্চ শিক্ষার সৌভাগ্য যাঁহার হইল তিনিই এই

* Sarton, *Introduction,* Vol. II, part II, p. 935.

বিপুল ঐশ্বর্যের স্বাদ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করিলেন; এই ঐশ্বর্যের ত্রুটী ও দৈন্য চোখে পড়িবার বা এই সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করিবার মত অবস্থা তখন তাঁহার নহে। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসও অ্যারিষ্টটলীয় জ্ঞানৈশ্বর্যের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়াছিলেন। ল্যাটিন কৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত অ্যারিষ্টটলীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁহার জ্ঞান-চর্চার মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই কার্যে, অন্ততঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তাঁহার অবদানই সর্বশ্রেষ্ঠ। অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনে সুপণ্ডিত মুসলমান বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ ঐস্লামিক সভ্যতার জন্য যাহা করিয়াছিলেন অ্যালবার্ট ল্যাটিন সভ্যতার জন্য সেইরূপ করেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরীক্ষার গুরুত্ব-উপলব্ধি : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অ্যালবার্ট পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধি ও ইহার গুরুত্ব প্রচারের প্রধান কৃতিত্ব ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ রজার বেকনকে দিয়া থাকেন। বেকনকেই বলা হইয়া থাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু বেকনের পূর্বে অ্যালবার্টের রচনায় এই মনোভাবের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য রবার্ট গ্রোসেটেস্ট সম্বন্ধেও এই উক্তি বহুলাংশে প্রযোজ্য। বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্রলয় যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে সংঘটিত হইয়াছিল এবং মহাপ্রলয়ের আর কোন কারণ অন্বেষণ যে বৃথা, প্রচলিত এই ধরনের বিশ্বাস সম্বন্ধে অ্যালবার্ট এক জায়গায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সাধিত হয় তাহা তিনি অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে ঈশ্বরের কার্যকলাপের একটি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণ আছে। এইসব প্রাকৃতিক কারণ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। তিনি বলিতেন, বস্তু সম্বন্ধে জানিতে হইলে কোন একটি সার্বজনীন মতবাদ হইতে সুরু না করিয়া বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণ পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করাই হইবে প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা শুধু তাঁহার মুখের কথাই নহে, বৈজ্ঞানিক জীবনে এই আদর্শ তিনি সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছেন। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের বিচিত্র স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি নিজে ও ছাত্রদের সহযোগিতায় বহু পরীক্ষা সম্পাদন করিয়াছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক পুশে* অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস ও রজার বেকনকে সংযুক্তভাবে আধুনিক পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুশে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করেন—(১) গ্রীক বিজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের যুগ,—অ্যারিষ্টটল ইহার প্রধান প্রতিভূ; (২) রোমক বিশ্বকোষের যুগ,—ইহার প্রতিভূ প্লিনি; এবং (৩) মধ্যযুগ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যুগ,—ইহার প্রতিভূ হইলেন অ্যালবার্টাস ও বেকন। মধ্যযুগকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যুগ বলিয়া অভিহিত করার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকিলেও পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের প্রথম বনিয়াদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতত্রয়ী,—গ্রোসেটেস্ট, অ্যালবার্টাস ও বেকন, যে রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাণিবিদ্যা : অ্যালবার্টাসের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখি প্রাণিবিদ্যায় ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিবিদ্ ও উদ্ভিদ্‌বিদ্। থিওফ্রেস্-টাস (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩-২৮৮) ও অ্যাণ্ড্রিয়া সেসাল্‌পিনির (১৫১৯-১৬০৩) অন্তর্বর্তী দীর্ঘ আঠার শতাব্দীর মধ্যে অ্যালবার্টাসের সমকক্ষ প্রাণিবিদ্ ও উদ্ভিদ্‌বিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। তাঁহার প্রাণিবিদ্যার অধিকাংশ তথ্য অ্যারিষ্টটল, ইব্‌ন্ সিনা প্রমুখ পূর্ববর্তী প্রাণি-বিদ্‌দের গবেষণা হইতে গৃহীত হইলেও তিনি নিজেও এই সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। দানিয়ুব নদীর উপত্যকা-অঞ্চলের এবং কেলোন, রেভ্‌স্, হল্যাণ্ড, ব্রাবাণ্ট ও ইতালীর বিভিন্ন স্থানের প্রাণীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও নানা বিচিত্র ব্যবহার তিনি

* F. A. Pouchet, *Histoire des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le Grand et son époque consideré comme point de depart de l'école experimental,* Paris, 1853.

দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করেন। উত্তর সাগরের সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলের জন্তু-জানোয়ার, তিমি ও সিন্ধুঘোটক শিকার, অশ্ব ও বাজপাখীর নানা রোগ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার আলোচনা বিশেষ তথ্যপূর্ণ। প্রাণীবিশেষ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণা, যেমন পেলিকান পাখী নিজ রক্তের দ্বারা শাবকের পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে, গিরগিটি বা সালামান্ডার আগুনে পোড়ে না, এক প্রকার রাজহংস (barnacle goose) গাছে জন্মায় ইত্যাদি, তিনি শোধরাইবার চেষ্টা করেন। মৃত্তিকাগর্ভে প্রাণিদেহাবশেষ যে জীবাশ্মে রূপান্তরিত হয়, ইব্‌ন্ সিনার এই মতে তিনি আস্থাবান ছিলেন। আবার বহু ক্ষেত্রে তিনি প্রাণিবিদ্‌দের পুরাতন ভুল অপরিবর্তিতভাবেই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন বাদুড় পক্ষীশ্রেণীভুক্ত, তিমি একপ্রকার মৎস্য ইত্যাদি।
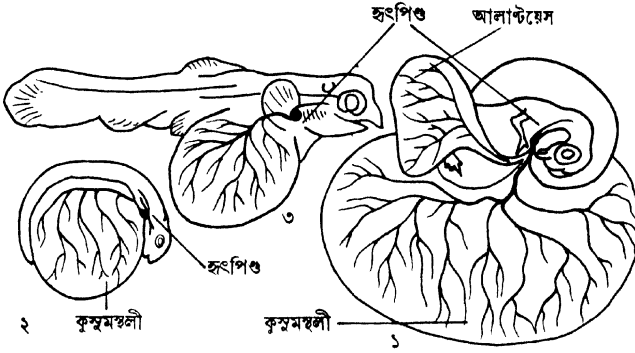
৩৩। পক্ষী ও মৎস্যের ভ্রূণ; (১) পক্ষীর ভ্রূণ, (২) মৎস্যের ভ্রূণ—প্রাথমিক অবস্থা, (৩) মৎস্যের ভ্রূণ—পরিণত অবস্থা।

জীববিদ্যায় তাঁহার কিরূপ উৎসাহ ছিল এবং নানা জটিল বিষয় তিনি কিরূপ বিশদ-ভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহার এক নমুনাস্বরূপ অধ্যাপক সিঙ্গার অ্যালবার্টাস কর্তৃক বর্ণিত পক্ষীডিম্ব ও মৎস্যডিম্বের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।* *De animalibus*-এর এক জায়গায় অ্যালবার্টাস লিখিয়াছেন,

"পক্ষীডিম্ব ও মৎস্যডিম্বের বিকাশ ও পরিণতি-পদ্ধতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, হৃৎপিণ্ড হইতে প্রসারিত দুইটি মহাশিরার মধ্যে একটির অস্তিত্ব মাছের ডিমে পাওয়া যায় না; কিন্তু পাখীর ডিমে দুইটি মহাশিরাই বর্তমান। পাখীর বেলায় একটি মহাশিরা (হৃৎপিণ্ড হইতে) ডিমের বহিরাবরণ পর্যন্ত প্রসারিত থাকে,—এই শিরার মারফত বহির্বর্তী অংশে রক্ত-সঞ্চারণ হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে ভুল করিয়া 'নাভেল' শিরা (navel vein) বলিয়াছেন; মাছে এই নাভেল শিরাটি থাকে না। কিন্তু যে মহাশিরাটি কুসুমস্থলী অভিমুখে প্রসারিত এবং যাহার সাহায্যে রক্ত চলাচলের ফলে ভ্রূণের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে তাহা অবশ্য পাখী ও মাছ উভয়ের ডিমেই থাকে। পাখীর মত মাছের বেলাতেও হৃৎপিণ্ড হইতে প্রথমে মস্তিষ্ক ও চক্ষু পর্যন্ত কতকগুলি নালী প্রসারিত; ইহার ফলে দেহের উপরের অংশের বৃদ্ধি সর্বাগ্রে সাধিত হয়। মাছের ছানা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কুসুমস্থলীটিও ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাছের দেহের সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। বৃদ্ধির পরিণত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন উদরে ও উদরের নিম্নদেশে সঞ্চারিত হইয়া সেইসব অংশকে ক্রমে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে।"

* Charles Singer, *A Short History of Biology*, p. 73-74.

ডিম্বের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান হইতে আমরা জানি যে, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে কুসুমস্থলী ছাড়া ঝিল্লীময় একটি ক্ষুদ্র স্থলী থাকে; এই স্থলীটির নাম 'আলাণ্টয়েস' (allantois)। হৃৎপিণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এই 'আলাণ্টয়েসে' রক্ত সরবরাহ হইয়া থাকে। মৎস্যডিম্বে একমাত্র কুসুমস্থলী ছাড়া আর কোন স্থলী বা 'আলাণ্টয়েস' থাকে না। অ্যালবার্টাস সম্ভবতঃ এই প্রভেদের কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : অ্যালবার্টাসের *On Plants* গ্রন্থটি মধ্যযুগের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তিনি ছিলেন থিওফ্রেস্‌টাসপন্থী। উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান (morphology) সম্পর্কে তাঁহার বহু পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা মৌলিক। দ্রাক্ষা-লতার ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে দ্রাক্ষাগুচ্ছের পরিবর্তে যে আকর্ষ (tendril) দেখা যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি মন্তব্য করেন, আকর্ষ দ্রাক্ষার অপরিণত পূর্বাবস্থা। শাখাকণ্টক (thorn) ও গাত্রকণ্টকের (prickles) প্রভেদ তিনি সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁহার এক অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং এই বিষয়ে খুব কম উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন।
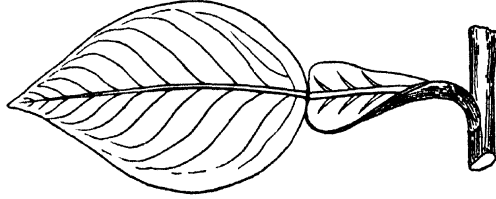
৩৪। অ্যালবার্টাসের বর্ণনা অবলম্বনে অঙ্কিত কমলালেবুর পাতা।

গণিত ও জ্যোতিষ : পিথাগোরীয় পাটীগণিতে অ্যালবার্টাসের কিছুটা উৎসাহ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি গণিতজ্ঞ ছিলেন না। গণিত অপেক্ষা জ্যোতিষে তিনি অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেন। মুসলিম জ্যোতির্বিদ্ আল্-বিত্রুজির জ্যোতিষ তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইউরোপে তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদ প্রচার করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। তবে তিনি টলেমীর জ্যোতিষীয় মতবাদের, বিশেষতঃ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনারই পক্ষপাতী ছিলেন বেশী।

কিমিয়া, ভূবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা : *De mineralibus* গ্রন্থে অ্যালবার্টাস কিমিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। ফটকিরি, হিরাকস, আর্সেনিক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিমিয়াবিদ্‌দের তথাকথিত কৌশল বা চাতুরির কথা তিনি জানিতেন এবং এই বিদ্যার প্রতি তিনি কোন দিনই শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। কিমিয়াবিদ্‌দের দ্বারা উৎপন্ন একপ্রকার স্বর্ণের উপর পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখান যে, ছয় সাতবার আগুনে এই কৃত্রিম স্বর্ণকে পোড়াইলে ইহা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; কিন্তু খাঁটী সোনা এইরূপ হয় না। ধাতু-রূপান্তরের সম্ভাবনা তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন না বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরিত ধাতু গুণাগুণের দিক হইতে যে আসল ধাতু অপেক্ষা সর্বপ্রকারে নিকৃষ্ট, ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। *De alchimia* নামক আর একটি গ্রন্থে গলিত কস্টিব সোডার প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তবে এই পুস্তক যথার্থই তাঁহার রচিত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অ্যালবার্টাসের বহু পূর্বে কস্টিক অ্যালকেলি বা তীক্ষ্ম-ক্ষারের কথা উল্লেখ করেন জাবির বা গেবের।

De mineralibus গ্রন্থে ভূবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা আছে। তিনি প্রায় ৯৫টি মূল্যবান মণিক ও খনিজের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এইসব মণিক ও খনিজের অনেক কথা মার্বোড, টমাস অব কান্টিম্প্রে প্রমুখ পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের রচনা হইতে গৃহীত হইলেও অ্যালবার্টাস নিজেও খনিজ সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেন। সমুদ্রের গতি, ভূমিক্ষয়, পর্বত-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় ভূবিদ্যা সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে ভূপৃষ্ঠের এজাতীয় পরিবর্তনের কারণ আকস্মিক এবং ইহা প্রধানতঃ অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। এইসব পরিবর্তনের পশ্চাতে ভূপৃষ্ঠের জল-ভাগেরও যে এক বিশেষ অংশ আছে, তাহার উপর তিনি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অ্যারিস্টটল, থিওফ্রেস্টাস, ওভিড, ইব্‌ন্ সিনা ও অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতদের মতবাদই তিনি প্রকারান্তরে আলোচনা করিয়াছেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অ্যালবার্টাসের প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁহার এরূপ আশ্চর্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বাল্যাবস্থায় তিনি নাকি অতিশয় নির্বোধ ছিলেন; লেখাপড়া বা কোনরূপ মস্তিষ্ক-চালনার ধার দিয়াও তিনি যাইতেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরে তাঁহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাঁহার এরূপ ধর্মভাবে প্রসন্ন হইয়া একদিন রাত্রিকালে কুমারী মেরী তাঁহাকে দেখা দেন এবং দর্শন অথবা ধর্মতত্ত্ব এই দুইএর কোন বিষয়ে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী হইতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। অ্যালবার্টাস দর্শনশাস্ত্রে যশস্বী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে কুমারী মেরী তাঁহাকে সেই বরদানই করিলেন বটে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব নির্বাচন না করিবার জন্য মনে মনে ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হইয়া বরদান প্রসঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, জীবনের শেষ দশায় উপনীত হইয়া অ্যালবার্টাস আবার তাঁহার বাল্যকালের নির্বোধ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে অ্যালবার্টাস শিষ্যবর্গের সম্মুখে সত্যসত্যই একদিন বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন এবং আর কখনও পূর্বেকার বুদ্ধি ও ধীশক্তি ফিরিয়া পান নাই।*

৮·৪। রজার বেকন (১২১৪-৯২)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রান্সিস্‌কান রজার বেকনের চরিত্র যেমন গুরুত্বপূর্ণ, নানাদিক দিয়া ইহা আবার তেমনই কুহেলিকাপূর্ণ ও বিতর্কমূলক। কালো ম্যাজিক, কিমিয়া, ফলিত জ্যোতিষ, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি নানা অবৈজ্ঞানিক ও আধা-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহার যেমন দুর্নাম আছে, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম পথপ্রদর্শক, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রধান উদ্গাতা ও পণ্ডিতীয় মনোভাবের প্রথম তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচক হিসাবেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার একটি অক্ষয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

বেকন ছিলেন স্বপ্নবিলাসী দ্রষ্টা। উচ্চাঙ্গের কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পাদন না করিলেও তিনি সে কালের দৃষ্টিতে অদ্ভুত যেসব বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার কথা কল্পনা করিয়া-ছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এককালে মানুষ সমুদ্রগামী নৌকা হইতে হালের পাট তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে যন্ত্রচালিত দ্রুতগামী বৃহদাকার অর্ণবপোত প্রবর্তন করিতে পারিবে, পশুর বদলে যন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা অবিশ্বাস্য বেগে যানবাহন চালাইতে পারিবে, পাখীর মত কৃত্রিম পক্ষযুক্ত একপ্রকার যান্ত্রিক উড়োজাহাজে আকাশে অবলীলাক্রমে বিচরণে সমর্থ হইবে, সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি! বেকনের এইসব বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। তাঁহার কালে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া লোকে

* Agnes Arber, *Herbals—Their Origin and Evolution,* Cambridge, 1912; p. 4.

এমন কি প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও কালসহকারে এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই সত্য হইয়াছিল।

বেকনের পূর্ববর্তী, তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল—সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে এক অভেদ্য একতার সন্ধান করা। এই একতার সন্ধান করিতে গিয়া বিজ্ঞানীকে শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদ, প্রজ্ঞা ও দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। জ্ঞানের এই অন্তর্নিহিত একতার প্রশ্ন বেকনকে কম বিব্রত করে নাই। কিন্তু তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন যে, এই একতার সন্ধানে ছুটিয়া হয়রান হইবার পরিবর্তে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের উচিত প্রথমে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা, জ্ঞানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। তথ্যের সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ না ঘটিলে এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই তথ্যের অভ্রান্ততা নির্ণয় করিতে না পারিলে জ্ঞানের সত্যকার মূল্য নিরূপণ যে সম্ভবপর নয়, ইহা বেকন সুস্পষ্টরূপে প্রথম অনুধাবন করেন। তিনি আরও অনুভব করেন যে, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভ্রান্ততা নির্ণয়ই যথেষ্ট নহে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন গণিতের প্রয়োগ। গণিতের প্রয়োগ ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি একরূপ অসম্ভব। এই মহাসত্য উপলব্ধি হইতেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রদূত হিসাবে বেকনের দাবী স্বীকার করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

বেকন বিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞান ও দর্শনের এক বিশেষ শাখা হিসাবে দেখেন নাই। মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতেও বিজ্ঞানকে তিনি বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। *Opus majus* ও *Opus tertium* গ্রন্থদ্বয়ে তিনি বারংবার বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও এক অতি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন সুসংবদ্ধভাবে জোরালো ভাষায় বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়তাবাদেরই জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রেণেশাঁসের অভিজ্ঞতার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকনের পক্ষে বিজ্ঞানকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা সহজ হইয়াছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা রজার বেকনের পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। রজার বেকনের চিন্তাধারার মৌলিকতার ইহা এক অকাট্য প্রমাণ। এই ভাবে বিচার করিবার ফলে বিজ্ঞান, শুধু বিজ্ঞান কেন সমগ্র দর্শন ও শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাঁহার দৃষ্টিতে এক নূতন তাৎপর্য ও অর্থ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সমসাময়িক কাল বেকনের প্রতিভা নিরূপণ করিতে পারে নাই। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস ও সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের সুনাম ও জনপ্রিয়তার চাপে বেকনের প্রতিভা অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছিল। ইহার জন্য বেকনের কলহপ্রিয় স্বভাবও বড় কম দায়ী নহে। তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না এবং অ্যালবার্টাস ও অ্যাকুইনাসের সাফল্যে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করিতেন। অবশ্য দার্শনিক হিসাবে অ্যাকুইনাসের প্রসিদ্ধি ছিল বেকনের অপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাঁহার রচনাও ছিল অনেক বেশী সুসংহত ও প্রণালীবদ্ধ। বেকনের রচনায় এই প্রণালী ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব; ইহা অসংলগ্ন ও স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তিতে দুষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি ছিলেন অ্যাকুইনাস অপেক্ষা বড় এবং সম্ভবতঃ অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের সমকক্ষ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক হইতে তিনি অ্যালবার্টাসকে অতিক্রম করিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাণী ও জীববিদ্যায় অ্যালবার্টাস বেকনকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছিলেন; তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিতে বেকন ছিলেন অনেক বেশী সুপণ্ডিত। উভয়ের জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে যত মতদ্বৈধই থাকুক না কেন বেকনের প্রতিভা ও স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

রজার বেকনের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়া আমরা যেমন বিস্মিত হই, কালো ম্যাজিক, কিমিয়া, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সমর্থন

তেমনি অদ্ভুত ঠেকে। মধ্যযুগের নানা রচনায় যাদুকর ও কিমিয়াবিশারদ হিসাবে আমরা বেকনের উল্লেখ পাই। ১৫৯২ খৃীষ্টাব্দে রচিত রবার্ট গ্রীণের নাটকে (*Honorable History of Frier Bacon and Frier Bungay*) এক উদ্ভট ও কুশলী যাদুকর হিসাবে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ১৬২৫ খৃীষ্টাব্দে নোদে বেকনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া সর্বপ্রথম তাঁহাকে এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করেন।* ১৭৩৩ খৃীষ্টাব্দে জেব বেকনের বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus majus*-এর এক সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রুয়ার, ব্রিজেস প্রমুখ পণ্ডিতগণ বেকন সম্বন্ধে গবেষণা ও তাঁহার গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত করিয়া যে সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহাতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই বিশিষ্ট ফ্রান্সিসকান পণ্ডিতের আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইয়াছে।†

সংক্ষিপ্ত জীবনী: ইংল্যাণ্ডে সমার্সেটের অন্তর্গত ইলচেষ্টারে বেকনের জন্ম হয় ১২১৪ খৃীষ্টাব্দে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। এইখানে তিনি খ্যাতনামা শিক্ষক ও পণ্ডিত রবার্ট গ্রোসেটেস্ট ও অ্যাডাম মার্শের ভাবধারা ও রচনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। অক্সফোর্ডের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অ্যারিষ্টটল সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া প্যারী গমন করেন আনুমানিক ১২৪০ খৃীষ্টাব্দে। প্রায় দশ বৎসর প্যারীতে, ইতালীতে ও ইউরোপের নানাস্থানে কাটাইবার পর ১২৫০ খৃীষ্টাব্দের অনুরূপ সময়ে অক্সফোর্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন। ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁহার তৎপরতার কথা বিশদভাবে জানা না থাকিলেও প্রধানতঃ অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও জ্ঞান-চর্চার কাজেই তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাস যে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ে তিনি *Epistola de accidentibus senectutis, Questions relative to the Aristotelian Physics and Metaphysics, to the De plantis and the De causis* প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি (*Epistola*) তিনি মহামান্য পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্টকে উপহার দেন ১২৪৩ খৃীষ্টাব্দে।

অক্সফোর্ডে অধ্যাপনার কার্যে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। অক্সফোর্ডে তখন ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতদের বিশেষ প্রাধান্য। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্সিস-কানদের প্রভাবে বেকন তাহাদের দলভুক্ত হন এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান-চর্চায় অতিবাহিত করিবার ব্রত গ্রহণ করেন। বেকনের জন্ম হইয়াছিল সম্ভ্রান্ত ধনী বংশে; কিন্তু বিদেশ ভ্রমণে এবং গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও বিজ্ঞান-চর্চার ব্যয় সঙ্কুলান করিতেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। যাহা হউক, ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে শেষ পর্যন্ত শুভ হয় নাই। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও কার্যকলাপ অচিরে ফ্রান্সিসকান প্রধানদের অসন্তোষ উদ্রেক করে। বিরুদ্ধ সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা-প্রকাশ, ভিন্ন মতাবলম্বীদের তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ ও কলহপ্রিয় স্বভাবের জন্য তিনি ফ্রান্সিসকানদের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। তারপর আর একটি ব্যাপারেও বেকনের জ্ঞান-চর্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল। ১২৫৪ খৃীষ্টাব্দে জিরার্ড নামে এক ফ্রান্সিসকান কর্তৃক রচিত *Liber introductorius ad evangelium aeternum* শীর্ষক গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক সভ্যের উপর ফ্রান্সিসকান কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক আদেশ জারি করে যে, কোন গ্রন্থ বা রচনা প্রকাশের পূর্বে প্রত্যেক সভ্যকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ

---

* Gabriel Naudé, *Apologie pour tous les grands personages qui ont eté faussement soupçonnez de Magie*, Paris, 1625.

† *Opus majus*, edited by Samuel Jebb (folio vol., London, 1733; by John Henry Bridges, Oxford, 1897).

করিতে হইবে। এই আদেশ বলবৎ হওয়ায় বেকন মহা অসুবিধায় পড়িয়া যান। অতঃপর তাঁহার পক্ষে কিছু প্রকাশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রায় ১২ বৎসর তিনি কোন গ্রন্থ লিখিবার বা প্রকাশ করিবার উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই।

১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বেকন নিজের বৈজ্ঞানিক মত ও বিশ্বাস গ্রন্থাকারে লিখিবার ও প্রকাশ করিবার এক আশাতীত সুযোগ লাভ করেন। ঐ বৎসর গি দ্য ফুক বা পোপ চতুর্থ ক্লিমেণ্ট বেকনের রচনাবলী পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। ফ্রান্সে অবস্থানকালে গি দ্য ফুকের সহিত বেকনের পরিচয় হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময় বেকনের রচনার ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সহিত ফুকের কিছু পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। ফুক ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপের পদে অভিষিক্ত হন এবং পর বৎসরই বেকনের সমগ্র রচনার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এক নগণ্য ফ্রান্সিস্‌কান পাদরীর পক্ষে ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ; বেকন ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। পোপের অনুরোধের বহু পূর্ব হইতেই তিনি *Compendium philosophiac* নামে এক বিরাট বিশ্বকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনাও তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার ফল। তিনি চারিটি বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্র (১ম খণ্ড), গণিত (২য় খণ্ড), পদার্থবিদ্যা (৩য় খণ্ড), অধিবিদ্যা ও নীতি-বিজ্ঞান (৪র্থ খণ্ড) এই ছয়টি বিষয় আলোচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তবে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই বিশ্বকোষের অতি সামান্য অংশই তিনি লিখিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। পোপের নির্দেশ পাইলে তিনি দেখিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পক্ষে পরিকল্পিত বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে না। তিনি বিশ্বকোষের পরিবর্তে *Opus majus, Opus minus, Opus tertium* ও *De multiplicatione specierum* নামে চারিটি গ্রন্থ পোপের নিকট প্রেরণ করেন ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। দুর্ভাগ্যক্রমে বেকনের গ্রন্থ পাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই ফুকের মৃত্যু হয়।

বেকনের প্রতি পোপের এই অনুগ্রহে ফ্রান্সিস্‌কান প্রধানরা তাঁহার প্রতি মনে মনে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিল। এমনিতেই বেকনকে তাহারা দেখিতে পারিত না; তাহার উপর উপর-ওয়ালাদের ডিঙ্গাইয়া বেকনের স্বয়ং পোপের এইরূপ অনুগ্রহভাজন হইবার ব্যাপারে প্রধানরা অপমানিত বোধ করিল। ফুকের মৃত্যু হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে তাহারা বদ্ধ-পরিকর হয়। প্রথমে অভিনব মতবাদের অধ্যাপনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক আদেশ জারি করা হয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্সিস্‌কা।রা নানারূপ উদ্ভট ও আজগুবী মত পোষণ করিবার এক অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনয়ন ব র। প্যারীতে এই অভিযোগের শুনানি হইয়াছিল এবং বেকন অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাবা সর আদেশ লাভ করেন ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার কারাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বেকনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—*Opus majus*

পোপ চতুর্থ ক্লিমেণ্টের নিকট প্রেরিত *Opus majus* বেকনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অপর তিনটি গ্রন্থ কতকটা ইহার সম্পূরক মাত্র—ইহাদের মধ্যে এমন কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই যাহা *Opus majus*-এ আলোচিত না হইয়াছে। এই গ্রন্থটি সাতটি ভাগে বিভক্ত:—(১) ভ্রান্তির কারণ, (২) দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সম্বন্ধ, (৩) ভাষাচর্চা, (৪) গণিত,—জ্যোতিষ, সঙ্গীত ও ভূগোলও ইহার অন্তর্ভুক্ত, (৫) আলোকবিদ্যা, (৬) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, এবং (৭) নীতি। *Opus minus* এই মূল গ্রন্থের উপক্রমণিকা বিশেষ। জ্যোতিষ, কিমিয়া, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

Opus tertium ও *Opus majus*-এর সম্পূরক। এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের, যেমন পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, কিমিয়া, ইত্যাদি, পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, *Opus majus* ও তাহার সম্পূরক উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি হইতে বেকনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। এইবার সংক্ষেপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার তৎপরতা ও মতের আলোচনা করিব।

গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোল : বেকন গণিতজ্ঞ ছিলেন বটে, তবে গণিতে কোন মৌলিক গবেষণা তিনি সম্পাদন করেন নাই। এই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ও চর্চায় গণিতের গুরুত্ব তিনি সম্যকরূপে অনুধাবন করেন। তিনি বলিতেন, জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; কিন্তু এই পরীক্ষার সমস্ত ফল পাইতে হইলে গণিতের মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টির আলোচনা হওয়া চাই। "Though the best source of knowledge (outside revelation) is experimentation, the latter must be completed by mathematical treatment to bear all its fruits." * বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গণিতের প্রয়োগের অপরিহার্যতা উপলব্ধি তাঁহার অভিনব ভাবধারার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এবিষয়ে তিনি একক ছিলেন না; তাঁহার গুরু রবার্ট গ্রোসেটেস্টও এরূপ মত পোষণ করিতেন।

Opus majus-এর চতুর্থ খণ্ডে গণিত সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণা করেনঃ—পদার্থবিদ্যায় গণিতের প্রয়োজনীয়তা, জ্যোতিষ, পঞ্জিকা-সংস্কার, ভূগোল ও ভাগ্যগণনা। তাঁহার জ্যোতিষীয় আলোচনা হইতে মনে হয়, তিনি গ্রীক ও আরব্য জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রোসেটেস্টের মত টলেমীর ও আল্-বিত্রুজির প্রস্তাবিত উভয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত মিলের দিক হইতে টলেমীর পরিকল্পনা যে অধিকতর সন্তোষজনক ইহা তিনি লক্ষ্য করেন; আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে আল্-বিত্রুজির পরিকল্পনা যে শ্রেয় প্রতীয়মান হয় তাহাও তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

পঞ্জিকা-সংস্কার ব্যাপারে বেকন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি গুরু ও শিক্ষক রবার্ট গ্রোসেটেস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। *Compotus naturalium* ও *De termino Paschali* গ্রন্থদ্বয়ে এসম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা মনোজ্ঞ ও তথ্যপূর্ণ। পঞ্জিকা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সময় পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হইয়াছিল *Compotus*-এ তাহার এক পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে, এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ও প্রচলিত নানাবিধ পঞ্জিকার তিনি ব্যাপক সমালোচনা করেন।

Opus majus -এর গাণিতিক খণ্ডে ভূগোল সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রাচীন ভৌগোলিকদের প্রদত্ত তথ্যই কেবল আলোচিত হয় নাই, স্বল্প পরিচিত নানা দেশ সম্বন্ধেও অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। বেকনের সমসাময়িক ফ্লেমিশ ফ্রান্সিসকান ভৌগোলিক ও পর্যটক উইলিয়ম অব রুব্রুকির ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে বহু তথ্য তিনি গ্রহণ করেন। মার্কো পোলোর পূর্বে রুব্রুকি ছিলেন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ভৌগোলিকদের অন্যতম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি সাইবিরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যে ও কনস্তান্তিনোপল, সিরিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে পর্যটন করেন। শুধু বর্ণনাই বেকনের ভূগোলের বিশেষত্ব নহে; ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহার নানা মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণ গোলার্ধ যে বসবাসের পক্ষে উপযোগী তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন। সমগ্র পৃথিবীর এক ব্যাপক ও সম্পূর্ণ পরিমাপ বা জরীপ গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পোপের নিকট তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সম্পর্কে

* Sarton, *Introduction,* Vol. II, p. 950.

পার্চমেণ্ট কাগজে স্বরচিত পৃথিবীর একটি মানচিত্রও তিনি পাঠাইয়াছিলেন; এই মানচিত্রে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান জনপদের স্থানাঙ্ক (Coordinates) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মানচিত্রটি এখন নিখোঁজ। তারপর স্পেন হইতে সমুদ্র-পথে সরাসরি পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিবার সম্ভাবনার কথা তিনি আলোচনা করেন। অবশ্য এই সম্ভাবনার কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে একাধিক ভৌগোলিক ও বিজ্ঞানী বলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার শোচনীয় অবনতির কালে এইরূপ কথা প্রাচীন ধারণার পুনরাবৃত্তি হইলেও নূতন করিয়া বলিবার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। এইরূপ বিশ্বাস হইতেই কলম্বাস তাঁহার দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কলম্বাসের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার উৎস অবশ্য পিয়ের দা'ই-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *Imago mundi*।

আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা : আলোক সংক্রান্ত গবেষণাতেও বেকন গ্রোসেটেস্টের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান ভিত্তি ছিল আল্-কিন্দি ও আল্-হাজেনের আলোক সম্বন্ধীয় গবেষণা। বেকন আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; এজন্য আরব্য বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকারদের মূল রচনার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। উল্লেখযোগ্য নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার না করিলেও প্রতিফলক ও লেন্সের সাহায্যে তাঁহার সম্পাদিত অনেক পরীক্ষার নজির পাওয়া যায়। তিনি অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সম্ভাব্যতা অনুমান করেন। গোলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে আলোকের প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ফলে উৎপন্ন প্রতিকৃতির যেসব দোষ জন্মাইয়া থাকে প্যারাবোলয়েড ও হাইপারবোলয়েড আকৃতির প্রতিফলকের অথবা লেন্সের ব্যবহারে সেইসব দোষ দূর করা যে সম্ভবপর তাহার অস্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এইসব পরীক্ষার ব্যয় সংকুলান করিতেই বেকনের পৈতৃক সম্পত্তির এক মোটা অংশ উজাড় হইয়া যায়। আলোক সংক্রান্ত গবেষণার উপর তিনি কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহার এক প্রমাণ এই যে, নিজে কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পোপকে তিনি একটি লেন্স উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেকনের কয়েকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আলোক এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাহিত হয় না; এই প্রবাহ ঘটিতে যত অল্পই হোক কিছুটা সময় লাগে। অর্থাৎ, আধুনিক ভাষায় আলোকের একটি সসীম গতিবেগ আছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের মতে আলোক প্রবাহ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিবার কথা অর্থাৎ তাহার গতিবেগ হওয়া উচিত অনন্ত। বেকন আরও বলেন, আলোক অতি ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ নহে, ইহা একপ্রকার গতির প্রবাহ (transmission of a movement)।* নিতান্তই ভাসা ভাসা ভাবে তিনি উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি করিয়াছিলেন। তবে বেকন আলোকতরঙ্গ-তত্ত্বের আঁচ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে কেহ যেন এইরূপ মনে না করিয়া বসেন।

বলবিদ্যাতেও তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। বল কি এবং গণিতের সাহায্যে কি ভাবে ইহাকে প্রকাশ করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। আদেলার্দ অব বাথের মত তিনি বলেন যে, শূন্য স্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব। দূরত্বের ব্যবধানে প্রত্যক্ষ কোনরূপ সংযোগ রক্ষা না করিয়া নানা প্রকার বল ও শক্তির ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া কি ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে এই প্রশ্ন বেকনের এক প্রিয় গবেষণার বস্তু ছিল। মানুষের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব তিনি দূরত্বের ব্যবধানে ক্রিয়াশীল এক অদৃশ্য বল বা শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা আগেই বলিয়াছি, তিনি ফলিত জ্যোতিষে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন।

কিমিয়া, বারুদ, চিকিৎসাবিদ্যা : আলোক বিজ্ঞানের মত কিমিয়াশাস্ত্রে বা রসায়নে বেকনের আজীবন নেশা ছিল। যাদুবিদ্যা-চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার ভয়ে তিনি গোপনে

* Sarton, Vol. II, p. 957.

কিমিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা ও গবেষণা করিতেন। অক্সফোর্ডের উপকণ্ঠে তাঁহার একটি কিমিয়ার গবেষণাগার ছিল। বেকন কিমিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করেন—অনুধ্যানমূলক (speculative) ও প্রক্রিয়া বা পরীক্ষামূলক (operative)। মৌলিক পদার্থ হইতে কিরূপে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা যায়—যেমন, লবণ, খনিজ, ধাতু প্রভৃতির উৎপাদন—এইরূপ আলোচনা অনুধ্যানমূলক কিমিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রক্রিয়ামূলক কিমিয়ার উদ্দেশ্য হইল স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, পরীক্ষা ও কৌশলের স্বারা তাহার উন্নতি সাধন করা। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি উপায়ে উন্নততর স্বর্ণ-প্রস্তুত, ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী নানাবিধ ঔষধ-প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য প্রক্রিয়ামূলক কিমিয়ার গবেষণা ও আলোচনার বিষয়। প্যারাসেলসাসের বহু পূর্বে বেকন বলেন যে, রাসায়নিক গবেষণার স্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ঔষধ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভবপর। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, কিমিয়া বা রসায়ন পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মধ্যগা।

বারুদ আবিষ্কারের সহিত বেকনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বিতর্ক আছে। বারুদ আবিষ্কার সম্পর্কে যেসব ল্যাটিন বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় রজার বেকন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং এক সময়ে একদল ঐতিহাসিকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেকনই বারুদের প্রথম আবিষ্কর্তা। *Epistola de secretis operibus naturae* ও *Opus tertium* -এ বিস্ফোরক দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়ায় বেকন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। *De secretis* -এ প্রাপ্ত একটি শূন্যের (cipher) ব্যাখ্যা করিয়া কর্ণেল হাইম এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেন যে, রজার বেকনই বারুদের আবিষ্কর্তা।* কিন্তু *de secretis* গ্রন্থের প্রমাণিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে। বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত, বেকন সম্ভবতঃ বারুদের কথা জানিতেন, কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনও না কোন সময়েই ইহার কথা ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে তিনিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর একদলের অভিমত, বারুদ ইউরোপে আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন মহাদেশে এবং তথা হইতে এই জ্ঞান মুসলমান বিজ্ঞানীদের সাহায্যে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। বারুদ আবিষ্কারের কথা পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

বেকন চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে *Liber de retardatione accidentium senectutis* গ্রন্থটির খ্যাতিই খুব বেশী। সারবস্তুর দিক হইতে তাঁহার *De erroribus medicorum* গ্রন্থটিই অধিকতর মূল্যবান। ইহাতে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পরীক্ষার গুরুত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান—পরীক্ষার আদর্শ

বেকন *Opus majus*-এর প্রথম খণ্ডে ভ্রান্তির কারণ ও ষষ্ঠ খণ্ডে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই দুইটি আলোচনার পারস্পরিক সম্বন্ধ অতি নিকট এবং গুরুত্বও সমধিক। মানুষ কেন ভুল করে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি এই উপসংহারে উপনীত হন যে, প্রামাণিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা, স্বভাব, কুসংস্কার ও জ্ঞানের মিথ্যা অহঙ্কার মানুষের ভুলের প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬১৬) চারি আদর্শের সহিত রজার বেকনের এই চারিটি কারণের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না।

---

* *Roger Bacon Commemoration Essays,* edited by A. G. Little, Oxford, 1914—Paper on 'Gunpowder' by Col. H. W. L. Hime.

বেকনের পরীক্ষার আদর্শের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা গ্রন্থে তাঁহার এই আদর্শের আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিজের পরীক্ষা-গুলিতে যতই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকুক, তাঁহার নানা মন্তব্যে ও সমালোচনায় যতই অসঙ্গতি, দুর্বলতা ও পরস্পর-বিরোধী মতবাদের বাহুল্য থাকুক, পরীক্ষার আদর্শের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠার নড় চড় দেখা যায় না। এইখানেই বেকনের শ্রেষ্ঠত্ব। রেণেশাঁসের পর গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের হাতে এই আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁহাদের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে ইউরোপের বিজ্ঞান-সাধনা যখন পণ্ডিতীয় মনোভাব ও আর্ষপ্রয়োগের জালে আবদ্ধ, বেকন বিজ্ঞানকে এই বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার প্রথম স্বপ্ন দেখেন। এজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে রজার বেকন অবিস্মরণীয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পরীক্ষার স্থান ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বেকন ঠিক কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যে কোন প্রকার গবেষণায় অগ্রসর হইতে হইলে এক প্রকার বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য। যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী প্রকৃতির রহস্য-ভেদের সুমহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস থাকা চাই যে, প্রকৃতিকে জানা সম্ভবপর এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিবার উপায় বর্তমান। এই বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার পক্ষে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সম্পাদনের উপযোগী যান্ত্রিক বিদ্যায় ও নানা কৌশলে ও টেক্‌নিকে সমৃদ্ধ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হইল প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতের নানা ঘটনা 'কি ভাবে' ঘটিয়া থাকে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা। 'কি ভাবে' ঘটে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান আয়ত্ত হইলে বিজ্ঞানী তখন চেষ্টা করেন 'কেন' এইরূপ ঘটিতেছে তাহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করিতে। কিন্তু মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি ঠিক ইহার উল্টাটি ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির অভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র বিশেষ পরিমিত থাকায় বস্তুজগতে ঘটনাবলী 'কি ভাবে' সংঘটিত হয় তাহা নির্ণয়ে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ অক্ষম ছিলেন। এমত অবস্থায় যুক্তি-তর্কের শরণাপন্ন হইয়া ঘটনা 'কেন' ঘটে তাহা চিন্তা করা ও সে সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা ও মতবাদের কাঠামো রচনা করা ছাড়া বিজ্ঞানীর গত্যন্তর ছিল না। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দুর্বলতার জন্য বস্তুর বিচিত্র ব্যবহার ও স্বভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য মনে হওয়ায় তাঁহারা বাধ্য হইয়াই প্রচার করেন যে, প্রকৃতির কার্যকলাপ উদ্দেশ্যহীন নহে, প্রকৃতি বৃথা কোন কাজ করে না, 'Natura nihil facit frusta'। বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যে পরগাছাটি বাড়িয়া উঠে তাহারও একটি উদ্দেশ্য আছে, একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে প্রকারান্তরে বৃক্ষকে সাহায্য করে, পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদের সহিত তাহার এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে, বড়দিনের উৎসবে গৃহসজ্জার কাজে এই পরগাছার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির রাজ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ও সহায়তার সম্ভবতঃ এক প্রতীকস্বরূপ এই পরগাছা! ইহা পরগাছার অস্তিত্বের মনগড়া কারণ-নির্দেশ মাত্র, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা ইহার স্বভাব ও ব্যবহার প্রণিধান করিবার চেষ্টা নহে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা নূতন তথ্য ও জ্ঞানলাভ যদি সম্ভবপর না হয়, তবে কি ভাবে এই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইবে? মধ্যযুগীয় পণ্ডিতেরা বলিতেন, মনীষী ব্যক্তিরা ঐশ্বরিক অনুগ্রহে অন্তর্দৃষ্টিবলে মাঝে মাঝে এই জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, ইহা আপনা হইতেই তাঁহাদের মনে উদয় হয়, ইহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেই হইবে।

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ যে জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায় বেকন নিজেও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে ইহা একমাত্র পন্থা নহে; প্রাকৃতিক দর্শন ও গণিতের মাধ্যমেও জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। ইহার পর বেকন যোজনা করেন তাঁহার নিজস্ব মতবাদ এবং ইহাই সর্বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ, প্রাকৃতিক দর্শন ও গণিতের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও সেই জ্ঞান যে অভ্রান্ত তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? বেকন বলিলেন, একমাত্র পরীক্ষার কষ্টিপাথরে

এই জ্ঞানের অভ্রান্ততা যাচাই করা যায়। শুধু তাহাই নহে, বাস্তব অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জ্ঞানকেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণে পরীক্ষার প্রয়োজন, ইহার সপক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন থাকা চাই, নচেৎ যত বড় পণ্ডিত যত বড় জ্ঞানের কথাই বলুন না কেন তাহার কোন মূল্যে নাই। বেকনের এই অভিমত আমরা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি* :—

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ
প্রাকৃতিক দর্শন বা } ⟶ পরীক্ষা ⟶ নিশ্চয়তা
গণিতের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান (বাস্তব অভিজ্ঞতা)
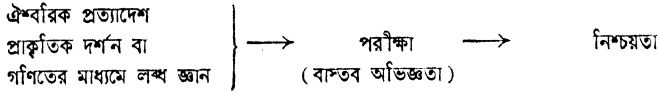
বেকনের সময়ে ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ বাধে নাই। ফ্রান্সিসকানদের হাতে তাঁহার নানা লাঞ্ছনা ও দুর্দশা ভোগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি দায়ী। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সমালোচনা এবং ফ্রান্সিসকান প্রধানদের কার্যের নিন্দা করিয়া তিনি নিজেই উপদ্রব ডাকিয়া আনেন। তাহার ফলে কি ধর্মসংস্থায় কি বিদ্যৎসমাজে উচ্চপদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভে তিনি বঞ্চিত হন। পোপ চতুর্থ ক্লিমেণ্ট তাঁহার জীবনের মোড় অনেকটা ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলে বেকন তাঁহার দীর্ঘ গবেষণা ও চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। লোকচক্ষুতে তিনি হয়ত এক সাধারণ যাদুকর ও কিমিয়াবিদ হিসাবেই থাকিয়া যাইতেন, তাঁহার উর্বর ও স্বকীয় মনের পরিচয় হয়ত চিরকালের জন্য চাপা পড়িয়া যাইত।

৮·৫। সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪)

পণ্ডিতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ও সমগ্র মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দার্শনিক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের আলোচনার যথার্থ স্থান ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে। কিন্তু সে যুগে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। বিজ্ঞান তখন ছিল একান্তই দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানের জীবন স্পন্দিত হইত। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের স্বরূপকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করিলেও মোটামুটিভাবে তাহার অধোগতি, অগ্রগতি বা প্রসার প্রচলিত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বীয় মতবাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হইয়াছে। এজন্য মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের প্রভাব বড় সামান্য নহে। নিছক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রোসেটেস্ট, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস বা রজার বেকনের মত অ্যাকুইনাসের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান না থাকিলেও বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতে তাঁহার রুচি ছিল এবং এই দুই বিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার বেকনের সমতুল্য না হইলেও তাঁহার শিক্ষক ও গুরু অ্যালবার্টাসের অপেক্ষা বেশী ছিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সহিত অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের সমন্বয়-সাধন : কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে অ্যাকুইনাসের গুরুত্ব অন্য কারণে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অ্যারিষ্টটলীয় দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নূতন জ্ঞান ও উৎসাহ ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে অ্যাকুইনাসের রচনাবলীর মধ্যে। অ্যাকুইনাস অ্যারিষ্টটলের দ্বারা

* Stewart Easton, *Roger Bacon and his Search for Universal Science*, Oxford, 1952, p. 176.

সম্পূর্ণ অভিভূত। সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর এই অলোক-সামান্য গ্রীক মহামনীষী যে চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে অ্যাকুইনাসের বিন্দু মাত্র সংশয় ছিল না। তাঁহার মতে অ্যারিস্টটলই হইলেন সকল জ্ঞানের উৎস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও দর্শন চর্চার একমাত্র লক্ষ্য হয় খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সহিত অ্যারিস্টটলীয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা। অ্যাকুইনাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয় *Summa theologica* ও *Summa philosophica contra gentiles* এই সমন্বয়-সাধনের অপূর্ব প্রয়াস। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এক দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যজনক বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এবং মূলতঃ এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত খ্রীষ্টধর্মের আদি-প্রচারকেরা জড়, প্রাণী, মানুষ ও বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানের সন্ধান দিয়া আসিয়াছিল। অন্যদিকে কোন প্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া শুধু প্রজ্ঞার দ্বারা, যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির দ্বারা প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ প্রাচীন অখ্রীষ্টীয় গ্রীক দার্শনিকগণ জড়, প্রাণী, মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারাই হোক, অথবা প্রজ্ঞার দ্বারাই হোক, এই দ্বিবিধ উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সত্যকার কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ থাকা উচিত নয়; কারণ শেষ পর্যন্ত সকল জ্ঞানের উৎসই ভগবান। সুতরাং ধর্মের সহিত দর্শনের সামঞ্জস্য-বিধান সর্বতোভাবে সম্ভবপর। অ্যাকুইনাসের পূর্বে এরিগেনা, আনসেল্ম প্রমুখ খ্রীষ্টীয় দার্শনিক-গণ নিও-প্লেটোনিজ্‌মের মরমীবাদের ভিত্তিতে এই সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ট্রিনিটি বা ত্রিতয় ও ভগবানের অবতারবাদের মরমীবাদী ব্যাখ্যায় ইহাঁরা যথেষ্ট রচনা-চাতুর্য দেখাইয়াছেন। অ্যারিস্টটল-পন্থী যুক্তিবাদী অ্যাকুইনাস দেখাইলেন, এইসব মৌলিক রহস্যের সমাধান যুক্তিসাপেক্ষ নহে, যদিও যুক্তির সাহায্যে ইহা অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টায় কোন বাধা নাই। তিনি সুকৌশলে এই সকল বিষয় দর্শনের আওতা হইতে পৃথক করিয়া বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত করেন।

অ্যাকুইনাস প্রধানতঃ অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র, সিলজিস্‌ম্‌ ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার দর্শনের কাঠামো রচনা করেন। আত্মপ্রত্যয়জাত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চিরন্তন ও অভ্রান্ত সত্য ধরিয়া লইয়া যুক্তি তর্কের দ্বারা অন্যান্য সকল বিষয়ের মীমাংসায় তিনি প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পরিকল্পনায় মানুষই হইল সৃষ্টির কেন্দ্র ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সুতরাং জড়, ইতর, প্রাণী ও বিশ্বচরাচরের অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল; মনুষ্য সৃষ্টিকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এইসব শেষোক্ত সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রণিধান করিতে হইবে মানুষের অনুভূতি ও তাহার বিচিত্র মানসিক জটিলতার মাধ্যমে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভূকেন্দ্রীয় বিশ্ব-পরিকল্পনা অপরিহার্য। সৃষ্টির কেন্দ্রই যখন মানুষ তখন তাহার আবাসভূমি পৃথিবী অকাট্য যুক্তিতে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থল হইতে বাধ্য। এইভাবে ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা টমিস্ট দর্শনের (সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদকে 'টমিজ্‌ম্‌', বা 'টমিস্ট' দর্শন বলা হয়) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, অ্যাকুইনাস নিজে টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ সমর্থন করিয়াছিলেন কার্যকরী একটি মতবাদ হিসাবে মাত্র—"non est demonstratio sed suppositio quaedam"। এজন্য তাঁহাকে এই সম্বন্ধে সাবধানে মতামত ব্যক্ত করিতে দেখা যায়।* টমিজ্‌মের সহিত ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইবার দায়িত্ব অ্যাকুইনাসের শিষ্যবর্গের।

অ্যারিস্টটলীয় মতের সহিত প্রধান বিরোধ : অ্যাকুইনাস অ্যারিস্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে পুরোপুরি গ্রহণ করিয়াও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার সহিত আপোষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। অ্যারিস্টটলের মতে বিশ্ব ও বস্তুজগৎ নিত্য ও শাশ্বত, অনাদিকাল হইতে

* William Cecil Dampier, *A History of Science*, p. 88.

বিদ্যমান। তারপর আত্মা ও দেহ একই বস্তু; সুতরাং দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসারে কালচক্রে বস্তু ও বিশ্বজগতের একদা সৃষ্টি হইয়াছিল; বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করিতে গেলে সৃষ্টি-পরিকল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। আত্মার নশ্বরত্ব সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের মতবাদ অ্যাকুইনাসকে আরও বেশী বিব্রত করে। ইহা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অ্যারিষ্টটল শিক্ষা দেন যে, আত্মা ও দেহ একই বস্তু হইতে উদ্ভূত এবং আত্মা দেহবস্তুর আকৃতি বিশেষ (form)! মৃত্যুতে বস্তু ও তাহার আকৃতির বিনাশপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিরও চিরকালের জন্য বিনাশ ঘটে।

অ্যাকুইনাস ও ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ : আমরা দেখিয়াছি, অ্যাকুইনাসের পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ইব্‌ন্ রুস্‌দ্ বা আভেরস্ (১১২৬-১১৯৮) অ্যারিষ্টটলের এইরূপ দার্শনিক মতবাদ সমর্থন করিয়া বস্তুর নিত্যতা ও ব্যক্তিগত আত্মার নশ্বরতা প্রচার করেন। তাঁহার মতে বস্তু নিত্য এবং সৃষ্টিবাদ সর্বৈব মিথ্যা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সুসংবদ্ধ নীতি ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। ইহার একটি নীতি হইল সক্রিয় বুদ্ধি (Active Intelligence)। এই বুদ্ধি মানুষের সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে ক্রমাগত প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃতপক্ষে অবিনশ্বর। মানুষের আত্মা এই সক্রিয় বুদ্ধির বা চেতনার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; সাময়িকভাবে মূল উৎস হইতে এই বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া জড়দেহকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলে; মৃত্যুতে এই চেতনা আবার মূল উৎসে গিয়া মিলিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে আত্মার কোন স্বাধীন সত্তা বা অমরত্ব নাই। জীবিতাবস্থায় ইহার যেসব অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে, দেহান্তরের পর এইরূপ কোন অভিজ্ঞতা আত্মার থাকা অসম্ভব। ইহা তখন সর্বপ্রকার স্মৃতি বা অনুভূতির বহির্ভূত। এইরূপ অবস্থায় আত্মার পুরস্কার বা শাস্তির প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিষ্টটলপন্থী আভেরসের সুচিন্তিত ও যুক্তিবাদী দর্শন খ্রীষ্টান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকদের রীতিমত শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজে আভেরসের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মাইকেল স্কট টলেডো হইতে আভেরসের গ্রন্থাবলীর তর্জমা সিসিলিতে আনিবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার ও সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের চেষ্টায় আভেরসের দর্শন ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গোঁড়া অধিনায়করা ইহাতে যে শঙ্কিত হইয়া উঠিবে তাহা বলা বাহুল্য এবং আভেরইজ্‌মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে খ্রীষ্টানরাও চেষ্টার কসুর করে নাই। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে ধর্মযাজকদের এক প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধিবেশনে আভেরইজ্‌মের চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়; ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে তাঁহার অধিবিদ্যা (metaphysics) সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির উপর প্রযুক্ত হয় এবং ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং পোপের নির্দেশে আভেরসের গ্রন্থপাঠ সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু বলপ্রয়োগে কোন দার্শনিক মতবাদের প্রচার বন্ধ করা এক জিনিস এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া সেই মতবাদের প্রচার আপনা হইতেই সঙ্কুচিত করা আর এক জিনিস। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা সর্বদাই দুর্বল; শেষোক্তটি সম্ভবপর না হওয়া পর্যন্ত চিরস্থায়ী ফললাভের আশা বৃথা। এই কারণেই সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস কোমর বাঁধিয়া আভেরইজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আভেরস অ্যারিষ্টটলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁহার দর্শনের বুনিয়াদ গড়িয়াছিলেন। অ্যাকুইনাসও ঠিক সেই পন্থাই অবলম্বন করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্যক্তিগত আত্মার অবিনশ্বরত্ববাদ অটুট রাখিয়া তিনি অ্যারিষ্টটলের বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা মতবাদের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মূল উপদেশ ও ধারণার সঙ্গতি বজায় রাখিলেন। সুতরাং যুক্তিতর্কের বিচারে খ্রীষ্টানদের পক্ষে আভেরইজ্‌মকে ঠেকানো এখন অনেক সহজ হইল। কোন কোন উৎসাহী টমিষ্ট দার্শনিক এ কথাও বলিয়াছেন যে, অ্যাকুইনাস এইভাবে আভেরইজ্‌মকে নিরস্ত্র করিয়া খ্রীষ্টধর্মকে মুসলিম পাণ্ডিত্যের নিকট নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন।

প্রথম প্রথম খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে টমিজ্‌ম্‌-বিরোধী পণ্ডিতদের অবশ্য অভাব ছিল না। অ্যারিষ্টটলের উপর গুরুত্ব আরোপই ছিল এইসব পণ্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান কারণ। অ্যাকুইনাসের জীবিতকালেই প্যারীর বিশপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি অনুসারে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মতবাদের বিরাট সম্ভাবনার কথা প্রধানরা বুঝিতে পারে এবং ধর্মতত্ত্বের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় তাঁহার প্রচেষ্টা সত্যই যে অতুলনীয়, সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে আরম্ভ করে। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেণ্টে বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের এক অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে বেদীর উপর পবিত্র বাইবেলের পাশে *Summa theologica*-র একটি প্রতিলিপি সংরক্ষিত হয়। পোপ পঞ্চম পায়াস্‌ (১৫৬৬-৭২) অ্যাকুইনাসকে সমগ্র খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার পঞ্চম শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে অভিহিত করেন—অপর চারিজন হইলেন অ্যাম্ব্রোজ, অগাস্টিন, জেরোম ও গ্রেগরি।

বিজ্ঞানে অ্যাকুইনাসের প্রভাব : অ্যাকুইনাসের দার্শনিক প্রতিভার স্পর্শে খ্রীষ্টধর্ম উপকৃত হইলেও বিজ্ঞান তাঁহার প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়। যুক্তিবাদের দ্বারা সুনিপুণ-ভাবে টমিষ্ট দার্শনিকেরা বিজ্ঞানকে এমন কঠিনভাবেই বাঁধিয়া ফেলিলেন যে, তাহার আর নড়িবার চড়িবার উপায় বা পৃথক সত্তা বলিয়া কিছু রহিল না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, অ্যারিষ্টটলীয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধতা করিবার অর্থই হইল সমগ্র খ্রীষ্টীয় দর্শনের ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা করা। বিজ্ঞানীর পক্ষে, প্রকৃত সত্য-সন্ধানীর পক্ষে ইহা বড় অস্বস্তিকর অবস্থা। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া এই কাঠামোর অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নানা বিতর্কের ও সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কায় পণ্ডিতরা প্রথম হইতেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধতায় যত্নবান হইলেন। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম ও নীতির বশবর্তী; প্রাচীনকালের মনীষী, দার্শনিক ও সর্বোপরি খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া সংঘটিত ঘটনাপরম্পরার বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই নিয়ম ও নীতিগুলির স্বরূপ সর্বকালের জন্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; বিজ্ঞানের রাজ্যে ইহার পর যাহা ঘটিবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির সহিত সংহতি রক্ষা করিবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার সহিত একান্তভাবে খাপ খাইবে। বিজ্ঞানে নূতন তথ্য আবিষ্কারের যে সম্ভাবনা নাই তাহা নহে; তবে এইসব আবিষ্কারের উদ্দেশ্যই হইবে পূর্বোক্ত শাশ্বত ও অভ্রান্ত নীতিগুলির নূতন সমর্থন জোগানো ও নূতনভাবে তাহাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা। এই বিশ্বাস লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইলে বিজ্ঞানীর সকল প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র এবং পদে পদে তাহাকে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বরণ করিতে হইবে। এ, এন, হোয়াইটহেড তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Science and the Modern World*-এ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, "—Every detailed occurrence can be co-related with its antecedents in a perfectly definite manner, exemplifying general principles. Without this belief the incredible labours of scientists would be without hope." এইরূপ আপোষহীন পণ্ডিতীয় মনোভাবের প্রধান উদ্যোক্তা সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস খ্রীষ্টীয় ধর্মদর্শনের বুনিয়াদ যত পাকা করিয়াই গড়িয়া থাকুন না কেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ সঙ্কুচিত করিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করিলেন। প্রায় দুই শত বৎসর এই পণ্ডিতীয় মনোভাবের জগদ্দল পাষাণ ভারে বিজ্ঞানের আর কোন নূতন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এই আবহাওয়ায় রজার বেকনের সুর বেসুরে বাজিয়াছিল এবং তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে উপহাসের পাত্র হইতে এবং কর্তৃপক্ষের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

৮·৬। ডান্স্ স্কোটাস, উইলিয়াম অব ওকাম প্রমুখ দার্শনিকগণ কর্তৃক পাণ্ডিতীয় মনোভাবের সমালোচনা

সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের এইরূপ পাণ্ডিতীয় মনোভাব, সর্বোপরি ধর্মের সহিত দর্শনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার প্রয়াসের বিরুদ্ধে রজার বেকন কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বেকনের সমালোচনা সমসময়ে তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর একজন ইংরেজ ফ্রান্সিসকান ডান্স্ স্কোটাস (১২৬৫-১৩০৮) টমিজ্মের বিরুদ্ধে সমালোচনায় অবতীর্ণ হইলে পণ্ডিত মহলে এই লইয়া আর এক দফা বাক্‌বিতণ্ডার ঝড় উত্থিত হয়। স্কোটাস অক্সফোর্ড ও প্যারীতে অধ্যাপনা করেন এবং বিচক্ষণ দার্শনিক হিসাবে তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ধর্মতত্ত্ব হইতে দর্শনকে পৃথক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বগুলি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী রচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বাহিরে মানুষেরও ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য (free-will) বলিয়া একটা জিনিস আছে যাহা যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে। ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া স্কোটাস মানুষের ব্যক্তিত্বের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। পাণ্ডিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যক্তিত্বকেই সব দিক দিয়া খর্ব করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তারপর স্কোটাস দেখান যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইতে উদ্ভূত ধর্মতত্ত্বের সহিত মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও তাহার উদ্ভাবিত ন্যায় ও দর্শনকে এক সুরে গ্রথিত করিয়া মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য এক স্বয়ংসম্পূর্ণ যুক্তিবাদী ধর্মদর্শনের অভ্রভেদী কাঠামো-রচনার প্রয়াস নিতান্তই অবাস্তব।

পাণ্ডিতীয় যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আরও জোরাল ভাষায় আক্রমণ পরিচালনা করেন উইলিয়াম অব ওকাম (১২৯৫-১৩৪৯)। ওকামের বিচারে কোন ধর্মীয় মত বা অনুশাসনকেই যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না, ইহা বিশ্বাসের এলাকাভুক্ত। একমাত্র দর্শনের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে যুক্তিতর্কের সার্থক প্রয়োগ সম্ভবপর। ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে যুক্তি খাটাইতে গিয়া পণ্ডিতরা একের পর এক কতকগুলি বিমূর্ত ভাবের (abstract idea) অবতারণা করিয়া বিষয়টিকে অনাবশ্যকভাবে কেবল জটিলতর করিয়া তোলেন। অতি সুন্দরভাবে অল্প কয়েকটি কথার দ্বারা এই মত ব্যক্ত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem,'—অর্থাৎ 'অহেতুক কতকগুলি সত্তা বাড়াইয়া লাভ নাই', অথবা 'অল্পে যাহা হয় বেশীর দ্বারা তাহা করিতে যাওয়া মূঢ়তা'। ইহাকে অনেক সময় 'ওকামের ক্ষুর' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ তাঁহার এই যুক্তি ছিল ক্ষুরের মতই তীক্ষ্ণধার। ইহার দ্বারা তিনি সেণ্ট টমাসের যুক্তিকেই যে শুধু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার চেষ্টা করেন তাহা নহে, একবার স্বয়ং পোপের সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে পর্যন্ত আক্রমণ করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন। ফলে পবিত্র ধর্মসংস্থার বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে তাঁহাকে আভিনোতে কিছুদিন বন্দিজীবন যাপন করিতে হয়। ইহার পরিণাম হয়ত আরও শোচনীয় হইত, তবে তিনি বন্দিশালা হইতে পলাইয়া ব্যাভেরিয়ার সম্রাট লুই-এর আশ্রয়ে আসিয়া কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া যান।

ওকাম অ্যারিস্টটল-প্রস্তাবিত পদার্থের গতিবাদেরও তীব্র সমালোচক ছিলেন। গতির ব্যাখ্যাকল্পে তিনি এক বিকল্প মতবাদ প্রস্তাব করেন; এই মতবাদের নাম 'প্ররোচনাবাদ' (Impetus Theory)। জাঁ বুরিদাঁ, অ্যালবার্ট অব স্যাক্সনি, নিকোলাস ওরেজ্‌ম, নিকোলাস অব কুসা প্রমুখ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানিগণ গতির প্ররোচনাবাদের আরও উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে অ্যারিস্টটলের মতবাদের পরিবর্তে চালু করিবার চেষ্টা করেন। সে কথা পরে আলোচিত হইবে। এই দার্শনিকগণ উপরিউক্ত পাণ্ডিতীয় মনোভাবেরও তীব্র সমালোচক ছিলেন। ডান্স্ স্কোটাস ও ওকামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারাও পণ্ডিতদের অসার যুক্তিতর্ক ও কথার কচকচির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লেখনী চালনা করেন। ইঁহাদের রচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নিষ্ফল পাণ্ডিতীয় যুগের অবসান ঘটিতে আর বিলম্ব নাই।

নবম অধ্যায়

৯। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত ল্যাটিন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নানা গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল স্কট, রজার বেকন, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের শুধু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌ বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হইবে। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস সে যুগের শ্রেষ্ঠ জীববিদ্‌ ও প্রাণিবিদ্‌ ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও তাঁহার অবদান বড় সামান্য নহে। এই কারণে সর্ববিদ্যাবিশারদ এইসব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের আলোচনা পৃথকভাবে না করিয়া উপায় নাই। অধিকন্তু ইঁহারা ছিলেন পণ্ডিতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। ইউরোপীয় মননশীলতার ইতিহাসে তাঁহারা এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের তিরোধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগের অবসান ঘটে।

তথাপি এই যুগে এমন সব পণ্ডিতও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগ বাছিয়া লইয়া তৎসংক্রান্ত গবেষণায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। উইলিয়ম অব সলিসেটো, থেডিয়াস অব ফ্লোরেন্স, অঁরি দ্য মঁদ্‌ভিল, মন্দিনো দি লুজ্‌জি, গি দ্য শোলিয়াক প্রমুখ ব্যক্তিগণ শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানেই পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। লিওনার্দো অব পিসা বা ফিবোনাচ্চির ও জোর্দানাস নেমোরারিয়াসের খ্যাতি শুধু গাণিতিক পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য। আর্নাল্ড অব ভিল্লানোভা ও রেমণ্ড লুলি ছিলেন প্রধানতঃ কিমিয়াবিশারদ। এই যুগে পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ পর্যটক উইলিয়ম অব রুব্রুকি ও মার্কো পোলো। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এইসব বিজ্ঞানীদের কয়েকজনের অবদানের কথা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

৯·১ চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যা

আমরা সালের্ণো, বোলোনা ও মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগের তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ্‌দের প্রায় প্রত্যেকেই এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন না কোন একটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোলোনায় ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ সময় হইতেই আমরা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে একটি ফ্যাকাল্টি বা চিকিৎসা-বিভাগ স্থাপিত দেখিতে পাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে প্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক উইলিয়ম অব সলিসেটোর তৎপরতায় বোলোনা শল্য-চিকিৎসা ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করে।

উইলিয়ম অব সলিসেটো (১২১০-৮০)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ, চিকিৎসক উইলিয়ম অব সলিসেটোর জন্ম হয় পিয়াসেন্‌জার নিকট সলিসেটো নামক স্থানে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বোলোনায় চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। ১২৭১-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি শল্য-

চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Cyrurgia* রচনা করেন; সাধারণ চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার *Summa conservationis et curationis* গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত *Cyrurgia*-য় দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতজনিত নানা ধরনের ক্ষত ও অস্থিভঙ্গ এবং এইসব ক্ষত ও অস্থিভঙ্গের অস্ত্রোপচার-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইতালীয়, ইংরেজী, ফরাসী, বোহেমীয়, হিব্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় *Cyrurgia*-র অনুবাদ নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে সলিসেটোর অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ নরদেহ-ব্যবচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তবে তাঁহার গ্রন্থে নরদেহ-ব্যবচ্ছেদের একাধিক উল্লেখ আছে। *Summa conservationis* গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় প্রধানতঃ হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, আল্‌-রাজি ও ইব্‌ন্‌ সিনা হইতে গৃহীত। তাঁহার এই গ্রন্থপাঠে মনে হয়, সলিসেটো শুধু একজন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসকই ছিলেন না, সাধারণ চিকিৎসাতেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

থেডিয়াস অব ফ্লোরেন্স (১২২৩-১৩০৩)

সলিসেটোর সমসাময়িক ফ্লোরেন্সনিবাসী থেডিয়াস,—তাঁহার আসল ফ্লোরেণ্টাইন নাম তাদ্‌দিও আল্‌দেরোত্তি, বোলোনার আর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ্‌ ও শল্যচিকিৎসক। তিনি গ্রীক চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থের আরবী সংস্করণের পরিবর্তে সরাসরি মূল গ্রীক সংস্করণ হইতে ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েকটি গ্রীক চিকিৎসা-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট ল্যাটিন তর্জমাও প্রস্তুত হইয়াছিল। বোলোনায় নর-দেহ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনায় তিনি পণ্ডিতীয় বিতর্কমূলক পদ্ধতির প্রবর্তক। ইহাতে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায় এবং ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই বিজ্ঞানের যে বিশেষ কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না তাহার জন্য এই নিষ্ফল পণ্ডিতীয় বিতর্কমূলক পদ্ধতি অনেকাংশে দায়ী। সেই দিক দিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে থেডিয়াসের প্রভাব মোটেই শুভ হয় নাই। অঁরি দ্য মদ্‌ভিল, মন্‌দিনো দি লুজ্‌জি প্রমুখ চিকিৎসাবিদ্‌গণ থেডিয়াসের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

লাঁ ফ্রাঞ্চি (মৃত্যু-১৩০৬)

ইতালীয় শল্যচিকিৎসক ও ফ্রান্সে শল্যচিকিসার প্রবর্তক লাঁ ফ্রাঞ্চির জন্ম মিলানে। তিনি উইলিয়ম অব সলিসেটোর শিষ্য ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বোলোনায় অধ্যয়ন করেন। ১২৯০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মিলানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ঐ বৎসর কোন কারণে ইতালী হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং প্রথমে লিয়োঁ ও পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক সহরে কিছুকাল কাটাইবার পর প্যারীতে আসেন আনুমানিক ১২৯৫ খৃীষ্টাব্দে। *Chirurgia parva* ও ***Chirurgia magna*** তাঁহার শল্যচিকিৎসার দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শল্য-চিকিৎসায় শুধু অস্ত্রোপচার-কৌশল ছাড়া সাধারণভাবে নানা রোগ ও তাহাদের চিকিৎসা-পদ্ধতির সহিত শল্যচিকিৎসকের যে পরিচয় থাকা আবশ্যক ইহা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং এ বিষয়ে ফরাসী চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরাসী অস্ত্রচিকিৎসকদের তখন ধারণা ছিল, শুধু ছুরি চালাইলেই কর্তব্য শেষ হইল। এজন্য ইউরোপীয় শল্য-চিকিৎসকদের আসরে ফরাসীদের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। শল্যচিকিৎসকদের যে ভাল চিকিৎসকও হওয়া প্রয়োজন এই কথা প্রচার করিয়া লাঁ ফ্রাঞ্চি ফরাসী শল্যচিকিৎসার মান উন্নয়ন করেন।

*Chirurgia magna*তে তিনি অস্ত্রোপচারের সংজ্ঞা, অস্ত্রচিকিৎসকের প্রয়োজনীয় কি কি গুণ থাকা উচিৎ, দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন, শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠ, চর্ম প্রভৃতির রোগ, হার্নিয়া, নানাবিধ যৌনরোগ ও জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। মস্তিষ্কের আকস্মিক আঘাতজনিত পীড়া, করোটি-ভঙ্গের (fracture of the skull)লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের অতি চমৎকার বর্ণনা ও আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত হয় এবং ল্যাটিনভাষী দেশের বাহিরেও ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে।

অঁরি দ্য মদ্ভিল (১২৭০-১৩২০)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য এক নর্মান বিদ্যার্থী বোলোনায় আসেন। এই নর্মান ছাত্রটির নাম অঁরি দ্য মদ্ভিল। নানা স্থান পরিভ্রমণের পর তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং এইখানেই স্থায়ীভাবে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যাপনার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শল্যচিকিৎসা, শারীরস্থান প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যার নানা বিভাগে বোলোনার বৈশিষ্ট্য ও উন্নত জ্ঞান তিনি মঁপেলিয়েতে প্রবর্তন করেন। ফ্লোরেন্টাইন চিকিৎসক থেডিয়াসের রচনা হইতে তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মন্দিনো দি লুজ্জি ছিলেন তাঁহার সতীর্থ।

মন্দিনো দি লুজ্জি (১২৭০-১৩২৬)

মদ্ভিলের অপেক্ষা তাঁহার সতীর্থ মন্দিনো দি লুজ্জি ছিলেন অধিকতর প্রতিভাবান চিকিৎসাবিদ্। শারীরস্থান বা অ্যানাটমি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ অতি উচ্চ পর্যায়ের। মন্দিনোর গবেষণার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এই যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে ও নিজহস্তে শব-ব্যবচ্ছেদ করিতেন এবং এইভাবেই তিনি শারীরস্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

মধ্যযুগে চিকিৎসক ও অধ্যাপকের পক্ষে স্বহস্তে এরূপ শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যাপার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দিনোর সময় হইতেই ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে ইহা শারীরস্থান সম্বন্ধীয় শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালের অধ্যাপকগণ পদমর্যাদার খাতিরে ক্রমশঃ স্বহস্তে নরদেহ বা প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ-কার্যকে হীন কর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ইহা হইতে বিরত হন। তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-গৃহের উচ্চাসনে বসিয়া প্রামাণিক পুঁথি হইতে শব-ব্যবচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী একজন সহকারী দেহের কোন কোন স্থান কাটিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলে নিম্নশ্রেণীর এক কর্মচারী তখন প্রকৃত ব্যবচ্ছেদ-কার্যটি সম্পন্ন করিত। এইভাবে শব-ব্যবচ্ছেদজনিত মূল্যবান বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে পুঁথিগত বিদ্যার পাণ্ডিত্য সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িলে শারীরস্থান সম্বন্ধীয় নূতন তথ্যের আবিষ্কার ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ এইরূপ পরিণতির আশঙ্কা করিয়াই মন্দিনো স্বহস্তে ছুরিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইলে অ্যানাটমির যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহকে হয়ত ষোড়শ শতাব্দীর ভেসালিয়াসের কাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করিতে হইত না। এজন্যই মন্দিনোর গবেষণা ও পরীক্ষা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ। "He (Mondino) took the first and perhaps the greatest step. It was two centuries and more before the next step was taken."*

* Charles Singer, *A Short History of Medicine*, p. 76.

মন্‌দিনো দি লুজ্‌জির পূর্বে ল্যাটিন চিকিৎসাবিদ্‌রা শারীরস্থানকে একটি পৃথক বিষয়-রূপে আলোচনা করিতেন না, শল্যচিকিৎসার অংগ হিসাবে ইহা উল্লিখিত হইত। লুজ্‌জি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে শুধু শারীরস্থানের উপর তিনি এক গ্রন্থ, *Anatomia Mundini*, প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ ইহা আধুনিক অ্যানাটমির প্রথম গ্রন্থ।
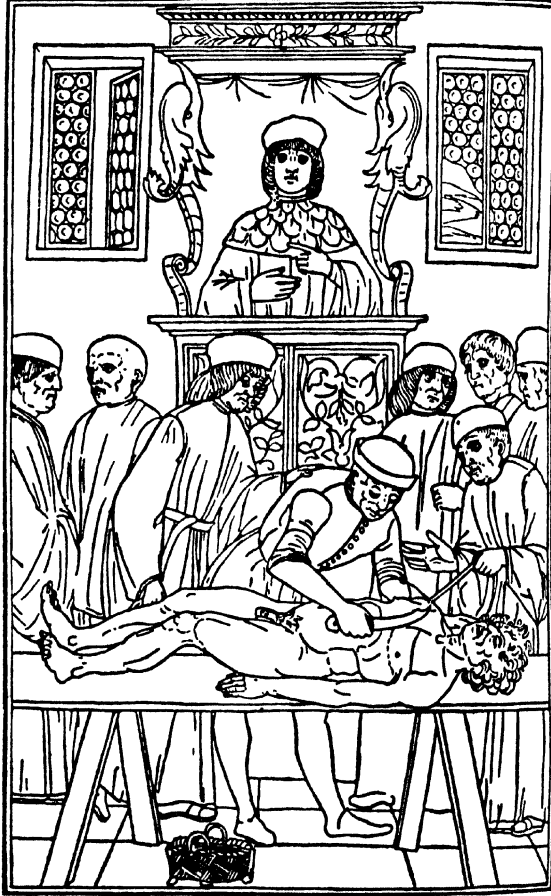
৩৫। উচ্চাসনে উপবিষ্ট অধ্যাপকের নির্দেশক্রমে নিম্নশ্রেণীর এক কর্মচারী শব-ব্যবচ্ছেদ করিতেছে।

লুজ্‌জি আরব্য চিকিৎসাবিদ্‌দের শারীরস্থান সম্বন্ধীয় রচনার সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন; এজন্য তাঁহার গ্রন্থে আরব্য চিকিৎসাবিদ্যার অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। অবশ্য তাঁহার নিজস্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারাও এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ। শারীরস্থান *Anatomia*র প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও এই গ্রন্থে তিনি শারীরবৃত্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন চিকিৎসা-ব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

গি দ্য শোলিয়াক (১৩০০-৬৮)

মধ্যযুগের আর একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক হইলেন গি দ্য শোলিয়াক। তিনি মংপেলিয়ে, বোলোনা ও প্যারীতে অধ্যয়ন করেন এবং মংপেলিয়ে ও আভিনোতে চিকিৎসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Great Surgery* মধ্যযুগে শল্য-চিকিৎসার প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইত। এই গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি বর্তমান।

শব-ব্যবচ্ছেদ

শব-ব্যবচ্ছেদের কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে এই সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যতদূর মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে শব-ব্যবচ্ছেদ চালু হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ইউরোপ বলিতেছি, কারণ গ্রীক প্রাধান্যের কালে ইউরোপে চিকিৎসা ব্যাপারে শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ছিল। হিপোক্রেটিস-সংগ্রহে শব-ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেক-জান্দ্রিয়ার হিরোফিলাস ও ইরাসিস্ট্রেটাস নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতেন। তবে রোমক আমল হইতেই আলেকজান্দ্রিয়ায় বা ইউরোপের অন্যান্য স্থানে নরদেহ-ব্যবচ্ছেদের কথা বড় একটা শুনা যায় না। গ্যালেনের সময় এইরূপ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল; এজন্য ইতর প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ হইতে তিনি তাঁহার অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্তের গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে আবার নরদেহ-ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় অবশ্য ঠিক শারীরস্থান সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োজন হইত না, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ণয় অথবা আদালতে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কালেভদ্রে শব-ব্যবচ্ছেদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইত। আইনের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বোলোনা বিশ্ব-বিদ্যালয় একান্ত স্বাভাবিক কারণেই এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছিল। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বোলোনায় শব-ব্যবচ্ছেদ সুরু হয়। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা একান্তই বিরল ছিল; চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মধ্যযুগে শব-ব্যবচ্ছেদ খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ এক ধারণা প্রচলিত আছে। ইহার স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ধর্মসংস্থা শব-ব্যবচ্ছেদ যে কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। পোপ অষ্টম বোনিফেস্ (১২৯৪-১৩০৩) এক আদেশ জারি করিয়া মৃতদেহ কর্তন ও তাহা সিদ্ধ করিয়া মাংস হইতে অস্থি পৃথক করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।* ধর্মযুদ্ধের সময় বিদেশে মৃত ব্যক্তিদের অস্থি স্বদেশে আনিয়া কবরস্থ করিবার জন্য এইরূপ প্রথার প্রবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিত বলিয়া পোপ উপরিউক্ত আদেশ জারি করিয়াছিলেন। তবে চিকিৎসা বা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যাপনার ব্যাপারে শব-ব্যবচ্ছেদ ধর্মসংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় নাই। এরূপ কোন নিষেধ না থাকিলেও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল এবং এখনও আছে। শব-ব্যবচ্ছেদজনিত কুসংস্কার শুধু খ্রীষ্টান কেন মুসলমান, ইহুদী, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিদের মধ্যেও প্রবল ছিল। এই কুসংস্কারের জন্য শল্যবিদ্যা ঘৃণ্য ও নীচ বৃত্তি হিসাবে বহুদিন পর্যন্ত পরিগণিত হইয়া আসিয়াছিল। মধ্যযুগে এবং তাহার পরেও শল্যবিদ্যার অনুন্নত অবস্থার জন্য এই কুসংস্কার অনেকটা দায়ী; ইহা দূর না হওয়া পর্যন্ত শল্যবিদ্যার উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

---

* Sarton, *Introduction*, Vol. II, p. 1082.

মধ্যযুগের হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য

হাসপাতালের উন্নতি ও সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব উপলব্ধি চিকিৎসাক্ষেত্রে মধ্যযুগের বিশিষ্ট অবদান। রোমক আমলের সুপ্রাচীন এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দির এবং 'ভেলিটুডিনারিয়া' বা এক ধরনের রুগ্নাগার হইতে হাসপাতালের উৎপত্তি।* মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ইউরোপ 'ভেলিটুডিনারিয়া'র পরিকল্পনাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানের উন্নত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ হইল আধুনিক হাসপাতাল। এই সময় 'hospite' বলিয়া একটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়; ইহার অর্থ 'তীর্থযাত্রী'। সেইরূপ 'hospitalia' শব্দের দ্বারা বুঝাইত 'অতিথিশালা'।† নামে অতিথিশালা হইলেও 'hospitalia'য় অতিথি ছাড়া অনাথ, বৃদ্ধ, অন্ধ ও অন্যভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরও স্থান দেওয়া হইত। কালসহকারে এই ধরনের 'hospitalia' হইতে আধুনিক হাসপাতালের উদ্ভব হয়।

রোমক আমলে জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থার যে উন্নতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম মধ্যযুগে তাহার প্রভূত অবনতি ঘটিয়াছিল। জলসরবরাহের অপর্যাপ্ততা ও সহরের ময়লা জল নিকাশের অব্যবস্থার ফলে পল্লী ও গৃহগুলি প্রায় সময়ই নোংরা ও অপরিষ্কার থাকিত; তারপর সঙ্কীর্ণ ও অল্পসংখ্যক দরজা জানালার জন্য গৃহগুলিও ছিল অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ও আলো-হাওয়ার সহিত সম্পর্কবিবর্জিত। সহরে কোন কঠিন সংক্রামক ব্যাধি একবার প্রবেশ করিলে তাহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তথাপি একটা বিষয়ে মধ্যযুগীয় জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রাচীন রোমক আমলের তুলনায় কিছুটা উন্নত ছিল। মহামারীর কারণ যে রোগ-সংক্রমণ এবং সংক্রমণ বন্ধ করিতে পারিলে মহামারীর কবল হইতে যে জনসাধারণকে রক্ষা করা যায়, এই সত্য উপলব্ধি ও তদুদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন আমরা প্রথম মধ্যযুগেই লক্ষ্য করি। প্রাচীনকালে সংক্রামক ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ ও গুরুত্ব এইভাবে উপলব্ধ হয় নাই।

খৃষ্টীয় শতকের প্রথমভাগে কুষ্ঠরোগ ধীরে ধীরে প্রথমে ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও পরে সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। এই ব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থার দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের জনসাধারণ হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা হয়। সাধারণের সহিত মেলামেশা ত দূরের কথা, গির্জায় পর্যন্ত তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন কোন উদারভাবাপন্ন গির্জায় তাহাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইলেও তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কোণ রক্ষিত থাকিত। আইনত কুষ্ঠরোগীকে প্রায় মৃত বলিয়া ধরা হইত; তাহার ছোঁয়াচ বন্ধ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কর্তৃপক্ষ এতটুকু শৈথিল্য প্রদর্শন করে নাই। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার আজ যতই নির্মম, অমানুষিক ও অন্যায় বলিয়া মনে হউক ইহার ফল শেষ পর্যন্ত শুভ হইয়াছিল। কয়েকশত বৎসরের মধ্যে এই রোগ ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। এককালে এক ফ্রান্সেই ২০,০০০ কুষ্ঠরোগী ছিল,—প্রায় ২০০ জনের মধ্যে একজন!

কুষ্ঠরোগের এরূপ প্রকোপ ও ব্যাপ্তি দেখিয়া মধ্যযুগের চিকিৎসাবিদ্‌দের ধারণা হইয়াছিল যে, ব্যাধিমাত্রই সংক্রামক। তবে সব ব্যাধিতেই কর্তৃপক্ষ রোগীদের পৃথক করিবার জন্য এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। কুষ্ঠরোগ ছাড়া আর যেসব রোগে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তন্মধ্যে প্লেগ, যক্ষ্মা, নেত্রবর্ত্মকলার রোগ (conjunctivitis) ও বিসর্প রোগ (erysipelas) উল্লেখযোগ্য। পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে আদেশ জারি করিয়া এইসব রোগীদের নগরের বাহিরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিত। তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইত, এমন কি সর্বসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত খাদ্য ও পানীয়ের বেচাকেনার

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১।
† Singer, *A Short History of Medicine*, p. 78.

জায়গায় তাহাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এরূপ কঠোর ব্যবস্থা বিধিবন্ধ থাকায় একাধিকবার নগর ও বন্দর বিশেষকে মহামারীর প্রকোপ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়। ১৩৭০ হইতে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইতালীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় সংক্রমিত ব্যক্তিদের নগর-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া ও নানাবিধ কঠোর ব্যবস্থার দ্বারা মিলান ও ভেনিস সহরকে এই মহামারীর হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভেনিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্বোপকূলে অবস্থিত রাগুসার সাধারণতন্ত্র প্লেগের আর এক উপদ্রবের সময় সহর-সংলগ্ন বন্দরে নবাগত যাত্রীদের অবতরণ নিষিদ্ধ করিয়া বন্দর হইতে বহু দূরে জাহাজ ভিড়াইবার সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এইখানে নবাগত যাত্রীদের ত্রিশ দিন কাটাইবার পর তবে সহরের অভিমুখে রওনা হইবার অনুমতি দেওয়া হইত। এই ত্রিশ দিনের ভিতর কাহারও মধ্যে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে তাহাকে আর সহরে যাইতে দেওয়া হইত না। ত্রিশ দিনের এই অপেক্ষা-কালকে বলা হইত 'trentina'। শেষে দেখা গেল এই অপেক্ষা-কালও যথেষ্ট নহে; তখন ইহাকে বাড়াইয়া চল্লিশ দিন করা হইল। চল্লিশ দিনের এই অপেক্ষা-কালের নাম 'quarantina'; 'quarantina' হইতেই আধুনিক ইংরেজী শব্দ 'quarantine'-এর উৎপত্তি। কোয়ারাণ্টাইন-ব্যবস্থা কালসহকারে ইউরোপের সর্বত্র প্রচলিত হয় এবং জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ইহা এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

৯·২। গণিত ও জ্যোতিষ

দ্বাদশ শতাব্দীতে আদেলার্দ অব বাথ, জন অব সেভিল, রবার্ট অব চেষ্টার, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, মাইকেল স্কট প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় আরব্য ও গ্রীক গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইলে ইউরোপে আবার এই দুই প্রাচীন বিদ্যার গবেষণা ও চর্চা সুরু হইয়াছিল। তর্জমা-প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমতঃ খ্রীষ্টান ল্যাটিন ইউরোপীয়দের নিকট গ্রীক ও আরব্য গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌দের আশ্চর্য অবদানের কথা উদ্ঘাটন করা, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও তৎপরতার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে স্বধর্মী ও স্বজাতীয়দের উৎসাহিত করা। অনুবাদকদের এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই আশাতীতভাবে সফল হইয়াছিল। শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই ইউরোপীয় গাণিতিক প্রতিভার নির্ভুল প্রকাশ আমরা একাধিক গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীর নানা গবেষণায় ও গ্রন্থে অবলোকন করি। এখন হইতে নিষ্ফল অনুকরণ ও পুরাতন গবেষণার পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে নূতন তথ্য নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারের দ্বারা ইউরোপীয় গবেষণা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। ফিবোনাচ্চি ও নেমোরারিয়াসের গবেষণায় পাশ্চাত্ত্য দেশে এক নূতন গাণিতিক যুগ সূচিত হয়। এই যুগে গাণিতিক গবেষণা শুধু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই; সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও দার্শনিক গণিত ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত অধ্যয়নে ও গবেষণায় অল্প-বিস্তর উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। রবার্ট গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন, সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ পণ্ডিতীয় যুগের বিশিষ্ট দার্শনিকদের গণিতে ব্যুৎপত্তির কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গণিতের ইতিহাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ভারতীয় দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতি এই সময় ল্যাটিন ইউরোপে প্রবর্তিত হয়। দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতির সহিত গাণিতিক অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান গণিতজ্ঞ ফিবোনাচ্চি নিজেই এই পদ্ধতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ইউরোপে ইহার প্রচার-প্রচলনের জন্য তিনি বিশেষভাবে দায়ী।

ফিবোনাচ্চি (১১৭০-১২৫০)

ফিবোনাচ্চির আর এক নাম লিওনার্দো। আনুমানিক ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিসায় জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নামের সহিত তাঁহার নামের মিল থাকায় ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে অনেক সময় লিওনার্দো পিসানো বা পিসার লিওনার্দো বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ফিবোনাচ্চির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *Liber abaci* প্রকাশিত হয় ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে। ল্যাটিন ভাষায় ভারতীয় দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতির এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় ও আরব্য পাটীগণিতের ইহাই সর্বপ্রথম বিশদ ও প্রণালীবদ্ধ আলোচনা। তাঁহার গ্রন্থে ও গবেষণায় প্রাচ্য গণিতের বিস্তর প্রভাব থাকিলেও প্রাচীন গ্রীক গণিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি কিছু কম ছিল না। ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, হীরো ও ডায়োফ্যাণ্টাসের গ্রন্থগুলি তিনি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথাকথিত আরবী সংখ্যা এবং দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতনের ভিত্তিতে গণনা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসে যে তিনি এই পদ্ধতিকে ইউরোপে প্রবর্তন করিতে কৃতসংকল্প হন। এই সংকল্প হইতেই তাঁহার *Liber abaci*র পরিকল্পনা।

*Liber abaci*র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন ও গণনা পদ্ধতি ল্যাটিন ইউরোপে প্রচলিত হয় নাই; রক্ষণশীল বণিক-সম্প্রদায় এমন কি শিক্ষকগণ পর্যন্ত বিধর্মীদের আবিষ্কার বলিয়া ইহার প্রচলনে এক সময় তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা টিকে নাই। ক্রমে এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হইল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই আবাকাস ও ঐজাতীয় জটিল গণনা-যন্ত্রের ব্যবহার সর্বত্র হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। মুদ্রণ আবিষ্কৃত হইলে অঙ্কপাতন, গণনা-পদ্ধতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের কাজে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সহজ-কঠিন নানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলে। প্রায় একশত বৎসর বিলম্বে হইলেও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতির প্রচলন ও জনপ্রিয়তার জন্য ফিবোনাচ্চির প্রচেষ্টা পরোক্ষভাবে দায়ী।

Liber abaci তে আলোচিত গণিতের আরও কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থে তাঁহাকে অজ্ঞাত রাশি, তাহার বর্গ ও ধ্রুবককে (constant) যথাক্রমে radix, sensus ও numerus নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংখ্যার বদলে অক্ষর ব্যবহার করিয়া তিনি সাধারণ সমাধানে (general solution) উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত রাশির মূল নির্ণয় তাঁহার গাণিতিক প্রচেষ্টার আর একটি নিদর্শন।

ফিবোনাচ্চি প্রত্যাবর্তক শ্রেণী (recurrent series) নামে যে এক নূতন ধরনের গাণিতিক শ্রেণী আবিষ্কার করেন এই গ্রন্থে তাহার এক মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। প্রত্যাবর্তক শ্রেণীর রাশিগুলি হইল—১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩...ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন রাশি অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুইটি রাশির যোগফল। এক জোড়া খরগোসের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা পুরুষাণুক্রমে কিভাবে বাড়িয়া যায় এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া ফিবোনাচ্চি প্রত্যাবর্তক শ্রেণী আবিষ্কার করেন। পরে এই শ্রেণী হইতে এজাতীয় আরও কয়েকটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, যেমন, $\frac{১}{২}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৫}$, $\frac{৫}{৮}$, $\frac{৮}{১৩}$...ইত্যাদি। এক সময় ফিবোনাচ্চির শ্রেণীর উপর গণিতজ্ঞরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। খরগোসের সন্তান-সন্ততি নির্ধারণ, জীবকোষের গণনা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারে এই শ্রেণীর সফল প্রয়োগের পর হইতে প্রায় সব বিষয়ে ইহার প্রয়োগের একটা অহেতুক চেষ্টা দেখা যায়। কোন কোন অতি উৎসাহী ফিবোনাচ্চিপন্থী গণিতজ্ঞ এরূপ শ্রেণীর সাহায্যে বিখ্যাত চিত্র, কারুশিল্প ও ভাস্কর্যের গাণিতিক বিশ্লেষণে পর্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছিল; পরে অবশ্য দেখা গেল, এরূপ প্রয়াস পাগলামিরই নামান্তর।

"Some professional and dilettant esthetes have applied Fibonacci's numbers to the mathematical dissection of masterpieces in painting and sculpture with results not always agreeable, although sometimes ludicrous, to creative artists."*

ফিবোনাচ্চির দ্বিতীয় বিখ্যাত গ্রন্থ *Practica geometriae* লিখিত হয় ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থ ইউক্লিডের একটি পুস্তক† ও হীরোর *Metrica* অবলম্বনে রচিত। ঘন-জ্যামিতির নানা প্রতিজ্ঞার সমাধান এবং পিরামিডের ফ্রাস্টামের (frustum) ঘন নির্ণয় করিতে পিথাগোরীয় প্রতিজ্ঞার এক বিশেষ প্রয়োগ ফিবোনাচ্চি উদ্ভাবন করেন। তারপর জ্যামিতিক সমস্যার সমাধানে বীজগণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় আলোচনা এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। মুসলমান গণিতজ্ঞরা অবশ্য বহু পূর্বেই এজাতীয় গবেষণায় আশ্চর্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু অনুন্নত খ্রীষ্টীয় ইউরোপে বিষয়টি তখন খুবই অভিনব ও কৃতিত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

Liber abaci ও *Practica geometriae* গ্রন্থদ্বয় উচ্চ প্রশংসিত হইলেও মৌলিকতার দিক হইতে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে নহে। এই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার *Liber quadratorum* ও *Flos* (*Flos super solutionibus quarundam questionum ad numerum et ad geometriam uel ad utrumque pertinentium*) নামে দুইটি গ্রন্থে (রচনাকাল—১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে (*Liber quadratorum*) কতকগুলি অতি জটিল বীজগণিতীয় সমস্যার সমাধান আছে। যেমন, $x^2+y^2=z^2$ অভেদের সমাধান পূর্ণ সংখ্যায় নির্ণয় করা; x_1^2, x_2^2, x_3^2 এই তিনটি বর্গের মান ও y সংখ্যার এমন মান নির্ণয় করা যাহাতে $x_1^2-y=x_2^2$ ও $x_1^2+y=x_3^2$ অভেদ সম্ভব হইতে পারে; x^2+y^2 ও x^2-y^2 উভয়েই এককালে বর্গ হইতে পারে না, ইত্যাদি। উপরিউক্ত দ্বিতীয় অভেদের সমাধান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই সম্রাট ফ্রেডারিক পিসায় অবস্থানকালে ফিবোনাচ্চিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি y-এর মান 5 ধরিয়া x-এর মান কি হইবে জানিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে x^2-5 ও x^2+5 উভয়েই একটি করিয়া বর্গ-সংখ্যা হয়। ফিবোনাচ্চির উত্তর হইয়াছিল, $x=\frac{41}{12}$.

তারপর

$$\sum_1^n n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

অভেদটিরও এক অতি মৌলিক সমাধান তিনি নির্ণয় করেন।

Flos-এ আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার কতকগুলি অনির্ণেয় সমস্যার সমাধান পাই। সমাধানগুলি তিনি পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার তৃতীয় মাত্রার কয়েকটি অভেদের সমাধান উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় মাত্রার এরূপ একটি অভেদ হইল :

$$x^3+2x^2+10x=20$$

ইহার সমাধানে ফিবোনাচ্চি আশ্চর্য মৌলিকতা ও প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি দেখান যে, জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে অভেদটিকে প্রথমে প্রকাশ করিয়া জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ইহার

---

* E. T. Bell, *Development of Mathematics*, 1940 ; p. 107.

† ইউক্লিডের এই পুস্তক এখন অবলুপ্ত; জ্যামিতিক চিত্রকে কিভাবে ভাগ করা যায় সেই বিষয়ের উপর পুস্তকটি রচিত হইয়াছিল।

সমাধান বাহির করা অসম্ভব। মূলের আঙ্কিক আসন্ন মান (numerical approximation) নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি এই অভেদের মূল বাহির করেন। ইহা হইল,

$$x = 1°22^{i}\ 7^{ii}\ 42^{iii}\ 33^{iv}\ 4^{v}\ 40^{vi}$$

অর্থাৎ $= 1\cdot3688081075.$

তাঁহার এইসব গবেষণায় ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ডায়োফ্যাণ্টাসের পরে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাশে দ্য মেজিরিয়াকের (১৫৮১-১৬৩৮) পূর্বে এরূপ পদ্ধতিতে বীজ-গণিতীয় গবেষণায় ল্যাটিন ইউরোপে ফিবোনাচ্চি ছাড়া আর কাহাকেও অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় না।

ফিবোনাচ্চির গাণিতিক গবেষণার ও প্রতিভার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মধ্য-যুগে খৃষ্টান ইউরোপের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। হিন্দু, আরব ও গ্রীকদের গাণিতিক প্রতিভা ও এই বিদ্যায় তাহাদের অমূল্য অবদান তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল; একাধিক গ্রন্থ-রচনার দ্বারা প্রাচ্যের এই অবদানের কথা প্রতীচ্যে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। ফিবোনাচ্চির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে গণিত-চর্চার অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে, এই বিদ্যায় নূতন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। "Fibonacci was the greatest Christian mathematician of the Middle Ages, and the mathematical renaissance in the West may he dated from him."* এই গাণিতিক নব জাগরণের জন্য যদি কোন বিশেষ বৎসরকে চিহ্নিত করিতে হয় তবে তাহা *Liber abaci*-র প্রকাশ-কাল ১২০২ খৃষ্টাব্দকেই করা উচিত।

জোর্দানাস নেমোরারিয়াস (মৃত্যু—১২৩৭)

ফিবোনাচ্চির সমসাময়িক জার্মান জোর্দানাস নেমোরারিয়াস গণিত অপেক্ষা বলবিদ্যাতেই অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তথাপি মধ্যযুগীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে লিওনার্দোর পরেই তাঁহার স্থান। তাঁহার গবেষণায় মুসলমান গণিতজ্ঞদের প্রভাব একেবারেই দেখা যায় না; পক্ষান্তরে তিনি নিকোমেকাস, বোয়েথিয়াস প্রমুখ গণিতজ্ঞদের অর্থাৎ প্রাচীন গ্রেকো-রোমক যুগের গাণিতিক গবেষণার আদর্শ অনুসরণ করেন। এইজন্য লিওনার্দো গণনা-কার্যের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা করেন নাই। পাটীগণিত সম্বন্ধে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এসম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা প্রধানতঃ নিগমনাত্মক। সংখ্যা কি, তাহার উদ্ভব কিরূপে হইয়াছিল, তাহার গুণাগুণ কিরূপ,—এজাতীয় প্রশ্নেই তিনি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, $x(x+1)$ বর্গ বা ঘন দুইয়ের কিছুই হইতে পারে না। বীজগণিতে তিনি একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং তাহাদের সমাধান সংক্রান্ত নানা নিয়মাবলীর আলোচনা করেন। সমীকরণের সাধারণ সমাধান প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি সংখ্যার পরিবর্তে বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করেন। *De triangulis* ও *Planisphaerium* জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। *De triangulis*-এর একস্থানে তিনি বস্তুর ভারকেন্দ্র (centre of gravity) নির্ণয় করিবার এক পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন।

নেমোরারিয়াসের আসল বৈজ্ঞানিক খ্যাতি বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। নিক্ষিপ্ত বস্তুর বিক্ষেপ-মার্গের সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধ (gravitas secundum situm)†

---

* Sarton, *Introduction*, Vol. II, Part II ; p. 611.
† Sarton, *Introduction*, Vol. II, Part II, p. 614.

তিনি আংশিকভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহার প্রস্তাবিত একটি সূত্রের উপর ঐতিহাসিকগণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সূত্রটি হইল,—কোন নির্দিষ্ট বলের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ওজনকে যদি কোন নির্দিষ্ট উচ্চতায় উত্তোলন করা যায়, তবে সেই একই বলের দ্বারা উক্ত ওজনের k-গুণ বেশী ভারী আর একটি ওজনকে k-গুণ কম উচ্চতায় উত্তোলন করা সম্ভবপর। বলবিদ্যায় তাঁহার অন্যান্য অবদান হইল স্থিতীয় ভ্রামকের (statical moment) স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং এই ভ্রামকের সাহায্যে কৌণিক লিভার ও নত সমতল (inclined plane) সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান-নির্ণয়। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ইউরোপে প্রধানতঃ নেমোরারিয়াসের চেষ্টায় ও উৎসাহে বলবিদ্যার চর্চা আবার সুরু হইয়াছিল।

স্যাক্রোবস্কো (আনুমানিক ১২৩০)

জোয়ান দ্য স্যাক্রোবস্কো, সংক্ষেপে স্যাক্রোবস্কো ছিলেন ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। তাঁহার আর এক নাম জন অব হ্যালিফাক্স। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু প্যারীতেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। তৎরচিত জ্যোতিষীয় গ্রন্থ *Tractatus de sphaera*-র (প্রকাশ-কাল-১২৩৩) মূল ভিত্তি আল্-ফারঘানি ও আল্-বাত্তানির জ্যোতিষ। পৃথিবী, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বৃত্ত, নক্ষত্রদের উদয়াস্ত, গ্রহদের কক্ষা ও গতি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের গবেষণালব্ধ কোন তথ্য বা তত্ত্বের আলোচনা অবশ্য ইহাতে নাই এবং এরূপ কোন মৌলিক গবেষণা তিনি আদৌ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। সুললিত ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সমগ্র জ্যোতির্বিদ্যাকে আলোচনা করিবার মধ্যেই ছিল তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্য *Sphaera* বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইহার বহুল প্রচার তৎকালীন জ্যোতিষীয় জ্ঞান-প্রসারে সহায়ক হইয়াছিল। হিব্রু, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিস্ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণের (১৪৭২) ৩০ বৎসরের মধ্যে ইহার অন্ততপক্ষে ২৫ বার পুনর্মুদ্রণ ও ইহার বহু সমালোচনা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বের অকাট্য প্রমাণ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত *Sphaera*-র পুনর্মুদ্রণের কথা জানা যায়। মাইকেল স্কট, পিয়ের দা'ই, রেজিওমণ্টানাস প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ স্যাক্রোবস্কোর সপ্রশংস সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। স্যাক্রোবস্কোর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পঞ্জিকার উপর লিখিত *De anni ratione* উল্লেখযোগ্য।

দশম আল্ফন্সো (১২২৩-৮৪)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আরব্য জ্যোতিষের জ্ঞান ও প্রভাব বিস্তারে লিওন ও কাস্তিলরাজ দশম আল্ফন্সোর তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্ফন্সো জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি অনুধাবন করেন যে, কেবলমাত্র আরবী ও গ্রীক জ্যোতিষীয় গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমার দ্বারা ইউরোপীয়দের মধ্যে এই বিদ্যায় স্বাধীন ও উন্নততর গবেষণার পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কার্যে অনুবাদ-তৎপরতা প্রথম সোপান মাত্র। জ্যোতিষে উন্নততর আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতে হইলে পুরাতন জ্যোতিষীয় তালিকা-গুলির সংস্কার-সাধন অত্যাবশ্যক।

আল্ফন্সোর জ্যোতিষীয় তালিকা : একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আল্-জারকালি কর্তৃক প্রণীত টলেডীয় জ্যোতিষীয় তালিকাই সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এই তালিকার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। টলেডীয় তালিকা সংস্কার ও সংশোধন করিয়া উন্নত ধরনের আর একটি জ্যোতিষীয় তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আল্ফন্সো তাঁহার সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত ইহুদী ও খ্রীষ্টান জ্যোতির্বিদ্‌কে নিয়োজিত করেন। জুডা বেন মোজেস ও আইজাক ইব্‌ন্ সিদের তত্ত্বাবধানে

এই তালিকা সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত হয় ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঠিক আল্‌ফন্‌সোর রাজ্যাভিষেকের পুণ্য দিনটিতে। এই তালিকায় অবশ্য কোন নূতন জ্যোতিষীয় মতবাদ বা ধারণার অবতারণা করা হয় নাই। কিন্তু ইহার জ্যোতিষীয় সংখ্যা ও গণনাগুলি পূর্বপ্রকাশিত অনুরূপ তালিকার সংখ্যা ও গণনা অপেক্ষা বেশী নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে জ্যোতিষীয় গবেষণায় আল্‌ফন্‌সোর তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব ইউরোপের সর্বত্র অনুভূত হয়।

Libros del saber নামে সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের এক বিরাট বিশ্বকোষও আল্‌ফন্‌সো তাঁহার সুযোগ্য পণ্ডিতদের দিয়া লিখাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় আরব্য জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীয় মতবাদ হইলেও সংকলনের দিক হইতে রচয়িতাদের যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহরা যে উপবৃত্ত-পথে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, এই গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, সপ্তম পরিচ্ছেদে বুধ গ্রহের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কক্ষা অঙ্কিত হইয়াছে উপবৃত্তের আকারে; উপবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবীর স্থান নির্দিষ্ট। এইরূপ ধারণা অবশ্য নূতন নহে; উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের গতির সম্ভাবনার কথা আল্‌-জারকালির রচনায় দেখা যায়। আল্‌ফন্‌সোর সময়ে টলেডোর ইহুদী ও খ্রীষ্টান জ্যোতির্বিদ্‌রা আল্‌-জারকালির গবেষণার ও গ্রন্থাদির সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন।

মধ্যযুগের জ্যোতিষীয় মতবাদ ও ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা

মধ্যযুগের ল্যাটিন ইউরোপীয় পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের নানা গবেষণা ও গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের জ্যোতিষীয় মতবাদ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। এইবার সমগ্রভাবে সেযুগে প্রচলিত জ্যোতিষীয় মতবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই বক্তব্য শেষ করিব। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণের নিকট হইতে তাঁহাদের আলোচিত ও প্রস্তাবিত জ্যোতিষীয় জ্ঞান ও মতবাদ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। এইভাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অ্যারিস্টটল, টলেমী প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক এবং আল্‌-জারকালি, আল্‌-বিত্রুজি, আল্‌বাত্তানি, নাসির আল্‌-দিন আত্‌-তুসি প্রমুখ খ্যাতনামা মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌দের গবেষণা ও জ্যোতিষীয় মতবাদের কথা অবগত হন। আরব্য প্রাধান্যের কালে জ্যোতিষীয় গবেষণার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আল্‌-বিত্রুজির সময় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা ব্যাপারে মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এক দল অ্যারিস্টটলীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার সমর্থক, অপর দল টলেমীর। অবশ্য উভয় পরিকল্পনারই সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল ভূকেন্দ্রীয় মতবাদ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ইউরোপেও জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ বাদানুবাদের ঢেউ অনুভূত হয়। আল্‌-বিত্রুজি কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত অ্যারিস্টটলীয় জ্যোতিষ এক দল পণ্ডিত সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, সেণ্ট বোনাভেঞ্চুর, ইংরেজ রবার্ট প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন আল্‌-বিত্রুজিপন্থী। ভিনসেণ্ট অব বোভে, বার্নাড অব ভেরদুন, জন অব সিসিলি এবং আরও অনেকে 'অ্যাল্‌মাজেস্টে' প্রস্তাবিত জ্যোতিষীয় মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করেন। গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন প্রমুখ কয়েকজন সাবধানী পণ্ডিত আবার কোন দিকেই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করিয়া দ্বিবিধ মতই সমর্থনযোগ্য বলিয়া রায় দিয়াছিলেন। আল্‌-বিত্রুজির জ্যোতিষের সমাদরলাভের প্রধান কারণ প্রাচীন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে অ্যারিস্টটলের অসম্ভব জনপ্রিয়তা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং তথ্যের সহিত মতবাদের সঙ্গতির কথা বিচার করিলে নানা দোষ-ত্রুটী সত্ত্বেও টলেমীর ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা যে অনেক বেশী উন্নত ধরনের ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য প্রাথমিক বাদানুবাদের উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হইলে ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শেষের দিকে এবং নিঃসংশয়ে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে টলেমীর জ্যোতিষের সমর্থকগণই ক্রমশঃ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন।

এজাতীয় মতভেদ ও মতবাদ বিশেষের বিরুদ্ধ বা অনুকূল সমালোচনা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর জ্যোতিষীয় তৎপরতার এক সুলক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হইলেও ইহার দ্বারা কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা, কোন নূতন আবিষ্কার সম্ভবপর হয় নাই। ইহা অনেকটা নিষ্ফল পাণ্ডিত্যীয় তর্কেরই সামিল ছিল। টলেমী জ্যোতিষকে যে পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ নূতন পর্যবেক্ষণবলে মধ্যে মধ্যে যেরূপ নূতন তথ্য সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ল্যাটিন ইউরোপে তেমন কিছুই দৃষ্ট হয় না। কোপার্নিকাসের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র মধ্যযুগে জ্যোতিষে ইউরোপীয়দের অবদান একরূপ শূন্য বলিলেই চলে। বরং খ্রীষ্টধর্মের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসে জ্যোতিষীয় মতবাদে ও ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় নানা উদ্ভট ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। মধ্যযুগে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বলোক, তাহাদের আবর্তন, গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা সর্বসাধারণ্যে বলবৎ ছিল, তাহার নিখুঁত বর্ণনা আমরা পাই ইতালীর অমর কবি দান্তের *Divina commedia*-য়। দান্তের কবি-প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত। এই প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়াছিল তাঁহার ব্যাপক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। জ্যোতিষে দান্তে ছিলেন অ্যারিষ্টটলপন্থী; মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌ আল্‌-ফারঘানির জ্যোতিষীয় রচনা-বলীর দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

দান্তের পরিকল্পনায় পৃথিবী একটি গোলক; ইহা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধের কিয়দংশ জুড়িয়া ভূখণ্ড; অবশিষ্ট ভাগ সমুদ্রাবৃত। এই ভূখণ্ড পশ্চিমে হারকিউলিসের স্তম্ভ হইতে পূর্বে গঙ্গা নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে মেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণে বিষুবরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কেন্দ্রদেশে অবস্থিত পবিত্র নগর জেরুজালেম। বিষুবরেখার আরও দক্ষিণে ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ও লোকবসতির গল্প পর্যটকদের মুখে দান্তে অবশ্য অনেক শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এইসব গল্প (?) তিনি বিশ্বাস করিতেন না। জেরুজালেমের ঠিক বিপরীত দিকে প্রতিপাদস্থানে (antipode) ভূপৃষ্ঠের বিশাল সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া শঙ্কু আকৃতির একটি পাহাড় বর্তমান। এই পাহাড়ে প্রেতলোকের নিবাস (Purgatory)। জেরুজালেমের ঠিক নীচে মৃত্তিকা গহ্বরে ভূকেন্দ্র বরাবর নরক নামিয়া গিয়াছে; লুসিফার এই নরকরাজ্যের অধীশ্বর।

ঊর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডলোকের বিস্তৃতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, ভূকেন্দ্রীয় দশটি গোলকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত। পৃথিবী হইতে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গোলকদের স্বর্গীয় গুণাগুণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চরমে পৌঁছে দশম গোলকে। ইহাই এম্পিরিয়ান বা গোলকধাম,—স্বয়ং ঈশ্বরের আবাস। পৃথিবীর অব্যবহিত পরের গোলকে চন্দ্রের স্থিতি, তারপর যথাক্রমে বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের। অষ্টম গোলকে ধ্রুব তারকারা বিরাজমান। নবম বা স্ফটিক গোলকটি (crystalline sphere) অতি দ্রুত আবর্তিত হইয়া থাকে; ইহা কোন গ্রহের বাহক নহে। নবম গোলক হইতেই সমগ্র বিশ্বের গতি উৎসারিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম প্রাথমিক চালক বা Primum Mobile। এই গতি স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া অন্যান্য গোলকদের ঘুরাইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে গ্রহরাও গতিশীল হয়। কিভাবে এই গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহার ব্যাখ্যাকল্পে দান্তে পরী, দেবদূত প্রভৃতি উদ্ভট ও অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন উপদেবতাদের অবতারণা করিয়াছেন।

দান্তের পরিকল্পনায় দশ গোলকে বিভক্ত গোটা ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ব হইতে পশ্চিমে আবর্তিত হইয়া থাকে। যে গোলকটির সহিত সূর্য বাঁধা তাহার গতি ছাড়া সূর্যের নিজস্ব আর একটি গতি আছে। এই গতির জন্যই সূর্য পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বৎসরে একবার রাশিচক্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। সূর্যের আহ্নিক ও বাৎসরিক গতি বুঝাইবার জন্য দান্তে এক উপমা দিয়া বলেন যে, এক ব্যক্তি
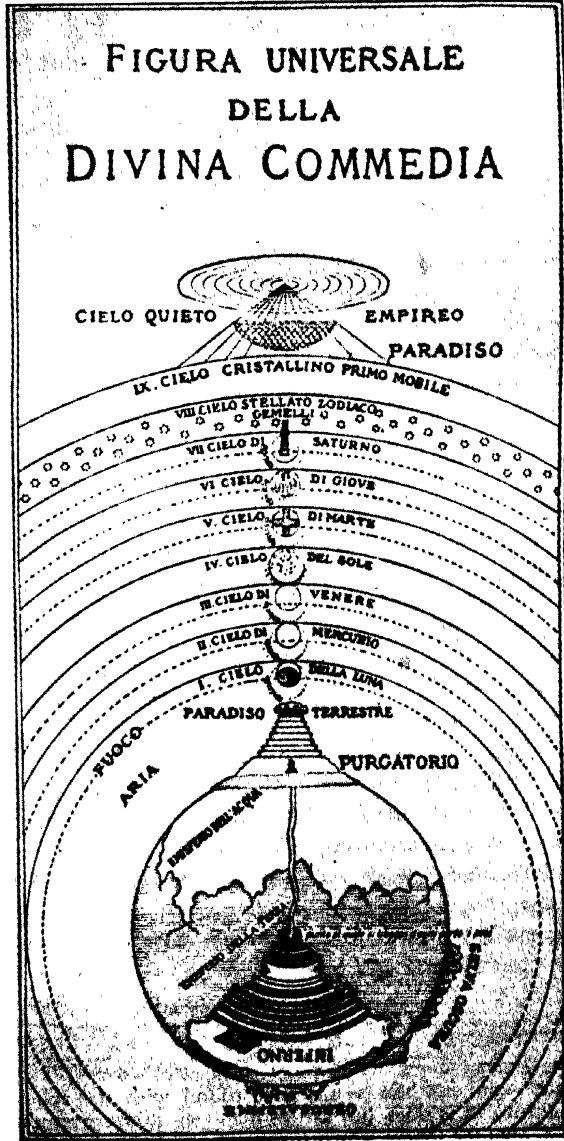
৩৬। *Divina commedia*য় বর্ণিত দান্তের ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা।

সিঁড়ি বাহিয়া নীচ হইতে উপরে উঠিবার সময় সিঁড়িটিও উপর হইতে নীচে ক্রমাগত নামিতে থাকিলে ব্যক্তিটির যেরূপ দ্বিবিধ গতি হইবে সূর্যের দ্বিবিধ গতিও অনেকটা সেইরূপ। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ ভূবিষুব ও ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকভাবে অবস্থিতি।

উপরিউক্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল গ্রহরা। আকাশে তাহাদের জটিল ও দুর্বোধ্য গতির ব্যাখ্যা ছিল প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের প্রধানতম শিরঃপীড়া। গ্রহদের অসমান ও খামখেয়ালী গতির ব্যাখ্যাকল্পে টলেমী উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত, পরিবৃত্ত, ডেফারেণ্ট প্রভৃতি জ্যামিতিক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।* অ্যারিষ্টটলপন্থী দান্তের পরিকল্পনায় অবশ্য উৎকেন্দ্রীয় পরিবৃত্ত ইত্যাদি স্থান পায় নাই; তবে কতকটা একই ধরনের এক পরিগোলকের (episphere) পরিকল্পনা সংযোজিত দেখা যায়। তৃতীয় গোলকে শুক্রের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই গোলকের উপরিভাগের কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি ক্ষুদ্র গোলক বা পরিগোলক আবর্তিত হয়; শুক্র এই পরিগোলকের পৃষ্ঠদেশেই বাধা থাকে।† পরিগোলকের পৃষ্ঠদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে শুক্র বৃহত্তর তৃতীয় গোলকের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করে।

অ্যারিষ্টটল-নির্ভর দান্তের জ্যোতিষ হিপার্কাস-টলেমীর জ্যোতিষ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। দান্তে অবশ্য ঠিক জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন না। জ্যোতিষ যাঁহাদের জ্ঞান-চর্চার প্রধান বিষয় ছিল তাঁহারা অ্যারিষ্টটলের পরিবর্তে টলেমীর মতবাদে অনেক বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তথাপি *Divina commedia*-য় বর্ণিত জ্যোতিষের গুরুত্বের প্রধান কারণ এই যে, জ্যোতিষ সম্বন্ধে খাঁটী মধ্যযুগীয় মনোভাব দান্তে যেরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন আর কাহারও রচনায় এরূপ দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, মানুষের ভাগ্য, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, তাহার নানা সংস্কার ইত্যাদি সবকিছুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দান্তের সময় মধ্যযুগীয় জ্যোতিষীয় চিন্তাধারা কোন খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, অতীব দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থে তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

মধ্যযুগে জ্যোতিষীয় অনগ্রসরতার প্রধান কারণ পর্যবেক্ষণের দারিদ্র্য। উন্নততর পর্যবেক্ষণের দ্বারা নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত না হইলে মানুষের চিন্তা নূতন পথে ধাবিত হয় না। জ্যোতিষে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গুরুত্বের কথা প্রথম উপলব্ধি করেন রজার বেকন। বাস্তব ক্ষেত্রে ল্যাটিন ইউরোপে এবিষয়ে প্রথম উৎসাহ প্রকাশ করেন উইলিয়াম অব স্যাঁ ক্লু। প্যারীর পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষচর্চার তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। স্যাঁ ক্লু ক্যামেরা অবস্‌কিউরার সাহায্যে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার নির্ণীত ক্রান্তিবৃত্তের তির্যকতার মান ২৩°৩৪′ (১২৯০)। রবার্ট‡ নামে একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্ এই সময় পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করেন। আস্তরলাব, বৃত্তপাদ প্রভৃতি যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার কয়েকটি পুস্তক বর্তমান। জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণ-ভাবে গ্রীক ও আরব্য জ্যোতিষীয় গ্রন্থের সমালোচনা ও টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে এই বিদ্যার চর্চা নিবদ্ধ ছিল।

---

* বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩-৩৫।

† "Dante explains how venus goes round with the sphere which forms the third of the skies, but as this does not quite correspond to the phenomena, another sphere which revolves independently is fixed to the sphere of the third sky, and the planet rides on the back of the smaller sphere (sitting like a jewel there, says Dante), reflecting the light of the sun."—Herbert Butterfield, *The Origins of Modern Science*, p. 19.

‡ রবার্টাস অ্যাংলিকাস।

কোপার্নিকাসের পূর্বে খ্রীষ্টান ইউরোপে পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল কিনা, অনেকে এই প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এরূপ কোন প্রশ্নের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সম্পূর্ণ নিশ্চল স্থিতির ধারণা এইরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার বিপরীতটি অর্থাৎ পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা তখন একেবারেই অচিন্তনীয় ছিল। একথা অবশ্য কেবল ল্যাটিন ইউরোপের ক্ষেত্রেই খাটে, কারণ সমসময়ে মুসলমানপ্রধান দেশে পৃথিবীর স্থিতি বা গতি সম্বন্ধে একাধিক জ্যোতির্বিদ্‌কে মাথা ঘামাইতে দেখা যায়। আলি ইব্‌ন্ উমার আল্‌-কিতাবি, কুতুব আল্‌-দিন্ আল্‌-শিরাজি ও আবুল ফারাজ নামে তিনজন মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, পৃথিবী নিশ্চল, ইহার কোনরূপ গতি আদৌ সম্ভবপর নহে। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, এজাতীয় আলোচনার দ্বারা নিঃসন্দেহে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহারা অথবা অপর একদল মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা বিচার করিয়াছিলেন। সমসময়ে ল্যাটিন খ্রীষ্টান জ্যোতির্বিদ্‌দের অপেক্ষা মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌রা যে অনেক বেশী উন্নত ছিলেন, এই ধরনের আলোচনা তাহার প্রমাণ।

৯·৩। পদার্থবিদ্যা

মধ্যযুগে গণিত, জ্যোতিষ, আবহবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ইহার চর্চা সাধারণতঃ গণিত, জ্যোতিষ, আবহবিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন, ন্যায় ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়াছিল। বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করে অনেক পরে। এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই গবেষণা সুরু হইয়াছিল। বলবিদ্যা, আলোকবিদ্যা ও চুম্বকের আশ্চর্য ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সুপ্রাচীন। অ্যারিষ্টটল, প্লেটো, আর্কিমিডিস, স্টেসিবিয়াস, হীরো প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানিগণের হাতে বলবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি বলিষ্ঠ বিভাগে উন্নীত হইয়াছিল; আলোকবিদ্যার গোড়াপত্তন করেন ইউক্লিড ও টলেমী; চুম্বক-প্রস্তরের আকর্ষণী শক্তি ও চুম্বকের দিগ্‌দর্শনধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল খ্রীষ্টজন্মের বেশ কিছু পূর্বে।

মধ্যযুগে বলবিদ্যা ও আলোকবিদ্যা প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের এক প্রিয় গবেষণার বিষয় ছিল। শেষোক্ত বিদ্যায় আল্‌-কিন্দি, ইব্‌ন্ আল্‌-হাইথাম্, ইব্‌ন্ সিনা প্রমুখ মুসলমান বিজ্ঞানিগণ আশ্চর্য স্বকীয়তা প্রদর্শন করেন। ল্যাটিন ইউরোপে প্রধানতঃ আল্‌-হাইথামের গবেষণাকে অবলম্বন করিয়াই আলোকবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন ও ভিটেলো আল্‌-হাইথামের গবেষণারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। বলবিদ্যা সম্বন্ধে আরব্য ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আদেলার্ড, গ্রোসেটেস্ট, বেকন ও জোর্দানাস নেমোরারিয়াসের বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কথা আলোচিত হইয়াছে; ইঁহাদের চেষ্টায় বলবিদ্যার গবেষণা-ক্ষেত্রে নূতন স্পৃহা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইলেও কোন নূতন তথ্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার কিংবা কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টেভিনাস ও গ্যালিলিওর যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহের পূর্ব পর্যন্ত আর্কিমিডিস-প্লেটো-স্টেসিবিয়াস-হীরোর বলবিদ্যাই ছিল এই বিদ্যার সকল প্রকার গবেষণার ও মননশীলতার একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং কি আলোকবিজ্ঞানে, কি বলবিদ্যায়, নূতন তথ্য আবিষ্কার অথবা উর্বর মতবাদ প্রস্তাবনার দিক হইতে বিচার করিলে ল্যাটিন ইউরোপের উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র চৌম্বক বিদ্যা সম্বন্ধে এই অবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। পেট্রাস পেরেগ্রিনাস নামে এক ফরাসী পদার্থবিদ্ চৌম্বক বিদ্যায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দেন। এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা সম্পাদন তাঁহার গবেষণার বিশেষত্ব।

উপরে আমরা যেসব বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের মধ্যে ভিটেলো ও পেত্রাস পেরেগ্রিনাস ছাড়া অন্যান্যদের গবেষণার কথা যথাস্থানে অল্প-বিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই দুই বিজ্ঞানীর পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভিটেলো (জন্ম—১২৩০)

পোলিশ পদার্থবিদ্ ও দার্শনিক ভিটেলো জন্মগ্রহণ করেন পোল্যাণ্ডের সাইলেসিয়া প্রদেশে আনুমানিক ১২৩০ খৃষ্টাব্দে। প্যারী ও পাদুয়ায় তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। আলোক-বিদ্যা সম্বন্ধীয় আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদির জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি। ভিটেলোর আলোক সংক্রান্ত আলোচনার প্রায় সমস্ত তথ্য ও জ্ঞান আল্-হাইথাম হইতে গৃহীত। আলোচনা-পদ্ধতির দিক হইতে রবার্ট গ্রোসেটেস্টের সহিত তাঁহার অনেক মিল লক্ষণীয়। এই বিদ্যায় তাঁহার জ্ঞান গ্রোসেটেস্টের সমতুল্য হইলেও আল্-হাইথাম এমন কি সমসাময়িক মুসলমান আলোকবিজ্ঞানীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল।
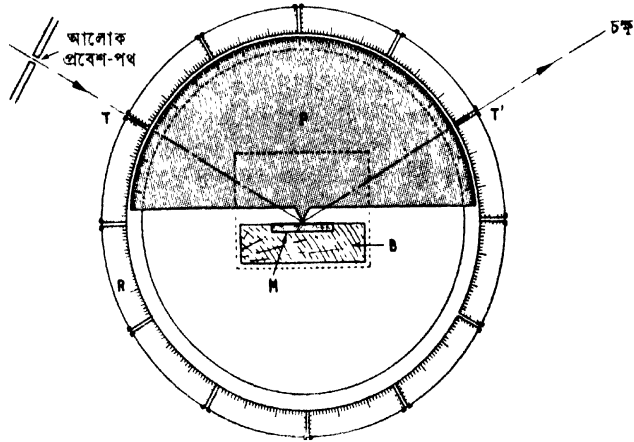
৩৭। আলোক-প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতন ও প্রতিফলন কোণদ্বয় যে সমান হয় তাহা এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে আল্-হাজেন ও ভিটেলো প্রমাণ করেন। R একটি পুরু কাঠের বলয়; ইহা ৩৬০° ডিগ্রীতে বিভক্ত। এই বলয়ের ভিতর ফুটা করিয়া সমান দূরত্বে কয়েকটি নল বসানো; T ও T' এরূপ দুটি নল এবং ইহাদের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গত হইতে পারে। যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে একটি কাঠের টুকরা B বসানো; ইহার উপর M প্রতিফলকটি রাখা হয়। P একটি অর্ধবৃত্তাকার ধাতব প্লেট; ইহার সূচাগ্র কেন্দ্র যন্ত্রের কেন্দ্রে স্থাপিত প্রতিফলকটিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। T নলের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া M প্রতিফলক হইতে প্রতিফলিত হইয়া T' নলের মধ্য দিয়া আবার বাহির হইয়া আসিবে। কাঠের বলয়ের ভাগ হইতে কোণদ্বয় মাপা যায়।

আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে তিনি সাধারণ পর্যায়ের কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করেন। রবিরশ্মির প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের জন্য রামধনুর উদ্ভব হইয়া থাকে, এই সত্য পরিষ্কারভাবে বুঝাইলেও প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের দ্বারা কিভাবে বিভিন্ন বর্ণ সূর্যরশ্মি হইতে পৃথক হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করে, তাহার কোন বিশদ আলোচনার চেষ্টা ভিটেলোর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নিসংযোগ করিবার কার্যে তিনি প্যারাবোলয়েড প্রতিফলকের

কোপার্নিকাসের পূর্বে খ্রীষ্টান ইউরোপে পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল কিনা, অনেকে এই প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এরূপ কোন প্রশ্নের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সম্পূর্ণ নিশ্চল স্থিতির ধারণা এইরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার বিপরীতটি অর্থাৎ পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা তখন একেবারেই অচিন্তনীয় ছিল। একথা অবশ্য কেবল ল্যাটিন ইউরোপের ক্ষেত্রেই খাটে, কারণ সমসময়ে মুসলমানপ্রধান দেশে পৃথিবীর স্থিতি বা গতি সম্বন্ধে একাধিক জ্যোতির্বিদ্‌কে মাথা ঘামাইতে দেখা যায়। আলি ইব্‌ন্ উমার আল্‌-কিতাবি, কুতুব আল্‌-দিন্ আল্‌-শিরাজি ও আবুল ফারাজ নামে তিনজন মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, পৃথিবী নিশ্চল, ইহার কোনরূপ গতি আদৌ সম্ভবপর নহে। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, এজাতীয় আলোচনার দ্বারা নিঃসন্দেহে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহারা অথবা অপর একদল মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ পৃথিবীর গতির সম্ভাবনা বিচার করিয়াছিলেন। সমসময়ে ল্যাটিন খ্রীষ্টান জ্যোতির্বিদ্‌দের অপেক্ষা মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌রা যে অনেক বেশী উন্নত ছিলেন, এই ধরনের আলোচনা তাহার প্রমাণ।

৯·৩। পদার্থবিদ্যা

মধ্যযুগে গণিত, জ্যোতিষ, আবহবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ইহার চর্চা সাধারণতঃ গণিত, জ্যোতিষ, আবহবিদ্যা, প্রাকৃতিক দর্শন, ন্যায় ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়াছিল। বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করে অনেক পরে। এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই গবেষণা সুরু হইয়াছিল। বলবিদ্যা, আলোকবিদ্যা ও চুম্বকের আশ্চর্য ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সুপ্রাচীন। অ্যারিষ্টটল, প্লেটো, আর্কিমিডিস, স্টেসিবিয়াস, হীরো প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানিগণের হাতে বলবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি বলিষ্ঠ বিভাগে উন্নীত হইয়াছিল; আলোকবিদ্যার গোড়াপত্তন করেন ইউক্লিড ও টলেমী; চুম্বক-প্রস্তরের আকর্ষণী শক্তি ও চুম্বকের দিগ্‌দর্শনধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল খ্রীষ্টজন্মের বেশ কিছু পূর্বে।

মধ্যযুগে বলবিদ্যা ও আলোকবিদ্যা প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের এক প্রিয় গবেষণার বিষয় ছিল। শেষোক্ত বিদ্যায় আল্‌-কিন্দি, ইব্‌ন্ আল্‌-হাইথাম্, ইব্‌ন্ সিনা প্রমুখ মুসলমান বিজ্ঞানিগণ আশ্চর্য স্বকীয়তা প্রদর্শন করেন। ল্যাটিন ইউরোপে প্রধানতঃ আল্‌-হাইথামের গবেষণাকে অবলম্বন করিয়াই আলোকবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন ও ভিটেলো আল্‌-হাইথামের গবেষণারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। বলবিদ্যা সম্বন্ধে আরব্য ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আদেলার্ড, গ্রোসেটেস্ট, বেকন ও জোর্দানাস নেমোরারিয়াসের বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কথা আলোচিত হইয়াছে; ইঁহাদের চেষ্টায় বলবিদ্যার গবেষণা-ক্ষেত্রে নূতন স্পৃহা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইলেও কোন নূতন তথ্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার কিংবা কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টেভিনাস ও গ্যালিলিওর যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহের পূর্ব পর্যন্ত আর্কিমিডিস-প্লেটো-স্টেসিবিয়াস-হীরোর বলবিদ্যাই ছিল এই বিদ্যার সকল প্রকার গবেষণার ও মননশীলতার একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং কি আলোকবিজ্ঞানে, কি বলবিদ্যায়, নূতন তথ্য আবিষ্কার অথবা উর্বর মতবাদ প্রস্তাবনার দিক হইতে বিচার করিলে ল্যাটিন ইউরোপের উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র চৌম্বক বিদ্যা সম্বন্ধে এই অবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। পেত্রাস পেরেগ্রিনাস নামে এক ফরাসী পদার্থবিদ্ চৌম্বক বিদ্যায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দেন। এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা সম্পাদন তাঁহার গবেষণার বিশেষত্ব।

স্কেল বা মাপনীর ব্যবস্থা ইহাতে আছে। সূক্ষ্মাগ্র দণ্ডের সহিত চৌম্বক শলাকাটিকে সংলগ্ন করিয়া এবং তাহাকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিয়া পেত্রাস বিবর্তন কীলকযুক্ত এক কম্পাসের (pivoted compass) বর্ণনাও *Epistola* -য় দিয়াছেন। একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে সূক্ষ্মাগ্র দণ্ডটি স্থাপিত; প্রকোষ্ঠের উপরিভাগ একটি স্বচ্ছ ঢাকনার দ্বারা আবৃত (৩৮নং চিত্র)। দণ্ডের উপরের দিকে দুই ছিদ্রপথে একটি লোহার ও আর একটি পিতলের কাঁটা এমনভাবে প্রবেশ করানো যে, কাঁটা দুইটি পরস্পরের সহিত একটি সমকোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করে। স্বচ্ছ ঢাকনার উপরে অবস্থিত একটি বৃত্তাকার মাপনীর সাহায্যে চৌম্বক শলাকার আবর্তন নির্ণয় করা যায়।
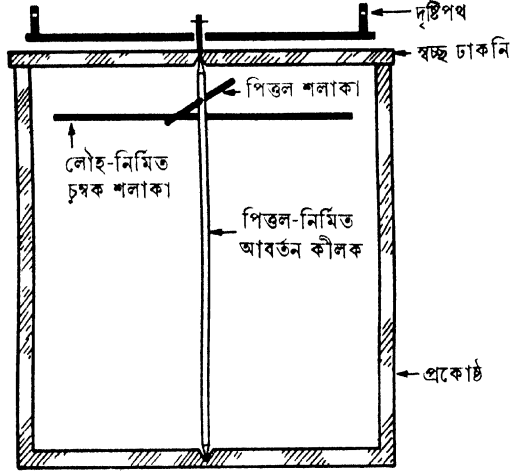
৩৮। পেরেগ্রিনাস কর্তৃক বর্ণিত আবর্তনকীলকযুক্ত কম্পাসের নক্সা।

সুপ্রাচীনকাল হইতে চুম্বক সম্বন্ধে যেসব তথ্য ও জ্ঞান ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়াছিল *Epistola* -য় তাহার বিশদ আলোচনা থাকিলেও ইহা একটি সাধারণ সংগ্রহ-গ্রন্থ নহে। চুম্বকের গুণাগুণ সম্বন্ধে পেরেগ্রিনাস কর্তৃক স্বহস্তে সম্পাদিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোচনায় সমৃদ্ধ ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষার স্থান ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। বিজ্ঞান-চর্চায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি একটা গোটা অধ্যায়ই *Epistola*-য় সংযোজনা করিয়াছিলেন। এই উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অধ্যাপক সার্টন মন্তব্য করিয়াছেন :

> "To sum up, the Epistola was not only a summary of magnetic knowledge; it added considerably to it and was a splendid and rare examplar of the experimental method. We find in it descriptions of floated and pivoted compass, of the two kinds of poles, their attractions and repulsions; magnetization by contact; inversion of the poles; breaking of a magnetic needle into smaller ones; exertion of magnetic force through water, glass etc.; etc."*

* Sarton, *Introduction*, Vol. II, p. 1031.

গতির প্ররোচনাবাদ

উইলিয়ম অব ওকামের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার প্রস্তাবিত গতির প্ররোচনাবাদ বা Impetus Theoryর সামান্য উল্লেখ করিয়াছিলাম। ওকাম এই মতবাদ ঠিক প্রথম প্রস্তাব করেন নাই; তাঁহার পূর্বে জন ফিলোপোনাস নামে এক দার্শনিক গতি সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের ধারণার নানা ত্রুটী-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া এইরূপ এক মতবাদ প্রথম প্রস্তাব করেন।* মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই মতবাদ সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। ওকাম সম্ভবতঃ এরূপ কোন এক আরব্য সূত্র হইতে ইহার কথা জানিয়া থাকিবেন; তবে ল্যাটিন ইউরোপীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনাই যে প্রথম তাহাতে সন্দেহ নাই। ওকামের পর জাঁ বুরিদাঁ, অ্যালবার্ট অব স্যাক্সনি, নিকোলাস ওরেজ্‌ম্‌ ও নিকোলাস অব কুসা প্ররোচনাবাদের আরও অনেক সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করেন। গতির প্ররোচনাবাদ শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইলেও গতি সম্বন্ধে গ্যালিলিওর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও মতবাদ প্রকাশের পূর্বে অ্যারিষ্টটলের বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর সন্তোষজনক এক মতবাদ প্রণয়ন করিবার ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। শুধু তাহাই নহে, ঐতিহাসিকদের অভিমত, প্ররোচনাবাদ গতির আধুনিক মতবাদের উদ্ভাবনে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এজন্য এই মতবাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

অ্যারিষ্টটলের মতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে প্রত্যেক ভারী বস্তুর এক স্বাভাবিক গতি আছে। এই গতি স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়া অবস্থান করিতে পারাই হইল বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহা ছাড়া অন্য যে কোন দিকের গতিই হইবে অস্বাভাবিক ও প্রবল এবং বলপ্রয়োগসাপেক্ষ। সুতরাং এরূপ গতির সঞ্চার করিতে হইলে কাহাকেও না কাহাকেও ক্রমাগত বলপ্রয়োগ করিয়া যাইতে হইবে। এই বলপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া মাত্রই বস্তুটি থামিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ইহা তখন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়িতে থাকিবে। তারপর বলের মাত্রা বরাবর সমান থাকিলে তবেই বস্তুটি বরাবর সমবেগে ধাবিত হইবে; অর্থাৎ বল সমবেগের কারণ, ইহার দ্বারা গতির ত্বরণ সম্ভবপর নহে। তারপর নির্দিষ্ট বলপ্রয়োগে বস্তু কিরূপ বেগে ধাবিত হইবে তাহা নির্ভর করে মাধ্যমের বাধার উপর। বাতাস ও জলের মাধ্যমের বাধা সমান নয়, এজন্য একই বলের প্রভাবে বস্তু বাতাসে যে বেগে চলিবে জলের মধ্যে সেই বেগে চলিতে পারিবে না। মাধ্যমের বাধাই যখন বস্তুর বেগ নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইলে বস্তুর পক্ষে যে কোন বলে অনন্ত বেগে ধাবিত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুর অনন্ত বেগের ধারণা নিতান্তই অবাস্তব। তাই অ্যারিষ্টটল বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিতে শূন্য স্থান বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও শূন্য স্থান সৃষ্টি করিতে পারেন না।

এই মতবাদের অপর্যাপ্ততা প্রথমেই ধরা পড়ে নিক্ষিপ্ত তীরের গতি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া। তীর নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ধনুকের ছিলার সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তীরটিকে গতিশীল রাখিবার জন্য ক্রমাগত বলপ্রয়োগের আর কোন উপায়ই তখন থাকে না। উপরিউক্ত মত অনুযায়ী তীরটির তৎক্ষণাৎ থামিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় না কেন? অ্যারিষ্টটলীয় ব্যাখ্যাকাররা বলেন, এক্ষেত্রে বাতাসের মাধ্যমই তীরটিকে গতিশীল রাখিতে সাহায্য করে। নিক্ষিপ্ত তীরের অগ্রভাগের চাপে সম্মুখস্থ বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে তীরের পশ্চাদ্ভাগের বায়ুর চাপ কমিয়া কিছুটা শূন্য স্থান উদ্ভব হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রকৃতির চেষ্টাই হইল এরূপ শূন্য স্থানের উদ্ভব বন্ধ করা;

* Stephen S. Mason, *Main Currents of Scientific Thought*, Schuman, New York, 1957; p. 91.

এজন্য তীরের সম্মুখস্থ বায়ু পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া আসিয়া তীরটিকে সামনের দিকে আরও ঠেলিয়া দেয়। এই ব্যাপার পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইবার ফলে তীরটি গতিশীল থাকে। শেষে বায়ুর বাধা ক্রমশঃ প্রবল হইলে তীরটি থামিতে বাধ্য হয় ও মাটিতে পড়িয়া যায়।

এই ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে, বাতাসের আলোড়নই তীরের গতির আসল কারণ; সুতরাং যেখানে বাতাস বা অনুরূপ কোন মাধ্যম নাই সেইরূপ স্থানের মধ্য দিয়া তীরের ধাবিত হইবার উপায় নাই; অর্থাৎ শূন্য স্থানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর কোন গতি থাকা সম্ভবপর নয়। তারপর পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তু যতই মাটির দিকে পড়িতে থাকে তাহার গতি ততই ত্বরিত হয়। পড়ন্ত বস্তুর এরূপ ত্বরিত গতি সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলপন্থীদের ব্যাখ্যা হইল, বস্তু নীচের দিকে পড়িতে থাকিলে তাহার উপর বায়ুর চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে ইহার গতি ত্বরিত হয়।

অ্যারিষ্টটলীয় গতিবাদের বিরুদ্ধে উইলিয়ম অব ওকাম, জাঁ বুরিদাঁ প্রমুখ পণ্ডিতদের প্রধান সমালোচনা এই যে, সুবিধামত একই মাধ্যম একবার বস্তুর গতি প্রতিরোধ করিতেছে, আবার সেই মাধ্যমই বস্তুর গতির কারণ হইতেছে। একই মাধ্যমের পরস্পরবিরোধী এরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এক বিকল্প মতবাদ হিসাবে ওকাম ও বুরিদাঁ যে 'প্ররোচনাবাদ' প্রস্তাব করেন তাহাতে কোন বস্তুকে গতিশীল রাখিতে হইলে সেই বস্তুর উপর ক্রমাগত বলপ্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, একবার মাত্র বলপ্রয়োগ করিয়া বস্তুটিকে গতিশীল করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা বলেন, বস্তু একবার চলিতে প্ররোচিত হইলে ইহা আপনা হইতেই কিছুক্ষণ গতিশীল থাকিবার গুণ অর্জন করে, ফলে বলপ্রয়োগ বন্ধ হইলেও তাহার চলা বন্ধ হয় না। ইহা অনেকটা উত্তাপের মত। চুল্লী হইতে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে দূরে সরাইয়া লইবার পরও লৌহখণ্ডে যেমন উত্তাপ থাকিয়া যায়, সেইরূপ গতিশীল বস্তু চালক-বিহীন হইয়া পড়িলেও ইহাতে কিছুটা গতি থাকিয়া যায় এবং সেই প্রেরণাবলে ইহা আরও কিছুক্ষণ গতিশীল থাকিতে সক্ষম হয়। প্রশস্তপাদ প্রমুখ ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ গতিশীল বস্তুর যে সংস্কারের কথা আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ১০৫), এই প্রেরণা অনেকটা সেই সংস্কারের মত। নিক্ষিপ্ত তীর এই প্রেরণা বা সংস্কারবশেই গতিশীল থাকে।

প্ররোচনাবাদের ভিত্তিতে পড়ন্ত বস্তুর ব্যাখ্যাও প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা বলেন, পড়ন্ত বস্তু গুরুত্বের জন্য যতই পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকে ততই ইহার গতির প্রেরণা বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্য ইহার বেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হয়। মনে করা যাক, উপর হইতে নীচে একটি বস্তু B বিন্দুতে সুরু করিয়া C বিন্দুতে আসিয়া পড়িতেছে এবং আর একটি বস্তু B হইতে আরও কিছু উপরে A বিন্দু হইতে সুরু করিয়া C বিন্দুতে পড়িতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুটি BC পথ যে সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিবে দ্বিতীয় বস্তুটি তাহা অপেক্ষা কম সময়ে সেই একই পথ নামিয়া আসিবে। তাহার কারণ, অধিকতর উচ্চতা হইতে B বিন্দুতে নামিয়া আসিবার সময় বর্ধিত প্রেরণাবলে দ্বিতীয় বস্তুটির বেগ প্রথমোক্ত বস্তু অপেক্ষা দ্রুততর হইয়া থাকে। এরূপ যুক্তির দ্বারা প্ররোচনাবাদের সমর্থকগণ দেখান যে, পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত বরাবর একটি সুরঙ্গপথ উন্মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে কোন বস্তুকে নিক্ষেপ করিলে বস্তুটি প্রথমেই কেন্দ্রে গিয়া থামিবে না; গতির সংস্কারবশে ইহা কেন্দ্রের উভয় দিকে দোলকের কাঁটার মত কয়েকবার উঠানামা করিয়া শেষে কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া বসিবে। অ্যারিষ্টটলীয় যুক্তিতে এরূপ সম্ভাবনা অচিন্তনীয়।

গতির প্ররোচনাবাদে অক্সফোর্ড ও প্যারীর অল্প কয়েকজন পণ্ডিতই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই গণ্ডীর বাহিরে এই মতবাদ কোনকালেই তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের এসম্বন্ধে উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতে দেখা যায়।

৯·৪। কিমিয়া—রসায়ন

মধ্যযুগে ইউরোপে কিমিয়া সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তি গ্রেকো-মিশরীয় ও আরব্য কিমিয়া। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে পরিচিত হইবার ফলে গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ল্যাটিন ইউরোপীয় জাতিরা যেমন উৎসাহিত হইয়াছিল, কিমিয়াশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং গবেষণার প্রতিও তাহারা সেইরূপ আকৃষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দী হইতেই আরব্য কিমিয়ার চর্চা ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। জার্মানীতে এডেল্‌বার্ট ফন্‌ ব্রেমেনের সভায় (১০৬৩) কয়েকজন কিমিয়া-বিশারদের তৎপরতার উল্লেখ আছে। পল নামে এক ইহুদী (পরে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন) কিমিয়া-বিশারদ তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার এক পদ্ধতির উল্লেখ করেন; তিনি নাকি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন গ্রীসে। এই সময় মাইকেল সেলাস নামে আর একজন বাইজান্‌টাইন পণ্ডিত ইউরোপে প্রাচ্য কিমিয়াবিদ্যা প্রসারে যত্নবান হন। এই সমস্ত তৎপরতা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ইউরোপে মধ্যযুগে কিমিয়া-চর্চার প্রধান অনুপ্রেরণা আসে কিমিয়া সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থের অনুবাদ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। রবার্ট অব চেষ্টার একখানি আরবী কিমিয়ার গ্রন্থ অনুবাদ করেন ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে। সিসিলিতে প্রাপ্ত *Liber luminis luminum* ও অক্সফোর্ডে প্রাপ্ত *De alchemia* গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদক মাইকেল স্কট; এই গ্রন্থদ্বয়ে নানা ধাতু ও লবণ প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা আছে। ইহাদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় যুগে ইউরোপে কিমিয়া-চর্চা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রধান কারণ—এই বিদ্যার প্রতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের ক্রমবর্ধমান কৌতূহল এবং অনুরাগ। অ্যালবার্টাস ম্যাগ্‌নাস, রজার বেকন ও সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস কিমিয়াবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন এবং প্রথমোক্ত দুইজন এই সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট অব বোভে, আর্নাল্ড অব ভিল্লানোভা ও রেমণ্ড লুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কিমিয়া-বিশারদ। ইউরোপে কিমিয়ার চর্চা ও অগ্রগতির জন্য ইঁহাদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভিন্‌সেণ্ট অব বোভে (১১৯০-১২৬৪)

ভিন্‌সেণ্ট অব বোভের খ্যাতি তাঁহার বিরাট বিশ্বকোষ *Speculum majus*-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব সব কিছুই আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে *Speculum naturale* শীর্ষক খণ্ডে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সঙ্গে মণিকবিদ্যা (mineralogy) ও কিমিয়ার অনেক আলোচনা আছে। তিনি কিমিয়াকে মণিকবিদ্যারই এক বিশেষ শাখারূপে মনে করিতেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসা ও লৌহ এই ছয়টি ধাতুর এবং পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও নিশাদল এই চারি প্রকার স্পিরিটের উৎপত্তি মৃত্তিকা-গর্ভে। পারদ ও গন্ধকের যৌগিক মিশ্রণের ফলে নানা প্রকার ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধাতুর রূপান্তরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। স্পর্শমণির সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতুগুলিকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টাই যে কিমিয়ার একমাত্র লক্ষ্য এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আর্নাল্ড অব ভিল্লানোভা (১২৪০-১৩১১)

আর্নাল্ড অব ভিল্লানোভা ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসক; মঁপেলিয়েতে ও বার্সেলোনায় তিনি চিকিৎসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। উপযুক্ত ঔষধের আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসার উন্নতিসাধনকল্পে তিনি কিমিয়া-চর্চায় উৎসাহিত হন। কথিত আছে, আভিনোর অষ্টম পোপ বোনিফেসের জন্য তিনি নাকি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চিকিৎসার্থে

রাসায়নিক দ্রব্যের অধিকতর ব্যবহারের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। *Rosarium philosophorum, De vinis, De venenis* প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি কিমিয়া সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন।

রেমণ্ড লুলি (১২৩০-১৩১৬)

অনেক ঐতিহাসিকের মতে রেমণ্ড লুলি ছিলেন ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর, তথা সমগ্র মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্। তাঁহার গ্রন্থাদির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ আছে। তারপর সমসময়ে রেমণ্ড লুলি নামে একজন বিচক্ষণ বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকের কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুণগ্রাহীরা এই নৈয়ায়িককে 'Doctor Illuminatissimus' নামে অভিহিত করিতেন। কিমিয়াবিশারদ ও নৈয়ায়িক দুই লুলিই এক ব্যক্তি ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিমিয়া সম্বন্ধে নৈয়ায়িক লুলির স্থানে স্থানে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলেন ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

যাহা হউক, লুলি কর্তৃক লিখিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে কিমিয়াশাস্ত্রে এই বিজ্ঞানীর অনুশীলন ও দান সুপরিস্ফুট। এই সকল গ্রন্থে অনার্দ্র কোহল (anhydrous alcohol), নাইট্রিক অ্যাসিড, অম্লরাজ (aqua regia) প্রভৃতি ধাতব অম্লের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ধাতব অম্লের প্রস্তুত-প্রণালীর প্রথম আবিষ্কার অবশ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। এই কৃতিত্ব আরব্য ও ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্দের মধ্যে ঠিক কাহাদের প্রাপ্য, তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। গেবেরের গ্রন্থাবলীর এক জায়গায় ধাতব অম্লের প্রস্তুত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে :

"এক পাউণ্ড হিরাকস (সাইপ্রাসের), অর্ধ পাউণ্ড শোরা ও এক পাউণ্ডের এক-চতুর্থ ভাগ ফটকিরি (জামেনির) লও; বকযন্ত্রের মধ্যে ইহা জলে দ্রবীভূত কর; এইবার ইহাতে এক-চতুর্থ ভাগ নিশাদল দ্রবীভূত করিলে দেখিবে যে দ্রবণটি অনেক বেশী তীক্ষ্ন হইয়াছে।"*

লুলির কিছু পূর্বে গেবেরের প্রতি আরোপিত কিমিয়ার এক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ হইতে লুলি ধাতব অম্লের প্রস্তুত-প্রণালীর কথা জানিয়া থাকিবেন।

স্পর্শমণির গুণাগুণ সম্বন্ধে লুলি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি অতি গর্বের সহিত জাহির করেন যে, সমুদ্র যদি পারদ হইত তিনি পৃথিবীর সমগ্র সমুদ্রভাগকেই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন। শুধু স্বর্ণ প্রস্তুত নহে, স্পর্শমণির সাহায্যে মূল্যবান পাথর, অক্ষয় স্বাস্থ্য ও যৌবন, দীর্ঘজীবন ইত্যাদি সম্ভবপর করা আদৌ দুঃসাধ্য নহে।

গেবের

বিখ্যাত রাসায়নিক জাবির ইব্ন্ হাইয়ান আরব্য কিমিয়ার স্থাপয়িতা। জাবিরের রচনার সহিত ল্যাটিন গেবের নামে আর এক জন কিমিয়াবিদের রচনার নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় অনেকে এই দুই ব্যক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অর-রসিদের সময়ে জাবিরের কর্মতৎপরতা নিবদ্ধ। গেবের কর্তৃক রচিত বলিয়া ল্যাটিন ভাষায় কিমিয়ার যে সকল গ্রন্থের কথা জানা যায় তাহার একটিরও রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বলিয়া মনে হয় না। অ্যালবার্টাস ম্যাগ্নাস বা রজার বেকনের কেহই গেবেরের রচনার কোন উল্লেখ করেন নাই। জাবির ও আল্-রাজি প্রমুখ বিখ্যাত মুসলমান কিমিয়াবিদ্দের

* J. R. Partington, *A Short History of Chemistry*, p. 40.

রচনা, বর্ণনা ও মতবাদের সহিত তথাকথিত গেবেরের রচনাবলীর নিকট সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া অনেকের মনে এই সন্দেহই জাগিয়াছে যে, এই শেষোক্ত রচনাবলী খুব সম্ভব জাবির বা অন্য কোন মুসলমান কিমিয়াবিশারদদের গ্রন্থরাজির তর্জমা বা সম্প্রসারণ মাত্র। অধ্যাপক সার্টন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছেন :

> "Were the Summa and the other Latin treatises translations from the Arabic or elaborations from such translation? It is difficult to say and it does not matter much. Was Geber, as the name would imply, the Persian alchemist Jābir ibn Haiyan? That is, are these Latin treatises translations of the Arabic ones written in the second half of the eighth century by that Jābir?" (*Introduction.*)

জাবির-গেবের প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও কিছু আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৫৬)। এই প্রশ্ন এখন পর্যন্ত প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, গেবেরের নামে প্রচলিত ল্যাটিন গ্রন্থগুলি তৎকালীন কিমিয়া সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই বিজ্ঞানে মধ্যযুগে আরবদের ও খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয়দের জ্ঞানের পরিধি কত দূর বিস্তৃত ছিল তাহা জানিবার পক্ষে এই গ্রন্থগুলি অপরিহার্য। গ্রন্থগুলির নাম : *Summa perfectionis, Liber de investigatione perfectionis, Liber de inventione veritatis sive perfectionis, Liber fornacum,* ও *Testamentum Geberis.* ইহাদের মধ্যে *Summa*-র প্রসিদ্ধিই সর্বাপেক্ষা বেশী। *Summa*-র কয়েকটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল : (১) রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণার পথে কয়েকটি বাস্তব ও মানসিক অন্তরায় : (২) কিমিয়ার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ধাতু-রূপান্তর সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুক্তি ও তাহার ক্ষালন; (৩) ধাতব পদার্থের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক কথা; যেমন সমস্ত ধাতু গন্ধক ও পারদের দ্বারা নির্মিত; মাত্র ছয় প্রকার ধাতুর—স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, টিন, তাম্র ও লৌহের—অবস্থান সম্ভবপর; (৪) কয়েকটি রাসায়নিক পদ্ধতির বর্ণনা—পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, নিম্নপাতন, ভস্মীকরণ, দ্রবণ, তঞ্চন (coagulation), বন্ধন (fixation) ইত্যাদি; (৫) বিভিন্ন পদার্থের প্রকৃতি; এবং (৬) পদার্থের রূপান্তরের উদ্দেশ্যে তাহার প্রস্তুতি এবং এই রূপান্তর যথার্থই সাধিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির আলোচনা, যেমন, জ্বলন, গলন, ভস্মীকরণ, বিজারণ (reduction), বাষ্পীভবন ইত্যাদি। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কিমিয়াশাস্ত্রের ইহা এক অতি বিশদ আলোচনা সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও তথ্যের দিক হইতে আরবী ভাষায় লিখিত প্রচলিত সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে ইহা নিকৃষ্ট।

ধাতু-রূপান্তর ও কিমিয়ার ত্রুটী-বিচ্যুতি

কিমিয়াযুগে ধাতুর রূপান্তর ও নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিবার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ বদ্ধমূল ও ব্যাপক ছিল যে, সমগ্রভাবে ধরিতে গেলে রসায়ন বলিতে আধুনিক কালে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন এই যুগে হয় নাই। বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে রসায়ন বলিতে আমরা বস্তুর সংযুতি, তাহার গঠন-বৈচিত্র্য ইত্যাদির অধ্যয়ন ও গবেষণা বুঝিয়া থাকি। রাসায়নিক গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হইল একদিকে বস্তুর সংযুতি পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মৌলিক উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, অন্যদিকে এই মৌলিক উপাদানগুলির নানা যৌগিক

মিশ্রণ-সংমিশ্রণের দ্বারা নূতন নূতন বস্তু প্রস্তুত করা। এই বিশ্লেষণ ও সংযোজনার অন্তর্নিহিত নীতিগুলির স্বরূপ আবিষ্কার করাও রাসায়নিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্যারাসেলসাস, ভ্যান হেলমন্ট, এগ্রিকোলা প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের গবেষণার পূর্বে রাসায়নিক গবেষণার এই আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত ধারণায় দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি সমাচ্ছন্ন থাকায় বহু শত বর্ষব্যাপী নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যযুগের কিমিয়াবিশারদরা রসায়নের রাজপথটি খুঁজিয়া পায় নাই। স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া গোটা পৃথিবীটাকেই এক দিন সোনার তালে রূপান্তরিত দেখিবার অন্ধ বিশ্বাস তাহাদের এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, বস্তুর বৈচিত্র্য ও তাহার রহস্যজনক সংযুতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তাঁহারা উপলব্ধি করে নাই। সকলেই এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন স্পর্শমণির সন্ধানে ছুটিয়া হয়রান হইয়াছে।

এই বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্য সুপ্রাচীন এবং ইহার বিবর্তনে কতকগুলি কারণও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন মিশরীয়দের সময় হইতে কিমিয়াবিদ্‌রা লক্ষ্য করে যে, ধাতুমাত্রই বিভিন্ন সংযুতির সংকর ধাতু (alloy); অর্থাৎ কয়েকটি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ। অতএব এইসব উপাদানের পরিমাণে তারতম্য ঘটাইয়া ধাতু বিশেষকে অপর একটি ধাতুতে পর্যবসিত করিবার সম্ভাব্যতা সাধারণ যুক্তি। এজন্য আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া যুগ হইতেই দার্শনিকদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সংকর ধাতুর বিভিন্ন উপাদানের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা ধাতুর রূপান্তর সাধন সর্বতোভাবে সম্ভবপর। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সমর্থন করেন। ধাতুর আপাতগঠন সংক্রান্ত উপরিউক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রথিতযশা দার্শনিকদের এইরূপ উচ্চ সমর্থন ধাতুরূপান্তর মতবাদের প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। ইহার পর ধাতুর বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ কিমিয়াবিদ্‌দের জল্পনার বিষয় হইল। অ্যালবার্টাস ম্যাগ্‌নাসের মতে আর্সেনিক, গন্ধক ও জলের সংমিশ্রণে ধাতুর উদ্ভব হইয়া থাকে। ভিল্লানোভা ও লুলি বলেন, পারদ ও গন্ধক ধাতুর সাধারণ উপাদান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিকল্পিত আর একটি মতবাদ অনুসারে পারদ, গন্ধক ও লবণ এই পদার্থত্রয়ের যোগে ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই মতবাদে ধাতুর অন্যতম উপাদান লবণ বলিতে কোন এক যৌগিক পদার্থ বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঘনীভবন, অগ্নিপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি যেসব ধর্ম লবণে বর্তমান এবং যাহা আমরা কোন কোন ধাতুর মধ্যেও লক্ষ্য করি, ধাতুর সেইসব ধর্মের ব্যাখ্যাকল্পে লবণ এক অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। গেবের ধাতুর উপাদান পারদ ও গন্ধকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ভিল্লানোভা, লুলি ও গেবেরের খ্যাতি এইরূপ প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল যে, অতি সহজেই ধাতু সম্বন্ধে তাঁহাদের এই 'পারদ-গন্ধক' মতবাদ সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে।

এই মতবাদ অনুসারে পারদ ও গন্ধকের আপেক্ষিক ভাগের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন একটি ধাতুকে অপর একটি ধাতুতে পরিণত করিতে হইলে এই আপেক্ষিক ভাগের যথাযথ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। জনৈক নকল গেবের লিখিয়াছেন, "যেহেতু সমস্ত ধাতুর উপাদান গন্ধক ও পারদ, ইহার কোন একটি উপাদান কম থাকিলে আমরা তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, অথবা বেশী থাকিলে কতকটা বাহির করিয়া লইতে পারি। এইরূপ ক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলটি প্রয়োগ কর: ভস্মীকরণ, ঊর্ধ্বপাতন, আস্রাবণ, দ্রবণ, পাতন, তঞ্চন, কেলাসন ও বন্ধন। লবণ, ফটকিরি, হিরাকস, তুঁতিয়া, সোহাগা, তীব্রতম সির্কা ও অগ্নি (এইরূপ ক্রিয়ার) সক্রিয় কারক।"*

ধাতুর রূপান্তর সম্ভবপর করিবার জন্য বিভিন্ন মাত্রার 'ঔষধ' প্রয়োজন। প্রথম মাত্রার ঔষধ প্রয়োগে নিকৃষ্ট ধাতুর মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধন করা যায়, তবে এই পরিবর্তনের কোন স্থায়িত্ব

* Ernst von Meyer, *A History of Chemistry.*

পরশ পাথর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সংকেতের আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি জার্মান কিমিয়া-গ্রন্থে ইহা প্রদত্ত। (*Endeavour*, July, 1948).

গবেষণাগারে কর্মরত কিমিয়াবিদ্—তেনিয়ের্স কর্তৃক অঙ্কিত। (*Endeavour, July*, 1945).

PLATE VI
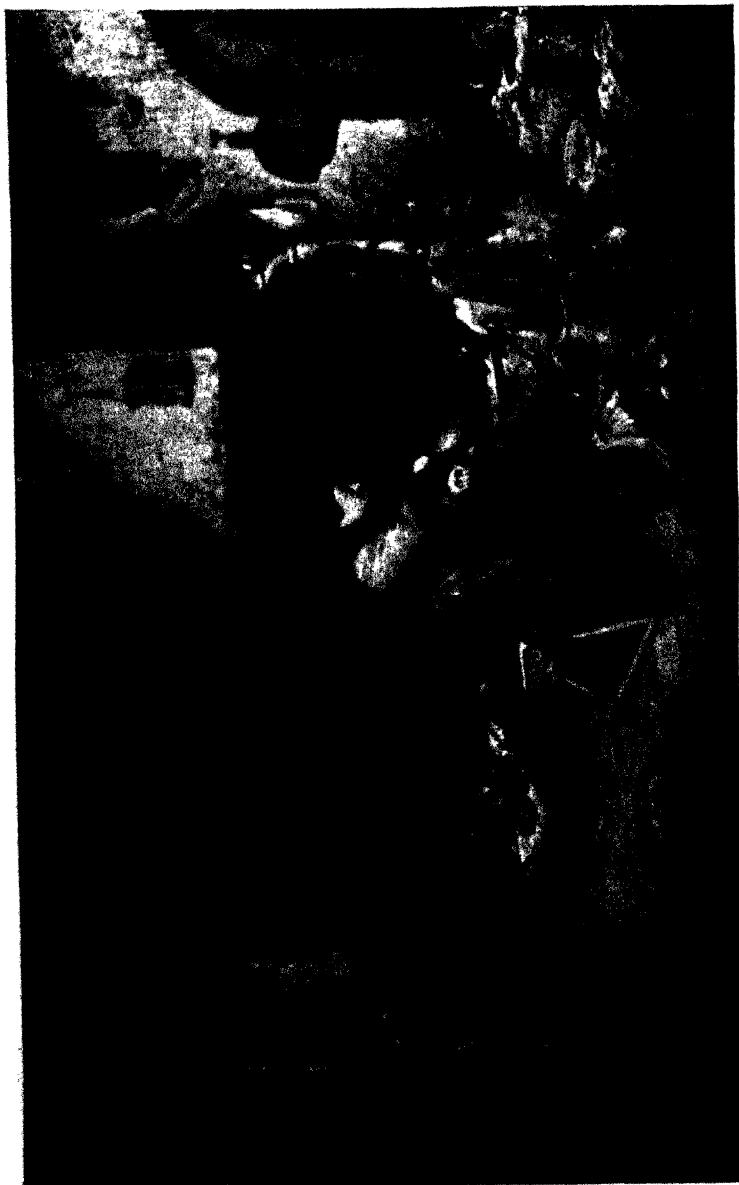
গবেষণাগারে কর্মরত কিমিয়াবিদ্‌—অস্টেড কর্তৃক অংকিত (ন্যাশন্যাল গ্যালারি, ইংল্যান্ড)। (*Endeavour*, October, 1942).

পরশ পাথর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সংকেতের আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি জার্মান কিমিয়া-গ্রন্থে ইহা প্রদত্ত। (*Endeavour*, July, 1948).

গবেষণাগারে কর্মরত কিমিয়াবিদ্‌—তেনিয়ের্স কর্তৃক অঙ্কিত। (*Endeavour, July*, 1945).

করেন নাই। বয়েল, গ্লাউবের, কুনকেল, ষ্টাহ্‌ল, বোয়েরহাভে প্রমুখ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাসায়নিকগণ আংশিকভাবে কিমিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজকীয় অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা কিমিয়ার প্রতিপত্তির আর এক প্রধান কারণ। এই ব্যাপারে জার্মান রাজন্যবর্গ কিমিয়াবিদ্‌দের এক সময়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া রাতারাতি প্রচুর ঐশ্বর্যলাভের লোভ এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার মূলে বিদ্যমান। সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ, স্যাকসনির ইলেক্টর অগাস্টাস, ব্র্যানডেনবুর্গের ইলেক্টর জন জর্জ কিমিয়ার পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্বর্ণ-প্রস্তুতের আশায় বা দুরাশায় ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজকোষ প্রায় উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে কিমিয়াবিদ্‌দের ব্যর্থতা ও বুজরুকি লোকে বুঝিতে পারিল। কিমিয়াবিদ্‌ বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক ধুরন্ধর জুয়াচোর বহু লোকের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, বহু লোককে সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িয়াছিল। এইসব প্রবঞ্চককে শায়েস্তা করিবার জন্য কিমিয়া সম্বন্ধে নানা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ সময় পোপ জন (Pope John XXII) কিমিয়ার চর্চা নিষিদ্ধ করিয়া এবং এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের কঠিন দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া কতকগুলি আদেশ জারি করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, এইরূপ আদেশজারির ফলে কিমিয়ার চর্চা ব্যাহত হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির পথ বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক সার্টন দেখাইয়াছেন* সমগ্রভাবে কিমিয়ার চর্চা ও গবেষণা বন্ধ করা এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি শুধু প্রবঞ্চক স্বর্ণ-প্রস্তুতকারকদের শায়েস্তা করিতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শুধু কিমিয়া-বিদ্যা নহে, যাদুবিদ্যা, যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকপাঠ প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের উপরেও এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছিল।

কিমিয়াযুগের স্বপ্ন একেবারে বৃথা হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে রাদারফোর্ড, কুরি-জোলিও, সিবোর্গ প্রমুখ আণবিক গবেষকদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে ধাতুরূপান্তর সম্ভবপর হইয়াছে, এমন কি পৃথিবী-বহির্ভূত ইউরেনিয়ামপারের (trans-uranic) কয়েকটি সম্পূর্ণ নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহা মধ্যযুগীয় কিমিয়া-পদ্ধতিতে নহে।

ধাতু ও যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান

কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য কিমিয়াবিশারদদের বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যম নিষ্ফল হইলেও সমগ্রভাবে রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতির দিক দিয়া বিচার করিলে এই পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা একেবারে বৃথা হইয়াছিল, একথা বলা চলে না। ধাতুরূপান্তর সাধনকল্পে অমোঘ পরশপাথরের বা তৃতীয় মাত্রার 'ঔষধে'র সন্ধানে কিমিয়াবিশারদরা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সর্বপ্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থের উপর সম্ভাব্য সর্বপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপক পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু, ধাতু-নিষ্কাশন, ক্ষার, লবণ, অম্ল প্রভৃতি নানা যৌগিক সম্বন্ধে কিমিয়াবিশারদরা যে অনেক নূতন তথ্য সঞ্চয় ও সমগ্রভাবে রাসায়নিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ ফলিত রসায়নে মধ্যযুগের কিমিয়াবিদ্‌দের অবদান অবহেলিত হইবার নহে।

স্বর্ণ : প্রথমে ধাতু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যার কথাই ধরা যাক। অতি প্রাচীন-কাল হইতে সুপরিচিত স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র, টিন, পারদ প্রভৃতি ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন উন্নীত হইয়াছিল দস্তা, অ্যান্টিমনি, বিসমথ প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ধাতুও এইযুগে আবিষ্কৃত হয়। মধ্যযুগে পুরাতন 'কিউপেলেশন' (cupellation) পদ্ধতিতে স্বর্ণ-শোধনের ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়; নকল গেবের এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শোরার ব্যবহারে এই শোধনকার্য যে বিশেষভাবে ত্বরিত হয় তাহা মধ্যযুগেই প্রথম

* Sarton, *Introduction*, Vol. III ; p. 167.

PLATE V

পরশ পাথর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সংকেতের আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি জার্মান কিমিয়া-গ্রন্থে ইহা প্রদত্ত। (*Endeavour*, July, 1948).

গবেষণাগারে কর্মরত কিমিয়াবিদ্—তেনিয়ের্স কর্তৃক অঙ্কিত। (*Endeavour, July*, 1945).

একদিকে তুঁতিয়া, হিরাকস, শোরা, সোডা, ফটকিরি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন বুঝাইত, অন্যদিকে নানা জাতের ক্ষার ও অম্ল ছিল এই 'sal' জাতীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বিভিন্ন লবণের নামকরণে আমরা নামের আদিতে 'sal' কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই; যেমন, sal petrae, sal maris ইত্যাদি। এই দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি যে আবার উদ্বায়ী (volatile) তাহা লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাদের এই বিশেষ গুণ যাহাতে নামকরণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয় তদুদ্দেশ্যে আর একটি সাধারণ কথা spiritus -এর ব্যবহার দেখা যায়। উদ্বায়ী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অভিহিত হইত spiritus salis কথার দ্বারা, অ্যামোনিয়ম কার্বনেট জাতীয় উদ্বায়ী ক্ষারীয় (alkaline) লবণের নাম দেওয়া হয় spiritus urinae ।

যেসব অ্যাসিডের সহিত কিমিয়াবিদ্‌দের পরিচয় ছিল তন্মধ্যে সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অম্লরাজ প্রধান। এক সময়ে ধরাণা ছিল, এই সকল অজৈব অ্যাসিডের প্রথম আবিষ্কর্তা আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা। *De inventione veritatis* নামে যে গ্রন্থটি গেবের কর্তৃক লিখিত বলিয়া অনুমিত হয় তাহার এক স্থানে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থটির রচনাকাল এখন চতুর্দশ শতাব্দী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। তথাপি গেবেরের রচনাবলীর উপাদান আরব্য কিমিয়া হইতে প্রধানতঃ গৃহীত, এইরূপ মতে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের পক্ষে আরবরাই যে প্রথম ধাতব অম্লের আবিষ্কর্তা ইহা সমর্থন করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে, আবু মনসুরের মত বিখ্যাত কিমিয়াবিদের রচনায় ধাতব অম্লের কোন উল্লেখ না থাকায় দশম শতাব্দীতে আরবরা সত্য সত্যই ধাতব অম্লের কথা জানিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের অভিমত, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কিমিয়াযুগের শেষভাগে ধাতব অম্লের প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাগুণ আবিষ্কৃত হয়।

সালফিউরিক অ্যাসিড : ফটকিরি উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে যে এক প্রকার উদ্বায়ী স্পিরিট নির্গত হয় এবং এই স্পিরিটের যে বিশেষ দ্রাবক-ক্ষমতা আছে গেবেরের সময় তাহা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী কিমিয়াবিদ্‌রা এই উদ্বায়ী স্পিরিটের ধর্ম আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। হিরাকস ও পাথরের কুচি হইতে পাতন-ক্রিয়ার দ্বারা এবং গন্ধক ও শোরার মিশ্রণে অগ্নি-সংযোগ করিয়া এই স্পিরিট উৎপাদনের আরও কতকগুলি পদ্ধতির বর্ণনা এই যুগে পাওয়া যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড বা তুঁতিয়ার রসকে (oil of vitriol) অনেকে sulphur philosophorum নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা ছিল, পরশ-পাথর উৎপাদনকল্পে যে প্রাথমিক উপাদান বা materia prima-র প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক উপাদান প্রস্তুত করিতে সালফিউরিক অ্যাসিড অপরিহার্য।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও অম্লরাজ : হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আবিষ্কৃত হইয়াছিল অনেক পরে, সম্ভবতঃ কিমিয়াযুগের শেষভাগে। সাধারণ লবণ ও হিরাকসের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া spiritus salis উৎপাদনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবিধ ধাতু ও তাহাদের অক্সাইডের উপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা হইতেই সম্ভবতঃ নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের তীব্র দ্রাবক ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। নাইট্রিক অ্যাসিডে স্যাল্‌মিয়াক দ্রবীভূত করিয়া নকল গেবের উপরিউক্ত অ্যাসিডদ্বয়ের মিশ্রণ বা অম্লরাজ (aqua regis, বর্তমান aqua regia) প্রস্তুত করেন। ধাতুরাজ স্বর্ণকে পর্যন্ত দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া অম্লরাজের উপর কিমিয়াবিদ্‌রা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। সমস্ত ধাতু ত বটেই, এমন কি গন্ধক পর্যন্ত এই দ্রাবকে নিঃশেষিত হইয়া যায়। সবকিছু দ্রবীভূত করিতে সক্ষম এইরূপ এক সার্বভৌম দ্রাবক alkahest-এর সন্ধানে কিমিয়াবিদ্‌রা বহু পরীক্ষা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অম্লরাজের আবিষ্কারে তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, ইহাই সেই বহু প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত সার্বভৌম দ্রাবক অ্যাল্‌কাহেস্ট।

পরশ পাথর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য সংকেতের আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি জার্মান কিমিয়া-গ্রন্থে ইহা প্রদত্ত। (*Endeavour*, July, 1948).

গবেষণাগারে কর্মরত কিমিয়াবিদ্—তেনিয়ের্স কর্তৃক অঙ্কিত। (*Endeavour, July*, 1945).

অ্যাসিড ও তাহার উগ্র গন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ অ্যালবার্টাস প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ ইহাদের সমশ্রেণীভুক্ত গণ্য করেন।

কোহল : কিমিয়াযুগে জৈব পদার্থ সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কোহল-পাতন-পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা মধ্যযুগে ল্যাটিন ইউরোপের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আমরা দেখিয়াছি, গোলাপ জল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যাপারে আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পাতন-যন্ত্রের ও পাতন-প্রণালীর যেরূপ উন্নতি ঘটিলে এজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর সেরূপ উন্নতিসাধন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোহল-পাতন-পদ্ধতির আবিষ্কার কোন মুসলমান কিমিয়াবিদের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। আবু মনসুর, ইব্‌ন্ সিনা, আবুল কাশিম প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের রচনায় পাতন সম্বন্ধে বহু আলোচনা থাকিলেও কোহল-পাতনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কোহল-পাতনের প্রথম নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর দুইটি রাসায়নিক পাণ্ডুলিপিতে।* একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় দক্ষিণ জার্মানীর ভাইসেনাউ-এর এক খ্রীষ্টান আশ্রমে, দ্বিতীয়টি ইতালীর তাস্কানি প্রদেশে সান গিমিনানো নামক স্থানে। এই দুই পাণ্ডুলিপিতে কোহলকে aqua ardens ও Brennendes Wasser নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময় জার্মানীতে অথবা ইতালীতে, হয়ত বা উভয় দেশে একই কালে স্বাধীনভাবে, কোহল-পাতন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যালবার্টাস ম্যাগ্‌নাস, ভিল্লানোভা ও লুলির রচনায় কোহলের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। সিসিলির সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নামে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থে ভিল্লানোভা কোহল-পাতনের বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কোহলকে aqua ardens ছাড়া aqua vitae নামেও অভিহিত করেন। তাঁহার এই বর্ণনা হইতে এক সময় পণ্ডিতদের ধারণা হইয়াছিল, কোহল-পাতন সম্ভবতঃ ভিল্লানোভারই আবিষ্কার; পরে অবশ্য এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়। ভিল্লানোভার সমসাময়িক রেমণ্ড লুলি তাঁহার *Testamentum novissimum* -এ কোহল-পাতন আরও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বার বার পাতনের দ্বারা অধিকতর গাঢ় কোহল প্রস্তুতের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর গলান পটাশ লবণের সাহায্যে কোহলকে নিরুদিত (dehydrated) করিবার উপায়, কোহলের দ্রাবক-ক্ষমতা, নানা অজৈব যৌগিকের উপর ইহার ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাতেও *Testamentum* সমৃদ্ধ। এইসব আলোচনা হইতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিল্লানোভা ও লুলির সময় কোহল-পাতন ইউরোপীয় কিমিয়াবিদ্ মহলে ব্যাপক-ভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

সালফিউরিক, নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত কোহলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মিষ্ট গন্ধযুক্ত যে ইথরের উদ্ভব হইয়া থাকে ইহা কিমিয়াবিদ্‌রা লক্ষ্য করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কতকগুলি যৌগিক প্রস্তুত হইতেছে তাহা কিমিয়াবিদ্‌রা ঠিক ধরিতে পারে নাই। কোহল শুধু মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এটুকু মাত্র বলিয়াই প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়া হইয়াছিল।

সির্কাম্ল : কোহল প্রস্তুতের মত সির্কাম্লের সন্ধান (acetic fermentation) হইতে উদ্ভূত নানা রাসায়নিক দ্রব্যের গবেষণাতেও এই সময়কার কিমিয়াবিদ্‌দের উৎসাহ বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যযুগের শেষের দিকে পাতন-ক্রিয়ার দ্বারা সির্কাম্ল ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সির্কাম্লজাত কয়েকটি জৈব লবণও এই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। আবু মনসুর ফল ও উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে প্রাপ্ত ট্যানিক অ্যাসিডের

* A. J. Liebmann, 'History of Distillation,' *Journal of Chemical Education*, April, 1956 ; p. 169.

উল্লেখ করেন। ইক্ষুশর্করার কথা মধ্যযুগের অনেক পূর্ব হইতেই অবশ্য জানা ছিল। এই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যটির ব্যবহার কেবলমাত্র ঔষধ হিসাবেই নিবদ্ধ ছিল।
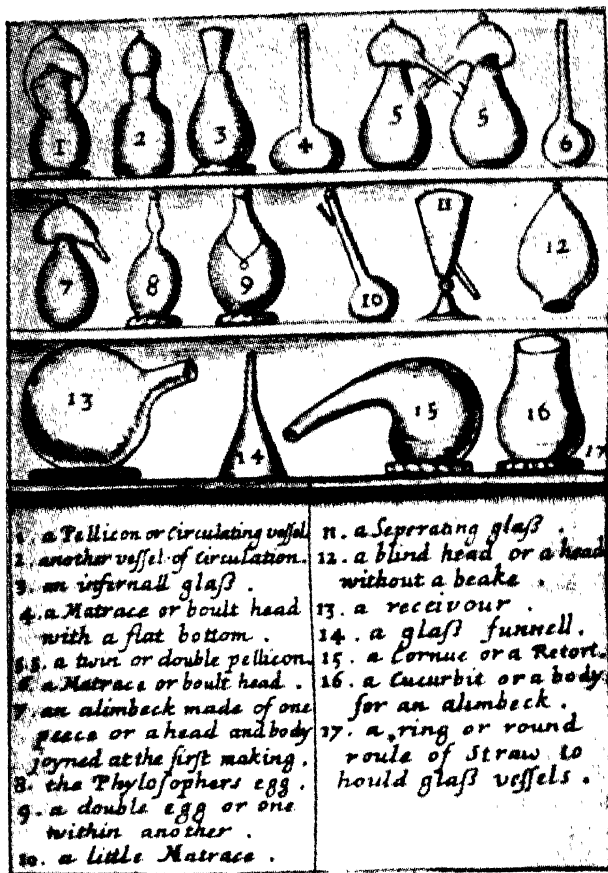
৩৯। মধ্যযুগে কিমিয়া-চর্চায় ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রপাতি। *A Compleat Body of Chemistry* গ্রন্থে (প্রকাশ-কাল—সপ্তদশ শতাব্দী) এই যন্ত্রপাতির বর্ণনা ও রেখাঙ্কন প্রদত্ত।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি : মধ্যযুগে রাসায়নিক গবেষণার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে চুল্লী, রিফ্লাক্স কন্‌ডেন্‌সার ও পাতন-যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কোনটিই অবশ্য মধ্যযুগীয় আবিষ্কার নহে। গ্রীক, হিন্দু ও আরব্য কিমিয়াবিদ্‌রা এই সকল যন্ত্রের কথা জানিত। আমরা দেখিয়াছি, কোহল পাতন-পদ্ধতি মধ্যযুগের এক প্রধান আবিষ্কার। পাতন-পদ্ধতির অধিকতর ও ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পাতন-যন্ত্রের ও কন্‌ডেন্‌সারের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থার দ্বারা উন্নত উপায়ে পাতনের পর

বাষ্পকে ঘনীভূত করা সম্ভবপর হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত *A Compleat Body of Chymistry* গ্রন্থে প্রদত্ত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির নমুনা দেওয়া হইল (৩৯নং চিত্র)।
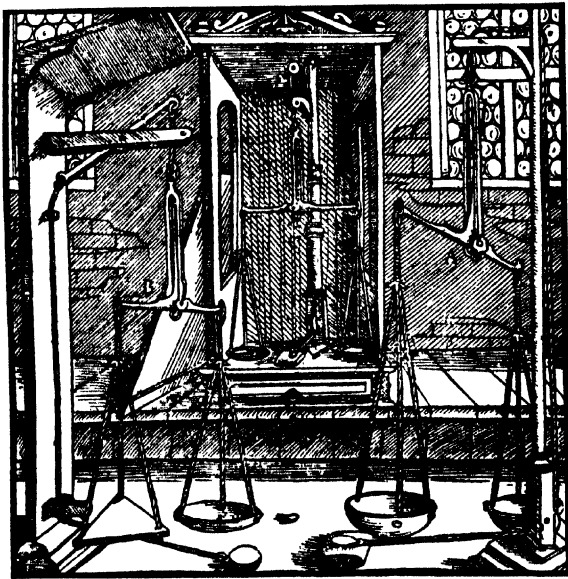
৪০। রাসায়নিক তুলাদণ্ড—এগ্রিকোলার *De re metallica* হইতে।

তুলাদণ্ডের ব্যবহারও সুপ্রাচীন। ঔষধ ব্যবসায়ী, সোনা-রূপার বিক্রেতা এবং কিমিয়াবিদ্‌রা ব্যবসায় ও গবেষণার কার্যে তুলাদণ্ডের আর সেই সঙ্গে নির্ভুল ওজনের ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী হইতে রাসায়নিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ ধরনের তুলাদণ্ডের প্রচলন দেখা যায়। কলোন, নুরেম্‌বার্গ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ তুলাদণ্ড নির্মিত হইত। *De re metallica* (১৫৫৬) গ্রন্থে প্রদত্ত রাসায়নিক তুলাদণ্ডের একটি নমুনা (৪০নং চিত্র) এখানে দেখানো হইল।

ইউরোপীয় রেণেশাঁস : আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব

(১৪০০-১৬০০)

দশম অধ্যায়

১০·১। রেণেশাঁসের অর্থ, ব্যাপ্তি ও কারণ

রেণেশাঁসের অর্থ

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রথমে ইতালীতে এবং পরে জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্মব্যবস্থা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য-চর্চা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য ইত্যাদি মানব-তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়, যে নব ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপীয়দের সকল কর্মে, চিন্তায় ও সাধনায় মূর্ত হইয়া উঠে, সংক্ষেপে তাহারই নাম রেণেশাঁস। রেণেশাঁসের শব্দার্থ পুনর্জন্ম। ইহা কিসের পুনর্জন্ম? রাজনীতির ঐতিহাসিক মনে করেন, ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন রাজনৈতিক চেতনার পুনর্জন্ম, যাহার ফলে মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া ইউরোপের সর্বত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন 'নেশন' বা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। সমাজ ও অর্থ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে সামন্ততন্ত্রের ও জায়গিরদারি প্রথার বিলোপ এবং তৎপরিবর্তে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও ক্রমে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রেণেশাঁসের প্রধান তাৎপর্য বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা খৃষ্টধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে উৎসাহী রেণেশাঁসের কথা উঠিলে আপনা হইতেই তাঁহারা 'রিফর্মেশন' বা ধর্ম-সংস্কারের বিরাট ও সুদূরপ্রসারী আন্দোলনকে স্মরণ করিবেন। বিজ্ঞানী দেখিবেন, এই রেণেশাঁসের সময়ই আধুনিক বিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যিনি সাহিত্যরসিক, ভাস্কর্যে ও শিল্পকলায় যাঁহার গভীর অনুরাগ, পেত্রার্কা ও বোক্কাচ্চিওর রচনায় তিনি এক নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি লক্ষ্য করিবেন, বত্তিচেলি, ডুরের, রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তিনি দেখিবেন কেমন করিয়া মাত্র কয়েকজন ক্ষণজন্মা প্রতিভার যাদুস্পর্শে সমগ্র শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের কী যুগান্তর ঘটিয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, এই সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল মানবতার আহ্বান। সুদূর অতীতে গ্রীক মনীষী ও শিল্পিগণ এই মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়াই অপূর্ব সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ভাস্কর্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রেণেশাঁসের সময় এই মানবতার পুনর্জন্মের পর হইতেই আমরা দেখি কর্ম ও চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপের অগ্রগতি অপ্রতিহত।

বস্তুতঃ রেণেশাঁস সর্ববিধ মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক জটিল আন্দোলন। সামন্ততন্ত্র, পোপতন্ত্র ও এই দুই শক্তির অনুগ্রহ-পুষ্ট খৃষ্টীয় পণ্ডিতের দল এক জোটে যে জীবন-দর্শন, প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিকায় জীবনের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও পরিণাম সম্বন্ধে যে ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করিয়া এক অচলায়তন ব্যবস্থাকে কায়েমী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, রেণেশাঁসের আন্দোলন সেই জীবন-দর্শন, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই বড় কথা। ইহা সহজে বড় বদলায় না, কিন্তু একবার বদলাইলে সব কিছুই তখন ওলট পালট হইয়া যায়। জন্মাবধি যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট রংএর চশমার মধ্য দিয়া পৃথিবীকে দেখিতে অভ্যস্ত হঠাৎ একদিন চশমার কাচের রং বদলাইয়া গেলে তাহার যে অভিজ্ঞতা হয় ইহা অনেকটা সেইরূপ। এতদিন নিজেকে ও জগৎকে যেভাবে দেখিবার কথা স্বপ্নেও মনে হয় নাই দৃষ্টিভঙ্গীর এরূপ পরিবর্তনের ফলে সেইভাবে দেখাই এখন মানুষের পক্ষে একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হইল।

পুরাতন মুখ, পরিচিত ব্যবস্থা, স্বীকৃত মত, বদ্ধমূল সংস্কার একে একে নূতন রূপে, নূতন সংশয়ে ও অনিশ্চয়তায় ধরা দিল। নিজেকে ও পৃথিবীকে মানুষ আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল।

মধ্যযুগে মানুষ এই নিজেকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ঘটিয়াছিল তাহার আত্মার ও ব্যক্তিত্বের। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হইল বশ্যতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম-জীবনে বিনা প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের অনুশাসন মানিয়া চলা এবং আদেশ পালন করাই মানুষের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বিরাট প্রতিষ্ঠানের একটি নগণ্য অংশরূপে এবং কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছিল; ইহার বাহিরে নিজের জন্য মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী পবিত্র ধর্মসংস্থা যে চরম স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। স্বর্গদ্বারের সজাগ প্রহরী হিসাবে তাহার প্রাথমিক কর্তব্যই ছিল মানুষের প্রতিটি কর্ম ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা, ধর্মসংস্থা যাহা আদেশ দিবে তাহা পালন করিতে এবং যাহা শিখাইবে তাহা বিশ্বাস করিতে নরনারীকে বাধ্য করা। ইহার বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমাহীন শাস্তি ছিল ভয়ংকর।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও মননশীলতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের বিস্ময়কর প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই প্রয়াস হইতে অবশ্য বিশেষ কোন নূতন জ্ঞান, নূতন আবিষ্কার সম্ভবপর হয় নাই। তবে কত সূক্ষ্ম যুক্তিজাল রচনা করিয়া একই কথা যে কত বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা যায়, পণ্ডিতদের জ্ঞান-চর্চা তাহার এক অতুলনীয় উদাহরণ। কার্লাইল ব্যঙ্গচ্ছলে এই দার্শনিকদের সেই মুসলমান ফকিরদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহারা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অসম্ভব দ্রুতবেগে অনবরত পাক খাইয়া যাইতে পারে। ইহা এক অতি দুরূহ ও আশ্চর্য কসরত সন্দেহ নাই; তবে যেখান হইতে পাক খাওয়া সুরু সেখানেই তাহাকে শেষ পর্যন্ত থামিতে হয়। কোন এক উৎসাহী ছাত্র একবার সূর্যের দেহে কাল দাগ অর্থাৎ সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করিয়া একথা তাহার প্রবীণ অধ্যাপককে জানাইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "বৎস! আমি বহুবার অ্যারিস্টটলের গ্রন্থরাজি পড়িয়া শেষ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও এজাতীয় বিষয়ের এতটুকু উল্লেখ দেখি নাই। যাও, শান্তিতে গিয়া বিশ্রাম কর এবং নিশ্চিত জানিও, যে দাগ তুমি দেখিয়াছ আসলে ইহা সূর্যের নহে ইহা তোমার নিজের চোখেরই কোন দাগ হইবে।" অ্যারিস্টটলের বাহিরে, বিশেষতঃ অ্যারিস্টটলীয় জ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয়ের ভিত্তিতে পণ্ডিতগণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন তাহার বাহিরে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা নিরর্থক ও বাতুলতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; ইহাতে সংশয় পোষণের অর্থ দাঁড়াইয়াছিল নাস্তিকতা, চরম ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার শিক্ষার বিরোধিতা।

এজন্য রেনেশাঁসের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হইয়াছিল মননশীলতার এই উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ, সর্ব বিষয়ে চিন্তার স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নির্দিষ্ট জ্ঞান ও ঐতিহ্যের সাজানো প্রকোষ্ঠে যুগের পর যুগ দিন গুণিতে গুণিতে মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিল। অনির্দিষ্ট পথ ও অনিশ্চিত ভাগ্যের আকর্ষণ ক্রমশঃই দুর্বার হইয়া উঠিল। এই গণ্ডীর বাধা অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত পথের বাহিরে পা বাড়াইবামাত্র মানুষ অনুভব করিল দিকে দিকে জীবনের বিচিত্র আহ্বান, বিস্মিত হইয়া দেখিল এক সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবী অপূর্ব সম্ভাবনীয়তায় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

রেনেশাঁসের ব্যাপ্তি—কয়েকটি প্রধান ঐতিহাসিক তারিখ

রেনেশাঁসের সূচনার ও সমাপ্তির কোন নির্দিষ্ট ও একক ঐতিহাসিক তারিখের উল্লেখ সম্ভবপর নহে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দুইশত

বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় ছিল, মোটামুটিভাবে এরূপ বলা যায়। এই বিস্তৃত কালের মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীদের হাতে কনস্তান্তিনোপলের পতন। রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর হইতে মুসলিম প্রাধান্য বিস্তার পর্যন্ত বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের পূর্ব সাম্রাজ্য এতদিন প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করিতেছিল; তুর্কীদের আক্রমণে সহসা তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ছয়শত বৎসর যাবৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপ যে পশ্চিম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিল, তাহাও নির্মূল হইল। এইসব ঘটনাস্রোতের পরিপ্রেক্ষিতে রোমের ধর্মসংস্থা নিতান্তই অসহায় ও দুর্বল মনে হইল, আর বুঝা গেল সব দিক হইতে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কনস্তান্তিনোপল পতনের আর একটি গুরুত্ব এই যে, বহু গ্রীক পণ্ডিত ও শিক্ষক এই সময় প্রাচীন পুঁথিপত্রসহ বাইজাণ্টিয়াম পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের বিভিন্নাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে উদ্বাস্তু বাইজাণ্টাইন গ্রীক পণ্ডিতদের আগমনে গ্রীক ভাষা-চর্চার এবং মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি পড়িবার ও তর্জমা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পেত্রার্কার (১৩০৪-৭৪) সময় হইতে মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি হইতে গ্রীক সাহিত্যের রসাস্বাদনের যে স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল এবং তদুদ্দেশ্যে গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের যে হিড়িক পড়িয়া যায়, ইতালীতে ও পশ্চিম ইউরোপে বাইজাণ্টাইন পণ্ডিতদের আগমনে এই সংগ্রহ-কার্যে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

রেনেশাঁস সম্পর্কিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আমরা পাই ১৪৯২-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকা আবিষ্কার, স্পেনের প্রাধান্যলাভ, ভারত মহাসাগরে ইউরোপীয় নাবিকদের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা যুগান্তকারী ঘটনা এই কয়েকটি বৎসরকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই সময় ইতালীতে অষ্টম চার্লসের সামরিক অভিযানের ফলে ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানিস জাতিদের পক্ষে এই মহামূল্য উপদ্বীপের কর্তৃত্ব লাভের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়। রেনেশাঁসের প্রথম ফসল ফলিয়াছিল ইতালীর মৃত্তিকায়; জ্ঞানে, কর্মে ও নূতন ভাবধারার অভিনবত্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালী ছিল ইউরোপের পুরোভাগে। এখন পশ্চিম ইউরোপের জাতিরা সেই ফসল ভোগ করিবার জন্য হাত বাড়াইল।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য তারিখ কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় গ্রন্থ *De revolutionibus*-এর ও ভেসালিয়াসের শারীরস্থান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ *De fabrica*-র প্রকাশ-কাল ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে প্রস্তাবিত যে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার ভিত্তিতে এতদিন জ্যোতিষীয় তথ্যের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছিল, এখন দেখা গেল গোটা মতবাদটাই ভুল। সেইরূপ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন মানুষের দেহযন্ত্রের ও শারীরবৃত্তের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহাতে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, *De fabrica*-য় সেই চিত্রেরই কয়েকটি প্রধান অসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল। কেবল জ্যোতিষে ও শারীরস্থানে প্রচলিত মতবাদের অসঙ্গতি প্রদর্শন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণার জন্য গ্রন্থ দুইটির গুরুত্ব নহে। এই দুই গ্রন্থের প্রকাশনে প্রাচীন জ্ঞানের অভ্রান্ততায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এক রূঢ় আঘাত লাভ করিয়াছিল। এজন্য পূর্বে একবার যেমন বলিয়াছি (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০-১১), ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ রেনেশাঁসের একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখই শুধু নহে, কোন একটি বিশেষ বৎসরে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সীমারেখা যদি আদৌ টানিতে হয় তবে তাহা এই বৎসরই টানা উচিত।

রেনেশাঁসের কয়েকটি প্রধান কারণ

আমরা যে ব্যাপক অর্থে রেনেশাঁসকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এই বিরাট ঐতিহাসিক বিবর্তনের যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিলাম তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই আন্দোলন

কোন একক কারণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই। বহু কারণ, বহু বিচিত্র অবস্থার একত্র সমাবেশ এই আন্দোলনের বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও এক বণিক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, সামুদ্রিক অভিযান ও তাহার ফলে নূতন মহাদেশ আবিষ্কার, গ্রীক সাহিত্য ও ভাস্কর্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, কম্পাস, কাগজ, মুদ্রণ, যান্ত্রিক ঘড়ি, বারুদ প্রভৃতি কারিগরি আবিষ্কার ইউরোপীয় রেনেশাঁসের কয়েকটি প্রধান কারণ। এইসব কারণ আবার পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কম্পাসের আবিষ্কার ও জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে ইহার প্রয়োগ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানগুলিকে সম্ভবপর করিয়াছিল। নূতন গোলার্ধ আবিষ্কারে ইউরোপীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়। গ্রীক সাহিত্যের পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করিয়া যে ব্যাপক বিদ্যোৎসাহিতা রেনেশাঁসের সময় পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রধানতঃ সম্ভবপর হইয়াছিল কাগজ ও মুদ্রণের কল্যাণে।

মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ

এরেনবার্গ,* ক্রাউথার,† বার্ণাল,‡ প্রমুখ লেখকগণ দেখাইয়াছেন, মধ্যযুগে সহর ও বন্দরের পত্তন, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার, সর্বোপরি মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও মূলধনের বিনিয়োগ রেনেশাঁসের এক প্রধান কারণ। সামন্ততন্ত্র শাসিত সমাজে কৃষিই হইল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির একটি সাধারণ সত্য এই যে, ইহাতে উৎপাদন মোটামুটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থাকে; ফলে সর্বপ্রকার লেন-দেনের ব্যাপারে দ্রব্য-বিনিময়ই যথেষ্ট। এমত ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রয়োজন যেমন সীমাবদ্ধ মূলধন বিনিয়োগের সুযোগও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ এবং মূলধন বিনিয়োগের তেমন সুযোগ না থাকায় সুদে অর্থলগ্নির কারবার অন্যায় বলিয়া পরিগণিত। তথাপি দশম ও একাদশ শতাব্দী হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিতে থাকিলে অনিবার্য কারণেই ব্যবসায়ীদের তহবিলে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। সুদে অর্থ খাটানো খ্রীষ্টধর্মসংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেক সময় জমি, স্বর্ণদ্রব্য অথবা মূল্যবান মণিমুক্তা বন্ধক রাখিয়া সামন্ত রাজাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনে অর্থ ধার দেওয়া হইত। কিন্তু এ ধরনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় ব্যবসায়ীদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সুরাহা হইতে পারে নাই। এই অর্থ প্রায় ক্ষেত্রেই জলে গিয়াছে। রাজানুগ্রহ, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার আশায় এইভাবে অর্থ ধার দিতে গিয়া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিকাংশ মহাজনই দেউলিয়া হইয়াছিল। ইহুদীদের পক্ষে সুদ গ্রহণের কোন ধর্মীয় বাধা না থাকায় লাভজনক কারবারে অর্থলগ্নির ব্যাপারে ইহুদী ব্যবসায়ীরা অবশ্য অগ্রণী হইয়াছিল। এজন্য খ্রীষ্টান ইউরোপে সমগ্র মধ্যযুগে ইহুদীদের বড় কম নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। এরেনবার্গ লিখিয়াছেন, সুদে অর্থলগ্নির অপরাধে ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক অত্যাচারের লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

অর্থলগ্নির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুশাসন অপেক্ষাও বড় কথা হইল সামন্ততন্ত্রী ব্যবস্থায় মূলধন বিনিয়োগের সুযোগের অভাব। এই সুযোগ নিশ্চিতভাবে প্রথম উপস্থিত হয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত উত্তর ইতালীর বণিকদের নিকট। ধর্মযুদ্ধের সময় হইতে ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দর ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকিলে এইসব বন্দরের বিত্তশালী বণিকরা লাভজনক আমদানি-রপ্তানির কারবারে মূলধন বিনিয়োগের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে লাভবান হইতে

*Richard Ehrenberg, *Capital and Finance in the Age of Renaissance,* trans., H. M. Lucas (1928).

† J. G. Crowther, *The Social Relations of Science.*

‡ J. D. Bernal, *Science in History.*

হইলে স্থানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন এবং গুণের দিক হইতেও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমোন্নতি সাধন অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, ইহাই মূলধন বিনিয়োগের প্রধান প্রেরণা। তাই উত্তর ইতালীর বাণিজ্যিক তৎপরতা সুরু হইবার অল্পকালের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই কাচ ও রেশম নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারে ভেনিস, বিবিধ সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ-দক্ষতায় জেনোয়া, বস্ত্রশিল্পে ও উচ্চশ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিতে ফ্লোরেন্স বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। ইউরোপের ঘরে বাহিরে সর্বত্র এইসব দ্রব্যের চাহিদা।

এই ধরনের উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণ সামন্ততন্ত্রী ব্যবস্থায়, অর্থাৎ যেখানে কারিগরকে স্থানীয় কাঁচামাল হইতে সুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত সব কিছু একা হাতে করিতে হয় সেখানে সম্ভবপর নয়। ফ্লোরেন্সের যে বস্ত্রশিল্পের কথা বলা হইল তাহার বস্ত্র আসিত ফ্ল্যান্ডার্স হইতে, কারণ উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নে ফ্ল্যান্ডার্সের তাঁতীরা ছিল সুদক্ষ। আবার বস্ত্র রাঙ্গাইবার কাজে ফ্লোরেন্টাইন কারিগররা ছিল অদ্বিতীয়। সুতরাং ফ্ল্যান্ডার্স হইতে কাপড় আনাইয়া ফ্লোরেন্টাইন কারিগরদের সাহায্যে উৎকৃষ্ট রঙ্গীন বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে যে শিল্প-পত্তনের প্রয়োজন তাহার মূলধন যোগাইবার জন্য চাই আর এক তৃতীয় পক্ষ। তারপর বিদেশের হাটে এই মাল সরবরাহের জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন ত আছেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ফ্লোরেন্টাইন মহাজনরাই আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রবর্তক এবং মধ্যযুগে ও রেণেশাঁসের সময় তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপের সর্বত্র অনুভূত হইয়াছিল।

এই প্রভাব শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে নাই। কোন কোন ধনকুবের ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী হইয়াছিল। বিখ্যাত মেদিচি বংশ এইভাবেই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন পুরুষ ধরিয়া মহাজনী কারবার চালাইবার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেদিচিরা ফ্লোরেন্সের তথা সমগ্র ইউরোপের প্রধান মহাজন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জিওভানি দ্য মেদিচি স্বয়ং এক পোপের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করিয়া পরে পোপের অনুগ্রহে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেদিচি বংশ পোপের মহাজন হিসাবে কাজ করিয়াছে। কসিমো শুধু অর্থের জোরে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ফ্লোরেন্স শাসন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ভেনিস ও নেপ্‌ল্‌স্‌ একবার এক জোট হইয়া আক্রমণাত্মক অভিযানের ফন্দি আঁটিলে তিনি এই দুই রাষ্ট্রকে অর্থ ধার দেওয়া বন্ধ করিবার ভয় দেখান; ফলে এই জোট সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়।

ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি উত্তর ইতালীর বিভিন্ন জনপদে ও বন্দরে এইভাবে যে নূতন শিল্পের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রার মাধ্যমে দ্রব্য লেন-দেনের যে নূতন অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা ক্রমশঃ উত্তর দিকে মিলান, আউগ্‌স্‌বুর্গ, নুর্নবার্গ ও জার্মানীর সমগ্র রাইন উপত্যকা হইয়া হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ইহা একটি সরু ফালি মাত্র। কিন্তু এই ফালিটুকুই ছিল রেণেশাঁসের সময় ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান সড়ক। এই পথে কেবল স্থানীয় দ্রব্যই যাতায়াত করে নাই, সমগ্র প্রাচ্যের বিপুল দ্রব্য-সম্ভার ভেনিস অথবা জেনোয়ার ঘাটে প্রথম আমদানি হইয়া এই পথেই সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই পথে বাণিজ্যের অপ্রতিহত গতিবিধিই ফ্লোরেন্স, মিলান, আউগ্‌স্‌বুর্গ, নুর্নবার্গ প্রভৃতি জনপদের বিপুল সমৃদ্ধিকে সম্ভবপর করিয়াছিল। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, রেণেশাঁস এই বাণিজ্য-পথকে অনুসরণ করিয়াই ইউরোপের সর্বত্র বিস্তৃত হয়।

পর্তুগীজ ও স্প্যানিসদের সামুদ্রিক অভিযান, নূতন গোলার্ধ আবিষ্কার ও তাহার ফলাফল

পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যাপক সামুদ্রিক অভিযান এবং তাহার ফলে আমেরিকা আবিষ্কার, আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে পোঁছিবার নূতন সমুদ্র-পথ আবিষ্কার ইত্যাদি ব্যাপার রেণেশাঁসের

এক প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকৃত। এই অভিযানগুলি বহু দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার এবং এক অতীব লাভজনক ঔপনিবেশিক রাজত্বের সূত্রপাত ইহা যেমন সম্ভবপর করিয়াছিল, অপর দিকে এই জাতীয় ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

অটোম্যান তুর্কীদের ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতার চাপে, বিশেষতঃ কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর হইতে, প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে বিকল্প-পথে কিভাবে এই যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাই ছিল ইউরোপীয়দের প্রধান চিন্তার বিষয়। পূর্ব দিকে স্থলপথে তুর্কীদের বজ্র আঁটুনির ফলে ইউরোপীয়দের পক্ষে তখন মাত্র দুইটি পথ খোলা ছিল। প্রথমতঃ, সমুদ্র-পথে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলভাগ অনুসরণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া এবং সমগ্র আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ইরিথ্রীয় সাগরে বা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করা; দ্বিতীয়তঃ, অতলান্তিক মহাসাগর-পথে সরাসরি পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া চীন অথবা ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হওয়া। দুই পথই কল্পনামূলক। আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া অতলান্তিক হইতে ভারত মহাসাগরে পেঁাছানো যে যাইবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না, কারণ আফ্রিকার স্থলভাগ শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে গিয়া যে মিশে নাই তাহা কে বলিতে পারে? অবশ্য জনশ্রুতি এইরূপ, সুপ্রাচীন অতীতে ফিনিশীয় নাবিকরা এইভাবেই নাকি আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সাবধানী পর্তুগীজ নাবিকরা এই পথই বাছিয়া নেয়। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দায়াজ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করেন এবং ইহার এগার বৎসর পর ভাস্কো দা গামা এই পথেই ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন।

পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে অথবা চীন মহাদেশে পেঁাছিবার সম্ভাবনার কথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই অলোচিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, ইরাটোস্থেনিস পৃথিবীর পরিধির মাপ নির্ণয় করিয়াছিলেন ২৫০,০০০ ষ্টাডিয়া। বিপরীত গোলার্ধে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত এক বিরাট ভূখণ্ডের অস্তিত্বও তিনি অনুমান করেন। সেনেকাও এইরূপ ভূখণ্ডের অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর পরিধির এক ভুল মাপ (১৮০,০০০ ষ্টাডিয়া) বাহির করিয়া পোসিডোনিয়াস এইরূপ ভূখণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সমুদ্র-পথে, পশ্চিমে মাত্র ৭০,০০০ ষ্টাডিয়া বা ৬৮৫০ মাইল অগ্রসর হইলেই ভারতবর্ষে পেঁাছানো যাইবে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬)। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ভৌগোলিকদের এইসব কথা লোকে বহুদিন হইতেই বিস্মৃত হইয়াছিল। মধ্যযুগে ইসিডোর অব সেভিল, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, ভিনসেণ্ট অব বোভে, পিয়ের দা'ই, তস্কানেলি প্রমুখ অল্প কয়েকজন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণভাবে সকলেরই পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ উদ্ভট ধারণা ছিল। পিয়ের দা'ই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Imago mundi*তে পোসিডোনিয়াসের ভৌগোলিক মতবাদ আলোচনা করেন। ফ্লোরেণ্টাইন তস্কানেলিও অনুরূপ মত সমর্থন করিয়া পশ্চিম দিকে অতলান্তিক মহাসাগর-পথে চীনদেশে পেঁাছিবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তস্কানেলি এই ব্যাপারে এরূপ উৎসাহী ছিলেন যে, অতলান্তিক পারি দিবার এক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও মানচিত্র প্রণয়ন করিয়া তাহা তিনি পর্তুগালের রাজ-সভায় পাঠাইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এক পত্রে পর্তুগীজ সভাসদদের উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

> ". . . and how many leagues you will have to cross to reach those regions most fertile in all kinds of spices and jewels and precious stones; and think it not marvellous that I call West the land of spices, while it is usually said that spices come from the East, for whoever navigates Westward in the lower hemisphere shall always find the same paths West and whoever

travels Eastward by land in the higher hemisphere shall always find the same land East."

কলম্বাস তস্কানেলির পরিকল্পনা ও মানচিত্রের কথা শুনিয়াছিলেন। *Imago mundi*র এক প্রতিলিপিও তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এইসব রচনা হইতে প্রেরণা পাইবার পর প্রাথমিক বহুবিধ বাধা, বিপত্তি ও নৈরাশ্য সত্ত্বেও জেনোয়াবাসী এই নিভীক নাবিক কিভাবে তাঁহার দুঃসাহসিক অভিযানে কৃতকার্য হইলেন এবং ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাহামা দ্বীপের সান সালভাডরে প্রথম পদার্পণ করিলেন তাহার ইতিহাস সুবিদিত। ইহার পর কয়েকবারই কলম্বাস অতলান্তিক পারাপার করিয়াছেন। তাঁহার অভিযানের ফলে পৃথিবীর অপর গোলার্ধে সম্পূর্ণ এক নূতন মহাদেশ যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল জীবিতকালের মধ্যে তাহা তিনি জানিয়া যাইতে পারেন নাই। ফ্লোরেণ্টাইন আমেরিগো ভেসপুচি এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার নামেই এই মহাদেশের নামকরণ হয়।

দুস্তর অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রান্ত হইলেও সেনেকার ভবিষ্যদ্বাণী বা তস্কানেলির স্বপ্ন সফল হইতে তখনও বাকি ছিল। অতলান্তিকের পথে চীন অথবা ভারতবর্ষের উপকূল-ভাগের সন্ধান তখনও মিলে নাই। ষোড়শ শতাব্দী উন্মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও সম্ভবপর হইল। ১৫১৯-২২ খৃষ্টাব্দে ম্যাগেলান দক্ষিণ-আমেরিকা ঘুরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের পথে সে অসাধ্য সাধন করিলেন। বাকি পথটুকু অতিক্রম করিয়া ম্যাগেলানের ভাগ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা আর ঘটিয়া উঠে নাই; ফিলিপিন দ্বীপে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ তিন বৎসর পর পাঁচখানি জাহাজ ও দুইশত আশী জন নাবিকের মধ্যে মাত্র একখানি জাহাজ একত্রিশ জন নাবিক লইয়া স্পেনে ফিরিয়া আসে। সমুদ্র-পথে ইহাই মানুষের প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ।

সমুদ্র-পথে আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের সহিত নূতন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সূচিত হয়। পূর্বে ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়ার স্থলপথের বাণিজ্য তুর্কীদের একচেটিয়া থাকায় প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের এতদিন যেসব অসুবিধা ছিল তাহার অবসান হইল। পূর্বে বলিয়াছি, মুসলমান বণিকদের হাত গলিয়া সামান্য যেটুকু বাণিজ্য ইউরোপীয়দের ভাগ্যে জুটিত তাহার উপর প্রধান কর্তৃত্ব ছিল ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকদের। এই ভেনিস ও জেনোয়া হইতে মিলান, আউগস্‌বুর্গ, নুর্নবার্গ, রাইনল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ ও দেশের মধ্য দিয়া বাণিজ্যের গতি প্রবাহিত হইত। এবার হইতে এই বাণিজ্য-পথের প্রাধান্য সংকুচিত হইল এবং সেই সঙ্গে সুরু হইল ভেনিস ও জেনোয়ার দুর্ভাগ্য। কাহারও সর্বনাশ কাহারও পৌষ মাস। সমুদ্র-পথের বহুগুণ বর্ধিত নূতন বাণিজ্যে ভাগ বসাইয়া প্রথমে পর্তুগাল ও স্পেন এবং পরে অতলান্তিকের উপকূলবর্তী ইউরোপীয় দেশগুলি ফাঁপিয়া উঠিল। তারপর আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেখানে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইলে এবং ইক্ষু, তামাক, তুলা ইত্যাদির চাষ আরম্ভ হইলে নূতন গোলার্ধের এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য কয়েক শতাব্দীর জন্য পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিকে পাকা করিয়া তুলিল।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের এরূপ দ্রুত বৃদ্ধিতে স্বভাবতঃই উন্নততর ও অধিকসংখ্যক জাহাজ নির্মাণের একটা হিড়িক পড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজ চলাচলে প্রয়োজনীয় নানাবিধ মানচিত্র, কম্পাস ও অনুরূপ যন্ত্রপাতির চাহিদাও অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এইসব কাজে কিছুটা বিজ্ঞানজানা নূতন ধরনের কারিগরদের প্রয়োজন, যাহারা চুম্বকের গুণাগুণ বুঝিয়া কম্পাস, জ্যোতিষে চন্দনসই জ্ঞানের ভিত্তিতে নক্ষত্রের নির্ভরযোগ্য মানচিত্র ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে পারে। অনেকে মনে করেন, এই সময় হইতেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে পেশাদার বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; রেণেশাঁসের আন্দোলনে এই সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক বার্ণাল লিখিয়াছেন :

"This was the beginning of a scientific public, and furnished both a training ground and a livelihood for intelligent youths of all classes. Navigation schools were founded in Portugal, Spain, England, Holland and France. The motion of the stars now had a cash value and astronomy stood in no danger of being neglected, even after astrology had gone out of fashion. (*Science in History,* p. 277).

নূতন ভৌগোলিক জ্ঞান, নূতন নূতন দেশের বিচিত্র মানুষ, পশু, পক্ষী ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভে একদিকে ইউরোপের মানসলোক যেমন প্রসারিত হয়, অন্য-দিকে পৃথিবী সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্মসংস্থা কর্তৃক প্রচারিত বহু ভুল ধারণার স্বরূপও প্রকটিত হয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্বন্ধে এতদিন যে সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছিল, ভূপ্রদক্ষিণের ফলে চিরতরে তাহার অবসান হইল। তারপর পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধ বলিয়া কিছু থাকিলেও সেখানে মানুষের বাস অসম্ভব, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকরা দৃঢ়তার সহিত এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। অগাষ্টিন বলিতেন, প্রথম দিকে ধর্মযাজকগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠে অর্থাৎ প্রতিপাদ স্থানে (antipodes) যান নাই, তখন এইরূপ প্রতিপাদ স্থানে মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। বাইবেলে আছে, যীশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল; অপর পৃষ্ঠে মানুষ থাকিলে কেমন করিয়া তাহারা যীশুকে দেখিল? এইসব কারণে প্রতিপাদ স্থানে মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস এক সময় চরম অধার্মিকতা বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ বিশ্বাসের জন্য ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে সেকো দা'স্কোলিকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল; আবানোর পিটারও একই অপরাধে ইনকুইজিশন কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

নূতন গোলার্ধ আবিষ্কারে বহুদিনের এক ভুলই শুধু ভাঙ্গিল না, সমগ্র ধর্মসংস্থার শিক্ষা, বিশ্বাস ও কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল যেন এক রূঢ় আঘাতে টলিয়া উঠিল। ইউরোপের ক্ষুদ্রতার ও পৃথিবীর বিরাটত্বের এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা মানুষকে আবিষ্কারের পথে প্রবুদ্ধ করিল। এই সময় স্প্যানিস মুদ্রার এক পিঠে খোদিত হয় হারকিউলিসের থাম, আর তার নীচে লিখিত হয় দুটি কথা—'Plus Ultra', অর্থাৎ 'সামনে আরও আছে'। থামিও না, আগাইয়া যাও, সামনে আরও আছে,—ইহাই হইল রেণেশাঁসের মর্মকথা। ইহা বিজ্ঞান-সাধনারও মূলমন্ত্র। তাই রেণেশাঁসের সমুদ্রমন্থন হইতে মনুষ্য সমাজ সর্বকালের জন্য অমৃতস্বরূপ আধুনিক বিজ্ঞানকে লাভ করিয়াছিল।

১০·২। কারিগরি আবিষ্কার ও রেণেশাঁস

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেসব কারণ ইউরোপীয় রেণেশাঁসকে সম্ভবপর করিয়াছিল তন্মধ্যে কাচ, কম্পাস, কাগজ, ছাপাখানা, যান্ত্রিক ঘড়ি, বারুদ, জলশক্তি ও বায়ুশক্তি ব্যবহারের যান্ত্রিক কৌশল ইত্যাদি বিবিধ কারিগরি আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রেণেশাঁসের সহিত কারিগরি আবিষ্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপার ঐতিহাসিকগণ এযাবৎ কিছুটা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সম্পর্ক উপেক্ষণীয় ত নহেই বরং মধ্য-যুগের নানা কারিগরি আবিষ্কার ও প্রয়োগের অনিবার্য ফলস্বরূপ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে গভীর ও ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল তাহাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক চিন্তাধারার নবজন্মের মূল কারণ। এতদিন অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলিয়া আসিয়াছেন, তুর্কীদের হাতে কনস্তান্তিনোপলের পতন ঘটিবার

পর প্রাচীন গ্রীক পুঁথিপত্র ও পাণ্ডুলিপিসহ বাইজান্টাইন পণ্ডিতগণ ইউরোপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের আনীত গ্রীক গ্রন্থের সংস্রবে আসিয়া পশ্চিম ইউরোপের জাতিরা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় নূতন করিয়া প্রবুদ্ধ হয়। কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ পতনের সুযোগে পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক গ্রন্থাদির অধিকতর প্রচার ও প্রসার রেনেশাঁসের একটি কারণ বটে, কিন্তু ইহাকে কোনক্রমেই প্রধান কারণ বলা যায় না। ইহাই যদি প্রধান কারণ হইবে তবে ষোড়শ শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ায়, রোমে অথবা কনস্তান্তিনোপ্‌লেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হইল না কেন? টলেমীদের আমলে আলেকজান্দ্রিয়ায়, রোমক প্রাধান্যের কালে রোমে, বাইজান্টাইন নৃপতিদের সময় কনস্তান্তিনোপ্‌লে প্রাচীন গ্রীক পুঁথি-পত্রের ত অকাল ছিল না; প্রতিভাবান ব্যক্তিও যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি বিজ্ঞানের যে নূতন বিকাশ, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, অজ্ঞাত প্রাকৃতিক রহস্যের সন্ধানে নির্ভীক-ভাবে অগ্রসর হইবার যে উন্মাদনা আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে লক্ষ্য করি, পূর্বে এমনটি কেন দেখা যায় নাই?

আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রাচীন গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত একথা সত্য। কিন্তু কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত গ্রীক গ্রন্থগুলি এজন্য দায়ী, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বীজ যত উৎকৃষ্টই হউক সকল মৃত্তিকায় তাহা অঙ্কুরিত হয় না। গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট বীজ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া মধ্যযুগীয় ইউরোপের অনুর্বর সামাজিক মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত হইতে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছে। কাগজ, মুদ্রণ, যান্ত্রিক ঘড়ি, বারুদ, জলচাকা, পবনচাকা, অশ্বশক্তি ইত্যাদি বিবিধ কারিগরি আবিষ্কারে ও তাহাদের প্রয়োগে চিরাচরিত অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়ায় ধীরে ধীরে এক নূতন সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। দাসত্বের উপর এই সমাজের প্রতিষ্ঠা নহে, ইহার ভিত্তি জলশক্তি, বায়ুশক্তি ও অশ্বশক্তি। যান্ত্রিক আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে ক্রমশঃ শৃঙ্খলিত করিয়া ও ক্রীতদাস প্রথার নৈতিক অবমাননা হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়া যে স্বাধীন ও সুস্থ সমাজ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সমাজের উর্বর মৃত্তিকায় গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ফ্যারিংটন লিখিয়াছেন :

> "The technical revolution of the middle ages was necessary to prepare the soil of Western Europe to receive the seed (of Graeco-Roman science) and the technical device of printing was necessary to multiply and broadcast the seed before the ancient wisdom could raise a wholesome crop."*

ঠিক এই অভিমতই প্রতিধ্বনিত করিয়া লিন হোয়াইট তাঁহার *Technology and Inventions in the Middle Ages* (1940) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর নবাবিষ্কৃত পশু, জল ও বায়ুশক্তির একত্রিত প্রভাব যত্নের সহিত গবেষণা করা হয় নাই। দ্বাদশ এমন কি একাদশ শতাব্দী হইতেই অধিক পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন মিটাইতে অথবা মানুষের পেশীশক্তির বদলে যেসব ক্ষেত্রে সহজে যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে সেখানে অমানবীয় শক্তি দ্রুতগতিতে মানবীয় শক্তির স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। মধ্যযুগের শেষভাগের প্রধান গৌরব তাহার গির্জা, মহাকাব্য বা পাণ্ডিত্যপ্রীতির মধ্যে অন্তর্নিহিত নহে; ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক জটিল সভ্যতা রচনার মধ্যে ছিল এই গৌরব। এই সভ্যতা ঘর্মাক্ত-কলেবর ক্রীতদাসের বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহার ভিত্তি ছিল অমানবীয় শক্তি।

রেনেশাঁসের সময় উপরিউক্ত যেসব কারিগরি আবিষ্কারের প্রভাব ইউরোপে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহাদের কথা কিছু আলোচিত হইবে।

---

* Benjamin Farrington, *Greek Science,* Part II, p. 170.

কাচ ও কাচশিল্প

যে অল্প কয়েকটি আবিষ্কার ও সেই আবিষ্কার হইতে উদ্ভূত শিল্পের অগ্রগতি মানবসভ্যতার বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে, কাচ ও কাচশিল্প তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রকমের কাচের আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর নানা যুগান্তকারী গবেষণা ও ব্যাপক বৈজ্ঞানিক তৎপরতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কাচকে বাদ দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ ও সভ্যতার কথা চিন্তা করা অসম্ভব।

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে এই শিল্পের অধোগতি ঘটিলেও ইহা একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতে পাদরী ও ধর্মযাজকদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে এই শিল্প আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে। কাচ গলাইবার বড় বড় চুল্লী, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী নানা কাচপাত্র, জানালায় ব্যবহারের উপযোগী রঙ্গীন শার্সি প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহারের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে কাচশিল্প দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয় এবং কাচনির্মাণ-কৌশলও নানাভাবে উন্নীত হয়। এই উন্নতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ভেনিস। ধর্মযুদ্ধের কল্যাণে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভেনিসের প্রধান্যলাভের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচ্যের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইলে সিরিয়া, বাইজাণ্টাইন প্রভৃতি দেশের কাচশিল্পের সহিত সংশিলষ্ট কুশলী কারিগরদের নিকট হইতে ভেনিসীয় কারিগররা উন্নত ধরনের কাচনির্মাণবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং অল্পকালের মধ্যে কাচশিল্পে তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ও সর্বত্র স্বীকৃত হয়। এই প্রাধান্যের আর একটি কারণ এই যে, এই শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভেনিসীয়রা নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে অতি সহজে সংগ্রহ করিতে পারিত। যেমন, কাষ্ঠ আসিত পূর্ব ভেনিসিয়া ও নিম্ন আল্‌পস্‌ হইতে; লবণ আসিত ডালমেশিয়া হইতে; সোডা (rocchetta) অসিত মিশর অথবা স্পেনের আলিকান্ত প্রদেশ হইতে, মৃত্তিকা আসিত ভিসেন্‌জা হইতে এবং বালি আসিত লিডো ও ভেরোনা হইতে। ভেনিসীয়রা এই প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ সতর্কতা অবলম্বনের ত্রুটী করে নাই। কাচনির্মাণ সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্যাদি যাহাতে বাহিরে প্রকাশ পাইতে না পারে তজ্জন্য ১২৯১ খৃষ্টাব্দে ভেনিসের সমগ্র কাচশিল্প নিকটবর্তী জনবিরল দ্বীপ মুরাণোতে স্থানান্তরিত করা হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মুরাণোর কাচশিল্প জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং এইখানকার কাচনির্মিত দ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানি হইত। কাচশিল্পের প্রাধান্যের জন্য কাচ-কারিগর ও কাচ-ব্যবসায়ীরা আপনা হইতেই একরূপ আভিজাত্য ও কুলমর্যাদা লাভ করে। কাচ-কারিগর ও ব্যবসায়ীদের বলা হইত 'ভিত্রারি' (*Vitrarii*— ল্যাটিন vitrum হইতে) সম্প্রদায়। ভিত্রারি সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া তখন ভেনিসীয়দের এক গর্বের বিষয় ছিল এবং উচ্চবংশীয়দের সহিত ভিত্রারি সম্প্রদায়ের পুত্রকন্যাদের অবাধ বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থাপিত হইত।

বহু সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও কাচনির্মাণবিদ্যা ভেনিসীয়রা বেশী দিন একচেটিয়া রাখিতে পারে নাই। ভেনিস হইতে প্রথমে ইতালীর ও পরে ইউরোপের অন্যান্য সহরে এই বিদ্যা ছড়াইয়া পড়ে। পিসা, নুর্নবার্গ, বোহেমিয়া, সাইলেসিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি স্থানে কাচ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হয় এবং সর্বত্র কাচব্যবসায়ীরা শিল্পস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আপনাপন সমিতি বা গিল্ড (guild) স্থাপন করে। পশ্চিম ইউরোপের বাহিরে কনস্তান্তিনোপল, দামাস্কাস, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানেও কাচশিল্পের বহুল বিস্তার ও উন্নতি ঘটে। মধ্যপ্রাচ্যের এইসব দেশ হইতেও কম কাচ ইউরোপে আমদানি হইত না। চতুর্দিকে এরূপ অগ্রগতি সত্ত্বেও চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কাচশিল্পে ভেনিসীয়দের প্রাধান্য কেহ সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; তীব্র প্রতিযোগিতার আবির্ভাবে তাহাদের এক-

চৌটিয়া ব্যবসায়ে কিছুটা মন্দা পড়িলেও কাচনির্মিত দ্রব্যাদিতে রং-এর অপূর্ব বিন্যাসে ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ভেনিসীয় কারিগররা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অপরাজেয় ছিল। ভেনিসের সঙ্গে সঙ্গে কাচশিল্পে সৌন্দর্যসৃষ্টির কালও তিরোহিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে কাচ-শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে; নানা ধরনের ত্রুটীহীন কাচ ও তাহার অভিনব ব্যবহার আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কাচকে আশ্রয় করিয়া একদা যে কলাশিল্প ও সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণই অতীতের জিনিস।

শার্সি : সমতল ও স্বচ্ছ কাচখণ্ড প্রস্তুত করিবার কৌশল মধ্যযুগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ইহার ফলে জানালায় কাচের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অতি সামান্য ব্যাপার মনে হইলেও ইহার সহিত এক গভীর সামাজিক পরিবর্তন জড়িত। জানালায় কাচের শার্সির ব্যবহার অবশ্য সুপ্রাচীন। রোমক আমলে সমতল প্রস্তরখণ্ডের উপর গলিত কাচ ঢালিয়া শার্সির কাচ প্রস্তুত করা হইত; ইহার দ্বারা কাচের এক পিঠই শুধু সমতল হইত এবং ইহার স্বচ্ছতাও হইত আংশিক। এজন্য জানালায় কাচের ব্যবহার তেমন সুবিধাজনক হইতে পারে নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ইউরোপে স্বচ্ছ কাচ উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে মুরাণোতে এইরূপ কাচ উৎপন্ন হইত। ইহার কিছু পরে ফিলিপ দ্য ককরে নামে এক কাচ শিল্পপতির চেষ্টায় নর্মাণ্ডিতে স্বচ্ছ কাচের শার্সি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়।* চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে স্বচ্ছ কাচের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জানালায় শার্সির ব্যবহারও ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। প্রথম প্রথম স্বচ্ছ কাচের শার্সি অতি মহার্ঘ সম্পদরূপে গণ্য হইত। ডাঃ মামফোর্ড লিখিয়াছেন, গ্রীষ্মের ছুটিতে বা অন্য সময় অল্পকালের জন্য স্থান পরিবর্তনে যাইবার সময় গৃহস্থ জানালা হইতে কাচের শার্সি খুলিয়া বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া যাইত।† পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাধারণ বাসগৃহে শার্সির ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে পিক্কোলোমিনি লক্ষ্য করেন যে, ভিন সহরের প্রায় অর্ধেক গৃহেই কাচের শার্সি লাগানো হইয়াছে। স্বচ্ছ শার্সির কল্যাণে একই সঙ্গে বাহিরের দুরন্ত ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করা ও দিবালোক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া সম্ভবপর হইল এবং গৃহস্থের কাজে অচিন্তনীয় সুবিধা উপস্থিত হইল। মামফোর্ড লিখিয়াছেন :

> "To have light in the dwelling house or the hothouse without being subject to cold or rains or snow was the great contribution to the regularity of domestic living and business routine."

রসায়নে কাচ : রসায়নের উন্নতির মূলেও কাচ। প্রাচীন গ্রীকরা রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ কোন উন্নতি সাধনে যে সমর্থ হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ ছিল কাচপাত্রের অভাব। রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কাচপাত্র যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন দ্রব্যের পাত্র নহে। কাচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় না; স্বচ্ছ হইবার ফলে কাচপাত্রের অভ্যন্তরে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে বাহির হইতে তাহা দেখা যায়; ইহা অতি উচ্চ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে; ইহাকে পরিষ্কার করা সহজ, গলাইয়া অতি সহজে কাচপাত্রের মুখ বন্ধ করা যায় এবং ইচ্ছামত যে কোন আকারের পাত্র অনায়াসে তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায়। বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র, পরীক্ষানল, চাপমানযন্ত্র, তাপমানযন্ত্র ইত্যাদি কাচনির্মিত সরঞ্জাম বাদ দিয়া রসায়নে গবেষণার কথা চিন্তা করা পর্যন্ত কঠিন। তাই কাচশিল্পের উন্নতি না

---

* Sarton, *Introduction,* Vol. III, p. 173.

† Lewis Mumford, *Technics and Civilization,* George Routledge, 1934, p. 124-125.

হওয়া পর্যন্ত রসায়নের অগ্রগতিও যে অনিবার্য কারণে স্থগিত ছিল একথা আদৌ অত্যুক্তি নহে।

চশমার আবিষ্কার : কাচ ও চশমা এক জিনিস নহে, অথচ কাচ না হইলে চশমা হইত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোন এক সময় চশমা আবিষ্কৃত হয়। এই সম্পর্কে দুই ইতালীয় সালভিনো দেগ্‌লি আর্মাতি (মৃত্যু—১৩১৭) ও আলেসান্দ্রো দেল্‌লা স্পিনার (মৃত্যু—১৩১৩) নাম উল্লেখযোগ্য; সম্ভবতঃ ইঁহারা দুইজনেই পৃথকভাবে চশমার আবিষ্কর্তা। বিপুলদর্শক কাচ (magnifying glass) বা লেন্‌সের উল্লেখ পাওয়া যায় প্লিনি ও সেনেকার রচনায়। কিন্তু আর্মাতি বা স্পিনার পূর্বে লেন্‌সকে চশমার কাজে কেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিওপোলদো দেল মিগ্‌লিওর নামে এক ইতালীয় গ্রন্থকার তাঁহার এক গ্রন্থে লেখেন, সালভিনোই যে চশমার আবিষ্কর্তা ইহা তাঁহার কবরের উপর মর্মর ফলকে লিখিত আছে।* আবার আলেসান্দ্রো দেল্‌লা স্পিনার সমসাময়িক এক ঐতিহাসিকের লেখায় জানা যায় যে, আলেসান্দ্রোই সর্বপ্রথম চশমা তৈয়ারী করেন। তবে চশমা সর্বপ্রথম ইউরোপে আদৌ আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। চাও সি-কু নামে সুং রাজবংশের এক ব্যক্তির রচনায় চশমার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'উয়ান জেন সিয়াও শু' (উয়ান রাজবংশের কাহিনী) শীর্ষক একটি চৈনিক গ্রন্থ অবলম্বনে চাও তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ-কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (লাউফেরের মতে ১২৬০ খৃষ্টাব্দ), আবার কাহারও মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। মধ্যযুগের এক চৈনিক অভিধানে পাওয়া যায়, মালাক্কা হইতে নাকি চীনে চশমার প্রবর্তন হইয়াছিল। ইহা সত্য হইলে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে চীনে চশমার প্রচলন সম্ভবপর নহে (সার্টন)।

চশমার আবিষ্কার যে দেশে যখনই ঘটিয়া থাকুক সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ইউরোপে ইহার নির্মাণ ও ব্যবহার সুরু হয়। গি দ্য শোলিয়াক তাঁহার *Chirurgia magna*য় জনৈক চশমা প্রস্তুতকারকের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ত্রেভিসোর একটি ফ্রেস্‌কোতে চশমা-পরিহিত এক পাদরীর চিত্র দেখা যায়। চিত্রটি ডোমিনিকান কার্ডিনাল ইউগোল দি প্রোভেঞ্জার। সম্ভবতঃ ইহাই চশমাপরা ব্যক্তির প্রাচীনতম চিত্র।

চশমা-প্রস্তুতের কাজে ইউরোপের যেসব দেশ মধ্যযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তন্মধ্যে উত্তর ইতালী (সম্ভবতঃ ভেনিস) ও দক্ষিণ হল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। ইতালীতে চশমার নাম ছিল 'occhiali', হল্যান্ডে bril' বা 'brillen'। চশমা ও লেন্‌স তৈয়ারীর ব্যাপারে হল্যান্ডের এই প্রাথমিক তৎপরতা ও নেতৃত্ব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম হইতেই কাচ, লেন্‌স, চশমা প্রভৃতি ব্যাপারে ওলন্দাজদের এরূপ উৎসাহের ফলেই পরবর্তীকালে এবিষয়ে তাহারা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিল। ওলন্দাজ চশমা-নির্মাতা জোহান লিপেরশাইম কর্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার, জাকারিয়াস জানসেন নামে আর একজন ওলন্দাজ কর্তৃক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার এবং সর্বোপরি জীবাণুবিদ্যায় লিউয়েনহোয়েকের যুগান্তকারী গবেষণার পশ্চাতে ছিল কাচ ও চশমা-শিল্পে ওলন্দাজদের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা ও প্রাধান্য।

শিক্ষা, অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে চশমা আবিষ্কারের ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। দৃষ্টিদোষ দূর করিয়া চশমা মানুষের অধ্যয়ন-কাল দীর্ঘতর করিতে সাহায্য করে। ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সময় বিদ্যোৎসাহিতা ও গবেষণার ব্যাপক বৃদ্ধিতে এই আপাতসামান্য আবিষ্কারটি বড় কম সহায়ক হয় নাই।

---

* "Qvi diace Salvino d'Armato deg'l Armati di Fir, Inventor degli occhiali Dio gli perdoni la peccata—Anno D. Mccc xvii." সার্টন হইতে উদ্ধৃত; *Introduction,* Vol. II, p. 1025.

বিজ্ঞানের তথা মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে কাচের অবদান বলিয়া শেষ করিবার নহে। কাচ না হইলে রসায়ন বা জীবাণু-বিজ্ঞান হইত না, জ্যোতিষের বর্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত। বয়েল, তরিসেলি, পাস্কাল, গ্যালিলিও, পাস্তয়র, কক প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের যুগান্তকারী গবেষণার জন্য কাচের উপযুক্ত উন্নতির পথ চাহিয়া মনুষ্য সমাজকে যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যান্ত্রিক ঘড়ি

সময় নিরূপণের জন্য ঘড়ি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালেই অনুভূত হইয়াছিল। জলঘড়ি (ক্লেপসিড্রা) ও সূর্যঘড়ি বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের এই প্রয়োজন মিটাইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আমরা সুপ্রাচীন জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির পরিবর্তে ইউরোপের নানা স্থানে যান্ত্রিক ঘড়ির ব্যবহার দেখিতে পাই। যান্ত্রিক ঘড়ির নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়াই আধুনিক ঘড়ির উদ্ভব হইয়াছে। মানুষের জীবনে ঘড়ি আজ একটি অপরিহার্য সামগ্রী। যান্ত্রিক ঘড়ি আজ যেমন মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া সমগ্র সভ্যতাকে সময়ানুবর্তিতার পথে চালিত করিয়াছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে তেমনি আবার এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই যান্ত্রিক ঘড়ির উদ্ভব হইয়াছিল।

সমগ্র মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ইউরোপে ধর্ম-সাধনাই ছিল মানুষের জীবনের প্রধান কর্ম। উপাসনা, আহার, কর্ম, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিনকে প্রধানতঃ সাতভাগে ভাগ করা হইয়াছিল, যেমন—(১) ম্যাটুটিনা—ব্রাহ্ম মুহূর্ত, গাত্রোত্থানের সময়; (২) প্রাইমা—সূর্যোদয়; (৩) টার্সিয়া—সূর্যোদয় ও মধ্যাহ্নের মধ্যবর্তী সময়; (৪) সেক্স্টা—মধ্যাহ্ন (ইহা হইতে মধ্যাহ্ন বিশ্রামের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'siesta' কথার উৎপত্তি); (৫) নোনা—মধ্য-অপরাহ্ন; (৬) ভেসপেরি—সূর্যাস্তের পূর্ববর্তী এক ঘণ্টা সময়; এবং (৭) কমপ্লিটা—সূর্যাস্ত।* সূর্যোদয় (প্রাইমা) ও সূর্যাস্তের (কমপ্লিটা) মধ্যবর্তী সময়ের বিভাগগুলি সব সময় ঠিক থাকিত না; গির্জা-প্রধানদের সুবিধামত ইহার অদল বদল করা হইত। তারপর উচ্চ অক্ষাংশের শীতপ্রধান ও কুয়াশাচ্ছন্ন দেশগুলিতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় যথাযথ নিরূপণ করা খুবই অসুবিধাজনক ছিল। ঋতু-পরিবর্তন হেতু দিনরাত্রির দীর্ঘতার তারতম্যের ফলে উপরিউক্ত বিভাগের দীর্ঘতারও তারতম্য ঘটিত। ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষরা এসম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং লোকের যাহাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রায় প্রতিদিনই দৈনিক কর্মসূচীর সময় গির্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা হইত। এরূপ কাজে সময় নিরূপণের জন্য প্রাচীন জলঘড়ি বা সূর্যঘড়ি যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্মসংস্থার এই সময়ভাগ ও তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কাল-সহকারে এমন কায়েমী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, ইহার পরিবর্তনেই নানা অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা উপস্থিত হইত। এজন্য যান্ত্রিক ঘড়ির প্রথম প্রচলনের সময় তীব্র আপত্তি উঠিয়াছিল ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং ইউরোপের সর্বত্র সহর, নগর ও বন্দরের স্থাপনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি, শিক্ষার ব্যাপ্তি ইত্যাদি কারণে মানুষের কর্মস্রোত চিরাচরিত অলস ধর্ম-চর্চা ও নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া

---

* "Monastic life began during the third watch, called (1) matins (matutina); this was followed by (2) prima at sunrise, (3) tertia halway between sunrise and noon, (4) sexta at noon (hence the word siesta—midday rest), (5) nona in midafternoon, (6) vespers (vesperae) an hour before sunset, and finally (7) compline (completa) at sunset."—*Introduction,* Vol. III, pt. I, p. 716.

বিভিন্ন দিকে ও নানা খাতে প্রবাহিত হইল। সহর, নগর ও বন্দর হইল এই বিভিন্নমুখী কর্ম-স্রোতের প্রধান কেন্দ্র। সহরের প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে তৎপরতা, ব্যস্ততা ও সময়ানুবর্তিতা একান্ত অপরিহার্যভাবেই মানুষের জীবনে উপস্থিত হইল। সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধ হইল। এখন আর এক শ্রেণীর লোকের খেয়াল ও সুবিধা অনুযায়ী যখন তখন ঘণ্টা বাজাইয়া দিনের গতি ও কর্মসূচী জানাইলে চলিবে না, কারণ তাহার কর্মসূচীই যে জটিলভাবে বদলাইয়া গিয়াছে।
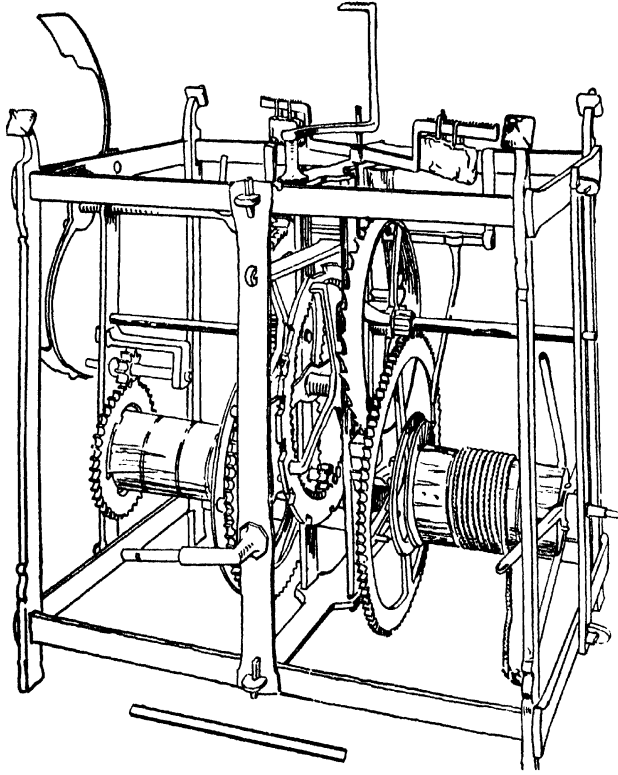
৪১। ডোভার যান্ত্রিক ঘড়ির নক্‌সা; নির্মাণকাল ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ; এখন লণ্ডন সায়েন্স মিউজিয়ামে রক্ষিত।

ইউরোপে এইরূপ সময়েই স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথম আবিষ্কৃত যান্ত্রিক ঘড়ির দুইটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। একটি ভারী ওজনের সাহায্যে সমগ্র যন্ত্রটিকে ঘুরানো হইত। এই ওজনটি দড়ির এক প্রান্তে বাধা থাকিত এবং দড়ির বাকি অংশ একটি দণ্ডের সহিত জড়ানো হইত। দণ্ডের সহিত দাঁতবিশিষ্ট কয়েকটি চাকা সংযুক্ত। ওজনটি মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচের দিকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবার সময় চাকাটিও ঘুরিতে থাকে। চাকাটির এইরূপ আবর্তনের সময় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সময়-নির্দেশক কাঁটাটিকে ঘুরাইবার আর একটি ব্যবস্থা থাকা চাই। ইহাই ঘড়ির নিয়ামক (escapement) ব্যবস্থা।

গ্যালিলিও কর্তৃক দোলক আবিষ্কৃত হইলে দোলক এই নিয়ামকের কাজ করে। ইহার পূর্বে তুলাদণ্ডের দ্বারা এই কাজ সম্পাদিত হইত। ঘড়ির নিয়ামকের কাজে তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রথম প্রস্তাব করেন ফরাসী বিজ্ঞানী ভিলা দ্য অনকুর (১২৫৭)। আপনা হইতেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাহাতে ঘড়ির মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা এইসব প্রাথমিক ঘড়িতে ছিল। প্রথম দিকে এবং বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ কামারশালায় যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মিত হইত; এই কাজ যে কিরূপ স্থূল ছিল তাহা বুঝা যায় ওজনের ভার ও চাকাগুলির পরিধি হইতে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ডোভার রাজপ্রাসাদে ব্যবহৃত ঘড়ির চিত্র প্রদত্ত হইল (৪১ নং চিত্র)। আনুমানিক ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়, এবং লণ্ডনের বিখ্যাত সায়েন্স মিউজিয়ামে ইহা এখন সংরক্ষিত। প্রাচীনতম যান্ত্রিক ঘড়ির মধ্যে ইহা অন্যতম।

উপরিউক্ত যে নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে যান্ত্রিক ঘড়ির নির্মাণ সম্ভব হইয়াছিল তাহা আবিষ্কৃত হয় সম্ভবতঃ ১২৭৫ হইতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইহার কিছু পূর্বে ভিলা দ্য অনকুর এসম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিয়াছিলেন; তুলাদণ্ডের সাহায্যে ঘড়ির নিয়ামকের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন। ১২৩২ হইতে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত অন্ততঃ কুড়িটি যান্ত্রিক ঘড়ির বিশদ বিবরণ ঐতিহাসিকগণ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইউরোপের যেসব দেশে এই জাতীয় ঘড়ি তখন নির্মিত হইত তন্মধ্যে সুইট্জারল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম চার্লস প্যারীর রাজপ্রাসাদের জন্য এক বিরাট ঘড়ি নির্মাণের কাজে দ্য ভিক নামে এক জার্মান ঘড়ি-নির্মাতাকে নিয়োগ করেন। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়। দ্য ভিকের ঘড়ির নক্সা ও গঠন-প্রণালীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ঘড়িতে ব্যবহৃত ওজনের ভার ছিল ৫ হন্দর, যে ওজনের দ্বারা ঘণ্টা বাজাইবার যন্ত্রটিকে চালানো হইত তাহার ভার ১৫ হন্দর, এবং প্রধান কয়েকটি চাকার ব্যাস ছিল প্রায় তিন ফুট। এই বিপুলকায় স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির নির্মাণকৌশল অবশ্য তৎকালীন যান্ত্রিক অনগ্রসরতারই পরিচায়ক। যাহা হউক, এই ঘড়ি চালু হইলে চার্লস এক আদেশ জারি করিয়া এই ঘড়ির সময় অনুযায়ী প্যারীর প্রত্যেক গির্জা হইতে এক ঘণ্টা অন্তর ঘণ্টাধ্বনি করিবার ব্যবস্থা করেন।

কম্পাস

চুম্বকের আকর্ষণী ধর্ম আবিষ্কৃত হয় গ্রীসে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে। কিন্তু চুম্বকের দিগ্দর্শন ধর্ম আবিষ্কারের কৃতিত্ব চৈনিকদের। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত আবিষ্কারের গুরুত্ব অনেক বেশী, কারণ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক চুম্বক বা চুম্বক-প্রস্তর পাওয়া গেলেও উত্তর ও দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকিতে পারে এইরূপ লম্বাকৃতি চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর। কোন ক্রমে পাওয়া গেলেও এই চুম্বক-খণ্ডকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝুলানো বা দোলায়মান অবস্থায় পরীক্ষা করা যাইতেছে ততক্ষণ ইহার দিগ্দর্শন ধর্ম জানিবার উপায় নাই। কি উপায়ে বা কিরূপ যোগাযোগের ফলে চৈনিকরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

চুম্বকের এই দিগ্দর্শন গুণ আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্যলাভ সত্ত্বেও চৈনিকরা কিন্তু জল-পথে যাতায়াতের কার্যে এই মূল্যবান গুণটিকে প্রথম প্রয়োগ করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। তাহাদের নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই জানা যায় যে, বিদেশীরা এই প্রয়োগের আবিষ্কর্তা। আরব্য কারিগরিবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে (পৃঃ ১৭২), দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে মুসলমান নাবিকরা যখন সমগ্র সমুদ্র-পথের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তা সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে কোন নাবিক তখন জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে চুম্বকের দিগ্দর্শন ধর্মের প্রয়োগের কথা চিন্তা হয়ত বা

প্রয়োগও করিয়া থাকিবে। সেই সম্পর্কে আমরা ইহাও বলিয়াছি, কম্পাস আবিষ্কারের সহিত ইতালীয় নাবিক ফ্লাভিও গিয়োজার নাম জড়াইবার বিশেষ যুক্তিসংগত কারণ নাই। ফ্লাভিওর অনেক পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ও মুসলমান বিজ্ঞানীদের রচনায় কম্পাসের নির্ভর-যোগ্য উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। ফ্লাভিওর পূর্বে কম্পাসের ব্যাপক প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নাবিকরাও ইহার প্রয়োগের কথা জানিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগও করিয়াছিল।* তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্লাভিওর সময় কম্পাসের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা সন্দেহাতীত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋর্ত প্রভৃতি বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করিয়া কম্পাস কার্ডের প্রবর্তন এই সময় হইতে দেখা যায়। কম্পাস কার্ডের সহিত চৌম্বক শলাকার সমন্বয় ঘটাইয়া উন্নততর দিগ্‌দর্শন যন্ত্র-নির্মাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ আমাল্‌ফি নিবাসী ফ্লাভিও প্রমুখ ইতালীয় নাবিকরা এই জাতীয় কোন আবিষ্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইউরোপীয় নাবিকেরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই যন্ত্র অল্প অল্প ব্যবহার করিতে থাকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপক সামুদ্রিক অভিযানে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র যে চঞ্চল ও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার জন্য এই চৈনিক-মুসলিম আবিষ্কার কম্পাস বড় কম দায়ী নহে। কম্পাসের ব্যবহারে দুস্তর সমুদ্রে জাহাজ চলাচল এইরূপ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য না হইলে ডায়াজ, ভাস্কো দা গামা, কলম্বাস, ম্যাগেলান প্রমুখ নাবিকগণের ঐতিহাসিক সামুদ্রিক অভিযান ও যুগান্তকারী ভৌগোলিক আবিষ্কার সমূহ আদৌ সম্ভব হইত কিনা কে জানে।

কাগজ

খ্রীষ্টীয় ইউরোপে কাগজের প্রবর্তন ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ প্রথমে ইতালীতে এবং পরে ইতালী হইতে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশে। কিন্তু ইউরোপে প্রথম প্রবর্তনের প্রায় বারশত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কাগজ আবিষ্কৃত হয় চীন মহাদেশে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে চীনদেশের নানাস্থানে ব্যাপকভাবে কাগজপ্রস্তুত ও ব্যবহারের বহু প্রমাণ বিদ্যমান। সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দী হইতে এই চৈনিক আবিষ্কারের কথা ধীরে ধীরে বহির্জগতে রাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করে (চীনের বাহিরে চৈনিক কাগজের ব্যবহার অবশ্য আরও প্রাচীন) এবং প্রথমে সমরকন্দে ও পরে সমরকন্দ হইতে আরও পশ্চিমে আরবীভাষী দেশগুলিতে কাগজ-প্রস্তুত-বিদ্যা ছড়াইয়া পড়ে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে মুসলমান অধিকৃত স্পেনে কাগজ-প্রস্তুতের একাধিক কারখানা স্থাপিত হয়। এই বিদ্যার জন্য ল্যাটিন ইউরোপ মুসলিম স্পেনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

সভ্যতার দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তনের জন্য যেসব ব্যবহারিক আবিষ্কার বিশেষ সহায়ক হইয়াছে কাগজ তন্মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার যদি মানব-সভ্যতার অগ্রগতির একমাত্র নির্ভুল মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে সেই প্রসারে বৃহত্তম অংশ গ্রহণ করিয়াছে কাগজ ও ছাপাখানা। এই প্রসঙ্গে কাগজ ও ছাপাখানাকে একত্রে উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই, কারণ উভয়েরই আবিষ্কার ও বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাপাখানা না হইলে কাগজের প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধ হইত না; কাগজ আবিষ্কৃত না হইলে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারও বৃথা যাইত।

কাগজের পূর্বে লিখিবার কাজে মিশরীয় প্যাপিরাস (papyrus) ব্যবহৃত হইত। কাগজ ও প্যাপিরাস এক জিনিস নহে, যদিও ল্যাটিন 'papiro', ফরাসী 'papier', ইংরেজী 'paper' ইত্যাদি ইউরোপীয় শব্দ প্যাপিরাস হইতে উদ্ভূত। *Cyperus papyrus* নামক একপ্রকার উদ্ভিদের কোমল কাণ্ডের পাত্‌লা করিয়া কাটা দীর্ঘচ্ছেদগুলিকে

---

* Sarton, *Introduction*, Vol. III, p. 715.

(longitudinal section) পর পর সাজাইয়া অনেকটা পাটির মত বুনিয়া এবং আর্দ্র ও কোমল অবস্থায় চাপ দিয়া মিশরীয় প্যাপিরাস তৈয়ারী করা হইত। সুতরাং প্যাপিরাস এক-প্রকার উদ্ভিদের পাত বিশেষ। কিন্তু কাগজ তাহা নহে। তন্তুময় উদ্ভিদ্ বা উদ্ভিদাংশকে প্রথমে মণ্ডে পরিণত করিয়া ইহার আঁশগুলিকে ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করাই প্রকৃত কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালীর উদ্দেশ্য। সাই লুন নামে এক চৈনিক তুঁত গাছের ছাল, শণ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদির মণ্ড হইতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করেন সম্ভবতঃ খৃীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রস্তুত চৈনিক কাগজের কয়েকটি নমুনা এখনও সংরক্ষিত আছে। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে চীন দেশে ও তুর্কীস্তানে বাঁশের পাতা ও রেশমের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী দুইশত হইতে তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঁশ ও রেশমের স্থান কাগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে এবং পঞ্চম শতাব্দীতে চীনের ও পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রায় সর্বত্র কাগজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গিলগিটে প্রাপ্ত কাগজের উপর লিখিত এক সংস্কৃত গ্রন্থের আবিষ্কারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীরে চৈনিক কাগজের ব্যবহার প্রমাণিত হইয়াছে।* চীনের বাহিরে সমরকন্দে কাগজ উৎপাদনের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম শতাব্দীতে (৭৫৭) এবং চৈনিক কাগজ-নির্মাতারাই এই বিদ্যা সমরকন্দে চালু করে। সমরকন্দ হইতে কাগজের উৎপাদন ও ব্যবহার সিরিয়া, মিশর ও মরক্কো প্রভৃতি ঐস্লামিক দেশগুলিতে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। সমরকন্দের অনুকরণে বাগদাদে এক কাগজ-প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় ৭৯৩ খৃীষ্টাব্দে, একথা পূর্বে বলিয়াছি। চীনের বাহিরে ইহাই সম্ভবতঃ দ্বিতীয় প্রাচীনতম কাগজের কারখানা। ৯০০ খৃীষ্টাব্দে মিশরে এবং দশম শতাব্দীতে স্পেনে কাগজের প্রথম প্রবর্তন ঘটে। ফাস ও শাতিবা ছিল মধ্যযুগের স্পেনের কাগজশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফাসে প্রায় চারিশত কাগজ-প্রস্তুতের কারখানা ছিল। শাতিবার কাগজশিল্প এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এই শাতিবা হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে নিয়মিতভাবে কাগজ সরবরাহ হইত। ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলিতে কাগজশিল্পের দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের পশ্চাতে ইহুদীদেরও যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। এই ব্যবসায়ের এক বিরাট অংশই যে শুধু ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইত তাহা নহে, অধ্যাপক সার্টন মনে করেন, সমরকন্দ হইতে ঐস্লামিক দেশগুলিতে এবং পরে ঐস্লামিক স্পেন হইতে ইউরোপে কাগজের প্রবর্তন ব্যাপারে ইহুদীদের বিশেষ হাত ছিল। আরবীভাষী দেশ হইতে ল্যাটিন ইউরোপে কাগজের ব্যবহার ও উৎপাদন প্রবর্তনের আর একটি নিদর্শন হইল ইউরোপীয় ভাষায় মূল আরবী হইতে উদ্ভূত কাগজ সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজী শব্দ 'ream', জার্মান 'ries', ফরাসী 'rame', ল্যাটিন 'risma' এবং স্প্যানিস ও পর্তুগীজ 'resma' আরবী 'rizma' (রিজ্‌মা) হইতে উদ্ভূত। কাগজের তাড়া বুঝাইতে 'রিজ্‌মা' কথাটি ব্যবহৃত হইত। কাগজের আরবী প্রতিশব্দ 'কাওয়াঘিদ্' পারসী 'কাঘদ' হইতে উদ্ভূত। আমাদের 'কাগজ' শব্দটিও সম্ভবতঃ পারসী 'কাঘদ' হইতে বানানো।

খৃীষ্টীয় ইউরোপে প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় ফ্রান্সের হেরো নামক স্থানে আনুমানিক ১১৮৯ খৃীষ্টাব্দে। তবে স্পেনের শাতিবা দখলে আসিবার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে ইউরোপে এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি দেখা যায়। খৃীষ্টানরা শাতিবা দখল করে ১২৩৮-৩৯ খৃীষ্টাব্দে। আরাগনের রাজারা শাতিবার কাগজশিল্পস্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; ফলে বহুদিন পর্যন্ত এখানকার প্রস্তুত কাগজের সুনাম অব্যাহত ছিল। তবে শাতিবার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অচিরে ইতালীতে কয়েকটি কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৬৮ হইতে ১২৭৮ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত ফাব্রিয়ানোর কাগজ-কলগুলি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে সুনাম অর্জন করে। ফাব্রিয়ানোর

---

* Sarton, *Introduction,* Vol. III, p. 174.

কাগজের সুনাম ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শুনা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কাগজ-শিল্প বোলোনা, পাদুয়া প্রভৃতি অন্যান্য ইতালীয় সহরে বিস্তার লাভ করে। জার্মানীতে সর্বপ্রথম কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে নুরেম্বার্গের নিকট।

প্যাপিরাসের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কাগজের পূর্বে প্যাপিরাস ছাড়া ইহার অভাব আর যে বস্তুটি পূর্ণ করিত তাহা হইল পার্চমেণ্ট অর্থাৎ মেষ বা ছাগচর্মের কাগজ। এই পার্চমেণ্টকে হটাইতে কাগজকে বড় কম বেগ পাইতে হয় নাই। দশম শতাব্দী হইতেই স্পেনে কাগজের উৎপাদন সুরু হইলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে স্পেনে, ইতালীতে অথবা ইউরোপের অন্য কোথাও ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় না। জার্মানীতে কাগজ-প্রস্তুতের তোড়জোড় ঘটে মাত্র চতুর্দশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ, ইউরোপের সর্বত্র কাগজের উৎপাদন ও ব্যবহার ব্যাপকভাবে চালু হইতে প্রায় চারিশত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার কারণ কি? কারণ, পার্চমেণ্ট ব্যবসায়ীদের কায়েমী স্বার্থ। তারপর কাগজের ব্যবসায়ে ইহুদীদের প্রাধান্য থাকায় খৃষ্টান মহলে এই বস্তুটি ব্যবহার করিতে প্রথম প্রথম যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তথাপি সবচেয়ে বড় কারণ হইল পার্চমেণ্টের তুলনায় কাগজের দুর্মূল্যতা। কাপড় ও শণ ছিল তখনকার দিনে কাগজ-প্রস্তুতের প্রধান উপাদান এবং দুইটি বস্তুই ছিল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত ইহার মূল্য-হ্রাস সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণের মধ্যে সুতীর জামা-কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে প্রচুর পরিমাণে ছেঁড়া জামা-কাপড় সুলভ হইতে থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক সস্তায় কাগজ উৎপাদন সম্ভবপর হয়। রসজ্ঞ ফরাসী ঐতিহাসিকগণ তাই চতুর্দশ শতাব্দীকে 'Siècle de la chemise' নামে অভিহিত করিয়াছেন,—অর্থাৎ "সুতীবস্ত্রের শতাব্দী।" এই সুতীবস্ত্রের শতাব্দীর কল্যাণে কাগজ পার্চমেণ্টকে হটাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা শুধু কাগজের নহে, ইহা সমগ্র মানব-সভ্যতার।

কাগজ যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া অধ্যাপক মামফোর্ড বলেন যে, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাইতে কাগজই মুখ্যতঃ দায়ী। পুরুষপরম্পরায় স্বীকৃত নানারূপ প্রথার উপর নির্ভর করিয়াই সামন্ততন্ত্রের স্থায়িত্ব। ব্যক্তিগত পরিচয়, সাক্ষাৎকার, আদান-প্রদান এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কাগজের প্রবর্তনে এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইল এবং এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। সাক্ষাৎকারের বদলে লোকে যাহা বলিবার তাহা লিখিয়া জানানোই সুবিধাজনক মনে করিল। আগে সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর বিনা দলিলে শুধু মুখোমুখি কথাবার্তার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইত। কাগজ সুলভ হওয়ায় এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লেন-দেন দলিল মারফত হইতে লাগিল। মুখের কথার পরিবর্তে দলিলে লিখিত কথা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইহা যে তোমার বা এইরূপ সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হইয়াছিল তাহার কোন লিখিত প্রমাণ আছে? যদি থাকে তবে তোমার কথা মানিব অন্যথা নহে,—কাগজের প্রবর্তন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানুষের সম্পর্কে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে। "Was it written on the bond? If so, it must be fulfilled. If not, it could be flouted."*

মুদ্রণ ও ছাপাখানা

কম্পাস ও কাগজের মত ব্লক-মুদ্রণ-প্রণালীর জন্যও প্রতীচ্য প্রাচ্যের নিকট ঋণী। ব্লক-মুদ্রণের প্রথম আবিষ্কার ও ব্যবহার ঘটে চীন মহাদেশে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই মুদ্রণ-ব্যবস্থা সমগ্র চীনে এবং সম্ভবতঃ জাপান ও কোরিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্যে চৈনিক কারিগর আবিষ্কার করিয়াছিল মুদ্রণ-প্রণালী আর ভারতবর্ষ সরবরাহ

* Lewis Mumford, *Technics and Civilization*, p. 137.

করিয়াছিল ছাপাইবার যোগ্য অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থরাজি। চীন, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থের যেসব নমুনা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। জাপান-সম্রাজ্ঞী সোটোকুর আদেশে মুদ্রিত বৌদ্ধ সম্মোহনী বিদ্যার এক গ্রন্থ প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হয় (৭৭০)। প্রজ্ঞাপারমিতা বা হীরক সূত্রের (Diamond Sutra) চৈনিক তর্জমাবলীর মুদ্রণ-কাল ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে চীন ও জাপানে মুদ্রিত বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে।

মুদ্রণ ব্যাপারে কোরীয় তৎপরতাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দশম শতাব্দী হইতে কোরিয়ায় গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে। কোরীয় মুদ্রণের বিশেষত্ব এই যে, সে দেশে কাঠের হরফের পরিবর্তে প্রথম ধাতুনির্মিত হরফের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ইহাতে উন্নত ধরনের মুদ্রণ সম্ভবপর হইয়াছিল। ধাতুর হরফে মুদ্রিত প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থের কয়েকটি অতি চমৎকার নমুনা এখনও সংরক্ষিত আছে।

নোট মুদ্রণ : গ্রন্থাদি মুদ্রণ ছাড়া আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মুদ্রণের প্রয়োগ ঘটিয়াছিল চীনে। মুদ্রার বদলে নোটের ব্যবহার প্রথম পরিলক্ষিত হয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৮০৭)। এত আগে নোট ছাপানো হইত কিনা তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় না; তবে দশম শতাব্দীতে প্রধান মন্ত্রী ফেং তাও-এর সময় হইতে যে ছাপানো নোটের প্রবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। ধাতুনির্মিত হরফ হইতে এই নোট ছাপা হইত। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নোটের প্রচলন এবং সেই সঙ্গে জাল নোটের সমস্যা এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে, ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানারূপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। রুব্রুকি, মার্কো পোলো, পেগোলেত্তি প্রমুখ একাধিক ইউরোপীয় পর্যটক ও ভৌগোলিক এবং বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক ও ঐতিহাসিক ইব্‌ন্ বাতুতা চৈনিক নোটের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন।

চীন, জাপান ও কোরিয়ার বাহিরে মুদ্রণ-প্রণালীর বিস্তার ঘটে মঙ্গোলাধিপতি কুবলাই খাঁর প্রাধান্যের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সুং রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়া কুবলাই চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তগত করিলে যেসব চৈনিক আবিষ্কার ও বৈশিষ্ট্য তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে মুদ্রণ-প্রণালী তাহার অন্যতম। চীনের বাহিরে মঙ্গোলিয়ায় ও মধ্য-এসিয়ায় মুদ্রণ চালু করিবার উদ্দেশ্যে খানবালিকে তিনি এক বিরাট ছাপাখানা স্থাপন করেন। কিয়াংসি ও হ্যাংচাও হইতে বহু ব্লক তিনি খানবালিকে স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁহার নির্দেশমত মঙ্গোলীয় ও চৈনিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজির মুদ্রণ এখানে বিপুল উদ্যমে আরম্ভ হয়। মঙ্গোলিয়া ও মধ্য-এসিয়া হইতে চৈনিক মুদ্রণ-প্রণালী ক্রমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া ঐস্লামিক দেশগুলিতে ও পরে ইউরোপে পৌঁছে।

ঐস্লামিক দেশগুলির মধ্যে তাব্রিজে (উত্তর-পশ্চিম পারস্য) মুদ্রণের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় হইতে এইখানে কাগজের নোট ছাপার কাজও আরম্ভ হয়। ঐস্লামিক জগতে নোট ছাপার ইহাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যে মুদ্রণের প্রবর্তন ঘটিলেও ইহা তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। এক মিশর ছাড়া আর কোন মুসলমান দেশে ইহা সমাদর লাভ করে নাই। মিশরে মুদ্রণ সম্পর্কে কিছুটা উৎসাহ সৃষ্টির কারণ এই যে, এই ব্যবসায় প্রধানতঃ তুর্কীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল এবং তুর্কীরাই মধ্য-এসিয়া হইতে মধ্যপ্রাচ্যে মুদ্রণের প্রবর্তন করিয়াছিল। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণকে যন্ত্রস্থ করিতে গোঁড়া মুসলমানদের আপত্তি মুদ্রণ সম্পর্কে মুসলিম জগতের উদাসীনতার প্রধান কারণ। বৌদ্ধ গ্রন্থের মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা চৈনিক, জাপানী ও কোরীয় মুদ্রাকরদের যেরূপ প্রেরণা যোগাইয়াছিল, কোরাণ বা অন্যান্য ঐস্লামিক ধর্মগ্রন্থ ছাপানো আপত্তিকর বলিয়া গণ্য হওয়ায় এইরূপ কোন প্রেরণা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অনুভূত হয় নাই। মিশর

ও উত্তর আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মুদ্রণ-প্রচেষ্টার সামান্য নজির পাওয়া গেলেও ইহা কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

> "The Egyptian printing art stopped, however, in the fourteenth century, and the Islamic attitude toward printing having in the meanwhile become inimical, no more printing was done by Muslims (except in China) until 1825, and the printing of the Qur'ān was frowned upon until our own days*

হরফ-মুদ্রণ : ব্লক-মুদ্রণের মত হরফ-মুদ্রণও চৈনিক আবিষ্কার। একাদশ শতাব্দীতে পি সেন হরফ-মুদ্রণের আবিষ্কর্তা। পি সেন-এর সমসাময়িক সেন কুয়া এই আবিষ্কারের ও পদ্ধতির এক চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। টি. এফ. কার্টার তাঁহার গ্রন্থে† সেন কুয়ার বর্ণনার এক ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন; তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

> "এই সময়ে সুতীর কাপড় পরিহিত (অর্থাৎ সাধারণ ঘরের এক কারিগর) চিং-লি পি সেন চলন্ত হরফ (movable type) আবিষ্কার করেন। তাঁহার পদ্ধতি এইরূপ : তিনি আঠাল মাটির সাহায্যে প্রথমে বর্ণমালার হরফগুলি তৈয়ারী করিতেন; হরফগুলির ধার খুব তীক্ষ্ন করিয়া কাটা এবং আগুনে পোড়াইয়া ইহাদের কঠিন ও শক্ত করা হইত। একটা বড় লোহার প্লেটের এক পিঠে তিনি পাইনের রজন, মোম ও কাগজপোড়া ছাই মিশাইয়া তাহা মাখাইয়া রাখিতেন। কোন কিছু ছাপাইবার আগে এই প্লেটের চারিধারে এক লোহার ফ্রেম বসাইয়া প্লেটের উপর হরফগুলি তিনি সাজাইয়া ফেলিতেন। ফ্রেমটি হরফের দ্বারা ভর্তি হইলে প্লেটটি তখন উত্তপ্ত করা হইত; ইহাতে (রজন, মোম ইত্যাদির) মিশ্রণটি গলিয়া হরফগুলিকে প্লেটের সহিত আঁটিয়া যাইতে সাহায্য করিত। এই অবস্থায় একখণ্ড মসৃণ তক্তার দ্বারা হরফগুলিকে চাপ দিয়া ঘষিয়া দিলে ইহারা তখন সমতল হইয়া যাইবে এবং সমস্ত প্লেটটি হইবে সাজানো হরফের একটি বড় ব্লক।
>
> মাত্র দুই তিনখানি প্রতিলিপি ছাপাইবার জন্য অবশ্য এই পদ্ধতি সময় সংক্ষেপের দিক হইতে আদৌ সুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু একশত কি হাজার প্রতিলিপি ছাপাইতে হইলে এই পদ্ধতিতে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা সম্পাদন করা যায়। তিনি সব সময়েই দুইটি করিয়া লোহার প্লেট তৈয়ারী রাখিতেন। একটি প্লেটের দ্বারা ছাপার কাজ চলিবার সময় আর একটি প্লেটে হরফ সাজাইবার বন্দোবস্ত করা হইত, যাহাতে প্রথমটির ছাপার কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টিও ছাপার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। এইভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইটি প্লেটের দ্বারা ছাপা চলিতে থাকায় সমস্ত কাজটি অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইত।
>
> একই পাতায় একটি অক্ষরের বার বার ব্যবহারে যাহাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য প্রতিটি অক্ষরের জন্য অনেকগুলি করিয়া হরফ তৈয়ারী করা হইত; এমন কি কতকগুলি সাধারণ অক্ষরের জন্য বিশ কি ততোধিক হরফও মজুত রাখা হইত। যেসব অক্ষরের দরকার হইত না, তাহাদের হরফগুলির পিঠে কাগজের লেবেল আঁটিয়া কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হইত।"

পি সেন কাঠের হরফও ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে প্লেটের আঠা হইতে কাঠের হরফগুলিকে ছাড়ানো অসুবিধাজনক দেখিয়া তিনি পোড়া মাটিই ব্যবহার করেন। তাঁহার কিছু পরে জনৈক অজ্ঞাতনামা মুদ্রাকর ধাতুর হরফ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, চলন্ত হরফের সাহায্যে মুদ্রণ-প্রণালী চীনদেশে প্রথমে চালু হইতে পারে নাই। চৈনিক বর্ণমালার সংখ্যাধিক্য হেতু হরফ-মুদ্রণ ব্লক-মুদ্রণের তুলনায় অসুবিধারই সৃষ্টি করে বেশী। পি সেনের

---

* Sarton, *Introduction,* Vol. III, p. 732.

† T. F. Carter, *The Invention of Printing in China and Its Spread Westward,* New York, 1931.

তিনশত বৎসর পরে ওয়াং চেন নামে আর একজন চৈনিক মুদ্রাকর আবার চলন্ত হরফের প্রবর্তন, কেহ বলেন, পুনরাবিষ্কার করেন। চেন এক বিরাট ঘূর্ণ্যমান হরফের বাক্স তৈয়ারী করেন (৪২ নং চিত্র); ক্ষিপ্রগতিতে হরফ বাছিয়া অসংখ্য বর্ণমালা সংবলিত জটিল চৈনিক ভাষার গ্রন্থাদি ছাপাইতে এই ঘূর্ণ্যমান বাক্স বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ওয়াং চেন কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। 'নুং শু' নামে স্বরচিত কৃষিবিদ্যার এক গ্রন্থ তিনি নবাবিষ্কৃত হরফ-মুদ্রণের পদ্ধতিতে ছাপাইয়াছিলেন।
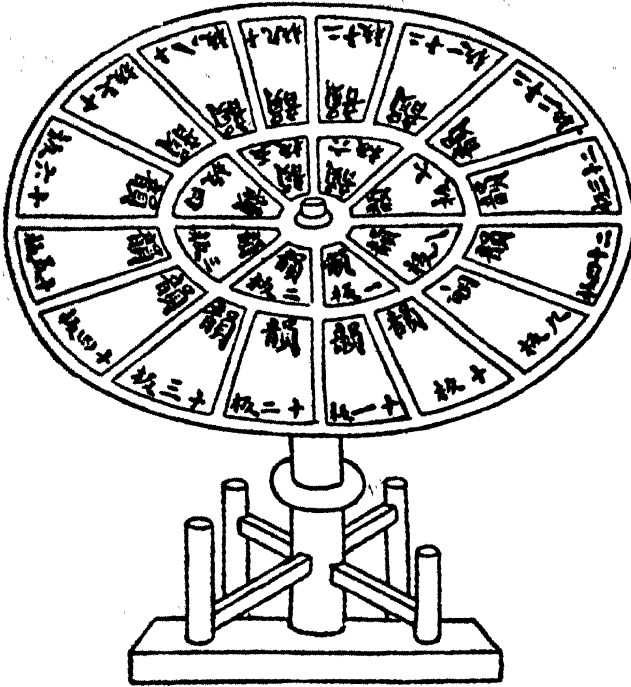
৪২। ঘূর্ণ্যমান হরফের বাক্স; হরফ-মুদ্রণের সুবিধার্থে এই ধরনের বাক্স আবিষ্কার করেন চৈনিক মুদ্রাকর ওয়াং চেন (আনুমানিক ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

এইত গেল মুদ্রণ আবিষ্কার ও বিবর্তনের গোড়ার ইতিহাস। ইউরোপে ব্লক-মুদ্রণ-পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে হরফ-মুদ্রণ-পদ্ধতিতে সে দেশে ছাপার কাজ আরম্ভ হয়। কবে, কোথায় ও কাহাদের মধ্যস্থতায় ইউরোপে প্রথম মুদ্রণ সুরু হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত, ইউরোপে স্বাধীনভাবেই মুদ্রণের পুনরাবিষ্কার ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ ইহা চৈনিক আবিষ্কার-নিরপেক্ষ। আবার অনেকের ধারণা, এই প্রাচ্য আবিষ্কারটি ইউরোপে পৌঁছে রাশিয়া অথবা ইতালীর মধ্য দিয়া। ইউরোপে ছাপার কাজ সুরু হইবার বহু পূর্বে পারস্যে, মিশরে ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে নোট ও গ্রন্থাদি মুদ্রণের যে সমস্ত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছে তাহাতে ইউরোপে স্বাধীনভাবে মুদ্রণের পুনরাবিষ্কারের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এক বা একাধিক অজ্ঞাতনামা মঙ্গোল, তুর্কী, মুসলমান বা ইহুদী মুদ্রাকর এই প্রাচ্য পদ্ধতি যে ইউরোপে প্রবর্তন করিয়াছিল, ইহাই মনে হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ইউরোপে ছাপাখানার প্রবর্তন : ইউরোপের কোন দেশে প্রথম মুদ্রণ সুরু হয় তাহা অদ্যাপি অমীমাংসিত। জার্মানী, ইতালী, হল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রত্যেকেই এই পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করিয়া থাকে। এই দাবী সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া জনৈক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন :—

"Holland has books but no documents;
France has documents but no books;
Italy has neither books nor documents;
Germany has both books and documents."
—*Encyclopaedia Britannica,* Vol. 18, p. 499.

মুদ্রণের প্রথম প্রয়োগ যেখানেই ঘটিয়া থাকুক, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার নানা গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি যে সর্বপ্রথম জার্মানীতে সাধিত হয় তাহা সর্ববাদিসম্মত। এই উন্নতির সহিত গুটেনবার্গ ও তাঁহার সহকর্মী মুদ্রাকরদের প্রচেষ্টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাইনৎজে গুটেনবার্গের ছাপাখানা ছিল; এইখানে তিনি ঢালাই করিয়া ধাতুনির্মিত হরফ তৈয়ারী করিতেন। ১৪৪৭ খৃীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা গুটেনবার্গের মুদ্রণ-প্রচেষ্টার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। ১৪৫৬ খৃীষ্টাব্দে তিনি বাইবেলের কিয়দংশ ছাপান। ইহার একখণ্ড কার্ডিনাল মাজার্যার গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

মাইনৎজ হইতে উন্নত ধরনের চলন্ত হরফের মুদ্রণ-পদ্ধতি ইতালী, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ডে ছড়াইয়া পড়ে। ১৪৬৪ খৃীষ্টাব্দে স্ভাইন্হাইন ও পানারৎজ্ নামে দুই জার্মান মুদ্রাকর রোমের নিকট সুবিয়াকো নামক স্থানে এবং ১৪৬৯ খৃীষ্টাব্দে জোহান ও ভেন্ডেলিন নামে অপর দুই জার্মান ভেনিসে ছাপাখানা স্থাপন করেন। ফ্রান্সে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা ক্রান্ৎজ্, গেরিং ও ফ্রিবুর্গার নামে তিনজন জার্মান; ১৪৭৩ খৃীষ্টাব্দে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁহারা এক ছাপাখানা খোলেন। হল্যান্ডে মুদ্রণ আরম্ভ হয় ১৪৭১ খৃীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ উট্রেচে, যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ওলন্দাজ মুদ্রাকরেরা গুটেন-বার্গেরও আগে হার্লেমে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করে। স্পেনে (ভ্যালেন্সিয়া) ছাপাখানার প্রবর্তক ল্যাম্বার্ট পামার্ট (১৪৭৪)। উইলিয়ম ক্যাক্সটন ইংল্যান্ডের প্রথম মুদ্রাকর (১৪৭৬)। তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন জার্মানীর কলোন সহরের এক ছাপাখানায়।

সুতরাং গুটেনবার্গের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ছাপাখানা ইউরোপের সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এক জার্মানীতেই এই সময়ে সহস্রাধিক ছাপাখানার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রণ ও ছাপাখানার আবিষ্কার ও বিবর্তনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে যে সত্যটি অতি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাহা হইল এই আবিষ্কারের আন্তর্জাতিকতা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু জাতির বহু শতাব্দীব্যাপী গবেষণা, পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার ফল মুদ্রণ ও ছাপাখানা। সমগ্র আবিষ্কারের ইতিহাসে এইরূপ আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। চীন প্রথম কাগজ আবিষ্কার করে; ব্লক-মুদ্রণ ও চলন্ত হরফের সাহায্যে মুদ্রণ সম্পর্কিত প্রথম গবেষণাও সম্পাদিত হয় চীনে। অদ্যাপি সংরক্ষিত ব্লক-মুদ্রণের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গিয়াছে জাপানে। কোরিয়া সর্বপ্রথম ধাতুনির্মিত হরফের দ্বারা গ্রন্থাদি ছাপায়। ছাপাইবার উপকরণ হিসাবে ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়াছিল বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের অমূল্য গ্রন্থসম্পদ। মধ্য-এসিয়া ও তুরস্কের জাতিরা এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে একেবারে ইউরোপের দ্বারদেশ পর্যন্ত মুদ্রণ পদ্ধতির জটিল তথ্য প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে এবং প্রধানতঃ তাহাদের চেষ্টাতেই পারস্য, মিশর প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে

একাধিক ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইউরোপে জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালী মুদ্রণের প্রাচীনতম কেন্দ্র। হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রত্যেকেই হরফ-মুদ্রণের উন্নতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা আরম্ভ করিবার দাবী করিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত জার্মানীই অবশ্য এই আবিষ্কারের বহু উন্নতি সাধন করিয়া ইহার প্রয়োগকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল এবং জার্মানী হইতে উন্নত মুদ্রণ-পদ্ধতি আবার সমগ্র পৃথিবীতে নূতন করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মুদ্রণের আবিষ্কার ও ক্রমোন্নতিতে ইউরোপ ও এসিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেরই অল্প-বিস্তর অবদান আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে মুদ্রণ ও ছাপাখানার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মুদ্রণের কল্যাণে পুস্তকের বহুল প্রকাশ ও প্রচার জ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিল। মুদ্রিত গ্রন্থ সুলভ হওয়ায় এই প্রথম জনশিক্ষার বিপুল সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। হস্তলিখিত গ্রন্থের প্রতিলিপি পূর্বে বিশেষ দুর্মূল্য ছিল; দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থ সংগ্রহ করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এজন্য অনিবার্য কারণেই সমগ্র প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র মৌখিক শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। তারপর হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে সব সময়েই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নানা ভুলভ্রান্তি থাকিয়া যাইত। নানা হাতে একই গ্রন্থের বারংবার প্রতিলিখনের ফলে এইসব ভুলভ্রান্তির মাত্রা এরূপ বাড়িয়া যাইত যে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই সংশয় উপস্থিত হইত। মুদ্রণ প্রবর্তিত হইলে এই জাতীয় অসুবিধার সুযোগ অন্তর্হিত হইল। মুদ্রিত গ্রন্থ সকলের সুলভ হইলে শিক্ষক-নিরপেক্ষ অধ্যয়নের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ মূল পাণ্ডুলিপির যাথার্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয়। কালক্রমে মুদ্রণের গুরুত্ব এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, লোকে একমাত্র ছাপার অক্ষরকেই প্রামাণিক ও অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছিল।

বারুদ

মধ্যযুগের আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বারুদ। চিরাচরিত যুদ্ধবিদ্যার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া এই আবিষ্কারটি সর্বত্র নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক যুগের সূচনা করিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুনের, মধ্যযুগে বারুদের এবং বিংশ শতাব্দীতে আণবিক শক্তির আবিষ্কার মানব-সভ্যতার বিবর্তনের দিক হইতে প্রায় সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ বারুদ বা 'কৃষ্ণচূর্ণ' শোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লার এক বিস্ফোরক মিশ্রণ। গন্ধক ও কাঠকয়লার সহিত মানুষের পরিচয় স্মরণাতীত কাল হইতে। সুতরাং বারুদের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য শোরা কখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং শোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লার মিশ্রণে যে একপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে এই জ্ঞানলাভ কোথায়, কবে ও কিভাবে সম্ভবপর হইয়াছিল। শোরার ইংরেজী 'salt peter' বা 'nitre' কথার উৎপত্তি 'sal petrae' বা 'niter' হইতে। 'sal petrae' ও 'niter' শব্দের ব্যবহার সুপ্রাচীন। ইহার দ্বারা অবশ্য তখন একাধিক পদার্থকে বুঝাইত; যেমন পটাশ, সোডা বা যে কোন ক্ষারীয় লবণ বুঝাইতে 'niter'-শব্দটি ব্যবহৃত হইত। হিব্রু শব্দ 'neter'-এর প্রয়োগ পাওয়া যায় যে কোন ক্ষারীয় লবণ সম্পর্কে। আরবদের আমলে নবম শতাব্দীতে আল্-বসরায় শোরা প্রস্তুতের একটি কারখানার উল্লেখ আছে। তবে ইহা সত্যই শোরা অথবা অন্যবিধ কোন ক্ষারীয় লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না।

আরব্য রাসায়নিকদের রচনায় প্রকৃত শোরার (পটাশিয়াম নাইট্রেট) প্রথম উল্লেখের কথা অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। ইব্‌ন্ আল্-বৈতারের গ্রন্থে এক জাতীয় বিস্ফোরক যৌগিক পদার্থ বুঝাইতে 'বারুদ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আধুনিক আরবী, পারসী ও তুর্কী ভাষায় শোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লার বিস্ফোরক মিশ্রণের নাম 'বারুদ' বা 'বারুৎ'। ভারতীয়

'বারুদ' শব্দটি হুবহু এই আরবী-পারসী শব্দের ব্যবহার মাত্র। তবে আল্-বৈতারের গ্রন্থে ব্যবহৃত বারুদ কথাটির দ্বারা প্রকৃত শোরাকে বুঝাইত কিনা তাহা প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার বর্ণনায় মনে হয়, নাইট্রোজেনঘটিত উদত্যাগী (efflorescent) যে কোন যৌগিক পদার্থকেই তিনি বারুদ আখ্যা দিয়াছিলেন। তবে আল্-বৈতারের সময়ে (মৃত্যু-১২৪৮) আরব্য রাসায়নিকগণ যে শোরার কথা জানিতেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শোরা ও সেই সঙ্গে বারুদ আবিষ্কারের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে চৈনিকদেরও এক দাবী আছে। ট্যাং রাজবংশের প্রাধান্যের কাল হইতে (সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দী) শোরার সহিত চৈনিকদের পরিচয় ছিল, কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সার্টন অবশ্য বলেন, এইরূপ অভিমতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।* এমন কি সপ্তম শতাব্দীতে 'গ্রীক আগুনের'† অনুরূপ কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সহিত চৈনিকদের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা পর্যন্ত তিনি অস্বীকার করেন। তবে একথা সত্য যে, মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে ১১৬১-৬২ ও ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে চৈনিকরা এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। তারপর চীনদেশে প্রচুর পরিমাণে শোরা পাওয়া যায়। এইসব যোগাযোগ লক্ষ্য করিলে এবং ফলিত বিজ্ঞানে চৈনিকদের স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতার কথা স্মরণ করিলে বারুদ আবিষ্কারে তাহাদের অগ্রাধিকারের দাবী একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত, বারুদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ল্যাটিন ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং রজার বেকনই নাকি ইহার আবিষ্কর্তা। তাঁহার *Epistola de secretis operibus naturae* গ্রন্থে উল্লিখিত এক শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিরূপে বারুদ আবিষ্কারের কৃতিত্ব বেকনের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২২৫)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেকনের সময় ইউরোপে কোন কোন বিজ্ঞানী সম্ভবতঃ বারুদ বা ঐজাতীয় বিস্ফোরক দ্রব্যের কথা জানিতেন। কিন্তু তাহাতে বারুদের আবিষ্কার সম্পর্কে ইউরোপীয় অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয় না।

একপ্রকার বিস্ফোরক রাসায়নিক মিশ্রণ হিসাবে বারুদের আবিষ্কার আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নহে। এই মিশ্রণের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-শক্তিকে যুদ্ধে অথবা শান্তিতে প্রয়োগ করিয়া মানব-সমাজের গোটা ভিত্তিকেই যে টলানো যায়, এই উপলব্ধিই বারুদের প্রকৃত আবিষ্কার। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের বা সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাপকভাবে উপলব্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঠিক আবিষ্কার বলা যায় না। শোরা-গন্ধক-কাঠকয়লার বিস্ফোরক মিশ্রণের তথ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কি তাহারও অনেক পূর্বে হয়ত আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বারুদের গুরুত্ব ও অভাবনীয় সম্ভাবনা কেহ উপলব্ধি করে নাই।

শক্তি

যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন জ্ঞান-চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নবজন্মকে সম্ভবপর করিয়াছিল সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক অন্যতম কারণ হইল যান্ত্রিক শক্তির অধিকতর প্রয়োগ। কাজ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। প্রকৃতিতে সবই আছে আবার কিছুই নাই। মৃত্তিকার উর্বরতা আছে, ভূনিম্ন স্তরে অমূল্য খনিজ সম্পদ নিহিত আছে, আর আছে ভূপৃষ্ঠের বিশাল অরণ্য ও নদী-সম্পদ। কিন্তু মৃত্তিকা আপনা হইতে ফসল ফলায় না; খনিজ ও অরণ্যসম্পদ নিজ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারে রূপান্তরিত হয় না। বুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োগে কৃষি ও শিল্পের পত্তনের দ্বারা মানুষকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া লইতে হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসর

---

* *Introduction*, Vol. II, Part II, p. 1037.

† বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।

এইসব দ্রব্য উৎপাদনের কাজে মানুষকে নির্ভর করিতে হইয়াছে প্রধানতঃ তাহার পেশীশক্তির উপর। কালক্রমে পশুশক্তির ব্যবহারে নিজের কায়িক পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হইলেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনধারণের তিক্ত সত্যকে যুগের পর যুগ তাহার স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। পেশীশক্তির উপর নির্ভরশীলতা হইতেই দাসপ্রথার উদ্ভব। প্রাচীন সভ্যতা যে একান্তভাবেই ক্রীতদাস-নির্ভর ছিল তাহার একমাত্র কারণ পেশীশক্তির বিকল্পে অন্য প্রকার শক্তির আবিষ্কারে ও প্রয়োগে মানুষের ব্যর্থতা। আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গীতে দাসপ্রথা যতই নির্মম ও মানবতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হউক, সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় ও বিবর্তনে এই প্রথার যে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল তাহা অনস্বীকার্য।

বলা বাহুল্য, দুর্বল ও পরিমিত পেশীশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নততর ও সমৃদ্ধতর সমাজ বা সভ্যতার ভিত্তি রচনা সম্ভবপর ছিল না। পেশীশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া এবং তাহার স্থানে জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়োজিত করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজের অবসান ঘটাইল এবং যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতার প্রবর্তন করিল। অনগ্রসর মধ্যযুগের রাত্রির অন্ধকারেই এই বিরাট পরিবর্তনটি সাধিত হইয়াছিল। প্রকৃতির উচ্ছৃংখল শক্তিসমূহকে বশীভূত ও নিয়োজিত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল, অভাবের পরিবর্তে প্রাচুর্যের সন্ধান মিলিল, আর এই প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির অনিবার্য ফলস্বরূপ মানুষের জীবনে আসিল বহুযুগের প্রতীক্ষিত অবকাশ। এই অবকাশের ক্ষেত্রেই সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিকাশ। ষোড়শ শতাব্দী হইতে সাহিত্যে, চিত্রাঙ্কনে, শিল্পকলায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে ইউরোপীয় মনীষার যে আশ্চর্য বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন যন্ত্র-সভ্যতা।

জলশক্তি : প্রথমে জলশক্তির কথা ধরা যাক। সারিবন্ধ জলপাত্রে চাকার সাহায্যে জল তুলিবার এক পদ্ধতি বাইজাণ্টিয়ামের ফিলো আবিষ্কার করেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। জলশক্তি ব্যবহার করিয়া তিনি নানাবিধ অটোম্যাটা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে রোমক আমলে জলচাকা-চালিত কল-কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়। জলচাকার ব্যবহার বিভিন্ন সময়ে ও নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও ইহার চল কখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার নানা আইন-কানুনের মধ্যে। শস্য ভাঙ্গাইবার কাজে ইহার ব্যবহার প্রধানতঃ নিবন্ধ থাকিলেও কাঠ চেরাইয়ের কাজে ও কল-কারখানা চালাইবার ব্যাপারে জলচাকার প্রয়োগ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতেই দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে বহু প্রাচীন যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে জলচাকার ব্যবহারও সাময়িকভাবে উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দী হইতে ইউরোপের নানা স্থানে খৃষ্টীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নূতন লোক-বসতি ও সভ্যতার প্রসার ঘটিলে জলচাকার ব্যবহারও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের মত অনগ্রসর দেশেও পাঁচ সহস্র জলচাকা-চালিত কল-কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বোলোনা, আউগস্‌বুর্গ, উল্‌ম্‌ প্রভৃতি শিল্পোন্নত সহরগুলিতে কল-কারখানা চালাইবার কাজে জলচাকার ব্যবহার সাধারণ আকার ধারণ করিয়াছিল। রোণ, দানিয়ুব ও ইতালীর খরস্রোতা নদনদীর প্রবাহ-শক্তিকে জল-চাকার সাহায্যে শৃংখলিত করিয়া নূতন শিল্প-সভ্যতার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। এই সময়ে সমুদ্রতীরে অবস্থিত কোন কোন দেশে, যেমন হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামে, জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টাও দেখা যায়।

কিরূপ বিবিধ কার্যে জলশক্তির ব্যবহার হইত তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। র‍্যাভেন্‌স্‌বুর্গে কাগজের কলে ছেঁড়া কাপড় হইতে মণ্ড প্রস্তুতের কাজে জলশক্তি ব্যবহৃত হইত (১২৯০); লাউসিৎজে লোহার কারখানায় (১৩২০) বড় বড় হাতুড়ি দ্বারা লোহার পাত

পিটাইতে ও কাটিতে এবং আউগ্‌স্‌বুর্গে কাঠ-চেরাইয়ের কারখানায় (১৩২২) এই শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চর্মশালায় চামড়া পিটাইতে, রেশমের কারখানায় রেশম বুনিতে, অস্ত্রশালায় অস্ত্র, বর্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জলশক্তি ব্যবহৃত হইত। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে নুর্নবার্গে রুডল্‌ফ্‌ তার টানিবার যে যন্ত্র নির্মাণ করেন তাহার শক্তি সরবরাহ করিত জলপ্রবাহ। খনি হইতে জল উত্তোলনের জন্য পাম্প চালাইবার কাজে জলশক্তির ব্যবহার সুবিদিত। খনিজ পদার্থকে চূর্ণ করিতে জলশক্তির প্রথম ব্যবহার ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। লৌহশিল্পের অগ্রগতিতে জলশক্তির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলশক্তির প্রয়োগে শক্তিশালী হাপর চালাইয়া বৃহদাকার চুল্লীতে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ সঞ্চার করা সম্ভবপর হয়; ইহাতে লৌহের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বায়ুশক্তি : জলশক্তির পরেই বায়ুশক্তির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুশক্তির প্রয়োগকল্পে মধ্য-এসিয়ায়, আফগানিস্তানে, পারস্যে ও অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে পবনচক্রের উদ্ভব ও ব্যবহারের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১৬৮-৯)। কোন সময় ও কোন পথে পবন-চক্রের আবিষ্কার ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অজ্ঞাত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পবনচক্রের ব্যবহার ইউরোপের নানাস্থানে প্রসার লাভ করে। ইউরোপে পবনচক্রের প্রথম নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায় ১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এক ফরাসী সনদে। এই সনদে সাভিনির প্রধান ধর্মযাজককে এভ্রু, বাইয়ু, কুতাঁস্‌ প্রভৃতি খ্রীষ্টানদের কয়েকটি কেন্দ্রে পবনচক্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে এইরূপ যন্ত্রের স্থাপনাকাল ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং ভেনিসে ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ওলন্দাজ ইঞ্জিনীয়রদের হাতে পবনচক্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয় এবং এই যন্ত্রের মাধ্যমে বায়ুশক্তির ব্যবহারে হল্যাণ্ড যেরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিল পৃথিবীর আর কোন দেশ তাহা পারে নাই। ইহার জন্য হল্যাণ্ডের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দায়ী। হল্যাণ্ডের অধিকাংশই নিম্নভূমি, বালিয়াড়ি, বিল ও জলা; নিম্নভূমি আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও বেশ কয়েক ফুট নীচু। তারপর রাইন, আম্‌স্টেল, মাস প্রভৃতি কয়েকটি বড় নদী ছোট দেশটিকে আরও কয়েকটি ছোট খণ্ডে ভাগ করিয়াছে। এজন্য লোক-বসতির সূত্রপাত হইতেই হল্যাণ্ডের প্রধান সমস্যা ছিল সমুদ্রের গ্রাস হইতে ভূখণ্ডকে রক্ষা করা এবং প্রাচীনকাল হইতেই বাঁধ বা ডাইক নির্মাণ করিয়া সমুদ্রকে ঠেকানোর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সব সময়ে বাঁধের উপর নির্ভর করাও নিরাপদ নয়; ঝড়ের সময় উদ্বেল সমুদ্র স্ফীত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া বা টপকাইয়া ব্যাপক প্লাবন ঘটাইতে পারে। এইরূপ প্লাবন প্রতিরোধ করিতে হইলে স্ফীত জলরাশিকে দেশের অসংখ্য নদী, খাল ও বিলগুলিতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য। এই কার্যে ওলন্দাজরা পবনচক্র ব্যবহার করিয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সমগ্র উপকূলভাগে সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত পবনচক্রগুলি ঝড়ের বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে; ইহাদের সাহায্যে জলরাশি উত্তোলন করিয়া এবং তাহা নদী-নালায় বহাইয়া দিয়া প্লাবন-প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা ওলন্দাজরা শুধু প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সমুদ্রকে ক্রমাগত দূরে ঠেলিয়া বহু নিম্নভূখণ্ডকে তাহারা সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ভূমি-সংরক্ষণ ও ভূমি-উদ্ধার হল্যাণ্ডের প্রধানতম জাতীয় সমস্যা। বিজ্ঞানের প্রয়োগে এই সমস্যার সার্থক সমাধানের উপর নির্ভর করিয়াছে তাহাদের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি। ওলন্দাজ ভাষায় একটা প্রচলনই আছে, ঈশ্বর সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন আর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে ভূমি।

এই প্রয়োজনের তাগিদে ওলন্দাজরা পূর্তবিদ্যায়, বিশেষতঃ ভূমি-সংরক্ষণ ও ভূমি-উদ্ধার সংক্রান্ত পূর্তবিদ্যায়, ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়র ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে এক সময় পরিগণিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ডে জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইলে ইংরেজরা বিখ্যাত ওলন্দাজ ইঞ্জিনীয়র কর্নেলিয়াস ভেমাঁডেনকে এই কাজের ভার দিয়া ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করিয়াছিল।

মধ্যযুগ হইতে জলশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার সুরু হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। জলশক্তি ও বায়ুশক্তির প্রসারে পেশীশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে জলচাকা ও পবনচাকা শক্তির প্রয়োজন আংশিকভাবে মিটাইতে পারিয়াছিল মাত্র। শিল্পে ও কৃষিকার্যে প্রযুক্ত সর্বপ্রকার মোট শক্তির কতটুকু ভাগ জলশক্তি ও বায়ুশক্তি মিলিতভাবে সরবরাহ করিত তাহা অবশ্য সঠিক নির্ণীত হয় নাই। কার্ল মার্ক্স *Capital*-এর এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে ১২,০০০ পবনচক্র সক্রিয় ছিল এবং তাহাদের দ্বারা মোট ৬০০০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হইত। মার্ক্সের এই হিসাবে পবনচক্র হইতে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ খুব কম দেখানো হইয়াছে; অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে পবনচক্র হইতে গড়পড়তা অন্ততঃ ১০ অশ্বশক্তি পাওয়া যায়।* যাহা হউক, পেশীশক্তি ছাড়া জলশক্তি ও বায়ুশক্তির পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহা সঠিক জানা না গেলেও জলচাকা ও পবনচাকার উদ্ভাবনের ফলে সমগ্রভাবে মানুষের শক্তির ব্যবহার প্রাচীনকালে যে কোন সময়ে ব্যবহৃত শক্তির অপেক্ষা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রেণেশাঁসের অব্যবহিত পূর্ব হইতে শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহৃত শক্তির এইরূপ পরিমাণ-বৃদ্ধি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির এক নির্ভুল মাপকাঠি। এই উন্নতির ফলে ইউরোপ সর্ববিষয়ে আগাইয়া চলিবার উৎসাহ পাইয়াছিল। জ্ঞানই অগ্রগতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায় ও পথপ্রদর্শক। তাই নূতন জ্ঞানান্বেষণে ও মননশীলতায় ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। অধ্যাপক মামফোর্ড লিখিয়াছেন :

> "Thanks to the menial services of wind and water, a large intelligentsia could come into existence, and great works of art and scholarship and science and engineering could be created without recourse to slavery: a release of energy, a victory for the human spirit." (*Technics and Civilization*, p. 118.)

নাল, জিন, গলবন্ধ প্রভৃতি অশ্বসজ্জার আবিষ্কার ও অশ্বের কার্যকারিতা বৃদ্ধি : শক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে আমরা আর একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইল মধ্যযুগে কয়েকটি আপাততুচ্ছ আবিষ্কারের দ্বারা অশ্বের পেশীশক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার। ঘোড়ার নাল, জিন ও গলবন্ধ প্রভৃতি আবিষ্কারের দ্বারা এই চতুষ্পদের পেশীশক্তিকে অধিকতর কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে ঘোড়ার ক্ষুরে ধাতুনির্মিত নাল পরাইবার ব্যবস্থা হয়। লৌহনালের অভাবে অশ্ব নরম তৃণভূমির উপর ছাড়া দৌড়াইতে পারিত না; এখন বন্ধুর পথেও অশ্বের গতি অবাধ হইল। শুধু তাহাই নহে, নালের কল্যাণে ভূমিকে সহজ ও নির্ভরযোগ্যভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারায় অশ্বের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইল। ঘোড়ার জিন, গলবন্ধ বা হাঁসুলি, পাদান বা রিকাব ইত্যাদি বিবিধ অশ্বসজ্জা আবিষ্কৃত হয় দশম শতাব্দীতে। গলার পরিবর্তে স্কন্ধদেশে হাঁসুলি স্থাপনের পর হইতে দেখা যায়, অল্প পরিশ্রমে পূর্বাপেক্ষা অধিকক্ষণ অশ্ব দৌড়াইতে বা কাজ করিতে সক্ষম। ইহার কারণ এই যে, পূর্বে গলায় বল্‌গার টান অনুভূত হওয়ায় অশ্ব সহজে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত, এখন সেই টান আসিয়া পড়িল স্কন্ধের উপর। ঘোড়ায় জিন, হাঁসুলি, রিকাব প্রভৃতির ব্যবহার ইউরোপের অনেক পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এসিয়াখণ্ডে। খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে অনুরূপ অশ্বসজ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অশ্বচালনা সম্পর্কিত উপরিউক্ত আবিষ্কারের ফলে কৃষিকার্যে অশ্বের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইল এবং অধিক সংখ্যায় অশ্ব এই কার্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরিবহণে অশ্ব পূর্বেও নিয়োজিত হইত; এখন হইতে এই কাজে অশ্বের ব্যবহারে অনেক বেশী সুফল

* Lewis Mumford, *Technics and Civilization*, p. 117.

পাওয়া গেল। নাল, জিন, গলবন্ধ, রিকাব ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে অশ্বচালনায় কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইউরোপে তাহার কিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল সে সম্বন্ধে লেফেভ্র দ্য নোয়েত এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন।* তিনি দেখাইয়াছেন, প্রাচীনকালে অশ্বসজ্জা সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিদ্যা জানা না থাকায় অশ্বশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হয় নাই। মধ্যযুগ হইতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অশ্বের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বাড়িয়া যায় এবং কালসহকারে ইহা এক বিরাট সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করে।

১০·৩। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)

রেনেশাঁসের নব জাগরণের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় চিত্রাঙ্কনে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্যে স্বাভাবিকতার প্রকাশ রেনেশাঁসের সময়ের শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রশিল্পীদের অপূর্ব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই ছিল এই স্বাভাবিকতার প্রকাশ। সাধারণ দৃশ্যপট অঙ্কনে, মানুষ ও প্রাণীর অবয়ব ও প্রতিকৃতির প্রকাশ-ভঙ্গীতে, তরুলতা পুষ্পের চিত্রে প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস আমরা এই সময় দেখিতে পাই। সাঁদ্রো বত্তিচেলি ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই স্বাভাবিকতার প্রধান উদ্যোক্তা। চিত্ররসিক-মাত্রই এই বিশ্ববিশ্রুত চিত্রকরদের অপূর্ব সৃষ্টির সহিত পরিচিত। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে বত্তিচেলি 'বসন্ত' নামে যে চিত্রটি অঙ্কন করেন রেনেশাঁস আমলের চিত্রকলার তাহা এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমলালেবুর কুঞ্জে দণ্ডায়মানা ভেনাস, তাঁর পাশে কিউপিড; ভেনাস বসন্তরাণীকে স্বাগত জানাইতেছে। বসন্তরাণীর সঙ্গে ফুলের রাণী ফ্লোরা ও বনদেবতা জেফিরাস; ফ্লোরার মুখে একটি ফুলের মালা। ভাব ও বর্ণের অতুলনীয় বিন্যাসে সমগ্র চিত্রটি অপূর্ব। পুষ্প ও লতাগুচ্ছের অঙ্গ-সংস্থানে চিত্রকরের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার নিখুঁত জ্ঞান সুপরিস্ফুট। একই চিত্রে ত্রিশটির উপর বিভিন্ন প্রজাতির পুষ্প ও লতার অবতারণা করা হইয়াছে। মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, ডুরের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বভাবশিল্পী। মানুষ ও প্রাণিদেহের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা কেবল তুলির আঁচড় ও রং-এর কৌশল আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই কার্যে বিজ্ঞানের বিশেষতঃ শারীরস্থানবিদ্যার যথেষ্ট সাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই স্বহস্তে শব-ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত করিতেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি রেনেশাঁস আমলের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীই শুধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। চিত্রশিল্পী হিসাবে লিওনার্দোর প্রতিভা জগদ্বিখ্যাত; প্যারী, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি চিত্রশালায় অদ্যাপি এই প্রতিভার নিদর্শন বর্তমান। কিন্তু যে প্রতিভা-বলে তুলির আঁচড়ে এই কালজয়ী শিল্পী চিত্রপটে বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও বিরাট প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে। লিওনার্দো কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন স্মারক-লিপির আকারে লিখিয়া রাখিতেন মাত্র। এইরূপ বহু সহস্র পৃষ্ঠার স্মারক-লিপির মধ্যে এখন প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই স্মারক-লিপি বা নোট বই-এর† বিচার-বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায়, লিওনার্দো ছিলেন একাধারে ইঞ্জিনীয়র, স্থপতি, পদার্থবিদ্, গণিতজ্ঞ, জীববিদ্ ও দার্শনিক। বিজ্ঞানের যে বিভাগেই তিনি মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার ছাপ পড়িয়াছে।

* Lefebvre de Noëttes, *L'Attelage: Le Cheval de selle à travers les âges*, Paris, 1931.

† Edward McCurdy, *Leonardo da Vinci's Note Books, arranged and rendered into English*, 1906.
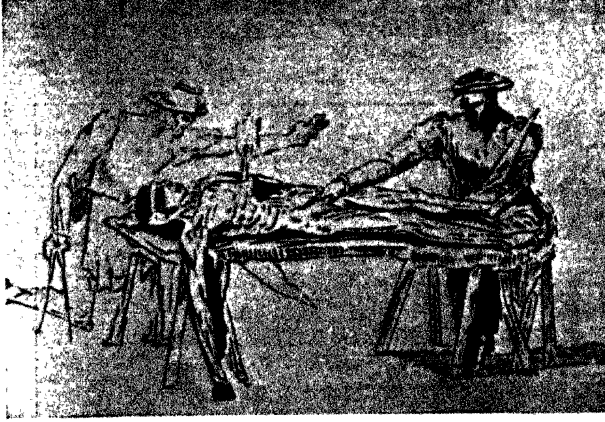
শব-ব্যবচ্ছেদ কার্যে রত মিকেলাঞ্জেলো (?)—মিকেলাঞ্জেলোর স্কেচ (অক্সফোর্ড মিউজিয়াম)।

By kind permission of Messrs. Alfred A. Knopf, Inc., New York.

ফুলের রাণী ফ্লোরা—বত্তিচেলির *Primavera* (১৪৭৮) হইতে।

By kind permission of Messrs. Ernest Benn Ltd., London.

PLATE VIII

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। (লিওনার্দোর নিজের অঙ্কিত পেনসিল স্কেচ)। (*Scientific American*, June, 1948.)

[পৃঃ ২৯৫

একই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে নানা বিদ্যার এরূপ আশ্চর্য সমাবেশের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজন্মের যেসব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা এই এক ব্যক্তিতে মূর্ত হইয়া উঠে। সাহিত্যে পেত্রার্কার উদাত্ত কণ্ঠ যদি নবযুগের সূচনা করিয়া থাকে, বিজ্ঞানে সেই নবযুগকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন ফ্লোরেণ্টাইন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। বলিতে গেলে, আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে তিনি একাই একটি সমগ্র অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকট লিওনার্দো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সের পিয়েরো দা ভিঞ্চি ছিলেন ফ্লোরেন্সের একজন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী। অতি অল্প বয়স হইতেই লিওনার্দো চিত্রাঙ্কনে বিশেষ উৎসাহ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পুত্রের এরূপ উৎসাহ দেখিয়া সের পিয়েরো তাহাকে অ্যাণ্ড্রিয়া ভেরোচ্চিও নাম এক খ্যাতনামা চিত্রকর ও কারিগরের নিকট শিক্ষানবিসির জন্য প্রেরণ করেন। ভেরোচ্চিও তখনকার দিনের একজন নামকরা চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে ও পূর্তবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইহার উপর তিনি আবার সোনা-রূপার কারবারও চালাইতেন। এই সময় কারিগরদের সমস্ত জিনিস নিজের হাতেই তৈয়ারী করিয়া লইতে হইত; এজন্য সব রকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত কারিগরদের কারখানাগুলি ছিল রীতিমত এক একটি গবেষণাগার বিশেষ। ভেরোচ্চিওর মত শিল্পী ও কারিগরের শিক্ষানবিসি লাভ করা পরম সৌভাগ্যের কথা। লিওনার্দো এই সৌভাগ্য ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি চিত্রাঙ্কন ছাড়া পূর্তবিদ্যা, স্থাপত্য, ধাতুনিষ্কাশনবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থানবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করেন। ভেরোচ্চিওর কাছে শিক্ষানবিসির সময় হইতেই স্বাধীন-ভাবে তিনি চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

লিওনার্দোর শিল্পী-প্রতিভার কথা অবগত হইয়া মেদিচিরা তাঁহাকে তাঁহাদের রাজসভায় আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, লিওনার্দো শুধু চিত্রাঙ্কন লইয়াই থাকিবেন। কিন্তু তিনি চিত্রাঙ্কন ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, পূর্তবিদ্যা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানে বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। শুধু তাহাই নহে, এইসব গবেষণার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রাচীন বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মতামতের সমালোচনা, এমন কি সময় সময় অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করেন। ইহাতে ফ্লোরেন্সের পণ্ডিত ও বিদ্বৎসমাজ ক্রমশঃ লিওনার্দোর উপর অসন্তুষ্ট হয়, এবং মেদিচিরাও তাঁহাকে অপছন্দ করিতে আরম্ভ করেন। লিওনার্দোও বুঝিলেন, ফ্লোরেন্সে তাঁহার পক্ষে সুনাম, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের আশা সুদূরপরাহত। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ করিয়া মিলানে আসেন এবং কাউণ্ট লুদোভিচো ফোর্জার অধীনে মিলানের প্রধান চিত্রশিল্পী ও ইঞ্জিনীয়রের পদে নিযুক্ত হন। লুদোভিচোর নিকট পদ প্রার্থনা প্রসঙ্গে লিওনার্দো তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, তাহা সংরক্ষিত আছে। পূর্তবিদ্যায় ও ফলিত বিজ্ঞানে তিনি কিরূপ উৎসাহী ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি নূতন যেসব জিনিস ও টেক্‌নিক আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার এক চমৎকার বর্ণনা এই পত্রে পাওয়া যায়। এই পত্রের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :

"যুদ্ধার্থে মারণাস্ত্র নির্মাণে ও উদ্ভাবনে যাহারা নৈপুণ্য ও মৌলিকতা দাবী করে তাহাদের নির্মিত ও উদ্ভাবিত অস্ত্রশস্ত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইসব অস্ত্রের সহিত প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রের কোনই প্রভেদ নাই। হে মহানুভব! এ সম্বন্ধে আমি যেসব গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি অভয় পাইলে আপনার নিকট তাহা জ্ঞাপন করিতে চাই। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি তাহা সুবিধামত নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :

"আমি একপ্রকার অতিশয় হাল্‌কা অথচ সুদৃঢ় পুল তৈয়ারী করিয়াছি; অতি সহজে ইহাকে বহন করা চলে, শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে অথবা শত্রু হইতে পিছনে হটিতে ইহা ব্যবহার করা যায়। (আমার তৈয়ারী) আর এক প্রকার পুল আগুনে বা যুদ্ধে বিনষ্ট হয় না, অথচ অনায়াসে ইহাকে উত্তোলন

বা সংস্থাপন করা যায়। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষের পুল কিভাবে পোড়াইতে ও ধ্বংস করিতে হয়, আমি সে কৌশল জানি।

"কোন স্থান অবরোধ করিবার সময় কিভাবে পরিখা হইতে জলনিকাশ করিতে হয়, আমি তাহা জানি। এই সম্পর্কে নানা ধরনের পুল, মই ও বাঁধানো রাস্তা এবং এইরূপ অভিযানের উপযোগী নানারকম যন্ত্র নির্মাণ করিবার কৌশলও আমার করায়ত্ত।...

"অধিকন্তু আমার এমন সব (বিস্ফোরক) মসলা আছে যাহার দ্বারা শিলাবৃষ্টির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ করা যায়; এইরূপ আর এক মসলার দ্বারা ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া শত্রুকে ভীষণভাবে ভীত ও বিভ্রান্ত করিবার উপায় আমি জানি; এইসব মসলার ব্যবহার ও বহন খুব সহজ।

"শান্তির সময়ও সরকারী ও বেসরকারী গৃহাদি নির্মাণ ও অনুরূপ পূর্তকার্যের দ্বারা এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জল সরবরাহের ব্যবহার দ্বারা আমি আপনার পরিপূর্ণ সন্তোষ বিধানে কৃতকার্য হইব বলিয়া আশা করি।

"আমি মৃন্ময়, প্রস্তর বা পিত্তলনির্মিত মূর্তি গড়িতে সুদক্ষ এবং যে কোন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের মত—তা তিনি যত বড় শিল্পীই হউন, আমি ভাল ছবি আঁকিতে পারি।

"উপরিউক্ত বিষয়ের যে কোন একটিতে আমার নৈপুণ্য সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ থাকিলে আপনার উদ্যানে অথবা নির্বাচিত যে কোন স্থানে আমি সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।..."

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই পত্রে লিওনার্দো সামরিক পূর্তবিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতার কথাই বিশদভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। উচ্চাভিলাষী রাজ্যলিপ্সু লুদোভিচোর আর্ট অপেক্ষা সামরিক পূর্তবিদ্যার প্রয়োজন যে অনেক বেশী এইরূপ আন্দাজ করিয়াই তিনি তাঁহার দরখাস্ত এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন।

লিওনার্দো ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লুদোভিচোর রাজসভায় ছিলেন। লুদোভিচোর পতন ঘটিলে সিজার বোর্জিয়ার অধীনে তিনি প্রধান ইঞ্জিনীয়রের পদে নিযুক্ত হন ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫১৩ হইতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমে পোপের টাঁকশালের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি কাজ করেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লিওনার্দো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রধানতঃ ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। এজন্য কল্পনা ও প্রজ্ঞামূলক চিন্তা অপেক্ষা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণই ছিল তাঁহার গবেষণার বৈশিষ্ট্য। লিওনার্দো ছিলেন প্রধানতঃ শিল্পী; চিত্রশিল্পীর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণতা ও সাফল্য লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগে পারদর্শিতা অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শিল্প-প্রচেষ্টার সম্পূর্ণতার জন্য তাঁহাকে আলোকবিদ্যা, চক্ষুর গঠন-বৈচিত্র্য, শারীরস্থান, পক্ষীর উড্ডয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হইতে হয়। ভেরোচ্চিওর কারখানায় শিক্ষানবিসির কালে তিনি পূর্তবিদ্যায় উৎসাহিত হন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত এই বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ অটুট ছিল। এই পূর্ত-বিদ্যাই লিওনার্দোর বলবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার উৎস। এইসব ব্যবহারিক বিদ্যা আয়ত্তের জন্য তিনি নিজে যেমন বহু রকমের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে পূর্বগামী প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানিগণের রচনা ও গবেষণার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। লিওনার্দো তাঁর স্মারক-লিপিতে বাহাত্তর জন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে অ্যালবার্ট অব স্যাক্সনির রচনা, বলবিদ্যা বিশেষতঃ লিভার সম্বন্ধে নেমোরারিয়াসের গ্রন্থাদি এবং আলোকবিদ্যা সম্বন্ধে আল্-কিন্দি, ইব্‌ন্ আল্-হাইথাম ও রজার বেকনের মৌলিক আলোচনাগুলি অতীব যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পূর্তবিদ্যায় সুপ্রাচীন ভিট্রুভিয়াস এবং সমসময়ের খ্যাতনামা স্থপতি আলবের্তির (১৪০৪-৭২) রচনাবলী ছিল তাঁহার বিশেষ প্রিয়। সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে

বিখ্যাত স্থপতি ব্রামান্তে, মিলানের গণিতের অধ্যাপক লুকা পাকিওলি, পাভিয়ার শারীরস্থান-বিদ্যার অধ্যাপক দেল্লা তোরে এবং গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক তস্কানেলি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রাচীনকালের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে আর্কিমিডিসের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সময় আর্কিমিডিসের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য ছিল; এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে আর্কিমিডিসের গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে তার্তাগুলিয়া তাঁহার গাণিতিক গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি লিওনার্দোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারে তিনি অবশ্য প্রথম নন; গ্রোসেটেস্ট, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস ও রজার বেকন লিওনার্দোর পূর্বে এবিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। তবে প্রধান প্রভেদ এই যে, তিনি নিজে তাঁহার প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া এবং আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের ইহাই একমাত্র পথ। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আধুনিক পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক হইলেন লিওনার্দো। গ্যালিলিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই বল-বিদ্যায় ও জ্যোতিষে তাঁহার যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। লিওনার্দো তাঁহার নোট বই-এ লিখিয়াছেন, প্রকৃত বিজ্ঞান মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত; যেসব বিজ্ঞান এই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত নহে তাহা অসার ও ভ্রমাত্মক। "To me it seems that all sciences are vain and full of errors that are not born of experience, mother of all certainty, and that are not tested by experience; that is to say, that do not at their origin, middle, or end, pass through any of the five senses.* এইভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের যেসব অভিজ্ঞতা জন্মে, বুদ্ধি ও মননশীলতার দ্বারা সেইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অথবা তাহাদের অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম ও নীতি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তখন চেষ্টা করা উচিত। তারপর বুদ্ধি ও মননশীলতার সাহায্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার যে ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে, প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যায় গণিতের প্রয়োগ সম্ভবপর। এই বিষয়টির উপর লিওনার্দোকে বিশেষ জোর দিতে দেখা যায়। তিনি বলিতেন, নির্ভুল গাণিতিক অথবা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যে বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা সম্ভবপর নহে তাহা কোনক্রমেই প্রকৃত বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না। "No human investigation can be called true science without passing through mathematical tests; and if you say that the sciences which begin and end in the mind contain truth, this cannot be conceded and must be denied for many reasons."* সব শেষে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা নীতিকে যতক্ষণ পর্যন্ত একাধিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ভুলভাবে যাচাই করা না যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার সত্যতাকে স্বীকার করা যাইতে পারে না। পরীক্ষার ত্রুটী এড়াইবার জন্য একই জিনিস তিনি বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপদেশ দিতেন। "But before you base a law on this case test it two or three times and see whether the tests produce the same effects. This experiment should be made many times so that no accident may occur to hinder or falsify this proof, for the experiment may be false whether it

---

* Irma A. Richter (Editor), *Selections from the Notebooks of Leonardo da Vinci*, Oxford, 1952; p. 5-9.

deceived the investigator or not."* বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কোন আলোচনা লিওনার্দো তাঁহার নোট বই-এ করেন নাই; যখন যেমন মনে হইয়াছে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা টুকিয়া রাখিয়াছেন। এইসব টুকরা টুকরা কথা একত্র করিয়া পড়িলে দেখা যাইবে, অতি পরিষ্কাররূপে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম অবহিত হইয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা : এইভাবে অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লিওনার্দো যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা আরও বিস্ময়কর। প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণার ফল লিখিত না হওয়ায় বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার এজাতীয় প্রয়াসের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় নাই। বলবিদ্যায় তিনি বল ও গতির প্রকৃত সম্পর্ক অনুধাবন করিয়াছিলেন; বল যে কেবল গতির কারণ নহে, ইহার দ্বারা যে গতির ত্বরণ হইয়া থাকে, তাহা বুঝা যায় লিওনার্দোর নিম্নোক্ত উক্তি হইতে : "Nothing perceptible by the senses is able to move itself; . . . every body has a weight in the direction of its movement." অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আপনা হইতে গতিশীল হইতে পারে না; গতির অভিমুখে বস্তুর ভার থাকে। প্রথমটির দ্বারা তিনি পদার্থের জড়ত্ব বা নিষ্ক্রিয়তা বুঝাইতে চাহিয়াছেন; দ্বিতীয়টি অস্পষ্টভাবে বল ও ত্বরণের সম্বন্ধ নির্দেশ করিতেছে। তির্যকভাবে নিক্ষিপ্ত তীরের গতিপথ যে অধিবৃত্ত হয়, কয়েকটি অঙ্কনের দ্বারা ইহা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। স্টেভিনাসের পূর্বে তিনি বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বা অনন্ত গতির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। লিওনার্দো যন্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। যন্ত্র চালাইতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। তিনি দেখান যে, বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন গতি সম্ভব হইলে যন্ত্রকে অনন্তকাল ধরিয়া চালানো যায়, কিন্তু ইহা সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ। তাই তিনি বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন গতির অস্বাভাবিকতার কথা বলিয়াছিলেন।

তরল পদার্থের চাপ সম্বন্ধে আর্কিমিডিসের মতবাদ তিনি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি দেখান, একাধিক সংলগ্ন পাত্রে তরল পদার্থ একই উচ্চতা প্রাপ্ত হয়; ইহা বিভিন্ন পাত্রের আকার বা আয়তনের উপর নির্ভর করে না। তিনি আরও বলেন, দুইটি পাত্রে দুই রকম তরল পদার্থ রাখিলে তাহাদের উচ্চতা তরল পদার্থের ঘনাঙ্কের (density) ব্যস্ত অনুপাত (inversely proportional) হয়। সিদ্ধান্তগুলি লিওনার্দোর স্বাধীন গবেষণার ফল কিংবা আর্কিমিডিসের মতবাদের পুনরাবৃত্তি তাহা সঠিক বলা যায় না। এই সম্পর্কে জল-বলবিদ্যার বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নলপথে ও ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে জলপ্রবাহের প্রশ্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোকবিদ্যায় লিওনার্দোর বিশেষ উৎসাহ ছিল। আলোকরশ্মিকে তিনি এক প্রকার তরঙ্গের প্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন।

শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত : চিত্রাঙ্কনে ও ভাস্কর্যে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভের আশায় লিওনার্দো শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চিত্রকর বা ভাস্করের পক্ষে মানব ও প্রাণিদেহের গঠনবৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের দৃষ্টান্ত অবশ্য নূতন নহে এবং লিওনার্দোর পূর্বে ও পরে অনেক শিল্পীর মধ্যেই এই প্রয়াস দেখা যায়। তবে ইঁহারা কেহই অস্থি ও পেশীর বাহ্যিক সংস্থানের বাহিরে শারীরস্থান সম্বন্ধে অধিক কিছু অধ্যয়ন করা প্রয়োজন মনে করিতেন না। লিওনার্দোর অনুসন্ধিৎসু মন অবশ্য ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। তিনি দেহের প্রত্যেক স্থানের অস্থি ও পেশীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে বহু শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। এই প্রকার শব-ব্যবচ্ছেদজনিত অভিজ্ঞতা তিনি বহু চিত্রে ও পেনসিল স্কেচে অপূর্ব দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

লিওনার্দো মানব ও প্রাণিদেহের গঠনবৈচিত্র্যের নানা তুলনা করিয়াছেন। মানুষের পায়ের অস্থির সহিত অশ্বের পিছনের পায়ের অস্থির নানা মিল ও সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করেন। যেমন অশ্বের তথাকথিত জঙ্ঘার (hock বা hough) সহিত মানুষের পায়ের গাঁইটের নিকট সাদৃশ্য আছে। লিওনার্দোই সর্বপ্রথম এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন; তাঁহার বহু পরে অপরের
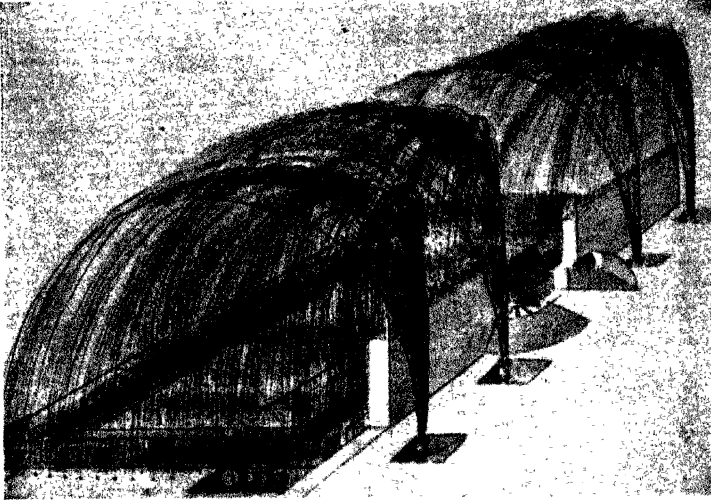
দুর্গের অভ্যন্তরে গোলা নিক্ষেপের দৃশ্য—লিওনার্দোর স্কেচ।
Crown copyright, Windor Castle Library.
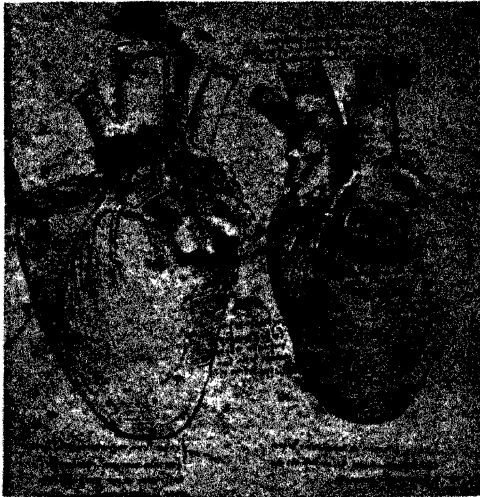
ব্যবচ্ছেদের পর হৃৎপিণ্ডের দৃশ্য—লিওনার্দোর স্কেচ।
(Quaderni II fo. 3v)

PLATE X

জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অবস্থান—লিওনার্দোর স্কেচ।
(Quaderni V fo. 8r)

হৃৎপিণ্ড, ক্লোমশাখা, মহাপাত্র ইত্যাদি—লিওনার্দোর স্কেচ।
(Quaderni III fo. 10v)

[পৃঃ ২১১

দুর্গের অভ্যন্তরে গোলা নিক্ষেপের দৃশ্য—লিওনার্দোর স্কেচ।

Crown copyright, Windor Castle Library.

ব্যবচ্ছেদের পর হৃৎপিণ্ডের দৃশ্য—লিওনার্দোর স্কেচ।

(Quaderni II fo. 3v)

সেই ছাঁচের দ্বারা কাচের এক কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈয়ারী করেন। এই নকল হৃৎপিণ্ডের উপর নানা পরীক্ষা করিবার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কপাটকগুলি কেবল একদিকেই শোণিত-সংবহন ঘটিতে দেয়। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতদূর অগ্রসর হইয়াও লিওনার্দো শেষপর্যন্ত শোণিত-সংবহন আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে হার্ভি এই সত্য আবিষ্কার করেন। শোণিত-সংবহন প্রণালীর প্রকৃত স্বরূপ প্রায় উদ্ঘাটন করিয়াও এ সম্বন্ধে তাঁহার নীরব থাকিবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি গ্যালেনের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেপ্টামের মধ্য দিয়া রক্ত যে দক্ষিণ হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে এই ভুল তথ্যে তাঁহার সন্দেহ থাকিলেও ইহা তিনি ভুল প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই।

লিওনার্দো চক্ষুর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেও মূল্যবান গবেষণা করেন। তিনি একটি কৃত্রিম চক্ষু তৈয়ারী করিয়া তাহার সাহায্যে অক্ষিপটের উপর কিরূপে বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে তাহা ব্যাখ্যা করেন।

লিওনার্দোর প্রভাব : সমসময়ে ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে লিওনার্দোর প্রভাব সম্বন্ধে এককালে পণ্ডিতগণ দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা না করায় এবং তাঁহার স্মারক-লিপির কথা স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লিওনার্দোর প্রভাব তেমন ব্যাপক হইতে পারে নাই, বহুদিন ধরিয়া একদল ঐতিহাসিক এরূপ কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। চিন্তাধারার অভিনবত্বে ও স্বকীয়তার দিক হইতে লিওনার্দো সমসাময়িক কাল হইতে অনেক বেশী আগাইয়া থাকায় তাঁহার নোট বই-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বিলম্বে অনুভূত হইয়াছিল, এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দুহেম এবং পূর্তবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা পরীক্ষা করিয়া থিওডোর বেক দেখাইয়াছেন যে, সমসময়ে ও তাঁহার মৃত্যুর পরে পূর্ণ এক শতাব্দী পর্যন্ত ইতালীতে, ফ্রান্সে ও জার্মানীতে লিওনার্দোর প্রভাব বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইয়াছিল।* তাঁহার নোট বই-এ আলোচিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ষোড়শ শতাব্দীর বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়রদের তৎপরতাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। জলনিয়ন্ত্রণবিদ্যা, ফলিত বলবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আগস্তিনো রামেলি (১৫৮৮), জাক বেস' (১৫৬৮), ভিত্তোরিও জঙ্কা (১৬০৭) এবং কাস্তেলি (১৬২৮) যেসব প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন তাহার প্রত্যেকটির প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। বলাবাহুল্য, লিওনার্দোর প্রভাব এই কয়েকজন বিজ্ঞানীর রচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ফলিত বলবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার বহু গ্রন্থেই তাঁহার ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্ট। রামেলি ও বেস'র কল্যাণে লিওনার্দোর প্রভাব ফ্রান্সে বিস্তৃত হইয়াছিল, জার্মানীতে এই প্রভাবের জন্য দায়ী স্ট্রাডা।

---

* A. P. Usher, *A History of Mechanical Inventions*, Harvard, 1954; p. 215-16.

একাদশ অধ্যায়

১১·১। জ্যোতিষ—সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন

প্রাচীন জ্যোতিষে সন্দেহ—নূতন জ্যোতিষীয় ভাবধারার সূচনা

মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্যোতিষের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, প্রথমে অ্যারিষ্টটলীয় ও পরে টলেমীর জ্যোতিষীয় মতবাদকে আয়ত্ত ও অভ্রান্ত মনে করিয়াই ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদেরা সন্তুষ্ট ছিলেন। এক আলফনসো ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মীদের সামান্য প্রচেষ্টা ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও জ্যোতিষে নূতন পর্যবেক্ষণের কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় না। নূতন পর্যবেক্ষণের, সুতরাং নূতন তথ্যের অভাবে, নূতন জ্যোতিষীয় মতবাদের অভ্যুত্থান সম্ভবপর নহে। তারপর ক্ষমতাবান খ্রীষ্টীয় দার্শনিকেরা ধর্মতত্ত্বের সহিত অ্যারিষ্টটলীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষীয় মতবাদের এমন সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন যে, সরাসরি ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধতার আশঙ্কায় প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদের সহসা কোন পরিবর্তনেরও আশা ছিল না।

নিকোলাস অব কুসা (১৪০১-৬৪) : তথাপি পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে জ্যোতিষীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ধীরে ধীরে রেনেশাঁসের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে জ্যোতির্বিদ্‌গণ কেবলমাত্র তত্ত্বীয় আলোচনার পরিবর্তে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন। এই মনোযোগ যত বৃদ্ধি পাইল, পর্যবেক্ষণের দ্বারা অধিকতর নির্ভুল তথ্যসমূহ যত সংগৃহীত হইতে থাকিল, টলেমীর জ্যোতিষের নানা অসঙ্গতি ক্রমশঃ ততই প্রকট হইয়া পড়িল এবং প্রাচীন জ্যোতিষের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। নিকোলাস অব কুসা তাঁহার সময়ের জ্যোতির্বিদ্‌ ও দার্শনিকদের 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ অজ্ঞানতা' সম্বন্ধে এক কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি অসীম, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 'কোন নিশ্চল বস্তুর সহিত তুলনা সম্ভবপর হইলে তবেই গতির অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়; এই কারণেই পৃথিবীর গতি আমরা অনুভব করি না, কিন্তু বাস্তবিকই পৃথিবীর গতি আছে।'

জর্জ পুরবাক (১৪২৩-৬১) : জর্জ পুরবাকের নেতৃত্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষচর্চা বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। পুরবাক যৌবনে নিকোলাস অব কুসার সংস্পর্শে আসেন এবং ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে ভিয়েনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি আলফনসোর জ্যোতিষীয় তালিকা ও 'অ্যালমাজেস্টের' নানা ভুল আবিষ্কার করেন এবং 'অ্যালমাজেস্টের' এক নূতন ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের তিনি নামকরণ করেন *Epitome of Astronomy*। প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও এই কার্যে তিনি আশানু-রূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত 'অ্যালমাজেস্টের' কোন নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ না পাওয়ায় তাঁহাকে এই গ্রন্থের বহু ত্রুটীপূর্ণ ও বিকৃত সিরিয়াক অথবা আরবী তর্জমার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই কাজ সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রেজিওমণ্টানাস (১৪৩৬-৭৬) : পুরবাকের জ্যোতিষীয় তালিকা সংস্কারের মহাসঙ্কল্প বৃথা যায় নাই। তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী জন মুলার বা রেজিওমণ্টানাস গুরুদেবের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুরবাকের খ্যাতি ও প্রতিভার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট জ্যোতিষ ও গণিত শিক্ষা ও গবেষণা করিবার জন্য রেজিওমণ্টানাস ষোল বৎসর বয়সে ভিয়েনায় আসেন এবং অচিরে পুরবাকের প্রিয় শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। গ্রীক ভাষায় লিখিত মূল 'অ্যালমাজেস্টের' প্রতিলিপির অভাবে পুরবাকের যে অসুবিধা হইয়াছিল কনস্তান্তিনোপল পতনে বহু প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের মধ্যে 'অ্যালমাজেস্টের' কয়েকখানি প্রতিলিপি উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ইতালীতে আনীত হইলে এই অসুবিধা দূর করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। পুরবাক বাঁচিয়া থাকিতেই 'অ্যালমাজেস্টের' গ্রীক প্রতিলিপির সংবাদ ভিয়েনায় পোঁছিয়াছিল এবং রেজিওমণ্টানাসকে সঙ্গে লইয়া তিনি ইতালীতে গমন করিবার সমস্ত আয়োজনও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে পুরবাকের ভাগ্যে ইহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। রেজিওমণ্টানাস একাই ইতালীতে গিয়া এইসব প্রাচীন গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়নে দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি পুরবাকের *Epitome of Astronomy* সম্পূর্ণ করেন এবং নিজেও জ্যোতিষ ও গণিত সংক্রান্ত অনেক গবেষণা করেন। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও সংশোধিত পুরবাকের জ্যোতিষীয় তালিকা প্রকাশিত হইলে জ্যোতিষীয় গবেষণার ইহা এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সর্বত্র অভিনন্দিত হয়।

রেজিওমণ্টানাস ইতালী পরিত্যাগ করেন ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে। ভিয়েনায় ও হাঙ্গেরীতে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি নুর্নবার্গে জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য আমন্ত্রিত হন। এইখানে বার্নাড ওয়ালটার নামে এক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যবসায়ী একটি মানমন্দির স্থাপনের জন্য রেজিওমণ্টানাসকে অর্থসাহায্য করেন। নুর্নবার্গের সুদক্ষ কারিগরদের সাহায্যে তিনি এই মানমন্দিরটি তৈয়ারী করেন এবং নিখুঁত ও উন্নত ধরনের জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করেন। জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য এইরূপ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ইহার পূর্বে ইউরোপে আর কোথাও ছিল না। অবশ্য নাসির আল্-দিন আত্-তুসি ও উলুগ বেগের যন্ত্রপাতির তুলনায় রেজিওমণ্টানাসের যন্ত্রপাতি অনেক নিকৃষ্ট ছিল। এই মানমন্দির হইতে রেজিওমণ্টানাস ও তাঁহার সহকর্মিগণ—বার্নার্ড ওয়ালটারও একজন সহকর্মী ছিলেন—বহু পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন; ইহাদের মধ্যে ধূমকেতু সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বকীয়তার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিকোলাস অব কুসা, পুরবাক বা রেজিও-মণ্টানাস কাহারও গবেষণা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু নিকোলাস পৃথিবীর গতির কথা প্রচার করিয়া, পুরবাক ও রেজিওমণ্টানাস আলফনসীয় তালিকার ও আরবী হইতে অনূদিত 'অ্যালমাজেস্টের' নানা দোষত্রুটীর প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদে সন্দেহ উদ্রেক করিলেন এবং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জ্যোতির্বিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর অ্যারিষ্টটলীয় জ্যোতিষ ও টলেমীর জ্যোতিষের পার্থক্যও ইউরোপীয় গোঁড়া পণ্ডিতদের কম বিচলিত করিল না। তাঁহারা এত-কাল অ্যারিষ্টটলের মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন; এখন দেখিলেন, আর একজন প্রতিভাবান গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ ক্লডিয়াস টলেমী অ্যারিষ্টটল অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের জ্যোতিষীয় মতবাদ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইসব আবিষ্কার ও সন্দেহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রেণেশাঁসের যুগে কোন কোন প্রগতিবাদী জ্যোতির্বিদের এইরূপ ধারণা হয় যে, এতকাল নির্বিবাদে অনুসৃত গ্রীক জ্যোতিষীয় মতবাদের মধ্যে অনেক গলদ আছে এবং এইসব গলদের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতির ও অগ্রগতির কোন আশা নাই। কোপার্নিকাস এইরূপ ধারণার বশবর্তী

হইয়াই জ্যোতিষীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিষের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিতে ধ্রুব বিশ্বাসের বলেই তিনি তাঁহার যুগান্তকারী সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষীয় মতবাদ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)

সংক্ষিপ্ত জীবনী : মিকোলা কোপের্নিগ, ল্যাটিন নিকোলাস কোপার্নিকাস, পোল্যাণ্ডের পোমেরানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ভিশ্চুলার তীরবর্তী থর্ন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। তাঁহার পিতার জন্মস্থান ক্রাকাও, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জার্মানীর সাইলেসিয়ার অধিবাসী। এই সাইলেসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে কোপার্নিকাসের মাতাও জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য কোপার্নিকাসের পোলিশ অথবা জার্মান জাতীয়তা সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক ও মতদ্বৈধ আছে এবং এখনও ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ধনীবংশে জন্মগ্রহণের ফলে সর্বপ্রকার উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। তিনি তিন বৎসর ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন; এইখানে অ্যালবার্ট ব্রুডজিউস্কির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি গণিত ও জ্যোতিষে আকৃষ্ট হন এবং নানা জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও পর্যবেক্ষণ-কৌশল আয়ত্ত করেন। সে যুগে ধর্মসংস্থায় উচ্চপদ অথবা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের প্রকৃষ্ট পথ ছিল আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন এবং এই দুই শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন। তাই গণিত ও জ্যোতিষে যথেষ্ট অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁহার প্রধান অধ্যয়নের বিষয় ছিল আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র। ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর এই দুই শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞানলাভের আশায় তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বোলোনা, পাদুয়া, ফেরুারা প্রভৃতি ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বোলোনায় বিদ্যাভ্যাসের সময় তিনি তথাকার প্রথিতযশা জ্যোতিষের অধ্যাপক পিথাগোরাসপন্থী ডোমিনিকো দি নোভারোর শিক্ষকতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এইরূপ জানা যায় যে, কোপার্নিকাস ও নোভারো এই সময়ে বোলোনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত 'অ্যালমাজেষ্টে'র নানা ভুলভ্রান্তি এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের নানা অসঙ্গতি গুরু-শিষ্যের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। ইতালীতে, বিশেষতঃ বোলোনায়, অবস্থানকালে কোপার্নিকাস যে প্রথম জ্যোতিষীয় সংস্কার সাধনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষা সমাপনান্তে কোপার্নিকাস ফ্রাউয়েনবুর্গ গির্জার ক্যাননের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিত-চর্চা তাঁহার অবসর সময়ের প্রধান গবেষণার বিষয় হইলেও রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। পোল্যাণ্ডের রাজা ও টিউটনিক রাজন্যবর্গের সম্পত্তিগত বিবাদ মিটাইবার জন্য তিনি অনেকবার মধ্যস্থতা করেন। মুদ্রা-সংস্কার ব্যাপারে পোলিশ সরকারের অনুরোধে কোপার্নিকাস একবার অতি মূল্যবান এক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এই রিপোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার পোলিশ মুদ্রার সংস্কার সাধন করেন। সাহিত্যে, কাব্যে ও চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি কবিতা লিখিতেন এবং কয়েকটি চিত্রও আঁকিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে নিজের একটি প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হইবে, জ্যোতিষীয় ও গাণিতিক গবেষণার দিক হইতে কোপার্নিকাসের এই দীর্ঘ একত্রিশ বৎসরকাল নিতান্তই উল্লেখযোগ্যহীনভাবে কাটিয়াছিল। বস্তুতঃ প্রতিটি অবসর মুহূর্ত তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন জ্যোতিষীয় পরিকল্পনার উন্নতি সাধনে। সম্ভবতঃ ইতালীতে বিদ্যাশিক্ষার সময় সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা প্রথম তাঁহার মাথায়

আসিয়াছিল। ইহাকে একটি কার্যকরী পরিকল্পনায় দাঁড় করাইতে হইলে নির্ভুল গণনার দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও জ্যোতিষীয় ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ফলে যেমন যেমন সংঘটিত হইতে দেখা যায় এই পরিকল্পনাও অবিকল সেই প্রকার ঘটনাবলীরই নির্দেশ দিতেছে। পৃথিবীর গতির ও সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার কথা যে নূতন নহে, কোপার্নিকাস ইহা অবগত ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি প্রথম সিসেরোর লেখায় দেখি যে, সাইর্যাকিউজবাসী হিসেটাস পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাস করিতেন। তারপর আমি প্লুটার্কের রচনায় আবিষ্কার করি, প্রাচীনকালের অনেকেরই এইরূপ অভিমত ছিল।" কিন্তু ইঁহারা কেহই গণিতের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। গণিতের ভিত্তিতে ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বুনিয়াদ রচনা করিবার সাফল্যই টলেমীর জ্যোতিষের ব্যাপক স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের এবং দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। সুতরাং ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে গণিতের প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, এই শেষোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জ্যোতিষীয় সমস্যার অধিকতর সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর। কোপার্নিকাস এই দুরূহ প্রচেষ্টায় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর নীরবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সৌর জগতের অভিনব পরিকল্পনার প্রকাশ বিদ্বৎসমাজে ও ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষমহলে যে দারুণ অসন্তোষ, তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিবে, ইহা কোপার্নিকাস বরাবরই আশংকা করিয়াছিলেন। তাই সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আঁট-ঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে গবেষণার ফল গ্রন্থাকারে তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং এই গ্রন্থ বহু পূর্বে শেষ হইলেও ইহার পরিবর্তনে ও সংশোধনে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করেন। তথাপি তিনি যে এক অভিনব জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত এবং পৃথিবীর গতিই যে ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়, ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচিরে বন্ধুমহলে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা সুরু হয়; অনেকে তাঁহার অভিনব মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। বন্ধুদের অনুরোধে কোপার্নিকাস অবশেষে তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদের এক সংক্ষিপ্তসার *Commentariolus* প্রকাশ করেন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে তাঁহার মূল গ্রন্থের পরিণত চিন্তাধারাই লিপিবদ্ধ হয়, শুধু বাদ দেওয়া হয় গাণিতিক অংশগুলি।

Commentariolus প্রকাশের দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যেও কোপার্নিকাস তাঁহার মূল ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে কোনরূপ উৎসাহ দেখান নাই। ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের তরুণ অধ্যাপক জর্জ জোয়াকিম (ইনি ল্যাটিন রেটিকাস নামেই অধিক প্রসিদ্ধ) কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের কথা শুনিয়াছিলেন। সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রেটিকাস কিছুদিন কোপার্নিকাসের নিকট গবেষণা করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার আশাতীত সুযোগ লাভ করেন। রেটিকাসের আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে কোপার্নিকাস শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হন এবং রেটিকাসের উপর এই ভার অর্পণ করেন। *Nicolai Copernici torinensis de revolutionibus orbium coelestium Libri VI* নামে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় নুর্নবার্গ হইতে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে, মুদ্রণের পর এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি যখন কোপার্নিকাসের হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় অবশ ও সংজ্ঞাহীন।

De revolutionibus প্রকাশের ইহাই সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের প্রায় প্রতি পাতায় মূল গ্রন্থ হইতে ইচ্ছাকৃত নানা প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি শিরোনামা পর্যন্ত কোপার্নিকাসের ইচ্ছানুযায়ী ছাপা হয় নাই। আরও আশ্চর্য এই যে, গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপিটি নিখোঁজ হয়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে এই পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলে। এই যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ-রহস্য প্রণিধানযোগ্য।

কোপার্নিকাসের গ্রন্থ-প্রকাশনের ভার গ্রহণ করিবার পর অন্য কয়েকটি জরুরী কাজ হাতে আসিয়া পড়ায় রেটিকাস নিজে মুদ্রণের শেষ পর্যায় দেখাশুনা করিতে পারেন নাই। তিনি কোপার্নিকাসের আর এক বন্ধু অ্যান্ড্রিয়া ওসিয়াণ্ডারকে মুদ্রণের শেষ পর্যায় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ওসিয়াণ্ডার নিজে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন লুথারপন্থী। লুথারপন্থীরা কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিল; *Commentariolus* প্রকাশিত হইলে লুথার ও মেলাংকথন হইতে আরম্ভ করিয়া লুথার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেই এই গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করিয়াছিল। বন্ধু হইলেও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ ওসিয়াণ্ডারের মনঃপূত হয় নাই, এবং এরূপ মতবাদ প্রস্তাবের জন্য লুথারপন্থীরা কোপার্নিকাসের উপর যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কা তিনি করিয়াছিলেন। ওসিয়াণ্ডার কোপার্নিকাসের নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে নিতান্তই তত্ত্বীয় ও কেবল গণনাকার্যের সুবিধার জন্য পরিকল্পিত, গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ মন্তব্য লিখিবার জন্য একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। "আমি বরাবরই এরূপ অনুভব করিয়াছি যে, আপনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলি ঠিক বিশ্বাসের বস্তু নহে, গণনার ভিত্তিস্বরূপ মাত্র; সুতরাং ইহাদের দ্বারা যখন তথ্যগুলি যথাযথভাবে বুঝানো যাইতেছে, মিথ্যা হইলেও ইহাতে (এরূপ সিদ্ধান্তে) কিছু আসিয়া যায় না।...সুতরাং ভূমিকায় এসম্বন্ধে কিছু বলা আপনার পক্ষে অতি উত্তম হইবে।"

কোপার্নিকাসের গ্রন্থের নিখোঁজ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, তিনি ওসিয়াণ্ডারের এই প্রস্তাবে আদৌ রাজী হন নাই। রেটিকাসের নিকট হইতে *De revolutionibus* মুদ্রণের ভারপ্রাপ্ত হইলে ওসিয়াণ্ডার এসম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ হাতছাড়া করিলেন না। প্রথমতঃ কোপার্নিকাস গ্রন্থের যে নাম প্রস্তাব করেন তিনি তাহার সঙ্গে 'Orbium coelestium' কথা দুইটি যোগ দেন; ইহার অর্থ 'স্বর্গীয় গোলকদের'। এরূপ নামকরণের জন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যেন সমগ্র গ্রন্থটিই টলেমীর ছাঁচে ঢালা। তারপর বহুদিন পূর্বে কোপার্নিকাসকে লিখিত এক পত্রে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এখন নিজেই ভূমিকার মধ্যে তাহা সুকৌশলে ঢুকাইয়া দিয়া কোপার্নিকাসের অভিমত বলিয়া চালাইলেন। এই জালিয়াতির জন্য বহুদিন পর্যন্ত পণ্ডিত মহলের ধারণা ছিল যে, গণনার সুবিধার জন্য এবং কতকগুলি বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আসলে সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্ররা চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাতে কোপার্নিকাসের মতবাদের গুরুত্ব ও মৌলিকতা প্রথম প্রথম অনেকের দৃষ্টিই এড়াইয়া যায়।

ওসিয়াণ্ডার আরও একটি দুষ্কার্য করিয়াছিলেন। *De revolutionibus* হইতে অ্যারিস্টার্কাসের সমস্ত উল্লেখ তিনি কাটিয়া বাদ দিয়াছিলেন। এজন্য একাধিক সমালোচক অ্যারিস্টার্কাসের ধারণা চুরি করিয়া মিথ্যা কৃতিত্ব অর্জনের অপচেষ্টার জন্য কোপার্নিকাসের নিন্দা করিয়াছিলেন। মেলাংকথন ও রাইনহোল্ড তাঁহার এরূপ অসাধুতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। অথচ আসল পাণ্ডুলিপিতে কোপার্নিকাস অন্ততঃ চার বার অ্যারিস্টার্কাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক জায়গায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, পিথাগোরীয় দার্শনিকগণ ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে অ্যারিস্টার্কাসই প্রথম পৃথিবীকে একটি গ্রহরূপে গণ্য করেন।

De revolutionibus-এর এই জালিয়াতির ব্যাপার গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কোপার্নিকাসের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চোখে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু মূল গ্রন্থটি নিখোঁজ হাওয়ায় এসম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করিবারও উপায় ছিল না। অবশেষে কেপ্লার এই জালিয়াতির ব্যাপার উদ্ধার করেন।*

* Kepler, *Astronomica Nova,* edited by Frisch, Vol. III; p. 136.

আসিয়াছিল। ইহাকে একটি কার্যকরী পরিকল্পনায় দাঁড় করাইতে হইলে নির্ভুল গণনার দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও জ্যোতিষীয় ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ফলে যেমন যেমন সংঘটিত হইতে দেখা যায় এই পরিকল্পনাও অবিকল সেই প্রকার ঘটনাবলীরই নির্দেশ দিতেছে। পৃথিবীর গতির ও সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার কথা যে নূতন নহে, কোপার্নিকাস ইহা অবগত ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি প্রথম সিসেরোর লেখায় দেখি যে, সাইরাকিউজবাসী হিসেটাস পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাস করিতেন। তারপর আমি প্লুটার্কের রচনায় আবিষ্কার করি, প্রাচীনকালের অনেকেরই এইরূপ অভিমত ছিল।" কিন্তু ইঁহারা কেহই গণিতের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। গণিতের ভিত্তিতে ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বুনিয়াদ রচনা করিবার সাফল্যই টলেমীর জ্যোতিষের ব্যাপক স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের এবং দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। সুতরাং ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে গণিতের প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, এই শেষোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জ্যোতিষীয় সমস্যার অধিকতর সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর। কোপার্নিকাস এই দুরূহ প্রচেষ্টায় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর নীরবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সৌর জগতের অভিনব পরিকল্পনার প্রকাশ বিদ্বৎসমাজে ও ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষমহলে যে দারুণ অসন্তোষ, তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিবে, ইহা কোপার্নিকাস বরাবরই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাই সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে গবেষণার ফল গ্রন্থাকারে তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং এই গ্রন্থ বহু পূর্বে শেষ হইলেও ইহার পরিবর্তনে ও সংশোধনে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করেন। তথাপি তিনি যে এক অভিনব জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত এবং পৃথিবীর গতিই যে ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়, ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচিরে বন্ধুমহলে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা সুরু হয়; অনেকে তাঁহার অভিনব মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। বন্ধুদের অনুরোধে কোপার্নিকাস অবশেষে তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদের এক সংক্ষিপ্তসার *Commentariolus* প্রকাশ করেন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে তাঁহার মূল গ্রন্থের পরিণত চিন্তাধারাই লিপিবদ্ধ হয়, শুধু বাদ দেওয়া হয় গাণিতিক অংশগুলি।

Commentariolus প্রকাশের দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যেও কোপার্নিকাস তাঁহার মূল ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে কোনরূপ উৎসাহ দেখান নাই। ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের তরুণ অধ্যাপক জর্জ জোয়াকিম (ইনি ল্যাটিন রেটিকাস নামেই অধিক প্রসিদ্ধ) কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের কথা শুনিয়াছিলেন। সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রেটিকাস কিছুদিন কোপার্নিকাসের নিকট গবেষণা করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার আশাতীত সুযোগ লাভ করেন। রেটিকাসের আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে কোপার্নিকাস শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হন এবং রেটিকাসের উপর এই ভার অর্পণ করেন। *Nicolai Copernici torinensis de revolutionibus orbium coelestium Libri VI* নামে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় নুর্নবার্গ হইতে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে, মুদ্রণের পর এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি যখন কোপার্নিকাসের হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় অবশ ও সংজ্ঞাহীন।

De revolutionibus প্রকাশের ইহাই সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের প্রায় প্রতি পাতায় মূল গ্রন্থ হইতে ইচ্ছাকৃত নানা প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি শিরোনামা পর্যন্ত কোপার্নিকাসের ইচ্ছানুযায়ী ছাপা হয় নাই। আরও আশ্চর্য এই যে, গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপিটি নিখোঁজ হয়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে এই পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলে। এই যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ-রহস্য প্রণিধানযোগ্য।

কোপার্নিকাসের গ্রন্থ-প্রকাশনের ভার গ্রহণ করিবার পর অন্য কয়েকটি জরুরী কাজ হাতে আসিয়া পড়ায় রেটিকাস নিজে মুদ্রণের শেষ পর্যায় দেখাশুনা করিতে পারেন নাই। তিনি কোপার্নিকাসের আর এক বন্ধু অ্যান্ড্রিয়া ওসিয়াণ্ডারকে মুদ্রণের শেষ পর্যায় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ওসিয়াণ্ডার নিজে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন লুথারপন্থী। লুথারপন্থীরা কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিল; *Commentariolus* প্রকাশিত হইলে লুথার ও মেলাংকথন হইতে আরম্ভ করিয়া লুথার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেই এই গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করিয়াছিল। বন্ধু হইলেও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ ওসিয়াণ্ডারের মনঃপুত হয় নাই, এবং এরূপ মতবাদ প্রস্তাবের জন্য লুথারপন্থীরা কোপার্নিকাসের উপর যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কা তিনি করিয়াছিলেন। ওসিয়াণ্ডার কোপার্নিকাসের নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে নিতান্তই তত্ত্বীয় ও কেবল গণনাকার্যের সুবিধার জন্য পরিকল্পিত, গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ মন্তব্য লিখিবার জন্য একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। "আমি বরাবরই এরূপ অনুভব করিয়াছি যে, আপনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলি ঠিক বিশ্বাসের বস্তু নহে, গণনার ভিত্তিস্বরূপ মাত্র; সুতরাং ইহাদের দ্বারা যখন তথ্যগুলি যথাযথভাবে বুঝানো যাইতেছে, মিথ্যা হইলেও ইহাতে (এরূপ সিদ্ধান্তে) কিছু আসিয়া যায় না।...সুতরাং ভূমিকায় এসম্বন্ধে কিছু বলা আপনার পক্ষে অতি উত্তম হইবে।"

কোপার্নিকাসের গ্রন্থের নিখোঁজ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, তিনি ওসিয়াণ্ডারের এই প্রস্তাবে আদৌ রাজী হন নাই। রেটিকাসের নিকট হইতে *De revolutionibus* মুদ্রণের ভারপ্রাপ্ত হইলে ওসিয়াণ্ডার এসম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ হাতছাড়া করিলেন না। প্রথমতঃ কোপার্নিকাস গ্রন্থের যে নাম প্রস্তাব করেন তিনি তাহার সঙ্গে 'Orbium coelestium' কথা দুইটি যোগ দেন; ইহার অর্থ 'স্বর্গীয় গোলকদের'। এরূপ নামকরণের জন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যেন সমগ্র গ্রন্থটিই টলেমীর ছাঁচে ঢালা। তারপর বহুদিন পূর্বে কোপার্নিকাসকে লিখিত এক পত্রে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এখন নিজেই ভূমিকার মধ্যে তাহা সুকৌশলে ঢুকাইয়া দিয়া কোপার্নিকাসের অভিমত বলিয়া চালাইলেন। এই জালিয়াতির জন্য বহুদিন পর্যন্ত পণ্ডিত মহলের ধারণা ছিল যে, গণনার সুবিধার জন্য এবং কতকগুলি বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আসলে সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্ররা চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাতে কোপার্নিকাসের মতবাদের গুরুত্ব ও মৌলিকতা প্রথম প্রথম অনেকের দৃষ্টিই এড়াইয়া যায়।

ওসিয়াণ্ডার আরও একটি দুষ্কার্য করিয়াছিলেন। *De revolutionibus* হইতে অ্যারিস্টার্কাসের সমস্ত উল্লেখ তিনি কাটিয়া বাদ দিয়াছিলেন। এজন্য একাধিক সমালোচক অ্যারিস্টার্কাসের ধারণা চুরি করিয়া মিথ্যা কৃতিত্ব অর্জনের অপচেষ্টার জন্য কোপার্নিকাসের নিন্দা করিয়াছিলেন। মেলাংকথন ও রাইনহোল্ড তাঁহার এরূপ অসাধুতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। অথচ আসল পাণ্ডুলিপিতে কোপার্নিকাস অন্ততঃ চার বার অ্যারিস্টার্কাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক জায়গায় ইহাও লিখিয়াছেন যে, পিথাগোরীয় দার্শনিকগণ ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে অ্যারিস্টার্কাসই প্রথম পৃথিবীকে একটি গ্রহরূপে গণ্য করেন।

De revolutionibus-এর এই জালিয়াতির ব্যাপার গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কোপার্নিকাসের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চোখে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু মূল গ্রন্থটি নিখোঁজ হাওয়ায় এসম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করিবারও উপায় ছিল না। অবশেষে কেপ্‌লার এই জালিয়াতির ব্যাপার উদ্ধার করেন।*

* Kepler, *Astronomica Nova,* edited by Frisch, Vol. III ; p. 136.

কোপার্নিকাস কর্তৃক গ্রন্থ-প্রকাশের এরূপ বিলম্ব সম্বন্ধে অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ধর্ম-সংস্থার বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। ইহাই সম্পূর্ণ কারণ বলিয়া মনে হয় না। *De revolutionibus*-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ *Commentariolus* প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতিলিপি তিনি ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক প্রধান ধর্মযাজকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মূল গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রুনোর বৈপ্লবিক মতবাদ ও তজ্জনিত বারাবারির পর হইতেই সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের লিখন, পঠন ও প্রকাশন ধর্ম-সংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। *De revolutionibus* নিষিদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের আলোচনায় খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন বোধ করে নাই। তবে একটা আশঙ্কার কিছু সঙ্গত কারণ অবশ্য তখনও ছিল। তাহা হইল, রূপকথার মত উদ্ভট ও অস্বাভাবিক মতবাদ পোষণের জন্য জনসাধারণ এমন কি শিক্ষিত মহলেরও বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র হইবার আশঙ্কা। পোপের নিকট উৎসর্গ-পত্রে তিনি এরূপ আশঙ্কার কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন : "I considered what an absurd fairy-tale people would consider it, if I asserted that the earth moved. . . . The scorn which was to be feared on account of the novelty and absurdity of the opinion impelled me for that reason to set aside entirely the book I had already drawn up."

কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ : আর্থার বেরি লিখিয়াছেন, সমগ্র জ্যোতির্বিদ্যার সাহিত্যে কোপার্নিকাসের *De revolutionibus*-এর সহিত একমাত্র টলেমীর *Almagest*-এর ও নিউটনের *Principia*-র তুলনা হইতে পারে।* যে কেন্দ্রীয় ধারণার জন্য ইহার এই বৈশিষ্ট্য তাহা হইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের যে সকল গতি আমরা লক্ষ্য করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা তাহাদের আসল গতি নহে। গতিশীল পৃথিবীর উপর অবস্থিত পর্যবেক্ষকের গতির জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের এইরূপ আপাতগতি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদের যে গতি আমরা দেখি ইহা তাহাদের আসল গতি নহে, আপেক্ষিক গতি। গ্রন্থের প্রারম্ভে কোপার্নিকাস তাই প্রথমেই আপেক্ষিক গতির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা বস্তু-নিচয়ের যেসব গতি দেখি, তাহা দর্শকের নিজের গতির জন্য হইতে পারে, অথবা যে বস্তুকে দেখিতেছি তাহার গতির জন্য, অথবা বস্তু ও দর্শক উভয়ের গতির জন্যও হইতে পারে।...পৃথিবীর যদি কোন গতি থাকে, তবে পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সেই গতি প্রতিভাত হইবে, অবশ্য বিপরীত দিকে।" বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য তিনি ভার্জিল হইতে একটি ছত্র উদ্ধৃত করেন, যেখানে অ্যানিস্ বলিতেছে, "Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt," অর্থাৎ "আমরা পোতাশ্রয় ছাড়িয়া পাড়ি দিলাম, আর দেশ ও নগর দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।"

কোপার্নিকাস বলেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী স্থির নক্ষত্রদের গোলক প্রতিদিনে যে একবার আবর্তিত হইতে দেখা যায় তাহা সত্য সত্যই এই গোলকের নিজস্ব আবর্তনের জন্য নহে, পৃথিবীর অক্ষের চতুর্দিকে দিনে একবার আবর্তিত হয় বলিয়া স্থির নাক্ষত্র গোলকের এই আপাত-আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীকার করেন, পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির কথা তাঁহার বহু পূর্বে পিথাগোরীয় জ্যোতির্বিদ্ গ্রীক হেরাক্লিডিস ও একফ্যান্টাস বলিয়া গিয়াছেন এবং সাইরাকিউজবাসী নিসেটাসও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যের বার্ষিক গতি সম্বন্ধে কোপার্নিকাস বলেন যে, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল অবস্থায় কল্পনা করিয়া পৃথিবীকে যদি সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণরত মনে করা যায় তাহা হইলে

* A. Berry, *A Short History of Astronomy*, p. 99.

ভূপৃষ্ঠস্থ দর্শক আগের মতই সূর্যের বাৎসরিক পরিক্রমণ লক্ষ্য করিবে। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর এইরূপ বার্ষিক গতির ফলে গ্রহদের আপাতগতিরও অনেক তারতম্য হইবে। পৃথিবীকে নিশ্চল মনে করিবার জন্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা বহু কৌশল খাটাইয়াও গ্রহদের খামখেয়ালী গতির সন্তোষজনক সমাধান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বৃত্তের পর বৃত্ত চাপাইয়া সমগ্র পরিকল্পনাকে তাঁহারা অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যকভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত জ্ঞান করিয়া অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীকেও যদি সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণরত মনে করা যায় তাহা হইলে অনায়াসে বহু দুরূহ জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

এইভাবে পৃথিবীর উপর একসঙ্গে আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি চাপাইয়া ও পৃথিবীর স্থলে সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোপার্নিকাস যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন তাঁহার নিজের ভাষায় (বঙ্গানুবাদ) ইহার বর্ণনা হইল এইরূপ :
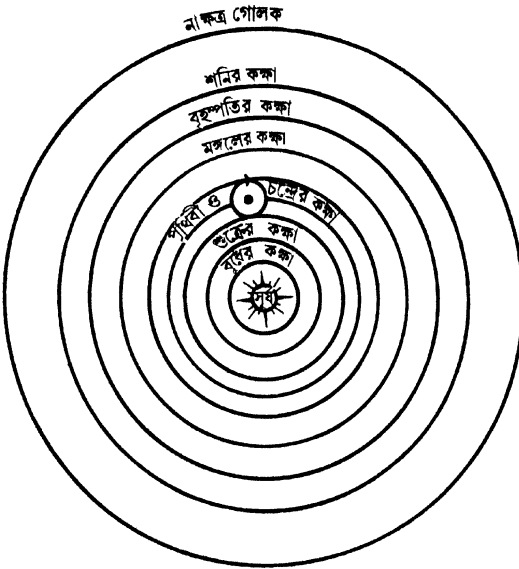
৪৪। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা।

"প্রথমে ও সবার উপরে বিরাজ করিতেছে স্থির নক্ষত্রের গোলক; এই গোলক ও ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু নিশ্চল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো এবং এই কাঠামোর প্রচ্ছদপটেই অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতি ও স্থিতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। যদিচ অনেকের ধারণা এই নাক্ষত্র গোলক এক রকম ভাবে আবর্তিত হইতেছে, তথাপি আমরা পৃথিবীর গতির যে তত্ত্ব প্রস্তাব করিতে যাইতেছি তাহাতে ইহার এইরূপ আপাত-আবর্তনের অন্য প্রকার কারণ নির্দিষ্ট হইবে। গতিশীল বস্তুদের মধ্যে প্রথমেই আসে শনি; ইহা ত্রিশ বৎসরে একবার কক্ষা-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে। তারপর বৃহস্পতি বার বৎসরে একবার (সূর্যকে) পরিক্রমণ করে এবং দুই বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে মঙ্গল। ক্রমিক পর্যায়ে চতুর্থ কক্ষায় বৎসরে একবার পরিক্রমণ করে পৃথিবী একথা আগেই আমরা বলিয়াছি। পৃথিবীর সহিত আবর্তিত হয় চন্দ্রের পরিবৃত্ত। পঞ্চম

স্থানে শুক্র নয় মাসে একবার ঘুরিয়া আসে। তারপর বুধ অধিকার করিয়া আছে ষষ্ঠ স্থান; তাহার ভগন-কাল আশী দিন। ইহাদের সকলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত সূর্য। এই অতি চমৎকার মন্দিরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কোথায় এই প্রদীপের স্থান হইবে যেখান হইতে তার আলোকচ্ছটায় একই কালে সকল বস্তুই উদ্ভাসিত হইতে পারে? অতি সঙ্গত কারণেই কেহ ইহাকে (সূর্যকে) বলিয়াছেন বিশ্বের প্রদীপ, কেহ বিশ্বাত্মা, কেহ বা আবার বিশ্বপালক;—ইহাই ত্রিস্‌মেজিস্তাস্ (Trismegistus), দৃশ্যমান ভগবান, সোফকলসের ইলেক্‌ট্রা, সকলের আরাধ্য দেবতা, এবং এইখানে যেন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সূর্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণরত গ্রহ-পরিবারকে শাসন করিতেছে।"*

গ্রীক জ্যোতিষের আমল হইতেই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি ছিল। প্রথমতঃ পৃথিবীর মত এত বড় ও এত ভারী এক নিরেট বস্তুর আহ্নিক গতি থাকিলে আবর্তনের বেগে ইহা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবার কথা। তারপর ভূপৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নহে এইরূপ জিনিসের উড়িয়া যাইবার বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা বর্তমান। পৃথিবীর আহ্নিক গতি পরিকল্পনা করিবার পথে উপরিউক্ত অসুবিধার কথা টলেমী নিজেই আলোচনা করিয়াছিলেন। কোপার্নিকাস ইহার উত্তরে বলিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা নাক্ষত্র গোলক বহুগুণ বড়। দিনে একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হইতে হইলে অসম্ভব দ্রুতগতিতে এই আবর্তন সংঘটিত হইতে হইবে। তাহার ফলে গোটা নাক্ষত্র গোলকই ত শতধা ভাঙিয়া পড়িবার কথা। তাহা যদি না হইতে পারে পৃথিবীর গতির বেলায়ই বা এ আশঙ্কা কেন? আলগা বা হালকা জিনিসগুলি আহ্নিক গতির জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় না কেন, ইহার সদুত্তর অবশ্য কোপার্নিকাস দিতে পারেন নাই।

অন্যান্য গ্রহদের মত বৃত্তাকারে শূন্যপথে পৃথিবীর পরিক্রমণ কল্পনা করিবার আর একটি প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, ইহাতে নক্ষত্রদের এক আপাত-গতি প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী বিস্তর পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও নক্ষত্রদের কোনরূপ গতি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোপার্নিকাস এই আপত্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এই আপত্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নাক্ষত্র গোলককে অতি প্রকাণ্ড ও পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত কল্পনা করিলেন। এই দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের আপাত-গতি বা লম্বন (parallax) অনুভূত হইবে না। কোপার্নিকাস নাক্ষত্র লম্বনের প্রশ্ন সুকৌশলে এড়াইয়া গেলেও পরবর্তী জ্যোতির্বিদেরা সহজে নিরস্ত হইলেন না। নির্ভুল পর্যবেক্ষণের নানা উন্নতি সত্ত্বেও যখন নক্ষত্রের এতটুকু লম্বন ধরা পড়িল না, তখন সৌর জগতে বিশ্বাসী জ্যোতির্বিদদের মনেও নূতন করিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল। নাক্ষত্র লম্বন অবশ্য এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কোন কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ইহার মান প্রায় এক মিনিটের মত দেখা গিয়াছে।

কোপার্নিকাসের পরিকল্পনায় গ্রহদের আপাত-খাপছাড়া গতির অতি সহজ ও সরল ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। পৃথিবীকে নিশ্চল ভাবিবার জন্য এই অদ্ভুত গতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বহুকাল সম্ভবপর হয় নাই। বুধ ও শুক্র গ্রহের বেলায় পরিবৃত্তের সাহায্যে হেরাক্লিডিস অব পণ্টুস সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত গতির কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেন। টলেমী হেরাক্লিডিসের পরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত করিয়া পরিবৃত্ত ও ডেফারেণ্টের সাহায্যে এই সমস্যার কতকটা সমাধান করিয়াছিলেন। কোপার্নিকাস দেখান, টলেমীর পরিকল্পনায় গ্রহদের স্বাভাবিক বৃত্ত-পথে পরিক্রমণ ছাড়াও আবার যে এক একটি কল্পিত পরিবৃত্তপথে ঘুরাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, পৃথিবীর পরিক্রমণ মানিয়া লইতে অস্বীকারই তাহার একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ টলেমীর এই পরিবৃত্তগুলি পৃথিবীর কক্ষা-পরিক্রমারই প্রতিবিম্বস্বরূপ। সুতরাং নির্দিষ্ট কক্ষায় পৃথিবীর

* *De revolutionibus orbium coelestium*, lib. I. cap x: ইংরেজী অনুবাদ W. C. D. and M. D. Whetham; *Readings in the Literature of Science*, Cambridge, 1924.

গতি স্বীকার করিলে পরিবৃত্তের জটিল ও অবাস্তব অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।
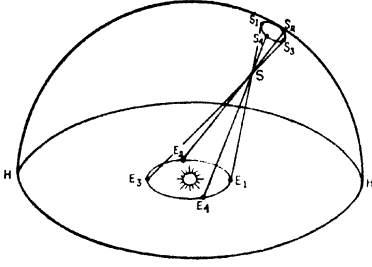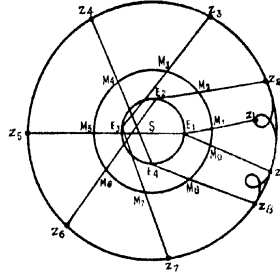
৪৫। নক্ষত্রের লম্বন। ৪৬। গ্রহ-গতি ব্যাখ্যা।

মনে করা যাক, ৪৬নং চিত্রে S সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বৃত্ত $E_1\ E_2\ E_3\ E_4$ পৃথিবীর কক্ষা, পরবর্তী বৃত্ত $M_1\ M_2 \ldots M_9$ মঙ্গল গ্রহের কক্ষা এবং $Z_1\ Z_2 \ldots Z_9$ নাক্ষত্র গোলক বা রাশিচক্র। আমরা জানি পৃথিবী বৎসরে একবার তাহার কক্ষা ভ্রমণ করিয়া আসে এবং মঙ্গল গ্রহের কক্ষা-পরিক্রমা করিতে লাগে প্রায় দুই বৎসর। মনে করা যাক, পর্যবেক্ষণের আরম্ভে পৃথিবী E_1 ও মঙ্গল M_1-এ অবস্থান করিতেছে। তিন মাস পর পর পৃথিবী ও মঙ্গলের অবস্থান যথাক্রমে $E_2, E_3, E_4, E_1, E_2 \ldots$ এবং $M_2, M_3, M_4, M_5, M_6 \ldots$ ইত্যাদির দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। এখন $E_1 M_1, E_2 M_2, E_3 M_3, E_4 M_4$ ইত্যাদি সরল রেখাগুলি রাশিচক্র পর্যন্ত বাড়াইয়া দিলে পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহকে যথাক্রমে Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 ইত্যাদি স্থানে দেখা যাইবে। মঙ্গল গ্রহ নিজ কক্ষায় অবশ্য সমান বেগে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী হইতে দেখিবার জন্য মনে হইবে এই গ্রহ রাশিচক্রে যেন Z_1 হইতে Z_2, Z_3, Z_4-এ অসমান বেগে অগ্রসর হইতেছে। এই বেগ যে অসমান তাহা $Z_1 Z_2, Z_2 Z_3, Z_3 Z_4$ ইত্যাদির দূরত্ব মাপিলেই বুঝা যাইবে। তারপর পৃথিবী যখন E_2, E_3 বিন্দুতে আর মঙ্গল M_2, M_3-তে, তখন মঙ্গলগ্রহকে ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দেখা যাইবে। পক্ষান্তরে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থান যখন E_1 ও M_1-এর অব্যবহিত পূর্বে ও পরে তখন এই দুই গ্রহের গতির পার্থক্যের জন্য মনে হইবে মঙ্গল গ্রহ হঠাৎ যেন দিক পরিবর্তন করিয়া ও ঘুরপাক খাইয়া আবার আগের মত চলিতেছে। পৃথিবীর E_4 হইতে E_1 ও মঙ্গল গ্রহের M_8 হইতে M_9-এ যাইবার সময়ও আর একবার এই প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। রাশিচক্রে মঙ্গল গ্রহের এইরূপ আপাত-দিকপরিবর্তন ৪৬নং চিত্রে ফাঁস বা লুপের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি কল্পনা করিয়া গ্রহদের আপাত-গতির জটিল ব্যাখ্যায় কোপার্নিকাস যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিলেও এই সাফল্য তাঁহার সম্পূর্ণ হয় নাই। গ্রহগতি সংক্রান্ত আরও কতকগুলি অসমতার চূড়ান্ত সমাধানে তিনি বিফল হইয়াছিলেন। সৌর জগতের চাবিকাঠি হাতে পাইয়াও শেষ পর্যন্ত রহস্যের দ্বার তিনি পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই। আমরা এখন জানি, ইহার জন্য শুধু প্রয়োজন ছিল বৃত্তের পরিবর্তে উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের পরিক্রমণ কল্পনা করা। এই সামান্য অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের অভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত তত্ত্বীয় গণনার ফল মিলাইবার অধিকাংশ চেষ্টাই তাঁহার একরূপ বলিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইয়াছিল। কেপ্‌লার এই পরিবর্তনটি সাধন করেন ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু পিথাগোরীয় ও অ্যারিস্টটলীয়

মতবাদের প্রভাব কাটাইয়া কোপার্নিকাস কিছুতেই ভাবিতে পারেন নাই যে, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও একান্ত স্বাভাবিক বৃত্ত ছাড়া আর কোন জ্যামিতিক রেখাপথে জ্যোতিষ্কদের মত স্বর্গীয় বস্তুদের আকাশ-পরিক্রমা সম্ভবপর। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে টলেমীর সেই পুরাতন কৌশল উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। সূর্যকে গ্রহদের কক্ষার ঠিক কেন্দ্রস্থলে না বসাইয়া কতকটা দূরে সরাইয়া বসাইলেন এবং কয়েকটি গ্রহের উপর একটি করিয়া পরিবৃত্ত চাপাইলেন। তথাপি তাঁহার সান্ত্বনা এইটুকু রহিল যে, টলেমী যেখানে ৭৯ বৃত্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার ৩৪টির অধিক বৃত্তের প্রয়োজন হয় নাই।

সৌর জগতের ভিত্তিতে কোপার্নিকাস ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অয়ন-চলনের আবিষ্কর্তা স্বয়ং হিপার্কাসের ধারণা ছিল, বিষুববৃত্ত (celestial equator) ধীরে ধীরে পূর্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইবার ফলে অয়ন-চলন সংঘটিত হইয়া থাকে। সূর্যের পরিবর্তে পৃথিবীর গতি স্বীকার করায় বিষুববৃত্ত ও ভূবিষুব দুইই এক হইয়া পড়িল। এখন বিষুববৃত্তের গতির অর্থই ভূবিষুবের গতি। তারপর এই গতির একটি প্রধান সর্ত এই যে, বিষুববৃত্তের গতির জন্য বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের অন্তবর্তী কোণের কোন তারতম্য হয় না। অর্থাৎ ভূবিষুব ও ক্রান্তিবৃত্তের অন্তবর্তী কোণ সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকিবে। এই অন্তবর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূবিষুব ও ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হইবে। আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূবিষুব সমতলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত; সুতরাং ভূবিষুবের গতির সংগে সংগে পৃথিবীর অক্ষরেখাও ঘূর্ণ্যমাণ লাটুর অক্ষরেখার মত ধীরে ধীরে চক্রাকারে শূন্যে আবর্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে মহাশূন্যে স্থির নাক্ষত্র গোলক পর্যন্ত প্রসারিত কল্পনা করিলে এই অক্ষরেখা নাক্ষত্র গোলকের উপর ধীরে ধীরে একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে। এই বৃত্ত রচনার কাল ২৬,০০০ বৎসর! অয়ন-চলন, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষরেখার উপরিউক্ত গতির জন্য মেরুদ্বয়ের অবস্থানও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে। খ্রীঃ ২১৭০ পূর্বাব্দে সপ্তর্ষি মণ্ডলের (Ursa major) পুলস্ত্য ও অত্রি নক্ষত্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া একটি সরল রেখা টানিলে যে দিক পাওয়া যায় তাহার সমান্তরালভাবে পৃথিবীর অক্ষরেখার অবস্থান ছিল। আল্‌ফা ড্রাকোনিস তখন ধ্রুব নক্ষত্র। বর্তমানে পুলহ ও ক্রতু নক্ষত্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া যে কাল্পনিক রেখা পাওয়া যায় পৃথিবীর অক্ষরেখা তাহার সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এই রেখার উপরে অবস্থিত ও লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডলের (Ursa minor) অন্তর্গত প্রধান নক্ষত্র সাইনোসুরা এখন ধ্রুব নক্ষত্র।

কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনার সাহায্যে নানা জ্যোতিষীয় প্রশ্নের সহজ মীমাংসার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচিত হইল। ইহা ছাড়া তিনি ঋতু-পরিবর্তন, গ্রহ, উপগ্রহ ও চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের অপেক্ষা তাঁহার প্রস্তাবিত সমাধান ও ব্যাখ্যা অনেক বেশী উন্নত ধরনের হইয়াছিল। তথাপি কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ এই যে, তিনি জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 'অ্যালমাজেস্টে' প্রদত্ত তথ্য ও তালিকাই ছিল তাঁহার প্রধান অবলম্বন। এই তথ্যের মধ্যে যে ভুল থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয়ের জন্য নূতন করিয়া জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের ও যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন যে একান্ত প্রয়োজন, কোপার্নিকাস সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। ভুল ও সন্দেহজনক তথ্যের উপর নির্ভর করিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাখ্যা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই এবং অনাবশ্যকভাবে তিনি সমাধানগুলিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কোপার্নিকাসের স্বকীয়তা : কোপার্নিকাসের স্বকীয়তা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন। টলেমীর 'অ্যালমাজেস্টে'র নিকট তাঁহার ঋণ অপূরণীয়। 'অ্যালমাজেস্টে'র তথ্য ও তালিকাই ছিল তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদের মূল ভিত্তি। তারপর অনেকটা এই বিখ্যাত

থর্ণে কোপার্নিকাসের গৃহ। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নাপোলিয়োঁর এই স্থান পরিদর্শনকালে চিত্রটি অঙ্কিত হয়।

উপরে—কোপার্নিকাসের হস্তাক্ষর।

বামে—নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। ওয়ার্স'র জাতীয় গ্রন্থাগারে ইহা সংরক্ষিত।
(*Endeavour*, October, 1943).

PLATE XII

জোহান কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০)।

টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১)।

গ্রন্থের অনুকরণেই তিনি *De revolutionibus*-এর কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। সূর্য-কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারও তিনি প্রথম উদ্যোক্তা নহেন। তাঁহার বহু পূর্বে গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা,—পিথাগোরীয় ফিলোলাউস, অ্যারিস্টার্কাস অব সামোস, এইরূপ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সাধারণভাবে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা স্বীকৃতি লাভ করিলেও সূর্য-কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা কোন সময়েই জ্যোতির্বিদ্‌দের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। মধ্যযুগের প্রথমভাগে মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা তাঁহার দার্শনিক আলোচনায় ইহার অস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোপার্নিকাসের কিছু পূর্বে নিকোলাস অব কুসাও পৃথিবীর গতির কথা উল্লেখ করেন। মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যেও অনেকে পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্যভট পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মত ব্যক্ত করা এক জিনিস এবং সেই মতের বিচারে দৃশ্যমান নানা ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও সমাধানের দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করা আর এক জিনিস। সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রথম উল্লেখ যতই সুপ্রাচীন হউক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা জ্যোতিষীয় ঘটনা, গ্রহের গতি, ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে কোপার্নিকাসের পূর্বে আর কোন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্ সমর্থ হন নাই। এইখানেই কোপার্নিকাসের কৃতিত্ব ও স্বকীয়তা।

তারপর যে সময়ে কোপার্নিকাস জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অনুকূলে মত ব্যক্ত করিবার মধ্যেও যথেষ্ট স্বকীয়তা ও নির্ভীকতা ছিল। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে পরিকল্পনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ করিয়া আসিয়াছে, যাহা প্রত্যেক নরনারীর ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহাতে শুধু সন্দেহ প্রকাশ নহে, তাহার ঠিক বিপরীত একটি মতবাদকে প্রকৃত সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা, গাণিতিক পদ্ধতি ও যুক্তির দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং ধর্ম-সংস্থার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত করা একমাত্র অনন্যসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার ক্ষেত্রেই সম্ভবপর।

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ যুগান্তকারী নহে। মানুষের সমগ্র চিন্তাধারায় ইহা এক মহা বিপ্লব সূচনা করিল। এতকাল মানুষ জানিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রিয় ও সাধের আবাসভূমি এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। একমাত্র তাহার জন্যই একদা সৃষ্ট হইয়াছিল এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ররা; তাহার সুবিধার জন্যই গ্রহদের আবর্তন ও কক্ষা-পরিক্রমণ; তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও ভবিষ্যতের সহিত এইসব জ্যোতিষ্কলোকের নিবিড় সম্বন্ধ। ঐ নিশ্চল নক্ষত্রলোকে চিরশান্তির স্বর্গ বিরাজ করিতেছে, এক দিন সেইখানে তাহার স্থান হইবে। কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ এইরূপ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিল। পৃথিবী আর ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে নহে; অন্যান্য ছন্নছাড়া গ্রহদের মত সেও তাহার সমস্ত সৃষ্টি লইয়া মহাশূন্যে অনবরত ঘুরপাক খাইয়া হয়রান হইতেছে। নক্ষত্র-লোকও আগের মত আর নিকটে নাই; মহাশূন্যে অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত দূরত্বে নাকি তাহার অবস্থান। কোপার্নিকাসের কিছু পরে ব্রুনো জানাইলেন মহাশূন্য অনন্ত এবং ইহাতে একাধিক ব্রহ্মাণ্ডলোক বিরাজ করিতেছে। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সহসা নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও অসহায় মনে করিল। এক অতি ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমাণ গ্রহের নগণ্য অধিবাসী হিসাবে তাহার সৃষ্টিকে বিধাতার এক বিরাট প্রহসন বলিয়া মনে হইল। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম-সংস্থা যে প্রমাদ গণিবে এবং ইহার প্রচার বন্ধ করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

অবশ্য *De revolutionibus* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা লোকে বুঝিতে পারে নাই। গ্রন্থের জটিল গাণিতিক আলোচনার চাপে কেন্দ্রীয় মতবাদ অনেকটা চাপা পড়িয়াছিল। তারপর ওসিয়াণ্ডার ইচ্ছা করিয়া গ্রন্থের নানা স্থানে অদল বদল করায় অনেকের কাছেই মনে হইয়াছিল, পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণ নিছক একটি গাণিতিক পরিকল্পনা

মাত্র, বাস্তব ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ্ কেবল কোপার্নিকাসের মতবাদের অভিনবত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম দিকে রাইনহোল্ড্, জন ফিল্ড্, রবার্ট রেকর্ড, টমাস্ ডিগ্স্ কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেন। সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দার্শনিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জিওর্দানো ব্রুনো। টাইকো ব্রাহে নিজে কোপার্নিকাসের ঘোর বিরোধী হইলেও নোভা বা নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়া সনাতন জ্যোতিষের দুর্বলতাই প্রমাণ করেন। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নানা জ্যোতিষীয় আবিষ্কার কোপার্নিকাসের অনুকূলেই রায় দিল। কেপ্লার সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইবার ফলেই গ্রহদের গতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইখানে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ বহুকাল পর্যন্ত কোপার্নিকাসের মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন নাই। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন যে বৎসর কেম্ব্রিজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন সেই বৎসর কোপার্নিকাসের জ্যোতিষের বিরুদ্ধে এক সন্দর্ভ রচনার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কসিমো দি মেদিচিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্যারী মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ কাসিনি (১৬২৫-১৭১২) কোপার্নিকাসের জ্যোতিষের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেই সময়ে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ গণনার দিক হইতে সুবিধাজনক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা মতবাদ হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। আমেরিকার ইয়েল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পর্যন্ত একই সংগে টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ সমান গুরুত্বের সহিত শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান চার্চ প্রথম সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে, এইবার হইতে কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১)

জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণগত যে দৈন্য ও দারিদ্র্য আমরা কোপার্নিকাসের গবেষণায় লক্ষ্য করিয়াছি এবং যে দারিদ্র্য সমগ্রভাবে জ্যোতিষীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা অপসারণ করেন দিনেমার টাইকো ব্রাহে। টাইকো ব্রাহের গবেষণা হইতেই আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের উৎপত্তি। টাইকো গণিতে ও জ্যামিতিতে পারদর্শী ছিলেন না, এজন্য তত্ত্বীয় জ্যোতিষে তাঁহার অবদান অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি যে তথ্য ও তালিকা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তী তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদেরা তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া জ্যোতিষের অভিনব সংস্কারসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। টাইকোর পর্যবেক্ষণলব্ধ অমূল্য তথ্য-সম্পদ হাতে না পাইলে কেপ্লার গ্রহদের গতি সংক্রান্ত তাঁহার বিখ্যাত নীতি ও সূত্রগুলির আবিষ্কারে সফল হইতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : স্ক্যানিয়ার অন্তর্গত নুডস্ট্রাপে (নুডস্ট্রাপ এখন দক্ষিণ সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত, টাইকোর সময়ে ইহা দিনেমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এক সম্ভ্রান্ত দিনেমার বংশে টাইকো ব্রাহের জন্ম হয় ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ইহার পর তিনি কিছুকাল লাইপ্‌ৎজিগ, ভিটেনবার্গ, রস্টক, বাজ্‌ল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ইউরোপীয় সফর শেষ করিয়া তিনি আবার ডেনমার্কে ফিরিয়া আসেন। ছাত্রাবস্থায় একবার নির্ধারিত সময়ে সূর্যগ্রহণ (১৫৬০) সংঘটিত হইতে দেখিবার পর হইতেই তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের সংগে সংগে জ্যোতিষ-চর্চাতেই তিনি ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ক্যাসিওপিয়া

তারামণ্ডলে এক নূতন নক্ষত্র বা নোভা আত্মপ্রকাশ করে। আঠার মাস এই নোভা নৈশাকাশে এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে দৃশ্যমান ছিল। টাইকো এই দীর্ঘ আঠার মাস নক্ষত্রটিকে নজরবন্দী রাখেন এবং স্বরচিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইহার কৌণিক দূরত্ব, ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন, এমন কি বর্ণের পরিবর্তন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার *De nova stella* গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হয়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি।

য়ুরাণিবোর্গ মানমন্দির : ইউরোপ সফরের সময় টাইকো একবার ল্যাণ্ডগ্রেভ হেসের চতুর্থ উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ল্যাণ্ডগ্রেভ জ্যোতিষে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; ক্যাসেলে তিনি এক মানমন্দির নির্মাণ করান। তরুণ টাইকোর জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি ও পর্যবেক্ষণের হাত দেখিয়া তিনি ডেনমার্কের রাজার নিকট টাইকোর জন্য একটি মানমন্দিরের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ জানান। ল্যাণ্ডগ্রেভের অনুরোধে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কোপেনহেগেন ও এলসিনোরের মধ্যবর্তী হুয়েন (Huen বা Hveen) দ্বীপে এই মানমন্দির স্থাপনের জন্য
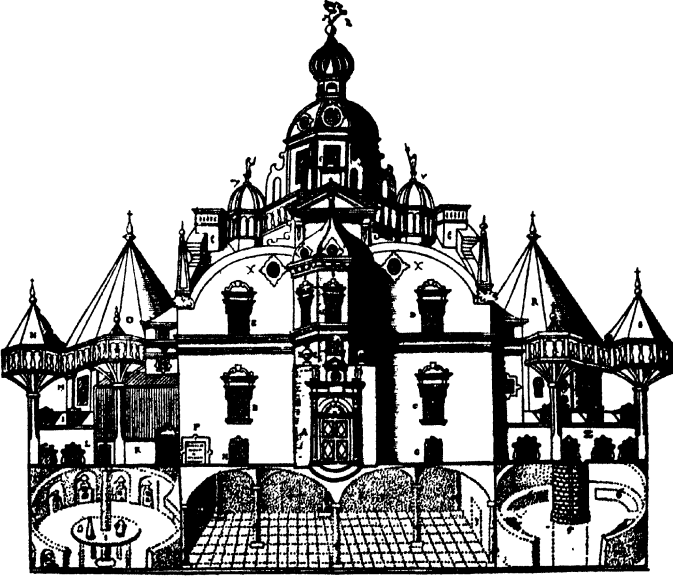
৪৭। য়ুরাণিবোর্গ মানমন্দির।

ভূমিদান করেন। শুধু তাহাই নহে, টাইকোকে তিনি মানমন্দির নির্মাণের জন্য এককালীন ২০,০০০ পাউণ্ড, আজীবন বেতনস্বরূপ বৎসরে ৪০০ পাউণ্ড এবং নরওয়েতে একটি নাতিবৃহৎ জমিদারি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখনকার দিনের অনুপাতে ইহা প্রচুর অর্থ। এই অর্থের দ্বারা হুয়েন দ্বীপে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর টাইকো তাঁহার বিখ্যাত মানমন্দির 'য়ুরাণিবোর্গ' (স্বর্গের মন্দির) নির্মাণ করেন। কয়েকটি রমণীয় উদ্যান, ছাপাখানা, প্রেক্ষাগার, চারিটি পর্যবেক্ষণাগার, যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, গ্রন্থাগার, কর্মীদের বাসস্থান

প্রভৃতি লইয়া এই বিরাট মানমন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। পর্যবেক্ষণাগারের যন্ত্রসজ্জা ছিল অতুলনীয়। সে সময়ে যত রকমের জ্যোতিষীয় যন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রত্যেকটির এবং তদুপরি টাইকোর নিজের উদ্ভাবিত নানা যন্ত্রপাতির দ্বারা ইহা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ১৫৭৬ হইতে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মানমন্দিরে তিনি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করেন।

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে টাইকোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফ্রেডারিকের মৃত্যু হয়। ডেনমার্কের পরবর্তী রাজা ও শাসকবর্গ টাইকোর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। টাইকো বরাবরই একটু উদ্ধত ও দাম্ভিক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন; এজন্য সত্যকার জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও, তিনি যত বড় পদস্থই হউন, খাতির করিয়া কথা বলিতেন না। তারপর টাইকোর অমিতব্যয়িতা। এইসব কারণে শীঘ্রই তিনি রাজসভার অনুগ্রহ হারাইলেন, প্রথমে তাঁহার মাসহারা কমানো হইল, পরে তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইল, এবং নরওয়ের জমিদারির আয় হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। সরকারী আয়ের সমস্ত পথ একে একে বন্ধ হইবার পরও নিজের সামান্য সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া টাইকো আরও পাঁচ বৎসর য়ুরাণিবোর্গে কাটাইয়াছিলেন। অবশেষে অবস্থা একেবারে অচল হইয়া পড়িলে অতি দুঃখের সহিত তাঁহার সাধের 'স্বর্গের মন্দির' চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া টাইকো কোপেনহেগেনের একটি ছোট ভাড়া বাড়ীতে চলিয়া আসেন। সভাসদ্‌দের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতেও খুশী হয় নাই। চান্সেলার ভালশেনডর্ফ টাইকোর গবেষণার মূল্য যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে এক কমিশন নিয়োগ করেন এবং ইহাতে তাঁহার দলের লোক সভ্য হিসাবে নিযুক্ত হন। এই কমিশন তাঁহার গবেষণার তীব্র সমালোচনা করিয়া এবং ইহা সম্পূর্ণ অপদার্থ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রায় দেয় যে, টাইকো এতদিন কেবল অকাজে ও অযথা সরকারী অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন। কথিত আছে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কোপেনহেগেনের লোকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া পথিমধ্যেই একবার টাইকোর উপর চড়াও হইয়াছিল।

টাইকো ডেনমার্ক পরিত্যাগ করিয়া হামবুর্গের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে অবস্থানকালে নিজের জীবনী ও তাঁহার উদ্ভাবিত জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া *Astronomiae instauratae mechanica* নামে এক গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরই জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ টাইকোকে প্রাগে আহ্বান করেন, মানমন্দির নির্মাণের জন্য সহরের একটি পুরাতন অট্টালিকা দান করেন, এবং তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৎসরে ৩০০০ ক্রাউন মুদ্রার ব্যবস্থা করেন। আবার নূতন উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া টাইকো মানমন্দির নির্মাণের কাজে ও জ্যোতিষীয় গবেষণায় লাগিয়া যান। এই সময় জোহান কেপ্‌লার নামে এক উদীয়মান তরুণ জার্মান জ্যোতির্বিদ্‌কে টাইকো সহকারীরূপে নিয়োগ করেন। সহকারীপদে বহাল হইয়া টাইকোর মানমন্দিরে গবেষণা করিবার জন্য কেপ্‌লার প্রাগে উপনীত হন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া টাইকোর জীবনান্ত ঘটে (২৪শে অক্টোবর, ১৬০১)।

জ্যোতিষীয় গবেষণা : ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে যে নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে ইহার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাই টাইকোর সর্বপ্রথম জ্যোতিষীয় প্রচেষ্টা। রাত্রির পর রাত্রি দীর্ঘ আঠার মাস ইহাকে নজরবন্দী রাখিয়া তিনি দেখাইলেন যে, নূতন নক্ষত্রটির কোন লম্বন (parallax) অথবা গ্রহদের মত ইহার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন গতি নাই। ইহার ব্যবহার অবিকল অন্যান্য নক্ষত্রের মত। সুতরাং নূতন নক্ষত্রটিও স্থির নাক্ষত্র গোলকের অধিবাসী। অ্যারিস্টটল বলিয়াছিলেন, নাক্ষত্র গোলকের কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর নহে; বিশ্বলোকে যাহা কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায় তাহা একমাত্র পৃথিবী ও চন্দ্রলোকের মধ্যবর্তী গোলকে (sub-lunary sphere) সম্ভবপর। টাইকো দেখাইলেন, চন্দ্রলোকের বাহিরে, এমন কি পরিবর্তনহীন শাশ্বত নক্ষত্রলোকেও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নক্ষত্রেরও জন্মমৃত্যু আছে।

ধূমকেতু সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বৃহৎ ধূমকেতু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ধূমকেতু সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল পরীক্ষা ও গবেষণা করেন। চন্দ্রলোকের বাহিরে বহু দূরে মহাশূন্যে যে ধূমকেতুর উৎপত্তি তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ১৫৭৭-এর ধূমকেতু সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ফল তিনি লিপিবদ্ধ করেন *De mundi aetherii recentioribus phaenomenis* গ্রন্থে; ইহার প্রকাশ-কাল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ধূমকেতুর আলোচনা ছাড়া *De mundi* গ্রন্থে টাইকো ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নিজের এক পরিকল্পনার খসড়া আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাকে তিনি সম্পূর্ণতা দান করিতে পারেন নাই। টাইকোর পরিকল্পনায় পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করে, কিন্তু অন্যান্য গ্রহ—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া কক্ষা-পরিক্রমা সম্পাদন করে (৪৮ নং চিত্র)। এই পরিকল্পনা অনেকটা
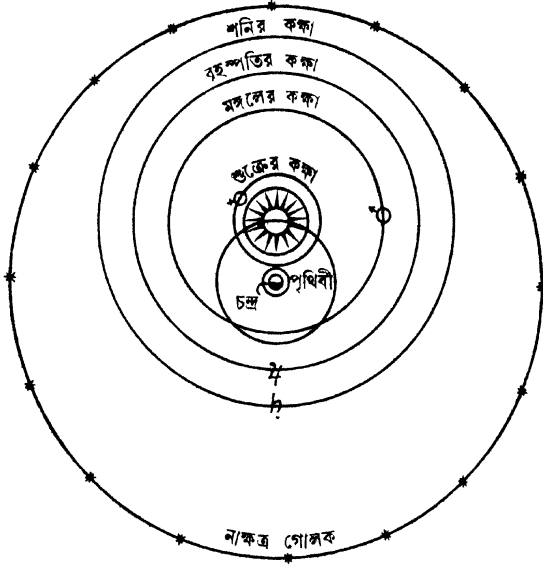
৪৮। টাইকোর ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা।

টলেমী ও কোপার্নিকাসের মতবাদের মধ্যে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা ও পদার্থবিদ্যার নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া তিনি পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। তারপর পৃথিবীর গতি থাকিলে নক্ষত্রদের লম্বন থাকিবার কথা; টাইকো অনেক চেষ্টা করিয়াও নক্ষত্রের এই লম্বন মাপিতে পারেন নাই। নক্ষত্রদের বিরাট দূরত্ব তাহাদের লম্বনের অনস্তিত্বের যে একটা সঙ্গত কারণ হইতে পারে কোপার্নিকাসের এই ব্যাখ্যা টাইকোর মনঃপূত হয় নাই। অবশ্য তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদ্ হিসাবে টাইকোর খ্যাতি নহে। জ্যোতিষের ইতিহাসে তাঁহার প্রসিদ্ধি নির্ভুল পর্যবেক্ষণের জন্য। পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ভুলের মাত্রা কমাইবার উদ্দেশ্যে তিনি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই তিনি অবিস্মরণীয়।

শুধু নির্ভুল পর্যবেক্ষণ নহে, জ্যোতিষ্কদের অবস্থান ও গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা টাইকো যেরূপ উপলব্ধি করেন তাঁহার পূর্বে আর কোন জ্যোতির্বিদ্‌কে এবিষয়ে এরূপ গুরুত্ব অর্পণ করিতে দেখা যায় না। কোপার্নিকাস সারা জীবনে মাত্র ২৭টি কি ঐরূপ পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। টাইকো সেইখানে এক সূর্যকেই নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একাদিক্রমে বহু বৎসর পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। য়ুরাণিবোর্গে দীর্ঘ বিশ বৎসর

৪৯। অতিকায় মুর‍্যাল কোয়াড্রান্ট বা বৃত্তপাদ।
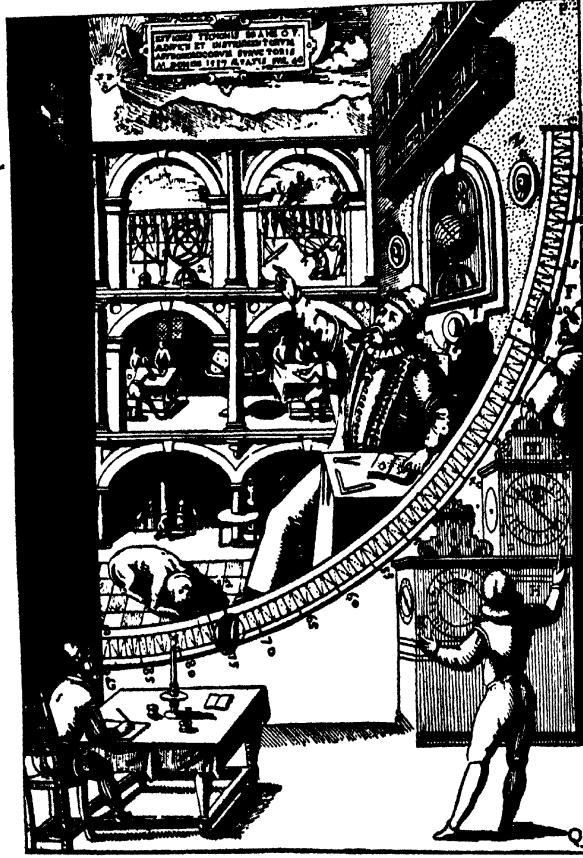
এইরূপ নিষ্ঠার সহিত নিয়মিতভাবে তিনি দৃশ্যমান প্রত্যেক গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ককে পর্যবেক্ষণ করেন। যন্ত্রের ত্রুটী থাকিলে অথবা নির্মাণ-কৌশলের অভাবে তাহার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হইলে ঝুরি ঝুরি পর্যবেক্ষণ গ্রহণেও সুফলের আশা অল্প। তাই যন্ত্রপাতির দোষ-ত্রুটী সংশোধনে ও অধিকতর কার্যকরী উন্নত ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবনে টাইকো বরাবরই বিশেষ

উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিষীয় গবেষণার প্রারম্ভে তিনি আউগ্‌স্‌বুর্গের শাসনকর্তার জন্য এক অতিকায় কোয়াড্রান্ট বা উচ্চতামাপক বৃত্তপাদ (mural quadrant) নির্মাণ করেন (৪৯ নং চিত্র)। এই বৃত্তপাদের ব্যাসার্ধ ছিল ১৯ ফুট, সমগ্র কাঠামোটি ছিল কাঠের তৈয়ারী। বৃত্তপাদের প্রান্তভাগে পিতলের পাতের উপর মাপনীর দাগকাটা। কয়েকটি লিভারের সাহায্যে ইহাকে নিজের সমতল ক্ষেত্রে অথবা উল্লম্ব অক্ষের (vertical axis) চারিদিকে ইচ্ছামত ঘুরানো যায়। দিগন্তের উপর অবস্থিত যে কোন জ্যোতিষ্কের দিকে বৃত্তপাদকে ঘুরাইয়া ও তাহার দ্বারা জ্যোতিষ্কটিকে পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ইহার উচ্চতা মাপা যায়। এই অতিকায় বৃত্তপাদের সাহায্যে টাইকো এক মিনিটের ভগ্নাংশ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে জ্যোতিষ্কের অবস্থান মাপিতে পারিতেন।
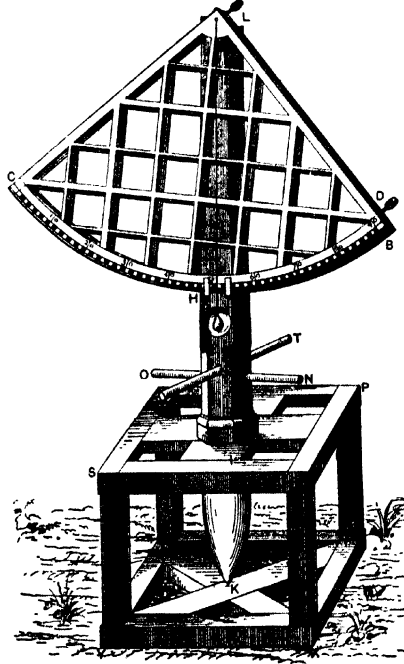
৫০। গৃহের বাহিরে সংস্থাপন করিয়া কাজের উপযোগী টাইকোর একটি বৃত্তপাদ।

য়ুরাণিবোর্গ মানমন্দিরের জন্য টাইকো নানা রকমের জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের আমল হইতে ব্যবহৃত আর্মিলারি গোলক নামে এক প্রকার যন্ত্র অবলম্বনে তিনি কতকগুলি নূতন ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। আর্মিলারি গোলক কতকগুলি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের সমষ্টি; প্রত্যেকটি বৃত্তের পরিধিতে মাপনীর ব্যবস্থা আছে। গ্রহ-নক্ষত্রের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য আর্মিলারি গোলক ব্যবহৃত হইত এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের কক্ষা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তের ব্যবস্থা এই যন্ত্রে করা হইত। টাইকো আর্মিলারি

গোলকের বৃত্তের সংখ্যা কমাইয়া ইহার গঠন অনেক সহজ করেন এবং একই যন্ত্রের দ্বারা যাহাতে জ্যোতিষ্কদের বিষুবাংশ (right ascension) ও বিষুবলম্ব (declination) নির্ণয় করা যায় তাহার ব্যবস্থা করেন।

আর্মিলারি গোলক ছাড়া ছোট বড় নানা আকারের সেক্স্ট্যান্ট ও অক্ট্যান্ট তিনি য়ুরাণিবোর্গ মানমন্দিরের জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইসব যন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল সঠিকভাবে দৃষ্টিপথ নির্ধারণ করা। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিপথ (line of sight) যাহাতে মাপনীতে সহজে ধরা পড়ে তজ্জন্য তিনি এলিডেডের (alidade) ব্যবস্থা করেন। এলিডেড একটি দণ্ডবিশেষ; ইহার দুই অগ্রভাগে ছিদ্র থাকে এবং উভয় ছিদ্রপথে জ্যোতিষ্কদের অবলোকন করিতে হয়। দণ্ডের কেন্দ্রটি বৃত্তপাদ বা সেক্স্ট্যান্টের কেন্দ্রস্থলে সংলগ্ন এবং তাহার এক প্রান্ত বৃত্তাকার ধাতব মাপনীর উপর যাওয়া-আসা করিতে পারে। সুতরাং এলিডেডের সাহায্যে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিপথ ঠিক করিয়া তাহার প্রান্তভাগের চিহ্নের বা নির্দেশক রেখার সহিত মাপনী মিলাইলেই জ্যোতিষ্কের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারিত হইবে।

টাইকোর গবেষণার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার এইসব যন্ত্রপাতির কথাও কিছু জানা দরকার; এই কারণে ইহাদের সামান্য উল্লেখ করা হইল মাত্র। যাহা হউক, এইভাবে উন্নত পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর করিয়া তিনি অতি নির্ভুল পরিমাপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত নক্ষত্রতালিকা রচনা করিতে তিনি যে নয়টি প্রধান নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন অধুনা নির্ণীত পরিমাপ হইতে তাহার পার্থক্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাত্র এক মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রহ সম্বন্ধে টাইকোর পর্যবেক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে কেপ্লার একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁহার (টাইকোর) মাপে ৮′ মিনিটের মত ভুল অসম্ভব। মতবাদের সহিত পর্যবেক্ষণের কোথাও যদি গড়মিল হয় তবে বুঝিতে হইবে মতবাদেরই কোথাও গলদ আছে, টাইকোর পর্যবেক্ষণে নহে। বস্তুতঃ টাইকোর নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ও তাহার উপর অটল বিশ্বাসের জোরেই কেপ্লার গ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

জোহান কেপ্লার (১৫৭১-১৬৩০)

জ্যোতিষের ইতিহাসে টাইকো ব্রাহে ও জোহান কেপ্লারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু বর্ষব্যাপী অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগৃহীত টাইকোর জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের নীরস দীর্ঘ তালিকা কেপ্লারের আশ্চর্য গাণিতিক প্রতিভার স্পর্শে সজীব হইয়া উঠে, জ্যোতিষে নূতন সম্ভাবনা, নূতন আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হয়। অতি শুভক্ষণে এই দুই জ্যোতির্বিদের যোগাযোগ ঘটে। তাহার ফলে সর্বকালের জন্য গ্রহদের গতি-রহস্যের কিনারা করিয়া যে মৌলিক নীতিগুলি আবিষ্কৃত হয়, পরবর্তীকালে তাহাই আবার নিউটনের গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। টাইকোর পর্যবেক্ষণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারিলে কেপ্লারের গাণিতিক প্রতিভা কোন পথে বিকশিত হইত অথবা একেবারে নিষ্ফল হইত কিনা তাহা কে জানে। তেমনই আবার কেপ্লারের হাতেই টাইকোর নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের চরম সার্থকতা।

বিজ্ঞানী হিসাবেও দুইজনের মধ্যে কি আশ্চর্য প্রভেদ! একজন ধনী, সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব, কর্মঠ, সুনিপুণ যন্ত্রশিল্পী, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সম্রাট, কিন্তু গণিতে ও তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে অপটু; আর একজন দরিদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য, পর্যবেক্ষণে অপটু, কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী, গণিত-সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একই বিভাগে একই সময়ে এইরূপ বিপরীতধর্মী প্রতিভার দৃষ্টান্ত বিরল।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : জোহান কেপ্‌লারের জন্ম হয় ষ্টাটগার্টের নিকটবর্তী ভীল নামক স্থানে ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর। কেপ্‌লাররা প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা ভুরটেম্‌বার্গের ডিউকের অধীনে সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এই ডিউকের সাহায্যে প্রথমে মোলব্রণের এক বিদ্যালয়ে এবং পরে টুবিংগেনের বিখ্যাত প্রোটেস্টান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কেপ্‌লার শিক্ষালাভ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম-এ উপাধি প্রাপ্ত হন ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে। টুবিংগেনে গণিত ও জ্যোতিষের অধ্যাপক মাইকেল ম্যাষ্টলিনের প্রভাবে তিনি গণিত ও জ্যোতিষ অধ্যয়নে উৎসাহিত হন। ম্যাষ্টলিন কোপার্নিকান জ্যোতিষের সমর্থক ছিলেন; তাঁহার নিকট জ্যোতিষ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়া কেপ্‌লার ছাত্রাবস্থা হইতেই সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের প্রধান সমর্থক হইয়া উঠেন। ইহাতে ধর্মসংস্থায় কোন যাজকের পদ লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; ভবিষ্যতে একমাত্র গণিত ও জ্যোতিষের অধ্যাপনা ও গবেষণার পথ অনুসরণ করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাৎসের এক বিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতিষের শিক্ষকের পদ খালি হইলে কেপ্‌লার সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

গ্রাৎসে অবস্থান কালেই তাঁহার গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গবেষণার সূত্রপাত। গ্রহদের পারস্পরিক দূরত্বের কোন জ্যামিতিক সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিষয়ে কয়েক বৎসর গবেষণা করিবার পর তিনি তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Prodromus dissertationum cosmographicarum continens mysterium cosmographicum* বা সংক্ষেপে *Mysterium cosmographicum* রচনা ও প্রকাশ করেন ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের একটি কপি তিনি টাইকো ব্রাহে ও গ্যালিলিওর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উভয় বিজ্ঞানীই এই গ্রন্থে তরুণ কেপ্‌লারের অনন্যসাধারণ গাণিতিক প্রতিভার ছাপ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হন। জ্যোতিষীয় মতবাদের দিক হইতে টলেমীপন্থী টাইকো কেপ্‌লারের কোপার্নিকীয় ভাব-ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে রুষ্ট হইলেও জহুরীর পক্ষে আসল মুক্তা চিনিতে বিলম্ব হইল না। প্রথমে অতিথিরূপে ও পরে প্রধান সহকারীরূপে তিনি কেপ্‌লারকে প্রাগের নবনির্মিত মানমন্দিরে নিযুক্ত করেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে টাইকোর মৃত্যু হইলে তিনি মানমন্দিরের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

প্রাগের মানমন্দিরে গবেষণা আরম্ভ করিবার অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের নূতন নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও মতামত দুইটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। জ্যোতিষীয় গবেষণায় আলোকবিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে *Ad Vitellionem paralipomena quibus astronomiae pars optica traditur* নামে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বায়ুমণ্ডলে আলোকের প্রতিসরণের জন্য জ্যোতিষ্কদের আপাত যে সকল পরিবর্তন দৃষ্ট হয় তাহা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে জ্যোতিষীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের এক উর্বর পরিকল্পনার বর্ণনা আছে; এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক অতি উন্নত ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন শাইনার। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কেপ্‌লারের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ *Astronomia nova . . . physica coelestis, tradita commentariis de motibus stellae Martis*। মঙ্গল গ্রহের গতি সম্পর্কিত গবেষণা ও সেই গবেষণা হইতে উদ্ভূত তাঁহার বিখ্যাত সূত্রগুলি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থ সমগ্র জ্যোতিষীয় সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে রুডল্‌ফ রাজ্যভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে কেপ্‌লারের পক্ষে প্রাগে অবস্থান করা কঠিন হইয়া পড়ে। উত্তর অস্ট্রিয়ার লিন্‌ৎজের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রাগ পরিত্যাগ করেন ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে। লিন্‌ৎজে অবস্থানকালে তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ *Epitome astronomiae*

Copernicanae (১৬১৮-২১) ও *Harmonices mundi* (১৬১৯) প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ধূমকেতুর উপর একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিন্‌ৎজে প্রোটেস্টান্ট উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে এই স্থানও কেপ্‌লারকে ছাড়িয়া যাইতে হইল। এবার তিনি আসিলেন উল্‌মে। তাঁহার সর্বশেষ বিখ্যাত গ্রন্থ *Tabulae Rudolphinae* প্রকাশিত হয় উল্‌ম হইতে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাই গ্রহ-সম্পর্কিত তাঁহার বিখ্যাত জ্যোতিষীয় তালিকা। দীর্ঘ ২৫ বৎসর এই তালিকা প্রণয়নের কার্যে তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন। এই তালিকা প্রকাশিত হইবার এক শত বৎসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উন্নততর জ্যোতিষীয় তালিকা প্রণয়ন আর সম্ভবপর হয় নাই। কেপ্‌লারের পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী সম্রাট রুডলফের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয়।

Tabulae Rudolphinae প্রকাশের পর তিন বৎসর কেপ্‌লার জীবিত ছিলেন। ধর্মীয় বিরোধ, ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আসন্ন যুদ্ধের (ত্রিশ বৎসরের) সম্ভাবনায় ও উত্তেজনায় ইউরোপের সর্বত্র তখন অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আবর্ত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে তিনি রাজসেনাপতি ভালেস্টাইনের শরণাপন্ন হন। ভালেস্টাইন তখন একজন দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর সন্ধান করিতেছিলেন এবং এবিষয়ে কেপ্‌লারের সুনামের কথা তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন। তিনি সানন্দে কেপ্‌লারের ভার গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে কেপ্‌লার রস্টকে জ্যোতিষের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সৌভাগ্যও তাঁহার বেশী দিন থাকিল না। শীঘ্রই ভালেস্টাইনের পতন ঘটিলে কেপ্‌লার আবার আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন এবং তাঁহার বেতন পর্যন্ত বাকী পড়িতে থাকে। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে 'ডায়েটে'র নিকট হইতে বাকী বেতন আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি র‍্যাটিস্‌বন যাত্রা করেন। পথশ্রমে ও ক্লান্তিতে অবসন্ন ভগ্নস্বাস্থ্য কেপ্‌লার র‍্যাটিস্‌বনে পৌঁছিবার কিছুদিনের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর। নগর তোরণের বাহিরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সময় এই মহামনীষীর পুণ্য সমাধির সকল অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

জ্যোতিষীয় গবেষণা : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্যোতিষীয় চিন্তাধারার যে নূতনত্ব, সাবেক পথ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ও অজ্ঞাত পথে অগ্রসর হইবার যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখিয়াছি, তাহার অন্যতম কারণ পিথাগোরীয় গণিত ও ভাবধারার পুনঃপ্রচার ও প্রসার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে প্রগতিবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পিথাগোরীয় চিন্তাধারার আদর ও সমর্থন দেখা যায়। বোলোনার গণিত ও জ্যোতিষের অধ্যাপক ডোমিনিকো দি নোভারোর তৎপরতার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। নোভারোর প্রভাবেই কোপার্নিকাস জ্যোতিষীয় গবেষণায় উৎসাহিত হন। কেপ্‌লারের শিক্ষক পিথাগোরাসপন্থী ম্যাস্টলিন সম্বন্ধেও এই উক্তি অনেকটা প্রযোজ্য। কেপ্‌লার ম্যাস্টলিনের প্রভাবে পিথাগোরীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন; প্রায় সমস্ত গবেষণায় ও তত্ত্বীয় আলোচনায় এই প্রভাব তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর যে পূর্ণ সংখ্যার এক সহজ আনুপাতিক নিয়মে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি গ্রহদের কক্ষা-বৃত্তের ব্যাসের মধ্যে এক আঙ্কিক সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রথম জ্যোতিষীয় গবেষণা সুরু করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে কক্ষা-বৃত্তের ব্যাসের মধ্যে সংখ্যার পরিবর্তে কোন জ্যামিতিক সম্বন্ধ বর্তমান কিনা তাহা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, পর পর কতকগুলি সুষম বহুভুজের (regular polygons) মধ্যে অন্তর্বৃত্ত ও পরিবৃত্ত রচনা করিলে এই বৃত্তদের ব্যাসের যে অনুপাত হয় ঠিক সেই

অনুপাতের ব্যাসের কক্ষা-বৃত্তে গ্রহরা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইল না। তখন তিনি প্লেটোর পাঁচ প্রকার সমঘনর (regular solid) অন্তর্গোলক ও পরিগোলকের ব্যাসের মধ্যে যে আনুপাতিক সম্বন্ধ বর্তমান তাহার সহিত গ্রহদের পারস্পরিক দূরত্বের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিনা তাহা চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। এই প্রচেষ্টা তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি দেখাইলেন, অষ্টতলকের (octahedron) অন্তর্গোলক ও পরিগোলকের ব্যাসের মধ্যে যে অনুপাত বর্তমান বুধ ও শুক্রের কক্ষা-বৃত্তের ব্যাসের অনুপাতও অবিকল সেইরূপ। এইভাবে ইকোসাহেড্রন, ডোডেকাহেড্রন, টেট্রাহেড্রন প্রভৃতির অন্তর্গোলক ও পরিগোলকের ব্যাসের মধ্যে পারস্পরিক যে অনুপাত থাকে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির কক্ষা-বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসের মধ্যেও সেই অনুপাত বর্তমান (৫১নং চিত্র)। এই জ্যামিতিক সম্পর্ক আবিষ্কারে কেপ্‌লার এইরূপ আনন্দিত ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে, প্রকাশ্যভাবে তিনি মন্তব্য করেন, এই আবিষ্কারের গৌরব এমন কি সমগ্র স্যাক্সনি রাজ্য-জয়ের গৌরবের সহিত বিনিময় করিতেও তিনি নারাজ।
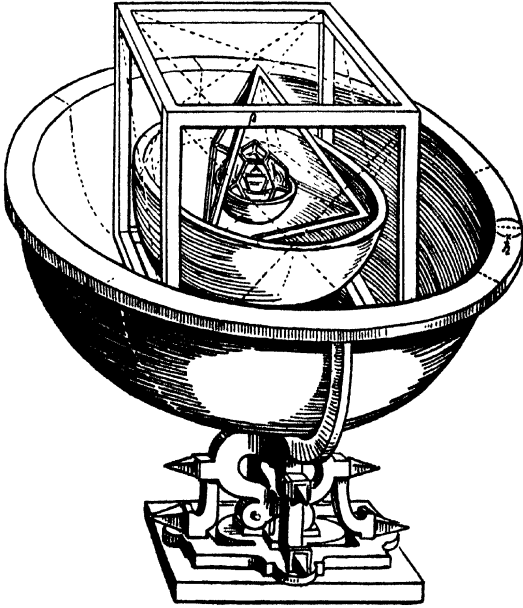
৫১। গ্রহ-গোলকদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কেপ্‌লারের ধারণা।

Mysterium cosmographicum-এ কেপ্‌লারের উপরিউক্ত আবিষ্কার আলোচিত হইয়াছে। গ্রহদের দূরত্বের যে অনুপাত পাওয়া যায় তাহার সহিত সমঘনর অন্তর্গোলক ও পরিগোলকের ব্যাসগুলির অনুপাতের অবশ্য সামান্য কিছু গরমিল ছিল। কেপ্‌লারের ধারণা হয় এই সামান্য গরমিলটুকু পর্যবেক্ষণের ভুল। অধিকতর নির্ভুল পর্যবেক্ষণের সহিত মিলাইতে পারিলে এই গরমিলটুকুও যে থাকিবে না, তাহাতে কেপ্‌লারের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। টাইকো ব্রাহের সংস্পর্শে আসিবার তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল টাইকোর নির্ভুল পর্যবেক্ষণের

সুযোগ লাভ করা। কার্যতঃ তাহার বিপরীতটিই ঘটিয়াছিল এবং কেপ্‌লার কোনকালেই পর্যবেক্ষণের সহিত তাঁহার উপরিউক্ত মতবাদের মিল ঘটাইতে পারেন নাই। এজন্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে *Mysterium cosmographicum*-এর গুরুত্ব এখন শুধু ঐতিহাসিক।

কেপ্‌লারের তিন সূত্র : প্রাগের মানমন্দিরে টাইকোর প্রধান সহকারীরূপে কর্মভার গ্রহণ করিবার পর হইতে কেপ্‌লারের জ্যোতিষীয় গবেষণায় এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়। টাইকোর সুশৃংখল গবেষণা-ব্যবস্থায় এক একজন সহকারীর উপর এক একটি সমস্যা সমাধানের ভার থাকিত। মঙ্গল গ্রহের গতি-সমস্যা সমাধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল কেপ্‌লারের উপর। গ্রহদের খাম-খেয়ালী গতি-রহস্যের সমাধান সুপ্রাচীন কাল হইতে জ্যোতির্বিদ্‌দের শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে কোপার্নিকাস এই রহস্যের আংশিক কিনারা করিয়াছিলেন মাত্র। জ্যামিতির নানা প্রকার বক্র রেখার মধ্যে বৃত্তই যে এইসব স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কের পরিক্রমণের একমাত্র স্বাভাবিক পথ, 'Nature's own curve', এই বিশ্বাস কাটাইয়া উঠিতে না পারায় কোপার্নিকাস বহুদূর অগ্রসর হইয়াও শেষ পর্যন্ত এই রহস্যের সম্পূর্ণ দ্বারোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্য ছাড়া অন্যবিধ উপায়ে এই সমস্যার যে কোনরূপ সমাধান হইতে পারে ইহা কাহারও মাথায় আসে নাই। টাইকো ও কেপ্‌লার এই সমস্যার সমাধানকল্পে মঙ্গল গ্রহকে নির্বাচন করিয়াছিলেন এই কারণে যে, গ্রহদের মধ্যে মঙ্গল ও বুধের বেলাতেই তথ্য ও তত্ত্বের গরমিল সর্বাধিক। বুধের গরমিল মঙ্গলের চেয়েও বেশী; কিন্তু বুধ সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ গৃহীত না থাকায় তথ্যের অপ্রতুলতা হেতু এই গ্রহ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের বিশেষ সহায়ক হয় নাই। মঙ্গল সম্বন্ধে বহু পূর্ব হইতেই জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ যে শুধু পর্যাপ্ত ছিল তাহাই নহে, টাইকো নিজে এই গ্রহকে বিশেষ যত্নের সহিত দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও ইহার সম্বন্ধে রাশি রাশি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং গতি-রহস্যের কিনারা যদি কখনও সম্ভবপর হয় তাহা যে এই মঙ্গল গ্রহ সংক্রান্ত তথ্যরাশির বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারাই হইবে এবিষয়ে দুই জ্যোতির্বিদই নিঃসন্দেহ ছিলেন।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে কেপ্‌লার তাঁহার উর্বর মস্তিষ্ক ও গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করেন। প্রথমে চিরাচরিত পদ্ধতিতে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত, পরিবৃত্ত ও ইকোয়েণ্টের (equant) (ইকোয়েণ্টের ধারণাটি অবশ্য নূতন) সাহায্যে উৎকেন্দ্রের অবস্থান, পরিবৃত্তের আকার ইত্যাদি নানাভাবে অদল-বদল করিয়া তিনি পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল মিলাইবার চেষ্টা করিলেন। ইহার কোন এক অবস্থায় তাঁহার উদ্ভাবিত জ্যামিতিক খস্‌ড়ার সহিত পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলের গরমিল মাত্র আট মিনিটে কমাইয়া আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। আর কেহ হইলে এই গরমিলকে পর্যবেক্ষণের ভুল বলিয়া এইখানেই হয়ত পরিকল্পনা রচনার কাজ সমাপ্ত করিতেন। কিন্তু কেপ্‌লার ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি টাইকোর পর্যবেক্ষণের নির্ভুলতার কথা জানিতেন। এই আট মিনিটের গরমিলকে আর যাহাই হউক টাইকোর পর্যবেক্ষণের ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিতে কেপ্‌লারের মন সরিল না। তিনি *Commentariis de motibus stellae Martis* গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"ঈশ্বরের করুণায় আমরা টাইকোর মত এক জন অতি সাবধানী পর্যবেক্ষক হাতে পাইয়াছি; এই হিসাবে তাঁহার পর্যবেক্ষণ হইতে আট মিনিটের গরমিল দেখা যাইতেছে...। কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের এই দান স্বীকার ও তাহার সদ্ব্যবহার করা আমাদের সমীচীন হইবে...কারণ আট মিনিট দেশান্তরের গরমিল তুচ্ছ মনে করিলেও ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমি যে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা যথেষ্ট নির্দোষ। কিন্তু ইহা তুচ্ছ মনে করিবার মত নহে; এই আট মিনিটের গরমিলই জ্যোতিষের সম্পূর্ণ সংস্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং ইহাই আমার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।"*

---

* *A Short History of Astronomy* গ্রন্থে মিঃ আর্থার বেরি কর্তৃক উদ্ধৃত *Commentariis*-এর ইংরেজী অনুবাদের (পৃষ্ঠা ১৮৪) বঙ্গানুবাদ।

প্রথমে কেপ্‌লারের মনে হয়, মঙ্গলের কক্ষা দুই মুখ বন্ধ ডিম্বাকৃতি কোন বক্ররেখা হইবে। পরে এই ধারণা পরিত্যাগ করিয়া তিনি উপবৃত্ত (ellipse) অবলম্বনে গণনা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। সূর্যকে ফোকসে (focus) সংস্থাপিত করিয়া উপবৃত্ত-পথে মঙ্গলগ্রহের পরিক্রমণের ভিত্তিতে গণনা করিয়া তিনি দেখাইলেন এখন আর এতটুকু গরমিলও হইতেছে না। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে রচিত হইল কেপ্‌লারের প্রথম সূত্র :

১। সূর্যকে ফোকসে রাখিয়া গ্রহরা উপবৃত্ত-পথে পরিক্রান্ত হয়।

পরিক্রমণরত গ্রহের বেগ সব সময় সমান হয় না। সূর্য হইতে গ্রহের দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম ইহার গতি তখন সবচেয়ে বেশী দ্রুত; দূরত্ব যতই বাড়িতে থাকে ইহার বেগও ততই হ্রাস পায়। সূর্য হইতে গ্রহের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার বেগের তারতম্য কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সে রহস্যও কেপ্‌লার ভেদ করিলেন। সূর্য হইতে গ্রহ পর্যন্ত যদি একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায় তাহা হইলে গ্রহ ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই রেখাটি উপবৃত্তের সমতলে ক্ষেত্র রচনা করিয়া চলিবে। কেপ্‌লার দেখাইলেন, গ্রহের অবস্থান যাহাই হউক একই সময়ের ব্যবধানে উপরিউক্ত কাল্পনিক রেখা একই ক্ষেত্র রচনা করিবে। বিষয়টি চিত্রের (৫২নং) সাহায্যে সহজে বুঝানো যায়। $P_1 P_2 P_3 P_4$ একটি উপবৃত্ত; $S_1 S_2$ দুইটি ফোকস। মনে করা যাক সূর্য প্রথম ফোকস S_1-এ অবস্থিত। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহটি P_1 হইতে
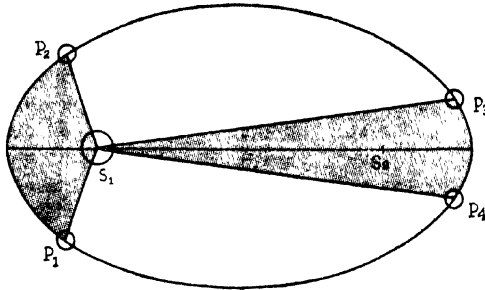
৫২। কেপ্‌লারের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা।

P_2-তে সরিয়া গেল; সুতরাং $S_1 P_1$ কাল্পনিক রেখাটি এই সময়ের মধ্যে $S_1 P_1 P_2$ ক্ষেত্র রচনা করিবে। সেইরূপ গ্রহটি ঠিক ঐ একই সময়ের মধ্যে P_3 হইতে P_4-এ সরিয়া যায় এবং $S_1 P_3 P_4$ ক্ষেত্র রচনা করে। কেপ্‌লার দেখান, এই দুইটি ক্ষেত্রফল $S_1 P_1 P_2$ ও $S_1 P_3 P_4$ সমান। এখন $P_1 P_2$ দূরত্ব $P_3 P_4$ দূরত্ব অপেক্ষা বেশী, এবং যেহেতু একই সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রান্ত হইতেছে, সেহেতু P_3 হইতে P_4-এ যে বেগে গ্রহটি ধাবিত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রুতবেগে ইহা ধাবিত হইবে P_1 হইতে P_2-তে যাইবার সময়। তাই কেপ্‌লারের দ্বিতীয় সূত্র হইল :

২। একই সময়ের ব্যবধানে গ্রহের যে কোন অবস্থানে সূর্য হইতে গ্রহ পর্যন্ত সংযুক্ত সরল রেখা একই ক্ষেত্রফল রচনা করিয়া থাকে।

প্রথমে এই সূত্র দুইটির সত্যতা তিনি মঙ্গল গ্রহের বেলায় প্রমাণ করেন। পরে ইহারা যে অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রেও, এমন কি বৃহস্পতির নবাবিষ্কৃত উপগ্রহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তাহা প্রমাণিত হয়। সমস্ত গ্রহের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সূত্রদ্বয়ের সাধারণ প্রয়োগ তিনি আলোচনা করেন

Epitome astronomiae Copernicanae গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ সমর্থনের অপরাধে রোমের ধর্মসংস্থা কর্তৃক নিষিদ্ধ গ্রন্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

গ্রহদের পারস্পরিক দূরত্বের মধ্যে যে এক আঙ্কিক অনুপাত বিদ্যমান এই বিশ্বাস কেপ্‌লার কখনও হারান নাই। জ্যামিতিক উপায়ে এই অনুপাত নির্ধারণে বিফল হইলেও তাঁহার আশা ছিল অন্যভাবে তিনি এই সম্বন্ধ একদিন আবিষ্কার করিতে পারিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি বোধ হয় তাঁহার বিখ্যাত তৃতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *Harmonices mundi* গ্রন্থে প্রথম এই সূত্রটি লিপিবদ্ধ হয় :

৩। গ্রহদের ভগন-কালের বর্গ সূর্য হইতে তাহাদের মধ্যক দূরত্বের ঘনর আনুপাতিক।

কোন গ্রহের ভগন-কাল (period of revolution) যদি t ও সূর্য হইতে তাহার মধ্যক দূরত্ব (mean distance) a হয়, তবে তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী :

$$t^2 \propto a^3\text{ ; অর্থাৎ, } \frac{t^2}{a^3} = c. \quad c = \text{ধ্রুবক।}$$

এই সূত্রের যাথার্থ্য নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। পৃথিবীর ভগন-কালকে এক বৎসর ও সূর্য হইতে তাহার দূরত্বকে একক ধরিয়া তালিকার অঙ্কগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রহ	ভগন-কাল (t)	মধ্যক দূরত্ব (a)	t^2	a^3	t^2/a^3
পৃথিবী ...	১	১·০০	১	১	১
বুধ ...	০·২৪	০·৩৮৭	০·০৫৮	০·০৫৮	১
শুক্র ...	০·৬১	০·৭২৩	০·৩৭৮	০·৩৭৮	১
মঙ্গল ...	১·৮৮	১·৫২৪	৩·৫৪	৩·৫৪	১
বৃহস্পতি ...	১১·৮৬	৫·২০২	১৪০·৭	১৪০·৮	১
শনি ...	২৯·৪৬	৯·৫৩৯	৮৬৭·৯	৮৬৮·০	১

কেপ্‌লারের উপরিউক্ত তিনটি সূত্রের দ্বারা গ্রহ-সংক্রান্ত গতির সমস্ত অবস্থাই বুঝানো হইয়াছে। প্রথম সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত হইল গ্রহের গতিপথ; এই গতিপথে কি ভাবে ও কিরূপ বেগে গ্রহ অগ্রসর হইয়া থাকে তাহার নির্দেশ মিলে দ্বিতীয় সূত্রে; সূর্য হইতে গ্রহের দূরত্বের সহিত ইহার ভগন-কালের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইল তৃতীয় সূত্রে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের গতির সম্ভাবনার কথা কেপ্‌লারের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন স্পেনদেশীয় মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ আল্-জারকালি (১০২৯-৮৭)। আল্-জারকালি অবশ্য ঠিক কেপ্‌লারের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়া তথ্য ও তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে গ্রহের উপবৃত্ত-তত্ত্বের প্রস্তাব করেন নাই। এইরূপ একটা কিছু যে অসম্ভব নহে ইহাই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র।

মহাকর্ষের উপলব্ধি : মহাকর্ষের সত্য উপলব্ধি করিয়া এই তিনটি সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন নিউটন। মহাকর্ষের ফলে সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের গতি উপরিউক্ত তিনটি সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে যে বাধ্য, নিউটন বলবিদ্যা প্রয়োগের দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন। কেপ্‌লার মহাকর্ষের সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু সূর্য ও গ্রহের মধ্যে এইরূপ একটি শক্তির বা প্রভাবের অস্তিত্ব তিনি আঁচ করিয়াছিলেন। উৎকেন্দ্র ও পরিবৃত্ত-কণ্টকিত জ্যোতিষীয় পরিকল্পনায় গ্রহরা একটি নিরেট বস্তুর পরিবর্তে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র

করিয়া ঘ্রিয়া থাকে। কিন্তু কেপ্‌লারের পরিকল্পনায় স্র্য উপবৃত্তের ফোকসে অবস্থিত; স্তরাং উপবৃত্ত-পথে প্রদক্ষিণরত গ্রহ ও সেই উপবৃত্তের ফোকসে অবস্থিত স্র্যের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধ থাকা যে বিচিত্র নয়, কেপ্‌লার সে সম্বন্ধে অনেক জল্পনা করেন। গিলবার্টের *De magnete* তিনি বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হয়, চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যেমন আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান সেইর্প এক প্রকার আকর্ষণী শক্তি anima motrix স্র্য হইতে বিচ্ছ্রিত হইয়া থাকে অনেকটা চাকার পাকির মত (৫৩নং চিত্র)। স্র্য নিজের অক্ষে আবর্তিত হইবার সময় বিচ্ছ্রিত anima motrix-এর সাহায্যে গ্রহদেরও তাহার চতুর্দিকে তাড়াইয়া বেড়ায়।
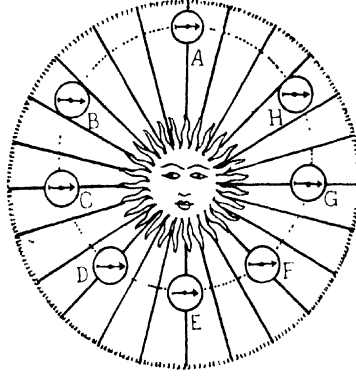
৫৩। গ্রহদের উপর স্র্যের প্রভাব সম্বন্ধে কেপ্‌লারের ধারণা।

তারপর গ্রহদের উপবৃত্ত-পথে গতিরও এক স্ন্দর ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন। গিলবার্ট দেখাইয়াছিলেন যে, প্থিবী একটি বিরাট চুম্বক এবং এই চৌম্বক ধর্মের জন্য চন্দ্রকে সে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কেপ্‌লার এখন প্রত্যেক গ্রহকেই এক একটি চুম্বকের মত মনে করিলেন; শ্ধ্ তাহাই নহে তাহাদের চৌম্বক অক্ষ সব সময়েই একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করে। স্তরাং পরিক্রমণ করিবার সময় আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জন্য গ্রহরা কখনও স্র্যের নিকটে আসিবে কখনও আবার স্র্য হইতে দ্রে সরিয়া যাইবে। দ্রত্বের এইর্প তারতম্যের জন্য তাহাদের গতিপথ হইবে উপবৃত্ত।

এই প্রকার জল্পনা-কল্পনা হইতে সম্ভবতঃ মহাকর্ষ সম্বন্ধেও কেপ্‌লার কিছ্ কিছ্ চিন্তা করিয়া থাকিবেন। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "বস্তুরা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে এক প্রকার স্নেহের আকর্ষণ বর্তমান; এই আকর্ষণবলে চুম্বকের মত তাহারা পরস্পরের সহিত মিলন-প্রয়াসী; একটি প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নীচে মাটিতে পড়ে প্থিবী তাহাকে আকর্ষণ করে বলিয়া।" তিনি আরও বলেন, মহাশ্ন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থাপিত দ্ইটি প্রস্তরখণ্ড পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় মিলিত হইবে। দ্রত্বের সহিত এই আকর্ষণের সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রে। এই স্ত্রের দ্বারা তিনি দেখান যে, গ্রহ স্র্যের নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতিও দ্রুততর হয়। স্তরাং অল্প দ্রত্বে anima motrix-এর প্রভাব বেশী এবং দ্রত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব কমিতে থাকে। কেপ্‌লার প্রথমে অন্মান

করিয়াছিলেন, এই প্রভাবের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাত হিসাবে (inversely as the square of the distance) সংঘটিত হইয়া থাকে। পরে তিনি এই মত পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, আকর্ষণের তীব্রতা শুধু দূরত্বের ব্যস্ত অনুপাত (inversely as the distance) অনুযায়ী বাড়ে বা কমে। ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ বুইয়ো কেপ্‌লারের উপরিউক্ত মত পরিবর্তনের বিরোধিতা করিয়া *Astronomia Philolaica* তে (প্যারী, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) লেখেন যে, তাঁহার প্রথমোক্ত অনুমানই ঠিক। নিউটন ঠিক এইরূপ অবস্থায় সমস্যাটি হাতে পাইয়াছিলেন।

কেপ্‌লারের জ্যোতিষীয় গবেষণার ভালমন্দ উভয় সমালোচনাই হইয়াছে। গ্রহ সংক্রান্ত তিনটি সূত্রের আবিষ্কর্তা ও রুডল্‌ফাইন জ্যোতিষীয় তালিকার প্রণেতা হিসাবে তাঁহার নাম জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু এই অতীব মূল্যবান গবেষণাগুলি তাঁহার ভুরি ভুরি রচনার ও গ্রন্থের অতি সামান্য অংশমাত্র। অধিকাংশ রচনাই তাঁহার নিছক কল্পনাপ্রসূত নানা উদ্ভট অনুমানের অযথা সম্প্রসারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে কেপ্‌লারকে কল্পনাবিলাসী ও মরমীবাদী বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। তারপর তিনি ছিলেন ফলিত জ্যোতিষে ও ভাগ্যগণনায় ঘোর বিশ্বাসী। তাঁহার অধিকাংশ রচনার বৈজ্ঞানিক মূল্য সত্য সত্যই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবার কথা। এজন্য কেহ কেহ এরূপ মন্তব্যও করিয়াছেন যে, গ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার সূত্রগুলির আবিষ্কার নিতান্তই আকস্মিক। হয়ত তাই। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, এই জাতীয় আকস্মিকতা কেবল মনীষা ও প্রতিভার ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)

Martyrs of Science গ্রন্থে ব্রুস্টার লিখিয়াছেন, প্রায় একই সময়ে টাইকো, কেপ্‌লার ও গ্যালিলিওর মত তিনজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর জ্যোতিষীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বাস্তবিকই আশ্চর্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৫৪ বৎসর বয়সে প্রাগে টাইকো যখন জ্যোতিষ্কদের পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, ৩০ বৎসরের কেপ্‌লার তখন মঙ্গল গ্রহের কক্ষা নির্ধারণে তাঁহার গাণিতিক প্রতিভা নিয়োগ করিতেছেন, আর ৩৬ বৎসরের গ্যালিলিও নক্ষত্রখচিত মহাশূন্যের রহস্যোদ্ঘাটনে নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সুনিপুণভাবে নির্মিত উচ্চাঙ্গের জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া টাইকো যে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাহার দ্বারা উত্তরকালে আধুনিক জ্যোতিষের বুনিয়াদ রচিত হইল; এই তথ্যের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ফলেই গ্রহ-পরিক্রমা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মাবলী আবিষ্কারের পরম সৌভাগ্য লাভ করিলেন কেপ্‌লার; এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নূতন জ্যোতিষ্কদের আবিষ্কার করিয়া ও নূতন নূতন ব্রহ্মাণ্ডলোকের সন্ধান দিয়া জ্যোতিষের ইতিহাসে অক্ষয় অবদান রাখিয়া গেলেন গ্যালিলিও।

গ্যালিলিও সম্বন্ধে শুধু এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। নানা জ্যোতিষীয় আবিষ্কারের দ্বারা তিনি একদিকে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল আধুনিক বলবিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞান। বস্তুর গতি ও স্থিতির প্রকৃত কারণ ও নিয়ম আবিষ্কার করিয়া এবং এ বিষয়ে দুই সহস্র বৎসরের সুপ্রাচীন ও নির্বিচারে স্বীকৃত অ্যারিস্টটলের মতবাদ ও শিক্ষাকে সর্বৈব ভুল প্রতিপন্ন করিয়া তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার গবেষণায় নিউটনের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ সুনিশ্চিত হইয়াছিল। গ্যালিলিও ও নিউটনের পদার্থবিদ্যার প্রয়োগেই কোপার্নিকাস-প্রস্তাবিত জ্যোতিষীয় বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতে পারিয়াছিল।

গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞানী। যে পরীক্ষার আদর্শের কথা রজার বেকন ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিতীয় মনোভাবের প্রতিকূল আবহাওয়ায় অস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন, রেণেশাঁসের সূচনায় যে আদর্শের কথা ফ্লোরেণ্টাইন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভেসালিয়াস, হার্ভি, গিলবার্ট প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের গবেষণায় যে আদর্শ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে মূর্ত হইয়া উঠে গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। তারপর কেবলমাত্র উদ্দেশ্যহীন পরীক্ষার দ্বারাও বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার সম্ভবপর নহে; পরীক্ষালব্ধ তথ্যের গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তবেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা, যত্নের সহিত সমস্যা বিশেষকে পৃথক করিয়া লইয়া তাহার সমাধানে মনঃসংযোগ। অত্যাশ্চর্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াও এই একাগ্রতার অভাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অধিক দিন অনুসরণ করিবার মত ধৈর্যের অভাবে লিওনার্দো তাঁহার প্রায় কোন গবেষণাকেই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে না পারায় এবং তথ্যের উন্নতি সাধনে অপারগ হওয়ায় কোপার্নিকাস তাঁহার যুগান্তকারী পরিকল্পনাকে নানা ভাবে জটিল ও দূষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং নিজের গবেষণায় যে কি বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। টাইকোর পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যহীন না হইলেও গাণিতিক জ্ঞানের অভাবে মূল জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। তত্ত্বীয় জ্ঞানে কেপ্‌লার গ্যালিলিও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু টাইকোর গ্রহ ও নক্ষত্র-তালিকা ব্যবহারের সুযোগ না পাইলে কেপ্‌লারের অপরিসীম গাণিতিক দক্ষতাও শেষ পর্যন্ত বৃথা যাইত কিনা কে জানে। তারপর এক লিওনার্দো ছাড়া ভেসালিয়াস, কোপার্নিকাস, টাইকো কিংবা কেপ্‌লার কেহই সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতীয় সংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন না। এই সংস্কার মাঝে মাঝে দুর্বল মুহূর্তে কেবলই তাঁহাদের পশ্চাতে টানিয়াছে। সেই দিক দিয়া গ্যালিলিও ছিলেন অতুলনীয়। অ্যারিস্টটল ও টলেমীর মতবাদের অসারতা যেদিন তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন সেদিন হইতে সনাতন পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষের সহিত চিরদিনের জন্য তাঁহার সম্পর্ক চুকিয়া গেল, জীর্ণ বস্ত্রের মত তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল। এমন কি পণ্ডিতীয় ভাবধারার প্রধান বাহন ল্যাটিন ভাষা পর্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিয়া পেত্রার্কার আদর্শে মাতৃভাষায় নিজের আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিলেন। অনাড়ম্বর সহজ সরল ভাষায় লিখিত গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক রচনা পড়িলে আজও মনে হইবে, ইহা যেন একালের কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর লেখা।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পিসায় গ্যালিলিও গ্যালিলি জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক ঐদিন রোমে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মিকেলাঞ্জেলো মৃত্যুশয্যায়। ইতালীয় প্রতিভার যে গৌরব-পতাকা এতদিন তাহার ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প বহন করিয়া আসিতেছিল তাহা যেন ঐদিন বিজ্ঞানের হাতে সমর্পিত হইল। গ্যালিলিওর পিতা ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলি ফ্লোরেন্সের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গণিতে ও সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; সঙ্গীত সম্বন্ধীয় এক পুস্তকে তাঁহার যথেষ্ট নির্ভীকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতার এই নির্ভীকতা ও ব্যক্তিত্ব পুত্রের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই গ্যালিলিওর বিদ্যোৎসাহিতার নানা পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতায়, চিত্রাঙ্কনে ও বাদ্যযন্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দান্তে, তাসো ও আরিওস্তো পড়িতে তিনি ভালবাসিতেন এবং ইঁহাদের কবিতার উপর তিনি কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ভিন্সেঞ্জিও পুত্রের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় পাইয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে। পদমর্যাদা ছাড়া চিকিৎসা-বৃত্তি তখনকার দিনে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। এমন কি অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও চিকিৎসাবিদ্যার এবং গণিত ও দর্শনের অধ্যাপকের বেতনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

প্রথমোক্ত অধ্যাপকের বার্ষিক বেতন ছিল ২০০০ স্কুদি (scudi) এবং শেষোক্ত অধ্যাপকের বেতন মাত্র ৬০ স্কুদি। এজন্য নিজে গণিতজ্ঞ হইয়াও ভিন্সেঞ্জিও পুত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে উৎসাহিত করেন। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা গ্যালিলিওর বেশী দিন ভাল লাগে নাই। কথিত আছে, তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস ফাঁকি দিয়া গণিতের ক্লাসের দরজার বাহির হইতে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতেন এবং ক্লাস ভাঙ্গিলে শিক্ষক কি পড়াইয়া গেলেন তাহা আরও বিশদভাবে শুনিবার জন্য ছাত্রদের পীড়াপীড়ি করিতেন। তাঁহার গণিত শিখিবার এইরূপ আগ্রহের সংবাদ পাইয়া গণিতের অধ্যাপক গ্যালিলিওকে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস হইতে ছাড়াইয়া গণিতের ক্লাসে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যায় আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক গণিতজ্ঞদের গ্রন্থরাজি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করেন। অল্পবয়সে এইরূপ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে গ্যালিলিও তিন বৎসরের জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

দোলকের ধর্ম আবিষ্কার : গণিত ও পদার্থবিদ্যার তত্ত্বীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার ব্যাপারে তাঁহার যেমন উৎসাহ দেখা যায়, সেইরূপ পুস্তকে বর্ণিত নিয়ম ও নীতির অভ্রান্ততা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করিবার আগ্রহও তাঁহার মধ্যে অতি অল্প বয়স হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে পিসার গির্জাভ্যন্তরে একটি ঝুলানো প্রদীপের দোলন সম্বন্ধে কুতূহলী হইয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, এই দোলনের আয়াম বা বিস্তার (amplitude) যাহাই হোক না কেন প্রদীপটির দোলন-কাল (period) সর্বদা অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইতেছে। গ্যালিলিওর কাছে অবশ্য কোন ঘড়ি ছিল না। তিনি নাড়ীর স্পন্দনকে ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করিয়া দোদুল্যমান প্রদীপের আয়াম ও দোলন-কালের সম্পর্কহীনতা সম্বন্ধে নিঃশয় হন। পরে অবশ্য এই সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, কোন সুতার অগ্রভাগে একটি ভারী বস্তু বাঁধিয়া তাহা দোলাইলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায় এবং দোলন-কাল নির্ভর করে কেবলমাত্র সুতার দৈর্ঘ্যের উপর, ঝুলানো ওজনের মাত্রার উপর নহে। গ্যালিলিওর প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে; এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল উদস্থিতীয় তুলাদণ্ড (hydrostatic balance)।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা-জীবন : পিসায় অধ্যাপনার কার্যে গ্যালিলিও শীঘ্রই সুনাম অর্জন করেন। এই সময়ে বলবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার নানা গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন উচ্চতা হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে অথবা নত সমতলের (inclined plane) উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িবার সময় বিভিন্ন বস্তুর গতিবেগ কিরূপ হয়, বেগ, উচ্চতা, বস্তুর ওজন, নত সমতলের কোণ ইত্যাদির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি বহু পরীক্ষা সম্পাদন করেন। গ্যালিলিওর বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কথা অন্যত্র আলোচিত হইবে। এইসব পরীক্ষা হইতে তিনি দেখান যে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বস্তুর গতি সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ভুল। নির্দিষ্ট উচ্চতা হইতে বিভিন্ন ওজনের দুইটি বস্তু নিক্ষিপ্ত হইলে ভারী বস্তুটি হালকা বস্তু অপেক্ষা দ্রুত গতিতে নীচের দিকে পড়িতে থাকিবে এবং সর্বাগ্রে ভূমি স্পর্শ করিবে, অ্যারিস্টটল এইরূপ মত পোষণ করিতেন। দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এই মতই গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল। গ্যালিলিও দেখাইলেন, এরূপ পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগ তাহার ওজনের উপর একেবারেই নির্ভর করে না, ভারী ও লঘু সব বস্তুই সমান বেগে নীচের দিকে পড়ে এবং এক সঙ্গেই ভূমি স্পর্শ করে। পিসার অ্যারিস্টটলপন্থী অধ্যাপকদের ভুল ভাঙ্গিবার জন্য তিনি একদিন সেখানকার বিখ্যাত হেলান মিনারের উপর হইতে ১০০ পাউন্ড ও ১ পাউন্ড ওজনের দুইটি প্রস্তরখণ্ড একসঙ্গে নীচের দিকে ছাড়িয়া দিলেন; প্রস্তর দুইটি একসঙ্গে নামিয়া আসিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। "The simultaneous clang of these two weights sounded the death

Devot.mo et Obblig.mo Ser.re
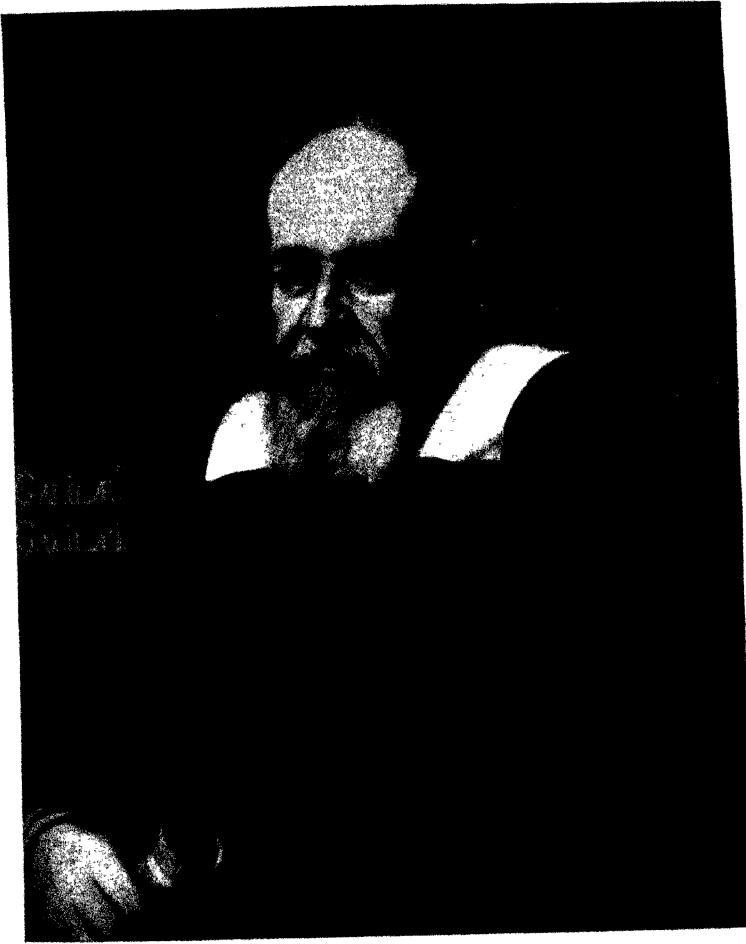
Galileo Galilej

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)।

By kind permission of the Bodleian Library, Oxford.

PLATE XIV
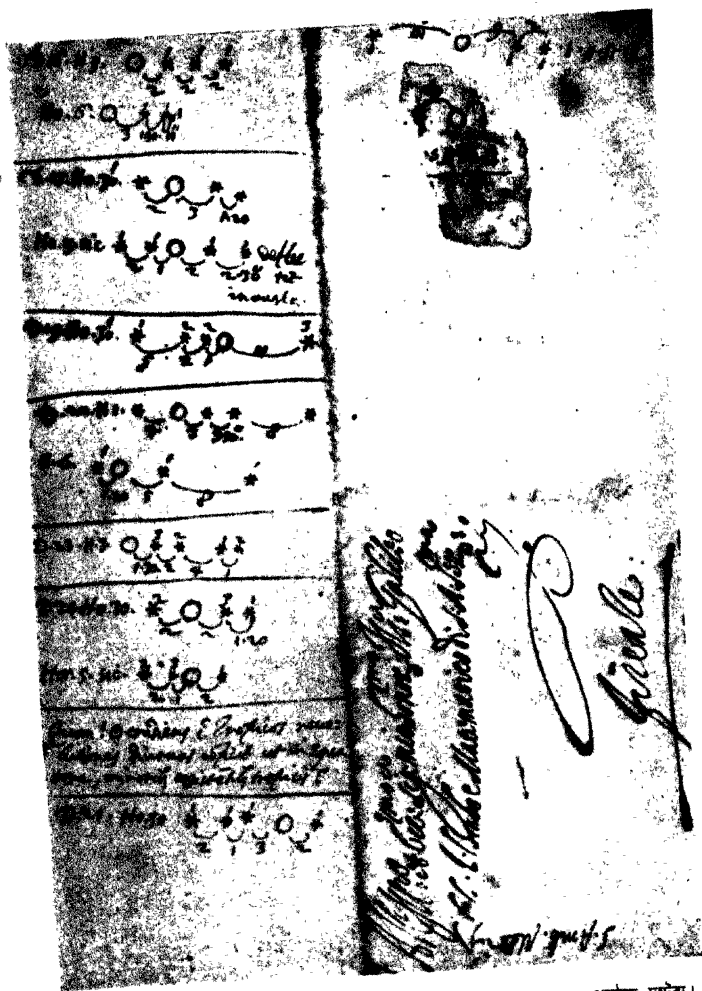
বৃহস্পতির উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে গ্যালিলিওর নিজস্ব অঙ্কন। ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
(*Scientific American*, August, 1949).

knell of the old system of philosophy, and heralded the birth of the new" * অর্থাৎ একসঙ্গে সশব্দে ওজন দুইটির ভূমি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দর্শনের মৃত্যুঘণ্টা যেন বাজিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে ঘোষিত হইল নূতন দর্শনের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু গ্যালিলিও যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হয় নাই। এই পরীক্ষার দ্বারা নিজেদের ভুল বুঝা ত দূরের কথা, প্রামাণিক গ্রন্থ ঘাঁটিয়া ও প্রথিতযশা প্রাচীন দার্শনিকদের উক্তি ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রথমে অ্যারিস্টটলপন্থী অধ্যাপকগণ গ্যালিলিওর পরীক্ষা ও মতবাদ সব কিছুই অসার বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারায় এই তরুণ অধ্যাপকের উপর তাঁহারা একযোগে বিরক্ত হইলেন এবং সব শেষে প্রাচীন মনীষী ও দার্শনিকগণের শিক্ষায় ও মতবাদে অনাস্থা প্রকাশের জন্য তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ দূষিত আবহাওয়ায় গ্যালিলিওর অধ্যাপনা ও গবেষণাও ধীরে ধীরে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় তিন বৎসরের চুক্তিপত্রের মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বেই তিনি পিসা পরিত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক : এই সময়ে গ্যালিলিওর জীবনে এক আশাতীত সুযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার এক বন্ধুর চেষ্টায় তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বৎসরের জন্য গণিতের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদের বেতনও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বিপুল আশা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লইয়া গ্যালিলিও পাদুয়ায় অধ্যাপনা ও গবেষণার কার্যে যোগদান করেন ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের সুবর্ণ অধ্যায় এই সময় হইতেই সুরু হয়। অধ্যাপনায় পূর্বেই তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। পাদুয়ায় আসিবার পর এই খ্যাতি আরও ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার ছাত্রসংখ্যাও দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিল। ছাত্রদের জন্য তিনি বলবিদ্যা, সূর্যঘড়ি, দুর্গপ্রাকারাদি সুরক্ষিত করিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে টুক্‌রা টুক্‌রা অনেক প্রবন্ধ ও নোট রচনা করেন। বহুদিন পর্যন্ত এইসব নোটের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রচনাগুলি আবিষ্কৃত হইলে তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।

পাদুয়ায় অবস্থানকালেই গ্যালিলিওর জ্যোতিষীয় গবেষণার সূত্রপাত। নূতন নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগ ও তাহার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের অসমতা নিরীক্ষণ, বহু নূতন নক্ষত্রের ও নীহারিকার আবিষ্কার, ছায়াপথের স্বরূপ নির্ণয়, বৃহস্পতির উপগ্রহদের আবিষ্কার, শনির চাকা সম্বন্ধে গবেষণা এবং এইসব আবিষ্কারের ভিত্তিতে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সমর্থন ইত্যাদি জ্যোতিষীয় গবেষণা তাঁহার পাদুয়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল। গ্যালিলিও ঠিক কোন সময় হইতে টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের বহু বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ প্রথম জীবনেই এই অভিনব মতবাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কেপ্‌লারের সদ্য প্রকাশিত নূতন গ্রন্থ *Mysterium Cosmographicum*-এর একটি প্রতিলিপি উপহার স্বরূপ লাভ করিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে তিনি যে পত্র লেখেন (১৫৯৭) তাহাতে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। গ্যালিলিও কেপ্‌লারকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"আদ্যোপান্ত আপনার গ্রন্থ আমি পড়িব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার বহু অংশ আমাকে চমৎকৃত করিবে। ইহা আমি আরও আনন্দের সহিত করিব এই কারণে যে, বহু বৎসর যাবৎ আমি নিজে কোপার্নিকাসের পরিকল্পনায় আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছি।

* Sir Oliver Lodge, *Pioneers of Science,* Macmillan, 1910 ; p. 90.

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে এই পরিকল্পনায় বহু প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, যাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এই শেষোক্ত পরিকল্পনার অসংগতি ও ত্রুটী প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি বহু যুক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে আমি ভরসা পাইতেছি না। আপনার মত আরও অনেক ব্যক্তি থাকিলে আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে আমি নিশ্চয়ই সাহস পাইতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে বলিয়া এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে বিরত রহিয়াছি।"

কেপ্‌লার এই যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্য গ্যালিলিওকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অ্যারিস্টটলপন্থীদের তীব্র বিরুদ্ধতার আশঙ্কায় গ্যালিলিও এই বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন। পাদুয়ায় তিনি সবেমাত্র নিযুক্ত হইয়াছেন, চাকরির স্থায়িত্ব অনিশ্চিত; এই অবস্থায় পণ্ডিত মহলে শত্রুতার সৃষ্টি করা সমীচীন হইত না। তারপর কোপার্নিকাসের পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধর্মসংস্থা ধীরে ধীরে কঠিন ও প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করিতেছিল। কেপ্‌লারকে লিখিত পত্রের তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারই স্বজাতি জিওর্দানো ব্রুনোকে কোপার্নিকাসে আস্থা স্থাপন ও অন্যান্য ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারের অপরাধে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। এরূপ সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহাতে গ্যালিলিওর পক্ষে নীরব থাকা আর সম্ভব হয় নাই। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাবে জ্যোতির্বিদ্ মহলে যে চাঞ্চল্যের ও বিতর্কের সৃষ্টি হয় গ্যালিলিও তাহাতে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নূতন নক্ষত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে কোপার্নিকাসের মতবাদের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির কথা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর হইতে বহু জ্যোতিষীয় আবিষ্কার ও আলোচনা উপলক্ষে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া ও শেষ পর্যন্ত দুই ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Dialogues on the Ptolemaic and Copernican Systems* প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা পরে বলিতেছি।

গ্যালিলিও পাদুয়ায় দীর্ঘ আঠার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেষের দিকে গবেষণার চাপ ও আবিষ্কারের নেশা বৃদ্ধি পাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একঘেয়ে অথচ বাধ্যতামূলক অধ্যাপনার কাজ তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অধ্যাপনার দায়মুক্ত হইয়া শুধু গবেষণা-কার্যে যাহাতে সকল সময় অতিবাহিত করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি এক প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ইহাতে সম্মত হয় নাই। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া এবং শুধু গবেষণা লইয়া থাকিতে পারেন এইরূপ একটি পদ প্রার্থনা করিয়া ফ্লোরেন্সের তরুণ কসিমো দি মেদিচির সহিত তিনি কয়েকবার পত্রালাপ করিয়াছিলেন। কসিমো গ্যালিলিওর নিকট কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এই দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কসিমোর চেষ্টায় ফ্লোরেন্সে এইরূপ এক পদ প্রাপ্ত হইয়া গ্যালিলিও ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পাদুয়া পরিত্যাগ করেন। গ্যালিলিওর ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, জীবনে তিনি মারাত্মক যেসব ভুল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পাদুয়া পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রধানতম। স্বাধীন ভেনিসীয় সাধারণতন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পোপের খাস এলাকা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার প্রধান কেন্দ্র সংরক্ষণশীল তাস্কানিতে জানিয়া শুনিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। গ্যালিলিওর জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্বে তাঁহার প্রধান কয়েকটি জ্যোতিষীয় আবিষ্কার ও গবেষণার কথা আলোচনা করা উচিত হইবে।

জ্যোতিষীয় গবেষণা

সার্পেন্টারিয়াস তারামণ্ডলের নূতন নক্ষত্র : সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষে গ্যালিলিওর আনুগত্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে কেপ্‌লারকে লিখিত পত্রের বহুপূর্বেই

তিনি কোপার্নিকাসের মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্পেন্টারিয়াস তারামণ্ডলে একটি নূতন নক্ষত্রের বা নোভার আবির্ভাবের পূর্বে গ্যালিলিওর উল্লেখযোগ্য কোন জ্যোতিষীয় গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই নূতন নক্ষত্রটির প্রতি কেপ্লারেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই ক্ষণস্থায়ী নূতন জ্যোতিষ্কটি যে স্থির নাক্ষত্র গোলকের অন্তর্গত, উভয় বিজ্ঞানীই নিঃসংশয়ে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে যে নূতন নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও টাইকো ব্রাহে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটল ও টলেমীর জ্যোতিষ অনুযায়ী নাক্ষত্র গোলকের কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর নহে; নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব অথবা পুরাতন কোন নক্ষত্রের লয় এই জ্যোতিষ্কলোকে অসম্ভব। একমাত্র পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী নভোমণ্ডলে (sublunary sphere) এই জাতীয় পরিবর্তন সম্ভবপর। সুতরাং নোভার আবিষ্কারে অ্যারিষ্টটলপন্থী জ্যোতির্বিদ্ ও দার্শনিকগণ উপরিউক্ত যুক্তিতর্ক অবতারণার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, নূতন নক্ষত্রটি নাক্ষত্র গোলকের অধিবাসী নহে। গ্যালিলিও ও কেপ্লার এই বিতর্কে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন, ইহা নাক্ষত্র গোলকেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এইরূপ ঘটনার দ্বারা প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদের অসঙ্গতিই সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্যালিলিও প্রথম প্রকাশ্যভাবে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার : দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবশ্য গ্যালিলিওর প্রাপ্য নহে। তবে এইরূপ একটি আবিষ্কারের কথা শুনিয়া স্বাধীনভাবে এবং উন্নত ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের ও এই যন্ত্রের সার্থক জ্যোতিষীয় প্রয়োগের কৃতিত্ব অবশ্যই গ্যালিলিওর প্রাপ্য। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ চশমা-নির্মাতা লিপেরশাইম তাঁহার নির্মিত এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন এবং সেই বৎসরই এই অদ্ভুত কাচনির্মিত যন্ত্রের কথা গ্যালিলিওর নিকট পেঁৗছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে লিপেরশাইমের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বিতর্কমূলক। একাধিক লেন্সের সমন্বয়ে বিপুলদর্শক যন্ত্রের উল্লেখ রজার বেকনের রচনায় পাওয়া যায়। ইংরেজ লিওনার্ড ডিগ্স্ (মৃত্যু—১৫৭১) সম্ভবতঃ একপ্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তা নামে জনৈক ইতালীয় চশমা-নির্মাতা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। লিপেরশাইম সম্ভবতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম নির্মাতা নহেন, তিনি ইহাকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার প্রচেষ্টার পর হইতেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয় এবং ইহার কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। লিপেরশাইম একটি নল বা চোঙের মধ্যে একটি উত্তল (convex) ও আর একটি অবতল (concave) লেন্স স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা দূরবর্তী বস্তুকে আসল দূরত্বের এক-তৃতীয়াংশ দূরত্বে এবং প্রায় নয় গুণ বড় করিয়া দেখা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ওলন্দাজ আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া গ্যালিলিও নিজেই এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণে কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার এক রচনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রায় দশ মাস পূর্বে আমার কাছে সংবাদ পেঁৗছে যে, জনৈক ওলন্দাজ চশমা-নির্মাতা এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার দ্বারা দূরবর্তী বস্তুদের নিকটবর্তী বস্তুর মত স্পষ্ট দেখা যায়। এই খবর পাইবামাত্র আমি নিজে কিভাবে এইরূপ এক যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আলোকবিদ্যার সূত্র ও নীতিগুলি তলাইয়া দেখিতে গিয়া একটি নলের দুই মুখে একদিক সমতল এইরূপ একটি উত্তল ও আর একটি অবতল লেন্স স্থাপন করিবার ধারণা আমার মাথায় আসে। শেষোক্ত লেন্সের নিকট চক্ষু রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে বস্তুসকল মনে হইল যেন প্রকৃত দূরত্বের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দূরে অবস্থিত এবং প্রায় নয়গুণ বৃহত্তর।"

শীঘ্রই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নানা উন্নতি সাধন করিয়া দূরবর্তী বস্তুদের অন্ততঃ ৩০ গুণ বড় করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা হইল। কাল বিলম্ব না করিয়া গ্যালিলিও তাঁহার এই অভিনব বিপুলদর্শক কাচ-যন্ত্রটিকে জ্যোতিষ্কলোকের রহস্যভেদে নিয়োজিত করিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা যে জ্যোতিষীয় গবেষণার সহায়ক হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এই কার্যে গ্যালিলিও ছাড়া আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীর তৎপরতা বিশেষ
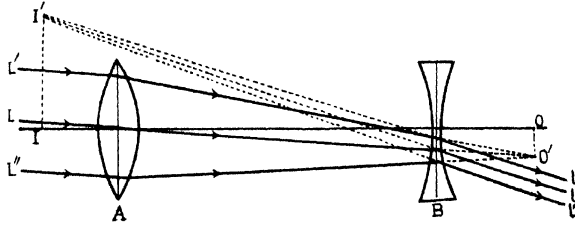
৫৪। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ গণিতজ্ঞ টমাস হ্যারিয়ট (১৫৬০-১৬২১) এবং জার্মানীতে সাইমন ম্যারিয়াস (১৫৭০-১৬২৪) সম্ভবতঃ গ্যালিলিওর কিছু পূর্বেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের অবলোকন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই সত্যকারের গবেষণার উদ্দেশ্য লইয়া ধৈর্য ও নিষ্ঠার সহিত জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের কার্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে ব্যবহার করেন নাই। এজন্য জ্যোতিষীয় গবেষণায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগের প্রকৃত গুরুত্ব গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

চন্দ্র কলঙ্কের কারণ আবিষ্কার : দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের প্রথম পর্যবেক্ষণের ফল *Sidereus Nuncius* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় (প্রকাশ-কাল ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ)।
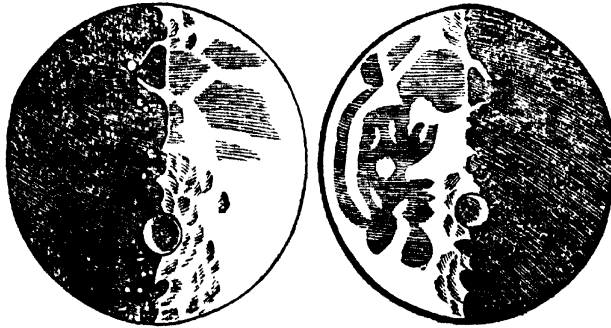
৫৫। চন্দ্রপৃষ্ঠ—গ্যালিলিওর অঙ্কন; *Sidereus Nuncius* হইতে।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক চন্দ্রের পৃষ্ঠে নানা প্রকার অসমতা, ছোট বড় অনেক দাগ ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়। ভূপৃষ্ঠের ন্যায় চন্দ্রের উপরিভাগও যে পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, নদী, গহ্বর, জলাশয় প্রভৃতির দ্বারা গঠিত গ্যালিলিও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এমন কি চন্দ্রের কয়েকটি পাহাড়ের উচ্চতাও তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ

যন্ত্রে বড় বড় কাল দাগ দেখিয়া তিনি তাহাদের সমুদ্র মনে করিয়াছিলেন, পরে অবশ্য এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছিল। প্রাচীন জ্যোতিষীয় ধারণা অনুযায়ী চন্দ্রকে একটি নির্দোষ স্বর্গীয় গোলক মনে করা হইত, ইহার পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই সমতল। চন্দ্রের কাল দাগ জ্যোতির্বিদ্‌গণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠের মতই অসমতল; শুধু তাহাই নহে স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া ইহার পক্ষে যেসব বিশেষ গুণ এতদিন দাবী করা হইয়াছিল তাহা অলীক। গ্যালিলিও আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন, পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে যেমন উজ্জ্বল দেখায় চন্দ্র হইতে পৃথিবীকে দেখা সম্ভবপর হইলে সূর্যালোক প্রতিফলনের জন্য পৃথিবীকেও অনুরূপ উজ্জ্বল দেখাইত। পৃথিবীকে গ্রহ মনে করিবার বিরুদ্ধে কোপার্নিকাস-বিরোধীদের প্রধান যুক্তি ছিল, গ্রহদের মত পৃথিবীর কোন দ্যুতি নাই। চন্দ্র পৃথিবীরই যে একটি ছোট সংস্করণ মাত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাহা প্রমাণ করিয়া এবং পৃথিবীর দ্যুতির সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইহাকে গ্রহ মনে করিতে কোপার্নিকাস-বিরোধীদের যে আপত্তি ছিল তাহা তিনি খণ্ডন করিলেন।

ছায়াপথ, যুগ্মনক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা : খালি চোখে অদৃশ্য অসংখ্য নক্ষত্রের অস্তিত্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়িল। কৃত্তিকা (Pleiades) তারামণ্ডলে খালি চোখে মাত্র ৬টি নক্ষত্র দেখা যায়; গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করিলেন ৩৬টি নক্ষত্র। যে ছায়াপথের (Milky Way) রহস্য এতদিন দুর্বোধ্য ছিল তিনি দেখাইলেন তাহা অসংখ্য ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রসমষ্টি। যুগ্ম-নক্ষত্র (double star), নক্ষত্রপুঞ্জ (star clusters) এবং কয়েকটি নীহারিকা তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার : দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা গ্যালিলিওর প্রথম পর্যায়ের আবিষ্কারগুলির মধ্যে বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর। ১৬১০
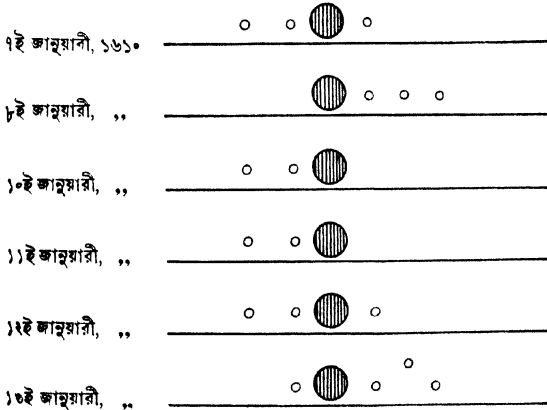
৫৬। বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার।

খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তিনি দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতিকে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় এই গ্রহের কাছে তিনটি জ্যোতিষ্ক দেখিতে পান। গ্রহের এত কাছে এইরূপ তিনটি জ্যোতিষ্ক দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং পরের দিন রাত্রিকালে তিনি আবার বৃহস্পতিকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, এক দিনের মধ্যেই এই জ্যোতিষ্কদের স্থান-

পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জ্যোতিষ্ক তিনটি আসল নক্ষত্র হইলে শুধু বৃহস্পতির গতির জন্য ইহাদের এইরূপ স্থান-পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। গ্যালিলিওর সন্দেহ হইল, হয়ত ইহারা নূতন গ্রহ, বৃহস্পতিকে পরিক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের স্থান-পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে। দুই দিন বাদ দিয়া ১০ই জানুয়ারী আবার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, সেই রাত্রে উপরিউক্ত জ্যোতিষ্কদের সংখ্যা কমিয়া দুইটিতে দাঁড়াইয়াছে। পরের রাত্রিতেও তিনি মাত্র দুইটি বস্তু দেখিলেন; তার পরের রাত্রিতে আবার তিনটি এবং তার পরের রাত্রিতে ১৩ই জানুয়ারী তিনি বৃহস্পতির নিকট চারিটি জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করিলেন (৫৬নং চিত্র)। ইহার পর গ্যালিলিও চোখে দূরবীন কষিয়া বহু রাত্রি বৃহস্পতির নিকটবর্তী এই জ্যোতিষ্কদের নজরবন্দী রাখিয়াছিলেন; কিন্তু চারিটির অধিক জ্যোতিষ্ক দেখিতে পান নাই। গ্যালিলিও নির্ভুলভাবে ইহাদের বৃহস্পতির গ্রহ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী কসিমো দি মেদিচির নামে ইহাদের নামকরণ করিলেন 'মেদিচি গ্রহ'। কেপ্‌লার প্রথম ইহাদের উপগ্রহ নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কারে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্করা একমাত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া শূন্যে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া থাকে, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের এরূপ মতবাদ সত্য নহে। পৃথিবী ছাড়াও অন্যান্য গ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নৈসর্গিক বস্তুরা বৃত্তাকারে ঘুরিতে পারে। কোপার্নিকাস পৃথিবীর গতির কথা প্রস্তাব করায় প্রাচীনপন্থী জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে অনেকে বলিয়াছিলেন, গতিশীল পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র তবে কিরূপে পরিক্রমণ করিবে? চন্দ্রের ত পিছনে পড়িয়া থাকিবার কথা? গ্যালিলিওর আবিষ্কারে তাঁহাদের সেই আপত্তি ভাসিয়া গেল। পরিক্রমণরত বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করিয়া একটি নয় চার চারিটি উপগ্রহ সমানে আবর্তিত হইতেছে, পিছনে পড়িয়া যাইতেছে না, বৃহস্পতিকে ঠিক আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সঙ্গে মহাশূন্য পরিক্রমণ করিতেছে। সুতরাং পরিক্রমণরত পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রের চক্রাকার গতিই বা সম্ভব হইবে না কেন? এইভাবে গ্যালিলিওর আবিষ্কার পরোক্ষভাবে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সমর্থন জোগাইল।

গ্যালিলিওর আবিষ্কারকে ভুল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। মার্টিন হর্কি নামে এক জার্মান জ্যোতির্বিদ্ একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, আলোকের প্রতিফলন ও নানাপ্রকার বিকৃতির জন্য এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। বৃহস্পতির উপগ্রহ বলিয়া গ্যালিলিও যেসব জ্যোতিষ্কদের দেখিয়াছেন আসলে তাহা তাঁহার দৃষ্টিভ্রম মাত্র।

এইসব প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গ্যালিলিওর আবিষ্কারকে বেশী দিন অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই এবং ধীরে ধীরে সকলেই ইহা মানিয়া লইল। প্রতিপক্ষের তখন চেষ্টা হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুদ্ধেই তাঁহাকে পরাস্ত করা। শাইনার ঘোষণা করিলেন, তিনি বৃহস্পতির পাঁচটি উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন; রাইটার জানাইলেন নয়টি; কেহ কেহ বারোটি পর্যন্ত উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের কথা প্রকাশ করিলেন!

শনির চাকা, শুক্রকলা : ১৬১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পাদুয়া পরিত্যাগের কিছু পূর্বে গ্যালিলিও শনির চাকা আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন, শনি গ্রহ যেন তিনটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু এই বিভক্তি তিনি দ্বিতীয় বার লক্ষ্য করিতে যাইয়া ব্যর্থ হন। এইজন্য শনির চাকার রহস্য শেষ পর্যন্ত তিনি ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। গ্যালিলিওর সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে উন্নততর পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর ছিল না। শনির চাকার রহস্য সমাধান করেন ক্রিশ্চিয়ান হাইজেন্‌স্ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে। শনির চাকার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার শুক্রকলা। শুক্রের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অবশ্য ইতিপূর্বেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রের মত ইহার আকৃতিরও যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহা গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন। একশত বৎসর পূর্বে কোপার্নিকাস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, মানুষের দৃষ্টিশক্তি কোনরূপে বাড়ানো সম্ভবপর হইলে চন্দ্রের ন্যায় বুধ ও শুক্রের কলা (phase) দেখা যাইবে। গ্যালিলিও

কোপার্নিকাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত করিলেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এই যে, শুক্রও চন্দ্রের মত একটি নিরেট দ্যুতিহীন বস্তু, সূর্যালোকেই ইহা ভাস্বর দেখায়; সুতরাং শুক্র ও চন্দ্রের মত পৃথিবী একই পর্যায়ের নৈসর্গিক বস্তু। সাফল্যের পথে কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ আর এক ধাপ অগ্রসর হইল।

সৌর কলঙ্ক ও সৌরাবর্তন : তারপর সৌর কলঙ্কের আবিষ্কার। ১৬১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম সূর্যে কতকগুলি কাল দাগ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু ১৬১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের পূর্বে এই আবিষ্কারের কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে হ্যারিয়ট, হল্যাণ্ডে জন ফ্যাব্রিসিয়াস ও জার্মানীতে শাইনার স্বাধীনভাবে সৌর কলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন, এবং তাঁহাদের এই আবিষ্কারের কথা গ্যালিলিওর আগেই প্রকাশিত হয়। এজন্য সৌর কলঙ্ক আবিষ্কারের কৃতিত্ব গ্যালিলিও, হ্যারিয়ট, ফ্যাব্রিসিয়াস ও শাইনার প্রত্যেকেরই আংশিকভাবে প্রাপ্য। ইঁহাদেরও পূর্বে কেহ কেহ খালি চোখে সৌর কলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তখন ধারণা ছিল, বুধ গ্রহ সূর্যের সম্মুখ দিয়া যাইবার জন্য সূর্যের চাকতির উপর তাহার যে ছায়া পড়ে তজ্জন্য এরূপ কাল দাগ দেখা যায়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *De maculis in sole observatis* গ্রন্থে ফ্যাব্রিসিয়াস লিখিয়াছেন, হঠাৎ একদিন সূর্যের উপর এক কাল দাগ লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ ইহা কোন মেঘ হইবে। পরের দিন প্রভাতে সূর্যের গায়ে তিনি আবার সেই কাল দাগ দেখিলেন; এইবার ইহা কিছুটা সরিয়া গিয়াছে। ইহার তিন দিন পরে তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সেই দাগ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে আরও অনেকটা সরিয়া গিয়াছে এবং কাল দাগটি সর্বপ্রথম যেখানে দেখিয়াছিলেন সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি দাগ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তারপর বড় কাল দাগটি সূর্যের দেহের পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হইল এবং দশ দিন
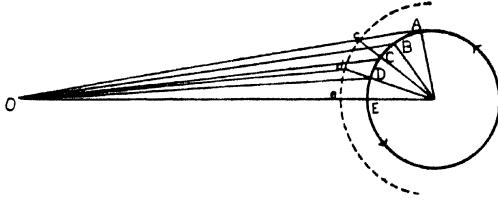
৫৭। গ্যালিলিও কর্তৃক সৌর কলঙ্কের ব্যাখ্যা।

পর ইহাকে আবার পূর্ব প্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা গেল। ফ্যাব্রিসিয়াস প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন, এই দাগ সূর্যপৃষ্ঠে অবস্থিত, কোন কাল মেঘ বা অনুরূপ কোন অস্বচ্ছ গ্রহের সূর্যের সম্মুখ দিয়া যাইবার জন্য ইহার উৎপত্তি নহে।

শাইনার জার্মানী হইতে এই কাল দাগ পর্যবেক্ষণ করেন ১৬১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। প্রথমে এই পর্যবেক্ষণকে তিনি দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আটটি বিভিন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াও যখন সেই একই কাল দাগ নিরীক্ষণ করিলেন তখন ইহাদের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর তাঁহার সংশয় রহিল না। তবে দাগগুলি যে সৌর পৃষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত, শাইনার এই অভিমত সমর্থন করেন নাই। সূর্যের অতি নিকটবর্তী ভ্রাম্যমাণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের জন্য এইরূপ দাগ দৃষ্ট হয়, এই ধরনের এক ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করিয়াছিলেন।

এই রহস্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন গ্যালিলিও। পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে সৌর কলঙ্কের গতির কথা বলা হইয়াছে। এই গতির একটি বিশেষত্ব এই যে, সূর্যের মাঝখান দিয়া যাইবার সময় ইহাদের বেগ দ্রুততর হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্যের প্রান্তভাগের দিকে অগ্রসর

হইবার সময় ইহাদের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। জ্যামিতির প্রয়োগ করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে, সৌর কলঙ্কের অবস্থিতি সূর্যপৃষ্ঠের উপর। মনে করা যাক $ABCDE$ সূর্যের গোলক, $e\ d\ c$ সূর্যের কিছু দূরে অবস্থিত একটি বৃত্তপথ এবং O বিন্দুতে পর্যবেক্ষকের অবস্থিতি। A, B, C, D, E ও e, d, c বিন্দুগুলির দূরত্ব পার্শ্ববর্তী বিন্দু হইতে সমান। এখন উপরিউক্ত কাল দাগ যদি সত্যই সূর্যের উপরে থাকে তাহা হইলে ইহা E বিন্দু হইতে D, C, B ও A বিন্দুতে যাইবার সময় পর্যবেক্ষকের চোখে যথাক্রমে $\angle EOD, \angle DOC, \angle COB$ ও $\angle BOA$ কোণ উৎপন্ন করিবে। প্রথম দুইটি কোণ প্রায় একরূপ, কিন্তু শেষের কোণ দুইটি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সৌর কলঙ্ক সূর্যের প্রান্তের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে পর্যবেক্ষকের নিকট মনে হইবে ইহার বেগ যেন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে $e\ d\ c$ বহির্বৃত্ত পথে কোন গ্রহের পরিক্রমণের জন্য সূর্যের দেহাংশ ঢাকা পড়িয়া এইরূপ কলঙ্কের সৃষ্টি হইলে, এই গ্রহ যখন e হইতে d ও c বিন্দুতে অগ্রসর হইবে, পর্যবেক্ষকের চোখে তখন যথাক্রমে $\angle eod$ ও $\angle doc$ কোণ উৎপন্ন হইবে। ৫৭নং রেখাঙ্কনের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে $\angle eod$ ও $\angle doc$ কোণের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। এই শেষোক্ত কারণ সত্য হইলে পর্যবেক্ষকের পক্ষে সৌর কলঙ্কের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই গতির যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায় তাহাতে একমাত্র আগেকার ব্যাখ্যাই সমর্থনযোগ্য।

ক্রমশঃ গ্যালিলিওর ব্যাখ্যাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এই গবেষণা হইতে পরবর্তী-কালে সূর্যের আবর্তনকাল ও বিষুবের অবস্থিতি নির্ণীত হইয়াছিল।

গ্যালিলিওর গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিষ্কার ও গবেষণা মোটামুটি আলোচিত হইল। এইসব আবিষ্কারের সবগুলিই ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁহার বৈজ্ঞানিক তৎপরতা অব্যাহত ছিল। এই সময় হইতে রোমের খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সহিত তাঁহার বিরোধ তীব্রতর আকার ধারণ করায় এবং জ্যোতিষীয় মতবাদ প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতা গুরুতরভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই নীরব থাকিতে অথবা অতীব সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইয়াছিল। তথাপি এই সময়েই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Diologue concerning the two systems of the world, the Ptolemaic and the Copernican* (প্রকাশ-কাল ১৬৩২) লিপিবদ্ধ করেন। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যে তিনখানি গ্রন্থ এপর্যন্ত লিখিত হইয়াছে গ্যালিলিওর *Dialogue* তন্মধ্যে একটি; আর দুইটি গ্রন্থ হইল কোপার্নিকাসের *De revolutionibus* ও নিউটনের *Principia*। এই তিনখানির মধ্যে রচনা-চাতুর্যে ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে *Dialogue* অদ্বিতীয়।* এই গ্রন্থই গ্যালিলিওর কাল হইয়াছিল। সে কথা একটু পরেই বলিতেছি।

ধূমকেতু সম্বন্ধে লিখিত *Il Saggiatore* ইহার কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয় (১৬২৩)। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিসাবে গ্যালিলিওর অন্যান্য রচনা হইতে ইহা নিকৃষ্ট হইলেও রচনা ও যুক্তি-বিন্যাসের দিক হইতে ইহা গ্যালিলিওর খ্যাতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল। পোপ অষ্টম উর্বানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয়, এবং এই গ্রন্থপাঠে পোপ এইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আহারের সময় ইহা তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিয়া শুনানো হইত।

দেশান্তর নির্ণয়ে জ্যোতিষীয় জ্ঞানের প্রয়োগ গ্যালিলিওর আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। পূর্বাকালে ও মধ্যযুগে চন্দ্রের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে এই গ্রহণের স্থানীয়

---

* A. Wolf, *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th centuries*, London, 1935 ; p. 35.

কাল নির্ণয় করিয়া দেশান্তর বাহির করা হইত। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষাকৃত বিরল ঘটনা; এজন্য দেশান্তর নির্ণয়ে ইহার প্রয়োগ সুবিধাজনক নহে। গ্যালিলিও এই কার্যে তাঁহার নবাবিষ্কৃত বৃহস্পতির উপগ্রহদের গ্রহণ ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করেন। বৃহস্পতির উপগ্রহদের পর্যায়-কাল খুব কম হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই ইহাদের একটির না একটির গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে দেশান্তর নির্ণয়ের কাজে নির্ভুল জ্যোতিষীয় ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করিবার ধারণা অতিশয় মৌলিক। কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত এই অতি উর্বর ধারণার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার সহিত গ্যালিলিওর বিরোধ, ইনকুইজিশন কর্তৃক গ্যালিলিওর বিচার

আমরা দেখিয়াছি, অতি অল্প বয়স হইতেই কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদে গ্যালিলিওর ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাঁহার বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত প্রত্যেকটি জ্যোতিষীয় আবিষ্কার কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের সহায়ক হইয়াছিল। সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বহু পূর্বেই ধর্মসংস্থা কর্তৃক অধার্মিক মতবাদ হিসাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল; সেই সঙ্গে কোপার্নিকাসের গ্রন্থও নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হয়। এই কারণে প্রথম হইতেই জ্যোতিষীয় গবেষণার ব্যাপারে গ্যালিলিও যে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কেপ্‌লারকে লিখিত পত্রে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের নূতন নক্ষত্রের আত্মপ্রকাশ ও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের নানা জ্যোতিষীয় আবিষ্কার সম্পর্কিত আলোচনা ও বিতর্ক প্রসঙ্গে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে তাঁহার বিশ্বাস নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই সময় হইতেই টলেমীপন্থী জ্যোতির্বিদ্‌ ও ধর্মসংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষে উৎসাহী পদস্থ যাজকদের সহিত তাঁহার বিরোধ ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কে তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের মত এক ধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করিবার অপরাধের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কিভাবে তাঁহাকে জব্দ করা যায় গ্যালিলিওর শত্রুরা সেই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিওর সৌর কলঙ্কের পত্রাবলী প্রকাশিত হইলে কোপার্নিকাস-বিরোধীদল এই গ্রন্থে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে গ্যালিলিওর সহানুভূতির প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল সরকারীভাবে গ্যালিলিওকে তাঁহার জ্যোতিষীয় আবিষ্কার ও মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য রোমে আহ্বান করেন।

রোমে তাঁহার অভ্যর্থনা ভালই হইয়াছিল। তিনি উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কার্ডিনাল বার্বেরিণোর বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি লাভ করেন। বার্বেরিণোই পরে পোপের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গ্যালিলিও অপূর্ব দক্ষতা ও বাগ্মিতার সহিত তাঁহার আবিষ্কারসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং যাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন তাঁহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃহস্পতির উপগ্রহ ও অন্যান্য আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝাইলেন। তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণের কাছে বিরোধী দলের কোন যুক্তি ও প্রমাণ টিকিল না। প্রাথমিক সাফল্যের আতিশয্যে তিনি একটি মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন, বাইবেলের নানা উক্তির সহিত সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের আপাত অসঙ্গতি শুধু ব্যাখ্যা করাই সম্ভব নহে, সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বাইবেল এই মতবাদেরই সমর্থক। বলা বাহুল্য, ধর্মসংস্থা গ্যালিলিওর এই বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করিল না, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যাকল্পে পবিত্র ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তির অবতারণা না করিতে তাঁহাকে সাবধান করা হইল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় এক বৎসর পরে রোমের ধর্মসংস্থা পৃথিবীর গতিবাদ সম্পর্কে সর্বপ্রকার আলোচনা, রচনা, পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করে। শুধু তাহাই নহে, কোপার্নিকাসের মতবাদ সমর্থন ও শিক্ষাদান হইতে গ্যালিলিও যাহাতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকেন সেই মর্মে তাঁহার উপর এক আদেশ জারি করা হইল।

গ্যালিলিও নিরুৎসাহ ও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর কয়েক বৎসর তাঁহার সম্পূর্ণ নীরবে ও নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হয়। তিনি বিতর্কমূলক সর্বপ্রকার আলোচনা ও অধ্যাপনা হইতে বিরত রহিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবশ্য পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। অধিকতর নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ, বলবিদ্যা ও উদস্থিতিবিদ্যা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান গবেষণা তাঁহার এই সময় সম্পাদিত হয়।

১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনাল বার্বেরিণো অষ্টম উর্বান নাম ধারণ করিয়া পোপের পদে অভিষিক্ত হইলে গ্যালিলিও আবার নূতন আশার আলোকরেখা দেখিতে পাইলেন। তিনি নিজে রোমে গিয়া পোপকে অভিনন্দন করেন এবং তাঁহার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ *Il Saggiatore* পোপের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে পরোক্ষভাবে কোপার্নিকাসের মতবাদের কিছু কিছু সমর্থন প্রচ্ছন্ন থাকিলেও পোপ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

কোপার্নিকাস ও টলেমীর জ্যোতিষীয় মতবাদ সম্পর্কিত বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার আজীবন গবেষণা ও চিন্তাধারার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা গ্যালিলিও বহুদিন হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম এইরূপ একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু রোমের ধর্মসংস্থার অনিশ্চিত প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় ইহাকে শেষ অথবা প্রকাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। পোপ অষ্টম উর্বানের আনুগত্য লাভে উৎসাহিত হইয়া এতদিনে গ্যালিলিও তাঁহার সেই আরব্ধ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে ভরসা পাইলেন। *Dialogue concerning the two chief systems of the world, the Ptolemaic and the Copernican* ফ্লোরেন্স হইতে প্রকাশিত হয় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্যালিলিওর Dialogue : গ্যালিলিওর *Dialogue* রচিত হয় কথোপকথনের ভঙ্গীতে। কতকটা সাহিত্যিক রচনা-শৈলীর জন্য, কিন্তু বিশেষতঃ এরূপ একটি বিতর্কমূলক বিষয় সোজাসুজি আলোচনা করিবার পরিবর্তে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মুখে যাহা বলিবার বলাইয়া গ্রন্থকারের নিজস্ব মত গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। স্যালভিয়াতি, সাগ্রেদো ও সিম্‌প্লিসিও গ্রন্থের এরূপ তিনটি প্রধান কাল্পনিক চরিত্র। স্যালভিয়াতি কোপার্নিকান জ্যোতিষে আস্থাবান, সিম্‌প্লিসিও গোঁড়া অ্যারিষ্টটলপন্থী। সাগ্রেদো নিরপেক্ষ শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করিলেও কোপার্নিকান জ্যোতিষে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। অতি সহজেই স্যালভিয়াতির যুক্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখা যায়; এমন কি অ্যারিষ্টটলপন্থীদের পণ্ডিতীয় যুক্তিতর্ক সম্পর্কে স্যালভিয়াতির বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিতেও তাঁহার সমর্থন লক্ষণীয়। স্বভাব ও গঠনের দিক হইতে জ্যোতিষ্করা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অপরিবর্তনশীল, অ্যারিষ্টটলপন্থীদের এরূপ মতবাদ আক্রমণ করিয়া গ্রন্থের সূচনা। চন্দ্রের পাহাড় ও অসমতা, নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব, সৌর কলঙ্ক প্রভৃতি জ্যোতিষীয় আবিষ্কারের দ্বারা এই মতবাদ কিরূপ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইতেছে, স্যালভিয়াতির মুখে গ্যালিলিও তাহা বলাইলেন। তারপর পৃথিবীর গতির প্রশ্ন। নক্ষত্রখচিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ২৪ ঘণ্টায় একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হয়, কিংবা শুধু পৃথিবীই এই সময়ে আবর্তিত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে স্যালভিয়াতির অভিমত হইল, দিনরাত্রির জন্য আকাশে আপাত যেসব পরিবর্তন দৃষ্ট হয় উভয় কারণেই তাহা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর বটে, কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক ও বাৎসরিক গতিই ইহার প্রকৃত কারণ। পৃথিবী হইতে গ্রহের দূরত্ব বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাহার ভগন-কালও বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন, চন্দ্রের ভগন-কাল ২৮ দিন, মঙ্গলের ২ বৎসর, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী শনিগ্রহের ৩০ বৎসর ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রহ হইতেও বহুগুণ দূরে অবস্থিত নাক্ষত্র গোলকের ভগন-কাল মাত্র ১ দিন কিরূপে সম্ভবপর হয়?

অতঃপর গ্যালিলিও দেখাইলেন (স্যালভিয়াতির ভাষণে), একমাত্র পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রীয় বার্ষিক গতির ভিত্তিতেই গ্রহদের খামখেয়ালী গতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে প্রাচীনকাল হইতে দুইটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া আসিয়াছিল : (১) পৃথিবীর বাৎসরিক গতি থাকিলে নক্ষত্রদের লম্বন দৃষ্ট হওয়া উচিত; (২) পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাকিলে কোন বস্তু ঊর্ধ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে নিক্ষিপ্ত স্থান হইতে ইহার কিছুদূরে ভূমি স্পর্শ করিবার কথা। প্রথম আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য কোপার্নিকাসের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গ্যালিলিও বলিলেন, সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের অন্ততঃ দশ হাজার গুণ দূরে নক্ষত্ররা অবস্থিত; এই দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের লম্বন ধরা পড়িবার কথা নহে। দ্বিতীয় আপত্তির বেলায় বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইল। তিনি বলিলেন, কোন বস্তু সরাসরি নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হইবার মুহূর্তে পশ্চিম হইতে পূর্বে পৃথিবী যেই বেগে আবর্তিত হয় বস্তুটিরও অবিকল সেই বেগ থাকে। তজ্জন্য বস্তুটি ভূমি স্পর্শ করিবার অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে ভূপৃষ্ঠ পশ্চিম হইতে পূর্বে যতটুকু ঘুরিয়া যাইবার অবকাশ পায় বস্তুটিও সেই দিকে ততটুকুই সরিয়া যায়; সুতরাং নিক্ষেপ-স্থান হইতে কিছুটা দূরে গিয়া বস্তুর ভূমি স্পর্শ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ধর্মসংস্থা কর্তৃক গ্যালিলিওর বিচার : প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে *Dialogue* অ্যারিস্টটল-পন্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কথোপকথনের আকারে লিখিত হইলেও এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য যে প্রকারান্তরে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষীয় মতবাদ সমর্থন করা, ইহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। রোমে গ্যালিলিওর শত্রুরা আবার তৎপর হইয়া উঠিল। শাইনার পোপ উর্বানকে বুঝাইয়া ছাড়িলেন, এই গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা গ্যালিলিও ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পোপের নিষেধাজ্ঞাই কেবল অমান্য করেন নাই, সিমপ্লিসিও নামে যে চরিত্রটির অবতারণা করা হইয়াছে এবং যাহাকে অপদস্থ ও হীন প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, সেই চরিত্রটির দ্বারা সুকৌশলে গ্রন্থকার স্বয়ং পোপকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সৌর কলঙ্ক আবিষ্কারের অগ্রাধিকার ও ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে শাইনারের সহিত গ্যালিলিওর এককালে তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল। সেই বিবাদে গ্যালিলিও জয়ী হইয়াছিলেন, আর শাইনার পরিণত হইয়াছিলেন তাঁহার চিরশত্রুরূপে। অবিলম্বে রোমের ইনকুইজিশন হইতে তলব আসিল। গ্যালিলিও অসুস্থতার জন্য সময় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পরীক্ষা ও বিচার আরম্ভ হয়; সম্ভবতঃ দৈহিক অত্যাচার হইতেও তিনি অব্যাহতি পান নাই। এই বিচার সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজ লিখিয়াছেন :

> "On the 20th of June he was summoned again, and told he would be wanted all next day for a rigorous examination. Early in the morning of the 21st he repaired thither, and the doors were shut. Out of these chambers of horror he did not reappear till the 24th. He himself was bound to secrecy. No outsider was present. The records of the Inquisition are jealously guarded. That he was technically tortured is certain; that he actually underwent the torment of the rack is doubtful. Much learning has been expended upon the question, especially in Germany. Several eminent scholars have held the fact of actual torture to be indisputable (geometrically certain, one says), and they confirm it by the hernia from which he afterwards suffered, this being a well-known and frequent consequence.*

---

* Sir Oliver Lodge, *Pioneers of Science*; p. 128-9.

এই বিচারে গ্যালিলিও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। দৈহিক নির্যাতন ও ব্রুনোর ভাগ্য চিন্তা করিয়া সত্তর বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভবতঃ আর শহীদ হইবার সাহসে কুলায় নাই। তিনি মার্জনা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত অপরাধ স্বীকার এবং সেই মর্মে এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা-পত্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষতঃ বিজ্ঞান-সাধনার স্বাধীনতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :

"আমি ফ্লোরেন্সনিবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হইয়া এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ ধর্মযাজক-গণের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রীষ্টীয় সাধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হইয়া স্বহস্তে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করিতেছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মসংস্থার দ্বারা যাহা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হইয়াছে ও যাহা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে আমি তাহা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহায়তায় ভবিষ্যতেও করিব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এইরূপ মিথ্যা অভিমত যে কিরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করা হইয়াছিল; এই মিথ্যা অভিমত সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া ইহার সমর্থন ও শিক্ষকতা হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকিতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করিয়া ও কোন সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরাল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া আমি একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি; এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে, আমি খ্রীষ্টধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া থাকি।......অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতি ঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হইতে দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তঃকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি।......আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার উপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধেই ভবিষ্যতে আর কখনও কিছু বলিব না বা লিখিব না। এইরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানিতে পারিলে অথবা কাহারও উপর ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হইলে পবিত্র ধর্ম-সংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করিব তত্রস্থ বিচারকের নিকট আমি তাহা জ্ঞাপন করিব। শপথ পূর্বক আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার উপর যেসব প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিবে আমি তাহা হুবহু পালন করিব। এইসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যে কোন একটি যদি ভঙ্গ করি তাহা হইলে শপথভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ ও বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাঁহারা আমার সহায় হউন। আমি উপরিউক্ত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং নিজেকে উপরিউক্তভাবে বাঁধা রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ স্বহস্তলিখিত শপথলিপি যাহার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করিয়া শুনাইলাম তাহা আপনাদের নিকট সমর্পণ করিতেছি। ২২শে জুন, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট।"

শপথ-গ্রহণ সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় গ্যালিলিও নাকি বিড় বিড় করিয়া বলিয়াছিলেন, 'E pur si mouve' (তবু ইহা ঘুরিতেছে)। ইহা নিছক গল্পমাত্র। যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তাঁহার বিচার ও শপথ-গ্রহণ পর্ব সমাধা হইয়াছিল তাহাতে গ্যালিলিওর পক্ষে এইরূপ মারাত্মক উক্তি অসম্ভব। তবে সেই নিদারুণ বিপর্যয়ে ও বিড়ম্বনার মধ্যে ইহাই যে তাঁহার অন্তরের কথা ছিল, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

গ্যালিলিওর শপথপত্রের অনুলিপি ইউরোপের প্রত্যেক গির্জায় পাঠানো এবং বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়া শুনানো হইয়াছিল। ফ্লোরেন্সের প্রধান গির্জায় ইহা পাঠ করিয়া

শুনাইবার জন্য যে সভার আয়োজন হয় তাহাতে গ্যালিলিওর প্রত্যেক বন্ধু ও সমর্থক বিশেষভাবে আহূত হইয়াছিলেন।

রোমে কিছুকাল বন্দিজীবন যাপন করিবার পর গ্যালিলিও ফ্লোরেন্সের নিকট আর্সেত্রি নামক স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল নজরবন্দী অবস্থায় কাটাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। এইরূপ অন্ধ অবস্থায় পর বৎসর আর্সেত্রির গৃহে গ্যালিলিও ইংরেজ কবি মিলটনকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মিলটন তাস্কানির ভাগ্যবিড়ম্বিত এই মহর্ষির কথা চিরজীবন মনে রাখিয়াছিলেন ও তাঁহার নানা কাব্যে ও রচনায় ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক ঐ বৎসর জন্মগ্রহণ করেন মানব মনীষার আর এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ স্যার আইজাক নিউটন।

১১·২ গণিত

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় গণিতে যেসব উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতির প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিবোনাচ্চির কথা প্রসঙ্গে সে বিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই পদ্ধতির প্রয়োগ অবশ্য অতি ধীরে শম্বুক গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে আর্থিক লেন-দেন ও হিসাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশঃ লোকে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতির সুবিধা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং গণিতজ্ঞগণও ইহা ব্যাপকভাবে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করেন। তারপর দশমিক ও দশমিক ভগ্নাংশ, লগারিদ্‌ম্‌, $+$, $\div$, $\times$, $-$, $=$ ( ), $\surd$, সূচক (exponent) ইত্যাদি বিবিধ সঙ্কেতের প্রবর্তন এই সময়কার ইউরোপীয় গণিতের অপরাপর বৈশিষ্ট্য। ঋণাত্মক ও কাল্পনিক মূলের ব্যবহার এই সময় হইতেই ইউরোপে দেখা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের সমাধান, নানা গুরুত্বপূর্ণ অভেদ ও প্রতিজ্ঞার আবিষ্কার, π-এর মান নির্ধারণ করিবার উপায় ও জ্যামিতিক নানা উন্নতি গাণিতিক গবেষণার এক অতি উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। এই উর্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়া রেণেশাঁসের হাওয়া প্রবাহিত হইলে নানা দিকে ইউরোপীয় গণিত আবার মুকুলিত হইয়া উঠে।

রেণেশাঁসের সময় জলপথে যাতায়াত বৃদ্ধি গণিতের অগ্রগতিকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে নিরাপদে ও নির্ভুলভাবে জাহাজ চালাইতে হইলে প্রতি মুহূর্তে তাহার অবস্থান সঠিক জানা দরকার। এজন্য নানাবিধ ভৌগোলিক ও জ্যোতিষীয় ছক, তালিকা ইত্যাদি প্রণয়ন অপরিহার্য। গণিত ছাড়া এইসব ছক ও তালিকার কিছুই প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। গণিতের এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক এবং সেই প্রয়োজন হইতে এই বিদ্যা যে কিরূপ গভীরভাবে উপকৃত হইয়াছিল তাহা অনেক সময়ই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ত বটেই এমন কি পরবর্তীকালের গাণিতিক অগ্রগতির এক প্রধান কারণকেই অবহেলা করা হইবে। অধ্যাপক বেল লিখিয়াছেন :—

> "The necessity for accurate navigation in mid-ocean, and the determination of position at sea by tables based on dynamical astronomy, indicate the connection between 1492 and Laplace's celestial mechanics completed only in the first third of the ninteenth century. Some of the fundamental work (Euler's) of the eighteenth century in the lunar theory was undertaken to meet the need of the British Admiralty for reliable

tables. The stimulus for these particular advances, originating in the voyages of Columbus and others, was about evenly divided among exploration, land grabbing, commerce, and the brutal struggle for naval supremacy . . ." *

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট গণিতজ্ঞগণের মধ্যে পাকিওলি, দেল ফেরো, ষ্টিফেল, তার্তাগ্‌লিয়া, কার্দানো, ফেরারি ও ভিয়েতার নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের গাণিতিক গবেষণার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

লুকা পাকিওলি (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ)

ফ্রান্সিস্‌কান পাদরী লুকা পাকিওলির পাটীগণিত ও বীজগণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম মুদ্রিত কয়েকটি গ্রন্থের অন্যতম। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক গ্রন্থ ভেনিস হইতে প্রকাশিত হয়। পাটীগণিতের কয়েকটি মৌলিক নিয়ম এবং বর্গমূল নির্ণয় করিবার এক পদ্ধতির আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত গণনার আলোচনা এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এজাতীয় এক প্রশ্নের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

"জনৈক ব্যবসায়ী তাহার মূলধনের এক-চতুর্থাংশ পিসায় ব্যয় করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ ভেনিসে; ইহার পরিবর্তে তিনি ১৮০ ডুকা লাভ করেন এবং তাহার হাতে তখনও ২২৪ ডুকা থাকিয়া যায়; ব্যবসায়ীর মূলধনের পরিমাণ কত?

মনে করা যাক, তাহার মূলধন ছিল ১০০ ডুকা; তাহা হইলে তাহার উদ্বৃত্ত মূলধন হইবে ১০০−২৫−২০=৫৫; কিন্তু ৫৫ তাহার প্রকৃত উদ্বৃত্ত ডুকার (২২৪−১৮০=৪৪) পাঁচ-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ৫/৪; সুতরাং তাহার মূলধনের পরিমাণ হইল ৪/৫-এর ১০০=৮০ ডুকা।"†

পাকিওলি যোগ চিহ্ন নির্দেশ করিতেন p অথবা $\bar{p}$ এবং সমতা চিহ্ন *ae* দ্বারা। ইউরোপে আধুনিক মূল, যোগ ও বিয়োগ চিহ্নের ($\surd$, $+$, $-$) ব্যবহার আমরা তাঁহার সময় হইতেই দেখিতে পাই; তবে এই চিহ্নগুলি সম্ভবতঃ তিনি ঠিক উদ্ভাবন করেন নাই। সংখ্যা-সংবলিত প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণ তিনি সমাধান করেন। ঋণাত্মক মূলের অর্থ তিনি বুঝিতে না পারায় তাঁহার সমাধানে কেবলমাত্র ধনাত্মক মূলই গ্রাহ্য দেখা যায়। পাকিওলি তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাই তিনি এক জায়গায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমসময়ে গণিতের অগ্রগতির যে অবস্থা তাহাতে $x^3+mx=n$, $x^3+n=mx$ জাতীয় তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান-নির্ণয় অসম্ভব।

সিপিওন দেল ফেরো (১৪৬৫-১৫২৬)

তৃতীয় মাত্রার বা ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে পাকিওলির ব্যর্থতা বোলোনার গণিতের অধ্যাপক সিপিওন দেল ফেরোকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। বহু বৎসর চেষ্টার পর দেল ফেরো ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে $x^3+mx=n$ জাতীয় ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান আবিষ্কার করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার এক ছাত্র অ্যান্টোনিও ফিওরকে (কেহ বলেন ফ্লোরিডাস নামক আর এক ছাত্রকে) এই আবিষ্কারের কথা বলিয়া যান। সেই সময় গাণিতিক প্রতিযোগিতায়

---

* E. T. Bell, *Development of Mathematics*, 1940; p. 103.

† W. T. Sedgwick and H. W. Tyler, *A Short History of Science*, Macmillan, 1918; p. 232.

বিপক্ষকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার গাণিতিক আবিষ্কার অতীব যত্নের সহিত গোপন রাখা হইত। এজন্য পরবর্তীকালে বহু গাণিতিক সমস্যার সমাধানের অগ্রাধিকার নির্ণয় করিতে যাইয়া ঐতিহাসিকদের বিস্তর হয়রান হইতে হইয়াছে। উপরিউক্ত ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান-নির্ণয় এইরূপ একটি আবিষ্কার। দেল ফেরো তাঁহার আবিষ্কার গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও তার্তাগ্‌লিয়া স্বাধীনভাবে এই সমাধান আবিষ্কার করেন এবং সমাধান-পদ্ধতি গোপন রাখিয়া তাঁহার কৃতকার্যতার কথা প্রকাশ করেন। তার্তাগ্‌লিয়ার সাফল্যের কথা শুনিয়া অ্যান্টোনিও ফিওর তখন এই আবিষ্কারের অগ্রাধিকারের কৃতিত্ব দাবী করেন। ফিওরকে এক গাণিতিক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া তার্তাগ্‌লিয়া ইহার পাল্টা জবাব দেন। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষকে ৩০টি গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান করেন, এবং এরূপ স্থির হয় যে, ১৫ দিনের মধ্যে যিনি সর্বাধিক প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন তিনিই জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। কথিত আছে, তার্তাগ্‌লিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিওরের সমস্ত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর কষিয়া দেন, কিন্তু ফিওর তার্তাগ্‌লিয়ার একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেন নাই।

মাইকেল ষ্টিফেল (১৪৮৬-১৫৬৭)

ষ্টিফেল ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান বীজগণিতজ্ঞ। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Arithmetica integra*য় মূলদ ও অমূলদ রাশির কথা এবং সাধারণভাবে বীজগণিতের নানা সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। তিনি ঋণাত্মক সংখ্যার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, শূন্য অপেক্ষা বড় সংখ্যাকে শূন্য হইতে বিয়োগ করিলে ঋণাত্মক সংখ্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। বীজগণিতীয় প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেন। x, x^2, x^3 রাশি প্রকাশ করিতে তিনি $1A, 1AA, 1AAA$ প্রতীক ব্যবহার করিতেন। ষ্টিফেল ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহা প্রধানতঃ তাঁহার সমসাময়িক গণিতজ্ঞ হিরোনিমো কার্দানোর গবেষণা হইতে গৃহীত।

তার্তাগ্‌লিয়া (১৫০০-৫৭) ও কার্দানো (১৫০১-৭৬)

তার্তাগ্‌লিয়া ও হিরোনিমো কার্দানো উভয়ই ইতালীয়, উভয়েরই গবেষণার বিষয় বীজগণিত, বিশেষতঃ ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান-নির্ণয় এবং এই ব্যাপারে দুজনেই জীবনের অধিকাংশ কাল বিবাদ-বিতর্ক ও রেষারেষির মধ্য দিয়া কাটাইয়াছেন। তার্তাগ্‌লিয়ার আসল নাম নিকোলো ফণ্টানো। বাল্যাবস্থায় তাঁহার জন্মস্থান ব্রেসিয়া একবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও অধ্যুষিত হইবার সময় জনৈক সৈনিকের তরবারির আঘাতে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। এই আঘাত হইতে কোন রকমে তাঁহার জীবন রক্ষা হইলেও নিকোলো জন্মের মত তোতলা হইয়া যান। এই তোতলামির জন্যই তিনি তার্তাগ্‌লিয়া বা তোতলা নামে পরিচিত।

ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান: ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের নিয়ম আবিষ্কারের জন্য তার্তাগ্‌লিয়ার প্রসিদ্ধি। কোল্লা নামে এক ইতালীয় গণিতজ্ঞ একবার তাঁহাকে কতকগুলি দুরূহ গাণিতিক প্রশ্ন সমাধানের জন্য দেন। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল $x^3+px^2=q$ জাতের তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান-নির্ণয়। তার্তাগ্‌লিয়া সমীকরণটির এক অসম্পূর্ণ সমাধান বাহির করেন এবং এই আংশিক সাফল্যে তাঁহার ধারণা জন্মে যে, এই কাজে গণিতজ্ঞদের মধ্যে তাঁহার সাফল্যই সর্বপ্রথম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, দেল ফেরোর এক ছাত্র অ্যান্টোনিও ফিওর এজাতীয় ত্রিঘাত সমীকরণ $x^3+mx=n$ সমাধানের পদ্ধতির সহিত পরিচিত আছেন। তিনি এই পদ্ধতি দেল ফেরোর নিকট শিক্ষা করিয়াছেন।

তার্তাগ্লিয়া তখন ত্রিঘাত সমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যত্নবান হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এই কৌশল আবিষ্কার করিলেন। এই প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা দুরূহ পর্যায় হইল দ্বিঘাত অমূলদ রাশিদের (quadratic irrational) ত্রিঘাত অমূলদে (cubic irrational) পরিণত করা। তার্তাগ্লিয়া লক্ষ্য করেন, $x = \sqrt[3]{t} - \sqrt[3]{u}$ ধরিয়া লইলে $x^3 = mx - n$ সমীকরণ হইতে অমূলদ রাশিগুলি উধাও হইতেছে এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে $n = t - u$। শেষোক্ত সমতার সহিত $(\frac{1}{3}m)^3 = tu$ যুক্ত করিলে সহজেই দেখানো যায় যে,

$$t = \sqrt{\left(\frac{n}{2}\right)^3 + \left(\frac{m}{3}\right)^3} + \frac{n}{2}, \quad u = \sqrt{\left(\frac{n}{2}\right)^2 + \left(\frac{m}{2}\right)^3} - \frac{n}{2}$$

ইহাই তার্তাগ্লিয়ার সমাধান।*

উপরিউক্ত সমীকরণ সমাধানের অগ্রাধিকার লইয়া ফিওরের সহিত তাঁহার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার পর হইতে তাঁহার গাণিতিক খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে অন্যবিধ ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বে কোল্লার প্রস্তাবিত $x^3 + px^2 = q$ সমীকরণের এক আংশিক সমাধান তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন মাত্র; ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই সমীকরণকে $x^3 \pm mx = \pm n$ সমীকরণে রূপান্তরিত করিবার এক কৌশল আবিষ্কার করিয়া তিনি কোল্লার সমীকরণের এক সম্পূর্ণ ও সাধারণ সমাধান নির্ণয় করেন।

ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি যথা সম্ভব গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার্তাগ্লিয়ার সাফল্যের সংবাদ শীঘ্রই সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। গণিতজ্ঞ মহল তখন এই পদ্ধতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তার্তাগ্লিয়া এই সময় ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের কয়েকটি মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির ল্যাটিন তর্জমা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন; এই অনুরোধের উত্তরে তিনি জানান যে, তর্জমা-কার্য শেষ হইলেই বীজগণিতের একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি হাত দিবেন এবং সেই গ্রন্থে তাঁহার নবাবিষ্কৃত ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতিগুলি আলোচিত হইবে। মিলানের গণিতজ্ঞ হিরোনিমো কার্দানো কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; ত্রিঘাত সমীকরণের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত তার্তাগ্লিয়ার সমাধান-কৌশল জানিয়া ছাড়িলেন।

দুঃখের বিষয় কার্দানো তাঁহার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। তিনি সেই সময় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Ars Magna* প্রণয়ন করিতেছিলেন। ত্রিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধে গণিতজ্ঞ মহলে যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তার্তাগ্লিয়ার সমাধানগুলি প্রকাশ করিয়া সহজে নাম কিনিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য সমাধানগুলির আবিষ্কারক হিসাবে তার্তাগ্লিয়াকে তিনি পূর্ণ কৃতিত্বই দান করেন। তবে এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তার্তাগ্লিয়া কার্দানোকে কোন দিন ক্ষমা করিতে পারেন নাই। নানা গাণিতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া কার্দানোকে তিনি অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে প্রতিপক্ষের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তার্তাগ্লিয়া ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পূর্বপরিকল্পিত বীজগণিতের গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ত্রিঘাত সমীকরণের প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৭)।

এইসব কারণে ত্রিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধে তার্তাগ্লিয়ার নিজস্ব কোন রচনা নাই। তাঁহার পূর্বে দেল ফেরো এই প্রচেষ্টায় সম্ভবতঃ সফল হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে কিছু

* F. Cajori, *A History of Mathematics*; p. 133.

প্রকাশ করেন নাই, পাণ্ডুলিপির আকারে সামান্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও কালসহকারে অবলুপ্ত হয়। এজন্য একমাত্র কার্দানোর গ্রন্থ ও অন্যান্য কয়েকটি রচনা হইতে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে দেল ফেরো ও তার্তাগ্লিয়ার সাফল্যের কথা জানা যায়। কার্দানোর অভিমত, এই দুই গণিতজ্ঞের সমাধান-পদ্ধতি মূলতঃ এক। যাহা হউক, *Ars Magna* য় প্রথম লিপিবদ্ধভাবে এই সমাধানের আলোচনা দেখিয়া পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞদের ধারণা হইয়াছিল, কার্দানোই ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের আবিষ্কর্তা এবং বহুদিন পর্যন্ত ইহা কার্দানোর সমাধান বলিয়াই সুপরিচিত ছিল।

নানা দোষ ও গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ মিলানের এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কার্দানো। "A singular mixture of genius, folly, self-conceit and mysticism", অর্থাৎ, প্রতিভা, নির্বুদ্ধিতা, আত্মপ্রতারণা ও মরমীবাদের একক সংমিশ্রণ,—কার্দানো সম্বন্ধে ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তার্তাগ্লিয়ার সমাধান প্রকাশের ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের একটি কাল দিক প্রতিফলিত হইলেও তাঁহার গাণিতিক প্রতিভার কথা অনস্বীকার্য। *Ars Magna* রেণেশাঁসের সময়ের বীজগণিতের একটি অমূল্য রত্ন; এই গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর বীজগণিতীয় চর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ত্রিঘাত সমীকরণের যে তিনটি করিয়া মূল থাকে তাহা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন। ঋণাত্মক ও কাল্পনিক মূলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইলেও তিনি এরূপ মূলের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। বোলোনার গণিতজ্ঞ র‍্যাফেল বম্বেলি ঋণাত্মক ও কাল্পনিক মূলের তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন করেন।

লোদোভিচো ফেরারি (১৫২২-৬৫) ও চারিমাত্রার সমীকরণ

ত্রিঘাত সমীকরণের ন্যায় চারিমাত্রার সমীকরণেরও প্রথম প্রস্তাবক কোল্লা। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কোল্লা $x^4+6x^2+36=60x$ জাতীয় চারিমাত্রার এক সমীকরণ সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার কিছু পূর্বে কার্দানো বিশেষ ধরনের চারিমাত্রার কয়েকটি সমীকরণ সমাধান করেন। তন্মধ্যে $13x^2=x^4+2x^3+2x+1$ সমীকরণটি উল্লেখযোগ্য। সমীকরণের দুই পক্ষে $3x^2$ যোগ করিয়া এবং দুই পক্ষকেই সম্পূর্ণ বর্গে পরিণত করিয়া অনেকটা ডায়োফ্যান্টাসের ও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের পদ্ধতিতে তিনি এই সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করেন। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও চারিমাত্রার সমীকরণের সাধারণ সমাধান আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার্দানোর ছাত্র লোদোভিচো ফেরারির (১৫২২-৬৫) প্রাপ্য। ফেরারির সমাধান *Ars Magna*য় আলোচিত হইয়াছে।

ফেরারি কোল্লার সমীকরণকে সাজাইয়া লেখেন,

$$(x^2+6)^2=60x+6x^2 \quad \ldots\ldots\ldots (১)$$

বাম পক্ষ এখন একটি পূর্ণ বর্গ। দক্ষিণ পক্ষকেও একটি পূর্ণ বর্গে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দুই পক্ষে $2(x^2+6)\,y+y^2$ যোগ দিলেন; y একটি অজ্ঞাত রাশি। ফল দাঁড়াইল,

$$(x^2+6+y)^2=(6+2y)\,x^2+60x+(12y+y^2) \qquad (২)$$

দক্ষিণ পক্ষকে একটি পূর্ণ বর্গ হইতে হইলে নিম্নোক্ত অভেদটির প্রয়োজন,

$$(2y+6)\,(12y+y^2)=900 \qquad (৩)$$

এইবার (২) ও (৩) মিলাইয়া এবং দুই পক্ষের বর্গমূল বাহির করিয়া ফেরারি নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাইলেন,

$$x^2+6+y=x\sqrt{2y+6}+\frac{900}{\sqrt{2y+6}} \quad (৪)$$

(৪) একটি দ্বিঘাত সমীকরণ; সুতরাং সহজেই ইহার সমাধান বাহির করা যাইবে। কিন্তু x-এর মূলে y অজ্ঞাত রাশিটি থাকিয়া যাইতেছে। y- এর মান নির্ণয় করিতে হইলে (৩) সমীকরণের সমাধান প্রয়োজন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহা একটি ত্রিঘাত সমীকরণ এবং এরূপ সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। ফেরারি এইভাবে চারিমাত্রার সমীকরণ সমাধানের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বম্বেলিও এই ধরনের সমীকরণ সমাধান করিয়াছিলেন এবং অনেকে তাঁহাকেই এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ফেরারিই এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা।

চারিমাত্রার সমীকরণ সমাধানের অন্তর্নিহিত কৌশল এই যে, ইহাকে যেভাবেই হউক ত্রিঘাত সমীকরণে আনিয়া দাঁড় করাইতে হইবে। এই সাফল্য হইতে গণিতজ্ঞদের এককালে ধারণা হইয়াছিল, যে কোন উচ্চ মাত্রার সমীকরণ সমাধান করিতে হইলে তাহার পদ্ধতি হইবে কোনও প্রকারে ইহাকে অব্যবহিত নিম্ন মাত্রার এক সমীকরণে পর্যবসিত করা। অর্থাৎ পঞ্চম মাত্রার সমীকরণ সমাধানের উদ্দেশ্যে ইহাকে চারিমাত্রার সমীকরণে পর্যবসিত করিতে হইবে। কিন্তু পঞ্চম ও তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রার সমীকরণ সমাধানের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে অ্যাবেল প্রথম প্রমাণ করেন যে, পঞ্চম ও বৃহত্তর মাত্রার সমীকরণের বীজগণিতীয় সমাধান-নির্ণয় অসম্ভব।

ডায়োফ্যাণ্টাস এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলমান গণিতজ্ঞগণ বীজগণিতীয় গবেষণার যে আদর্শ ও ধারা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন দেল ফেরো, তার্তাগ্লিয়া, কার্দানো, ফেরারি, বম্বেলি প্রমুখ ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় বীজগণিতজ্ঞগণের হাতে তাহার চরম পরিণতি ঘটে। বিশেষ ধরনের সমীকরণ অথবা বীজগণিতীয় সমস্যার বিশেষ সমাধান নির্ণয়ে তাঁহারা প্রত্যেকেই আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এইসব সমাধানের পশ্চাতে বিদ্যমান মৌলিক নীতি ও সাধারণ সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা উপরিউক্ত গণিতজ্ঞগণের মধ্যে দেখা যায় না। আধুনিক কালের গাণিতিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল বিভিন্ন জাতের সমস্যার অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম ও মূল নীতিগুলি (general principles) আবিষ্কার করা যাহাতে এই সাধারণ নিয়ম ও নীতির প্রয়োগে অতি সহজেই সমস্যা বিশেষের সমাধান হইতে পারে।

ফ্রান্সিস ভিয়েতা (১৫৪০-১৬০৩)

এইরূপ সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা প্রথম লক্ষ্য করি ভিয়েতার গবেষণায়। ভিয়েতা সম্বন্ধে অধ্যাপক বেল লিখিয়াছেন, 'the first mathematician of his age to think occasionally as mathematicians habitually think today.' অর্থাৎ আজকাল গণিতজ্ঞগণ যেভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত তাঁহার সময় ভিয়েতাই সর্বপ্রথম মাঝে মাঝে সেইভাবে চিন্তা করিতেন।

ভিয়েতার আসল ফরাসী নাম ফ্রাঁসোয়া ভিয়েত। তাঁহার জন্মস্থান পোয়াতু এবং মৃত্যু হয় প্যারীতে। ফিবোনাচ্চির মত গণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁহার ছিল না কিংবা গণিতের অধ্যাপকের পদও তিনি কোন দিন অলংকৃত করেন নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ হেনরির অধীনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে তিনি বরাবর অধিষ্ঠিত ছিলেন। গণিত ছিল তাঁহার শখের

চর্চা, অবসর কাটাইবার এক উপায় মাত্র। এই শখ শেষে নেশায় পরিণত হয় এবং এই নেশা তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসে যে মাঝে মাঝে আহার নিদ্রা পর্যন্ত তিনি ভুলিয়া যাইতেন।

ভিয়েতার বৈশিষ্ট্য এই যে, একই নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি দ্বিঘাত, ত্রিঘাত প্রভৃতি সমীকরণ সমাধান করিতেন। এই নীতির নাম লঘূকরণ (reduction)। দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে তাঁহার পদ্ধতি হইল প্রথম মাত্রার x রাশিটিকে সুকৌশলে সরাইয়া দেওয়া। ত্রিঘাত সমীকরণের বেলায় কার্দানোর মত প্রথমে তিনি সমীকরণটিকে $x^3+mx+n=0$ আকারে রূপান্তরিত করিতেন। এখন যদি মনে করা যায়, $x=\frac{1}{z}(\frac{1}{3}a-z^2)$, সমীকরণটি গিয়া দাঁড়াইবে,

$$z^6-bz^3-\frac{1}{27}a^3=0$$

এইবার $z^3=y$ ধরিয়া লইলে ইহা একটি দ্বিঘাত সমীকরণে

$$y^2-by-\frac{1}{27}a^3=0$$

পর্যবসিত হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ লঘূকরণ পদ্ধতিতে তিনি চারিমাত্রার সমীকরণও সমাধান করেন।

সঙ্কেতের ব্যবহার : বীজগণিতে ভিয়েতার গবেষণার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণ বা অনির্দিষ্ট রাশি বুঝাইতে তিনি বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করিতেন। ডায়োফ্যান্টাস অজ্ঞাত রাশি নির্দেশ করিতে বিবিধ সঙ্কেত ব্যবহার করেন। আমরা দেখিয়াছি, বীজগণিতে সঙ্কেতের ব্যবহার হিন্দু গণিতজ্ঞদেরও এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ভিয়েতার কিছু পূর্বে জার্মানীতে রেজিওমণ্টানাস ও ষ্টিফেল এবং ইতালীতে কার্দানো অক্ষর ব্যবহার করেন। ভিয়েতার হাতে এই পদ্ধতি আরও উন্নতি লাভ করে এবং আধুনিক সাঙ্কেতিক বীজগণিতের উদ্ভবের জন্য তিনি বিশেষভাবে দায়ী। তিনি কিভাবে সমীকরণ লিখিতেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। আধুনিক পদ্ধতি : $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$
ভিয়েতার পদ্ধতি : *a* cubus + *b* in *a* quadr. 3 + *a* in *b* quadr. 3 + *b* cubo aequalia *a* + *b* cubo

২। আধুনিক পদ্ধতি : $x^3-8x^2+16x=40$
ভিয়েতার পদ্ধতি : 1 *C* − 8 *Q* + 16 *N* aequal. 40

সংখ্যাত্মক সমীকরণের (numerical equation) বেলায় (দ্বিতীয় উদাহরণ) অজ্ঞাত রাশিকে N, তাহার বর্গকে Q ও ঘনকে C অক্ষরের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। অজ্ঞাত রাশির বর্গ ও ঘন নির্দেশ করিতে ডায়োফ্যান্টাস প্রতীক ব্যবহার করিয়াছিলেন (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০)। ভিয়েতার বীজগণিতে সমতা চিহ্নের (=) ব্যবহার নাই। এই চিহ্নের ব্যবহার প্রথম প্রস্তাব করেন ইংরেজ গণিতজ্ঞ রবার্ট রেকর্ড তাঁহার *Whetstone of Witte* গ্রন্থে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে। ডায়োফ্যান্টাস '=' এর পরিবর্তে ' ι ' সঙ্কেতটি ব্যবহার করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সাধারণ সঙ্কেতের উদ্ভব ও প্রচলনের ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য। ইউরোপে '+' ও '−' চিহ্নের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জোহানেস ভিডম্যানের একটি পাটীগণিতে। তবে ষ্টিফেল ও তাঁহার পরবর্তী বীজগণিতজ্ঞদের হাতেই ইহার ব্যবহার চালু হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে উট্রেড গুণ চিহ্নের (×) প্রবর্তন করেন। গুণের বিকল্প চিহ্ন হিসাবে বিন্দুকে (·) প্রথম ব্যবহার করেন লাইবনিৎস। সুইস গণিতজ্ঞ জে-এইচ,

রাহ্‌ন ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক গ্রন্থে ভাগ চিহ্ন (÷) ব্যবহার করেন। অপেক্ষাকৃত বড় বা ছোট রাশি বুঝাইতে '>' বা '<' প্রতীকের ব্যবহার প্রথম প্রস্তাব করেন হ্যারিয়ট সপ্তদশ শতাব্দীতে। ফরাসী চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ শুকের এক পান্ডুলিপিতে (প্রকাশ-কাল ১৪৮৫) মূল চিহ্নের (√) প্রথম ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে রুডল্‌ফ এই চিহ্ন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে সুরু করিলে অন্যান্য গণিতজ্ঞগণও তখন ইহাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। রাশির শক্তি বা ঘাত (power) নির্দেশের জন্য এক সময় নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রাশির মাথার উপর সংখ্যা বা আক্ষরিক প্রতীক ব্যবহার করিয়া আধুনিক সূচক (index) পদ্ধতিতে রাশির ঘাত বুঝাইতে,—যেমন, x^2, x^3, x^a, x^n, ইত্যাদি, দেকার্তে প্রথম সচেষ্ট হন ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ওয়ালিস ও নিউটনের হাতে ইহার অনেক সম্প্রসারণ ঘটে। দশমিক সংখ্যা প্রকাশের জন্য ষ্টেভিনাসের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। তিনি ০·৩৪৬৯ সংখ্যাটি নিম্নলিখিত উপায়ে লিখিতেন :—

৩ (১) ৪ (২) ৬ (৩) ৯ (৪)

বন্ধনীর সংখ্যার দ্বারা কোন সংখ্যা দশমিকের কোন ঘরে অবস্থান করিতেছে তাহা বুঝানো হইয়াছে। ষ্টেভিন উপরিউক্ত রাশিটিকে দ্বিতীয় এক পদ্ধতি অনুসারে লিখিয়াছেন ৩′ ৪″ ৬‴ ৯⁗। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নেপিয়ারের একটি গ্রন্থে দশমিক নির্দেশ করিতে বিন্দুর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত বুঝাইতে π প্রতীকটির ব্যবহার আমরা পাই উইলিয়ম জোন্‌সের রচনাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে।*

ত্রিকোণমিতি : কথা প্রসঙ্গে গাণিতিক প্রতীকের ইতিহাস সামান্য আলোচনা করিলাম। ভিয়েতার বীজগণিতীয় গবেষণার পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহার ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত গবেষণা। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Canon mathematicus seu ad triangula cum appendicibus* গ্রন্থে ত্রিকোণমিতিতে তাঁহার নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ত্রিকোণমিতির অপেক্ষকের (trigonometrical function) সাহায্যে তিনি সমতল ও গোলীয় ত্রিভুজ সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সমাধান করেন। বীজগণিতীয় রূপান্তরকরণের (algebraic transformation) সাহায্যে ত্রিকোণমিতির সমস্যার সমাধান ব্যাপারে ইউরোপে ভিয়েতার প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম। ইহার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত কোণের মান তিনি অতি সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি $2 \cos a = x$ ধরিয়া $\cos n a$ রাশিকে x-এর অপেক্ষক হিসাবে প্রকাশ করেন; আবার $2 \sin a = x$ ও $2 \sin 2a = y$ ধরিয়া তিনি $2x^{n-2} \sin na$ রাশিকে x ও y-এর অপেক্ষক হিসাবে প্রকাশ করেন। এই ধরনের বীজ-গণিতীয় রূপান্তরকরণের দ্বারা এবং n-এর নানা মান ধরিয়া যে কোন কোণের অতি ক্ষুদ্র অংশের মান অতি সহজে নির্ণয় করা যায়। এই সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া ভিয়েতা এক জায়গায় মন্তব্য করিয়াছেন,— "Thus the analysis of angular sections involves geometric and arithmetic secrets which hitherto have been penetrated by no one."

ভিয়েতার গাণিতিক প্রতিভার একবার এক পরীক্ষা হইয়াছিল। প্যারীস্থ হল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে সগর্বে বলেন যে, ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ আদ্রিয়ানাস রোমানাস এমন

---

* F. Cajori, *A History of Mathematical Notations*, Vol. I, Chicago, 1928 ; A. Wolf, *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries*, p. 192-3.

এক সমীকরণ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা সমাধান করিবার মত বিদ্যা কোন ফরাসী গণিতজ্ঞের নাই। সমীকরণটি এইরূপ :

$$45y-3795y^3+95634y^5- \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad +945y^{41}-45y^{43}+y^{45}=C$$

ফ্রান্সের জাতীয় সম্মান ও খ্যাতি চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। ভিয়েতার ডাক পড়িল। ভিয়েতার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, আপাতদৃষ্টিতে এই অতি জটিল ও ভীতিপ্রদ সমীকরণটি আসলে একটি বর্ণচোরা আম। ইহা এমন একটি সমীকরণ যাহাতে $C=2\sin\phi$ কে $y=2\sin\frac{1}{45}\phi$ -এ রূপান্তরিত করিয়া ফলাইয়া লেখা হইয়াছে মাত্র। ত্রিকোণমিতির অভেদগুলিকে বীজগণিতীয় রূপান্তরকরণের দ্বারা সমাধানের কৌশল ভিয়েতা নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সুতরাং অনায়াসে নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে উপরিউক্ত সমীকরণের ২৩টি মূল নির্ণয় করিয়া তিনি ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূতের দম্ভোক্তির উচিত জবাব দিলেন। এই সমীকরণের অবশ্য ৪৫টি মূল বাহির হইবার কথা; কিন্তু বাকী মূলগুলি ঋণাত্মক হওয়ায় এবং ঋণাত্মক মূলের তাৎপর্য ভিয়েতার জানা না থাকায় ইহাদের তিনি বেমালুম বাদ দিয়া যান।

বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ইতিহাসে ভিয়েতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহার অমূল্য অবদানের সূত্র ধরিয়াই আধুনিক বীজগণিতের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। অধ্যাপক বেল লিখিয়াছেন, ভিয়েতার পর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাগ্রাঞ্জের আবির্ভাবের পূর্বে দুইশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত প্রতিভাবান গণিতজ্ঞের উদ্ভব হয় নাই।

১১·৩। পদার্থবিদ্যা

বলবিদ্যা—স্থিতিবিদ্যা, গতিবিদ্যা, উদস্থিতিবিদ্যা

আধুনিক বলবিদ্যার ভিত্তি রচিত হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীতে প্রধানতঃ দুইজন বিজ্ঞানীর তৎপরতায়। ফ্লেমিশ স্টেভিনাস ও ইতালীয় গ্যালিলিও প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বলবিদ্যার জন্মদাতা। তাঁহাদের পূর্বে, আরও সঠিক বলিতে গেলে, লিওনার্দোর পূর্বে প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। জোর্দানাস নেমোরারিয়াস এবং প্ররোচনাবাদের প্রবর্তক ও সমর্থক জাঁ বুরিদাঁ, নিকোলাস অব কুসা, নিকোলাস ওরেজ্‌ম্‌ প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী মাঝে মাঝে কিছু নূতন কথা বলিলেও অ্যারিস্টটলের শিক্ষা ও ধারণাই সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। সমগ্র পদার্থবিদ্যার এমন কি জ্যোতিষের প্রধান ভিত্তি হইল বলবিদ্যা। সুতরাং বলবিদ্যার অন্তর্নিহিত সত্যগুলি উপলব্ধ না হওয়া পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ও জ্যোতিষের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রধান কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাব। কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় বিপ্লবের মূলে ছিল বলবিদ্যায় গ্যালিলিওর যুগান্তকারী গবেষণা।

স্টেভিনাস (১৫৪৮-১৬২০)

স্টেভিনাস ছিলেন ফ্লেমিশ ইঞ্জিনীয়র। ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীতে তিনি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলবিদ্যায় গ্যালিলিওর সমসময়ে তাঁহার গবেষণা সম্পাদিত হয় এবং দুজনের গবেষণা অনেকটা পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করে। স্টেভিনাস তাঁহার মাতৃভাষা ফ্লেমিশে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্নেল তাঁহার গাণিতিক গ্রন্থের সর্বপ্রথম ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৬০৫-৮ খৃষ্টাব্দে; ইহার ফরাসী তর্জমা *Les oeuvres mathématiques de Simon Stevin* লাইডেন হইতে প্রকাশিত হয় ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে।

বস্তুর সাম্য : বস্তুর সাম্য সূত্র (law of equilibrium) ও বলের সামান্তরিক সূত্র (law of parallelogram of forces) স্টেভিনাসের প্রধান আবিষ্কার। সরাসরি কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে অথবা পরীক্ষার দ্বারা তিনি এই সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন নাই; বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে কতকটা স্বজ্ঞার (intuition) দ্বারা তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন। বাস্তব জগতে বস্তুকে একটি মাত্র বলের অধীনে থাকিতে বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং বস্তুর
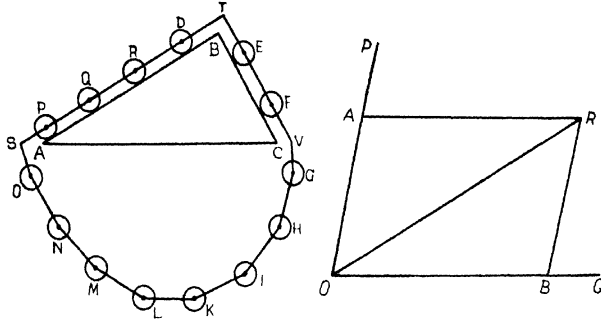
৫৮। বস্তুর সাম্যসূত্র ও বলের সামান্তরিক সূত্র।

উপর একাধিক বলের ক্রিয়া, অর্থাৎ একাধিক বলপ্রয়োগে বস্তুর গতি ও স্থানপরিবর্তন কিরূপ হয়, স্টেভিনাস এ বিষয়ে চিন্তা করেন। এরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে তিনি একটি কীলক বা ত্রিভুজাকৃতি প্রিজ্‌মের কল্পনা করেন (৫৮ নং চিত্র)। এই প্রিজ্‌মের ভূমি AC চক্রবালের সহিত সমান্তরাল। এখন AB ও BC-র উপর দিয়া $TSKV$ শিকলটিকে এমনভাবে ঝুলানো যাক যাহাতে ইহা AB ও BC নত সমতলের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে গড়াইয়া পড়িতে পারে। শিকলের দুই মুখ জোড়া। এই অবস্থায় শিকলটি যদি গড়াইয়া পড়িতে পারে তবে ইহার আর থামিবার কথা নহে, প্রিজ্‌মের দুই নত সমতল বাহিয়া ইহার অবিরাম গতি হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব জগতে এইরূপ অবিরাম গতির কোন নজির নাই। সুতরাং শিকলটি নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে। স্টেভিনাস আরও দেখাইলেন যে, AC ভূমির নীচে অবস্থিত শিকলের অংশ $SLKV$ বাদ দিলেও তাহার স্থিতি-সাম্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, BC বাহুর উপর অবস্থিত শিকলের অল্প, অতএব লঘু, অংশ AB বাহুর উপর ন্যস্ত দীর্ঘতর, অতএব ভারী, অংশকে টানিয়া রাখিতে সক্ষম। এখন শিকলের পরিবর্তে দুইটি ওজন M_1 ও M_2-কে একটি দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধিয়া সেই দড়িটিকে যদি উপরিউক্ত প্রিজ্‌মের উপর দিয়া ঝুলানো যায়, তাহা হইলেও কি সাম্য স্থাপিত হইবে? শিকলের পরীক্ষা হইতে স্টেভিনাস দেখাইলেন, ওজন দুইটি প্রিজ্‌মের দুই নত সমতল AB ও BC-র আনুপাতিক হইলে তবেই সাম্য স্থাপিত হইবে, অন্যথা নহে। অর্থাৎ,

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{AB}{BC}$$

এরূপ সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রধান সর্ত। এই আবিষ্কারে স্টেভিনাস নিজেই এত আশ্চর্য হন যে তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "Wonder en is gheen Wonder"—"বিস্ময়কর বটে, তথাপি বিস্মিত হইবার কিছু নাই।"

বলের সামান্তরিক সূত্র : বস্তুর সাম্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে ষ্টেভিনাস বলের সামান্তরিক সূত্রও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মনে করা যাক, O বস্তুর উপর OP ও OQ দুইটি বল কাজ করিতেছে। এখন বলের তীব্রতা অনুপাতে OP ও OQ সরল রেখা হইতে যথাক্রমে OA ও OB অংশ কাটিয়া লওয়া হোক। এইবার $OARB$ সামান্তরিকটি (parallelogram) সম্পূর্ণ করিয়া OR কর্ণ টানা হোক। ষ্টেভিনাস বলিলেন, O বিন্দুতে স্থাপিত বস্তুর উপর OA ও OB বলদ্বয়ের ক্রিয়া যাহা হইবে, সামান্তরিকের কর্ণ OR রেখার দ্বারা যে বল নির্দিষ্ট হইতেছে তাহার ক্রিয়াও অবিকল তদ্রূপ। আমরা জানি, সংক্ষেপে ইহাই বলের সামান্তরিক সূত্র।

ষ্টেভিনাস ও তাঁহার বন্ধু গ্রোটিয়াস পড়ন্ত বস্তু সম্বন্ধেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পাদন করেন। এরূপ এক পরীক্ষায় দুইটি ভিন্ন ওজনের সীসার বল এক সঙ্গে ৩০ ফুট উচ্চতা হইতে নীচে ফেলা হয়; একটি বলের ওজন অপরটির প্রায় দশগুণ। ষ্টেভিনাস ও গ্রোটিয়াস বল দুইটি একই সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করিতে লক্ষ্য করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার বলবিদ্যার গ্রন্থে পরীক্ষাটি বর্ণিত হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, পিসায় অবস্থান-কালে গ্যালিলিও অনুরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত, ষ্টেভিনাস গ্যালিলিওর কিছু পূর্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি সম্পাদন করেন।

তরল পদার্থের চাপ : উদস্থিতিবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্যও ষ্টেভিনাস বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তরল পদার্থের চাপ পাত্রের আকৃতির উপর নির্ভর করে না, ইহা নির্ভর করে পাত্রস্থ তরল পদার্থের উচ্চতার উপর, এই সত্য তিনি কয়েকটি
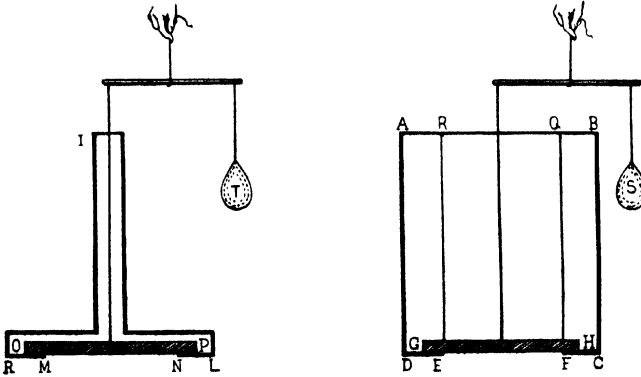
৫৯। তরল পদার্থের চাপ সম্বন্ধে ষ্টেভিনাসের পরীক্ষা।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। ষ্টেভিনাসের এই পরীক্ষা আজও প্রাথমিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের দেখানো হয়। $ABCD$ পাত্রের তলদেশের কিছুটা অংশ EF খোলা; ইহা একটি কাঠের চাকতি GH দ্বারা বন্ধ (৫৯ নং চিত্র)। IRL তলদেশ খোলা এরূপ আর একটি পাত্র; এই খোলা অংশ সমান আয়তনের কাঠের চাকতি OPর দ্বারা বন্ধ। IRL পাত্রের উচ্চতা $ABCD$ পাত্রের উচ্চতার সমান। GH ও OP চাকতিদ্বয় যথাক্রমে দুইটি তুলাদণ্ডের এক প্রান্ত হইতে ঝুলানো। তুলাদণ্ডের অপর প্রান্তের পাল্লায় ওজন চাপাইবার ব্যবস্থা। এইবার পাত্র দুইটিকে জলপূর্ণ করিয়া অপর পাল্লায় ধীরে ধীরে ওজন বাড়ানো হইল। এই ওজন

জলের চাপ অপেক্ষা বেশী না হওয়া পর্যন্ত চাকতি পাত্রের তলদেশের ছিদ্র আটকাইয়া থাকিবে, কিন্তু বেশী হওয়া মাত্র ওজনের পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবার সংগে সংগে চাকতি স্থানচ্যুত হইবে এবং তলদেশ দিয়া জল নির্গত হইবে। স্টেভিনাস দেখান, উভয় ক্ষেত্রেই একটি সমান ও নির্দিষ্ট ওজন অতিক্রম করিবার সংগে সংগে চাকতি স্থানচ্যুত হইতেছে; অর্থাৎ উভয় পাত্রে চাকতির উপর জলের চাপ সমান। এই পরীক্ষার দ্বারা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইল যে, জলের চাপ পাত্রস্থ জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এই প্রসংগে স্টেভিনাস মন্তব্য করেন, এক পাউন্ড জলের সাহায্যে উপরিউক্ত উপায়ে অতি সহজে এক লক্ষ পাউন্ড জলের চাপ সৃষ্টি করা যায়। আধুনিক ঔদক চাপযন্ত্রের (hydraulic press) ইহাই মূল নীতি।

তরল পদার্থের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে চাপ সব দিকে সমান হয়, স্টেভিনাস এরূপ আন্দাজ করিয়াছিলেন। তবে এ সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার কিছু লিখিয়া যান নাই। ফরাসী বিজ্ঞানী পাসকাল প্রথম এই নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (১৬৬৩)। ভাসমান বস্তুর সাম্য-সর্ত সম্বন্ধেও স্টেভিনাস কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গ্যালিলিওর বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা

সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা সমর্থন করিতে গিয়া ধর্মসংস্থার সহিত বিরোধ এবং সেই বিরোধের অপ্রীতিকর পরিণতির ফলে বৃদ্ধ বয়সে লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন ভোগ প্রভৃতি কারণে গ্যালিলিওর জ্যোতিষীয় গবেষণা স্বভাবতঃই পরবর্তী কালের বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের ব্যাপক দৃষ্টি ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই প্রশংসা তাঁহার সর্বতোভাবে প্রাপ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার আর এক নির্ভুল প্রকাশ দেখিতে পাই। গতি, ত্বরণ ও বল সম্বন্ধীয় তাঁহার নিঃশব্দ ও যুগান্তকারী গবেষণাকে কেন্দ্র করিয়া কোন আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু এইসব গবেষণার দ্বারা তিনি সুনিশ্চিতরূপে সর্বকালের জন্য অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যার বনিয়াদ ধূলিসাৎ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বলবিদ্যায় তিনি যে বিপ্লব সাধন করেন সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহা কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় বিপ্লব অপেক্ষাও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। লাগ্রাঁজ গ্যালিলিওর বলবিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণার সমালোচনা প্রসংগে লিখিয়াছেন,

> "These discoveries did not bring to him while living as much celebrity as those which he had made in the heavens ; but today his work in mechanics forms the most solid and the most real part of the glory of this great man. The discovery of Jupiter's satellites, of the phases of Venus, and the Sun-spots, etc., required only a telescope and assiduity ; but it required an extraordinary genius to unravel the laws of nature in phenomena which one has always under the eye, but the explanation of which, nevertheless, had always baffled the researches of philosophers."

অর্থাৎ, এইসব (বলবিদ্যা সংক্রান্ত) গবেষণার জন্য জীবদ্দশায় তিনি তেমন খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই যেমন করিয়াছেন তাঁহার আকাশের গবেষণায়। কিন্তু যার জন্য এই মহা মনীষার সত্যকার গৌরব তাহা হইতেছে তাঁহার বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা। বৃহস্পতির উপগ্রহ, শুক্র-কলা বা সৌর কলঙ্ক আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আর ধৈর্যের; কিন্তু

যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে এবং যাহাদের তাৎপর্য বুঝিতে দার্শনিকগণ বারংবার বিফল হইয়াছেন, সেইসব ঘটনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির নিয়ম ও নীতি আবিষ্কার করা একমাত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

পিসায় অবস্থানকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুরুতেই গ্যালিলিও বলবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শেষ জীবন পর্যন্ত এই বিদ্যায় তাঁহার উৎসাহ অটুট ছিল এবং যখনই অবসর পাইয়াছেন বলবিদ্যা সংক্রান্ত নানা পরীক্ষায় তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে সারা জীবনের পরিণত চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Mathematical discourses concerning two new Sciences Relating to Mechanics and Local Motion* প্রকাশ করেন ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থও কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্যালিলিও লিখিয়াছেন, "একটি অতি সুপ্রাচীন বিষয়ের আলোচনার দ্বারা এক নূতন বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করা আমার উদ্দেশ্য। প্রকৃতিতে গতি অপেক্ষা পুরাতন বোধ হয় আর কিছুই নাই। এই গতি সম্বন্ধে দার্শনিকগণ এপর্যন্ত বড় কম গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তথাপি পরীক্ষার দ্বারা আমি এই গতির প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি জিনিস আবিষ্কার করিয়াছি যাহা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই।...... পড়ন্ত বস্তুর গতি ও ত্বরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ ভাসা ভাসা ও খাপছাড়া কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ত্বরণের মাত্রা কিরূপ সে সম্বন্ধে সঠিক কেহ কিছু এ পর্যন্ত বলেন নাই।"

পড়ন্ত বস্তুর গতি : গ্যালিলিওর প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে লিওনার্দো এবং তাঁহারও পূর্বে প্ররোচনাবাদের সমর্থকগণ পড়ন্ত বস্তুর ক্রমবর্ধমান গতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি পরিমাণে ও কি নিয়মে গতির বৃদ্ধি হয় তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। গ্যালিলিও ইহা নির্ণয় করিলেন। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, পড়ন্ত বস্তুর বেগ (v) নীচের দিকে বস্তু যে পথ নামিয়া আসে সেই পথের বা দূরত্বের (s) আনুপাতিক; অর্থাৎ

$$v \propto s$$

পরে তিনি এরূপ সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারেন। ইহা সত্য হইলে বস্তুর আদৌ নীচে পড়িবার কথা নহে, ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র ইহার শূন্যেই ঝুলিয়া থাকা উচিত। তাঁহার পরবর্তী অনুমান হইল, এই বেগ সময়ের আনুপাতিক, অর্থাৎ

$$v \propto t$$

$$v = ft\,; \quad f = \text{ধ্রুবক (constant).}$$

পড়িবার অব্যবহিত পূর্বে বস্তুর বেগ যদি o হয় এবং t সময় পরে এই বেগ বৃদ্ধি পাইয়া যদি v হয়, তবে এই সময়ের মধ্যে বস্তুর গড়পড়তা বেগ $\frac{1}{2}v$ ধরা যাইতে পারে। এখন t সময়ের মধ্যে এরূপ গড়পড়তা $\frac{1}{2}v$ বেগে বস্তুটি s দূরত্ব অতিক্রম করিলে আমরা সহজেই দেখাইতে পারি,

$$\begin{aligned} s &= \tfrac{1}{2}\, v\, t \\ &= \tfrac{1}{2}\, f\, t^2, \text{ কারণ } v = f\,t \\ &\propto t^2, \quad \text{কারণ } \tfrac{1}{2} f = \text{ধ্রুবক} \end{aligned}$$

উপরিউক্ত আঙ্কিক সম্পর্কের তাৎপর্য এই যে, ১ সেকেণ্ডে পড়ন্ত বস্তু যদি s দূরত্ব নীচে নামিয়া আসে, ২ সেকেণ্ডে ইহা নামিয়া আসিবে ইহার চারগুণ ($4\,s$), ৩ সেকেণ্ডে নয়গুণ ($9\,s$), ৪ সেকেণ্ডে ১৬ গুণ ($16\,s$) ইত্যাদি।

নত সমতলের পরীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত সম্পর্কের প্রমাণ : এই সিদ্ধান্ত যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে গ্যালিলিও এক অতি চমৎকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এরূপ পরীক্ষায় পড়ন্ত বস্তুর উচ্চতা ও সেই উচ্চতা হইতে মাটিতে পড়িতে যে সময় লাগে তাহা নির্ভুলভাবে মাপিবার

বন্দোবস্ত থাকা চাই। উচ্চতা মাপা কঠিন নহে; কিন্তু কয়েক সেকেন্ড এমন কি এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে যে বস্তু মাটিতে পড়িতেছে সেই সেকেন্ড বা সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মত এত ক্ষুদ্র সময় মাপা যায় কিরূপে? সরাসরি গ্যালিলিওর সময় প্রচলিত জলঘড়ি বা যান্ত্রিক ঘড়ির কাঁটার সাহায্যে এত ক্ষুদ্র সময় মাপা অসম্ভব ছিল। দুই উপায়ে গ্যালিলিও এই সমস্যার সমাধান করেন। প্রথমতঃ বস্তুকে সোজা পড়িতে না দিয়া নত সমতলের (inclined plane) উপর গড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন; ইহাতে বস্তুর বেগ মন্দীভূত হওয়ায় নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিবার সময় দীর্ঘতর হইল। দ্বিতীয়তঃ জলঘড়ির ছিদ্রপথে নির্গত জল একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা অতি যত্নের সহিত ওজন করিয়া তিনি যতদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে সময় নিরূপণের চেষ্টা করেন। পাত্রে যত বেশী বা কম জল জমা হইবে সময়ও সেই অনুপাতে তত বেশী বা কম অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নত সমতলের এরূপ এক পরীক্ষায় ১২ গজ লম্বা একটি বোর্ড ব্যবহৃত হয়। এই বোর্ডের উপর অর্ধ ইঞ্চি চওড়া একটি নালী কাটা। এই দীর্ঘ ও সোজা নালীটি আবার মসৃণ পার্চমেন্ট দিয়া মোড়া। নত বোর্ডের উপর এই মসৃণ নালীপথে একটি অতি মসৃণ পিতলের গুলীকা গড়াইয়া দেওয়া হয়। সমগ্র নালীপথ অর্থাৎ ১২ গজ দূরত্ব এবং ইহার এক চতুর্থভাগ অর্থাৎ ৩ গজ দূরত্ব গড়াইয়া পড়িতে পিতলের গুলীকার যতটুকু সময় লাগে তাহা বারংবার অতীব যত্ন ও ধৈর্যের সহিত জলঘড়ির সাহায্যে মাপিয়া গ্যালিলিও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, পুরো বোর্ডের দৈর্ঘ্য গড়াইয়া পড়িতে যে সময় লাগে তাহার ঠিক অর্ধেক সময়ে গুলীকাটি এক-চতুর্থ দৈর্ঘ্য গড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং পড়ন্ত বস্তুর দূরত্ব ও সময়ের মধ্যে যে আঙ্কিক সম্পর্ক নির্ণীত হইয়াছিল তাহার সত্যতা হুবহু প্রমাণিত হইল।

ত্বরণের সংজ্ঞা : উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের ও পরীক্ষার মূল ভিত্তি হইল :

$$v = ft, \qquad \text{অথবা} \quad f = \frac{v}{t}$$

অর্থাৎ পড়ন্ত বস্তুর বেগ সময়ের সঙ্গে ক্রমশঃ ত্বরিত হইয়া থাকে। আমরা বলিয়াছি, f একটি ধ্রুবক। এখন t র মান ১ ধরিলে, $f = v$। ইহার অর্থ এই যে, একক সময়ে বেগের যে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) ঘটে তাহাই f; আরও সংক্ষেপে f হইতেছে বেগ বৃদ্ধির (বা হ্রাসের) হার (rate of change of velocity)। ইহার নাম ত্বরণ (acceleration)। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি সুবর্ণ মুহূর্তে ত্বরণ সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বলবিদ্যাকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন হইল।

বল ও বস্তুর জড়ত্ব : গতির ত্বরণের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে বল (force) সম্বন্ধেও চিরাচরিত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এতদিন জানা ছিল, বলের কার্য বস্তুকে গতিশীল করা। গ্যালিলিও বলিলেন, গতির সৃষ্টি নহে গতির পরিবর্তন সাধন করাই হইল বলের আসল কাজ। যে বস্তুর উপর কোন বল কার্য করিতেছে না সেই বস্তু হয় নিশ্চল থাকিবে নয় সমবেগে গতিশীল থাকিবে। বস্তুর পক্ষে স্থিতি বা গতি দুইই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; বাহির হইতে বলপ্রয়োগ ছাড়া ইহার স্থিতি ভঙ্গ করা অথবা গতিশীল অবস্থায় থাকিলে সেই গতির এতটুকু পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। সংক্ষেপে ইহাই বস্তুর জড়বাদ বা principle of inertia.

বলের স্বরূপ, বস্তুর জড়ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্তগুলি গ্যালিলিও পরিষ্কারভাবে লিখিয়া যান নাই। তাঁহার পরীক্ষা ও সেই সম্বন্ধে নানা মন্তব্য হইতে অবশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি জড়বস্তুর গতি সংক্রান্ত নীতিগুলি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই নীতিগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম প্রয়াস আমরা দেখি দেকার্তের মধ্যে। দেকার্ত লিখিয়াছেন (১৬৪৪), "যখন কোন বস্তু নিশ্চল অবস্থায় থাকে

তখন ইহা সেই অবস্থাতেই থাকিবার চেষ্টা করে এবং এই অবস্থান্তরের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত সর্বপ্রকার প্রয়াসকে বাধা দিয়া থাকে। সেইরূপে বস্তু গতিশীল হইলে ইহা সর্বদা সমবেগে একই দিকে চলিবার চেষ্টা করে।" এই রচনার ত্রিশ বৎসর পরে হাইজেন্স্ একই কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "অভিকর্ষ না থাকিলে এবং বায়ুমণ্ডল বস্তুর গতিকে ব্যাহত না করিলে কোন বস্তুর উপর একবার গতি চাপানো হইলে ইহা অনন্তকাল ধরিয়া সরল রেখায় একই বেগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকিবে।" ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন *Principia* য় উপরিউক্ত সত্য তিনটি সূত্র মারফত প্রকাশ করেন; অদ্যাপি ইহারা নিউটনের গতিসূত্র নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই যুগান্তকারী নীতিগুলির আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্যালিলিওর প্রাপ্য।

আলোকবিদ্যা ও চুম্বকবিদ্যা

মধ্যযুগে আলোকবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার প্রাধান্য লাভের কথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। এই বিদ্যায় ইব্ন্ আল্-হাইথাম, ইব্ন্ সিনা প্রমুখ মুসলমান বিজ্ঞানিগণের গবেষণাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ইউরোপে গ্রোসেটেস্ট, বেকন ও ভিটেলোর আলোক সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রধানতঃ ঐস্লামিক আলোকবিদ্যার পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ মাত্র। ইহার পর আলোকবিদ্যায় যুগান্তকারী গবেষণাসমূহ সম্পাদিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। দেকার্ত, গ্রিমাল্ডি, রোয়েমার, হুক, হাইজেন্স্ ও নিউটনের গবেষণা হইতেই আধুনিক আলোকবিদ্যার সূত্রপাত। আলোকবিদ্যায় এই নূতন যুগ সুরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে দুইজন বিজ্ঞানীর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হইলেন কেপ্লার ও ভিলব্রোর্ড স্নেল।

কেপ্লার : কেপ্লারের *Ad vitellionem paralipomena*-র (১৬০৪) কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভিটেলোর কাজ ছাড়া কেপ্লারের নিজস্ব অনেক মৌলিক গবেষণা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দূরত্বের সঙ্গে আলোকের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে, আলোকের উৎসকে কেন্দ্র করিয়া যে কোন দূরত্বের ব্যাসের গোলক কল্পনা করিলে আলোকের ঔজ্জ্বল্য সেই গোলকপৃষ্ঠের ক্ষেত্রের ব্যস্ত অনুপাত (inversely proportional) হইবে। এখন গোলকপৃষ্ঠের ক্ষেত্র ব্যাসের দ্বিঘাতের আনুপাতিক, অর্থাৎ $\propto r^2$; সুতরাং আলোকের ঔজ্জ্বল্য দূরত্বের দ্বিঘাতের ব্যস্ত অনুপাত অনুযায়ী পরিবর্তিত হইবে।

আলোকের প্রতিসরাঙ্ক নিরূপণের জন্য কেপ্লার কতকগুলি পরীক্ষা করেন। কিন্তু প্রতিসরণের সাইন-নিয়ম তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থাকায় তিনি আপাতন ও প্রতিসরণ কোণের অনুপাত নির্ণয় করিয়া তাহাকেই প্রতিসরাঙ্ক হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন; ফলে তাঁহার নির্ণীত মান প্রতি ক্ষেত্রেই কিছুটা ভুল হইয়াছিল। এক ও একাধিক লেন্সের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি কিভাবে বাঁকিয়া যায় এবং নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় কেপ্লার জ্যামিতির সাহায্যে তাহা অঙ্কন করিয়া দেখান। এইভাবে তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকলাপের এক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। লেন্সের গোলাপেরণ (spherical aberration) দোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বৃত্তাকারের পরিবর্তে পরাবৃত্তাকার লেন্স্ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তাঁহার সময়ে শারীরবিদ্দের ধারণা ছিল, অক্ষিকোটরের লেন্সের এক পিঠ পরাবৃত্তাকার; সুতরাং দূরবীক্ষণ বা অনুরূপ যন্ত্রে এই জাতীয় লেন্স্ ব্যবহার করিলে প্রতিবিম্বে গোলাপেরণ দোষ আর থাকিবে না।

স্নেল (১৫৯১-১৬২৬) : আলোক প্রতিসরণের সাইন-নিয়ম আবিষ্কৃত হয় কেপ্লারের সমসাময়িক লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ভিলব্রোর্ড স্নেলের গবেষণা অবলম্বনে। বর্তমানে এই নিয়মকে আমরা যেভাবে জানি সেই সাইন সূত্রাকারে স্নেল তাঁহার নিয়ম লিপিবদ্ধ

করেন নাই। তিনি দেখান, একটি জলপূর্ণ পাত্রে বাতাস হইতে জলে আলোক তির্যকভাবে প্রবেশ করিয়া পাত্রের খাড়া দেহ স্পর্শ করিলে আলোকের এই প্রতিসরণ-পথ এবং প্রতিসরণ না হইলে পাত্রের দেহ পর্যন্ত আলোকের যে পথ হইত সেই পথের অনুপাত সর্বদা এক। এই নিয়ম হইতে সাইন কোণানুপাতের নিয়ম অবশ্য সহজেই কষিয়া বাহির করা যায়, কিন্তু স্নেল তাহা করেন নাই। দেকার্ত তাঁহার *Dioptrique*-এ (১৬৩৭) ইহা প্রথম প্রমাণ করেন। তারপর স্নেল তাঁহার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন নাই। ক্রিশ্চিয়ান হাইজেন্‌স্ স্নেলের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা তিনিই প্রথম প্রচার করেন।

চৌম্বক বিকার : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে চুম্বকবিদ্যার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে কম্পাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এই উন্নতির এক প্রধান কারণ। কম্পাসের চৌম্বক শলাকা যে ঠিক ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ অর্থাৎ মধ্যরেখার (meridian) সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে না, মধ্যরেখার সহিত একটি ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করে, পঞ্চদশ শতাব্দীর কোনও এক সময় ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার নাম 'চৌম্বক বিকার' (magnetic declination)। এই বিকারের মাত্রা সর্বত্র সমান নহে। চৌম্বক বিকারের এরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নাবিকদের ধারণা হইয়াছিল, এই পরিবর্তনের সহিত দেশান্তরের একপ্রকার সম্বন্ধ থাকা কিছু বিচিত্র নয় এবং এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলে মধ্যসমুদ্রে সঠিকভাবে দেশান্তর নিরূপণের সমস্যার একটা সহজ সমাধান হইতে পারে। এই আশায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষতঃ জলভাগে, চৌম্বক বিকার নির্ণয়ের একটা হিড়িক পড়িয়া যায়। তারপর যেসব স্থানের বিকারের মাত্রা সমান, মানচিত্রে তাহাদের যোগ করিয়া কতকগুলি রেখাঙ্কন (isogonic lines) টানা হয়। এই রেখাঙ্কনগুলির মধ্যে কোনরূপ নিয়ম বা শৃঙ্খলা দেখা গেলে হয়ত বা দেশান্তর নিরূপণে ইহাদের কাজে লাগানো যাইত; কিন্তু রেখাঙ্কনগুলি নিতান্তই খাপছাড়া ধরনের হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইহারা কোন উপকারে আসে নাই।

বিনতি : এই সময় চৌম্বক শলাকার আর একটি গুণ 'বিনতি' (dip) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চুম্বক শলাকাকে ইচ্ছামত অবস্থান করিবার সুযোগ দিয়া ঝুলাইবার ব্যবস্থা করিলে দেখা যাইবে, ইহা ক্ষিতিজের সহিত সমান্তরাল থাকিবার পরিবর্তে তির্যকভাবে অবস্থান করিতেছে। চুম্বকের এই ধর্মের নাম বিনতি। তির্যকভাবে থাকিবার জন্য ক্ষিতিজের সহিত চুম্বক শলাকা যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাই বিনতির মাপ। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ হার্টম্যান নামে এক জার্মান পাদরী এই গুণ প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু তাঁহার রচনা বহুদিন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই আবিষ্কারের কথা অনেক পরে জানা গিয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট নর্ম্যান নামে এক ইংরেজ কম্পাস-নির্মাতা স্বাধীনভাবে চুম্বকের বিনতি আবিষ্কার করেন। লণ্ডন সহরের জন্য এই বিনতির পরিমাপ তিনি নির্ণয় করেন ৭১°৫০′। *The Newe Attractive* গ্রন্থে নর্ম্যান তাঁহার আবিষ্কারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

উইলিয়ম গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩) : সুপ্রাচীন অতীতে চৌম্বক প্রস্তর আবিষ্কারের পর হইতে মধ্যযুগে পেত্রাস পেরেগ্রিনাস, আমাল্‌ফি নিবাসী ফ্লাভিও গিয়োজা এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নাবিকদের চুম্বক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে ধীরে ধীরে যে এক নূতন বিদ্যার উদ্ভব হইতেছিল তাহাকে রূপ দান করেন উইলিয়ম গিলবার্ট। চৌম্বক বিদ্যাকে একটি নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মধ্যেই তাঁহার কৃতিত্ব নিবদ্ধ নহে, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব গবেষণাও অতীব মৌলিক। পরীক্ষামূলক গবেষণায় সমসাময়িক ইংরেজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ যে অল্প কয়জন বিজ্ঞানীর তৎপরতায় ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষামূলক গবেষণার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গিলবার্ট নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম।

তৎরচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *De Magnete*- এর (প্রকাশ-কাল—১৬০০) প্রধান আলোচ্য বিষয় চৌম্বক বিদ্যা; একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে তিনি তড়িৎ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। গোলাকার চৌম্বক প্রস্তরের মেরুদ্বয় নির্ণয় করিবার এক পদ্ধতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র কম্পাসকে চৌম্বক গোলকের উপরিভাগে বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া চৌম্বক কাঁটার দুই অগ্রভাগ গোলকের গায়ে চিহ্নিত করা হয়। পরে এই চিহ্নগুলি যোগ করিলে দেখা যায়, রেখাগুলি গোলকের ঠিক বিপরীত দিকে দুইটি বিন্দুতে গিয়া মিলিত হইয়াছে; এই বিন্দুদ্বয়ই চৌম্বক প্রস্তরের মেরু।

এইরূপ পরীক্ষাকালে গিলবার্ট আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করেন। দুই মেরু হইতে সমান দূরত্বে, অর্থাৎ চৌম্বক গোলকের বিষুব বৃত্তে, কম্পাসের কাঁটা গোলকপৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে অবস্থান করে; কিন্তু বিষুব বৃত্ত হইতে চৌম্বক মেরুর দিকে লইয়া গেলে দেখা যায়, চৌম্বক কাঁটা ক্রমশঃই গোলকপৃষ্ঠের সহিত বেশী বাঁকিয়া থাকিতেছে এবং মেরুতে পোঁছিলে একেবারে সোজা লম্বভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। চৌম্বক কাঁটার এই প্রকার বিনতি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে গিলবার্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী একটি অতিকায় চৌম্বক গোলক। তারপর চুম্বককে এক বা একাধিক খণ্ডে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক খণ্ডেই যে দুইটি করিয়া চৌম্বক মেরু আত্মপ্রকাশ করে, চুম্বকের এই বিশেষত্ব গিলবার্ট প্রমাণ করেন। তিনি উন্নত ধরনের একটি বিনতিমাপক যন্ত্রও তৈয়ারী করিয়াছিলেন; পঞ্চম খণ্ডে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

কেপ্‌লারের উপর গিলবার্টের গবেষণার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ৩২৫)। চৌম্বক আকর্ষণের মত এক প্রকার আকর্ষণ বলেই, অর্থাৎ anima motrix-এর দ্বারা সূর্য যে পরিক্রমণরত গ্রহদের ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, কেপ্‌লারের এজাতীয় আলোচনার প্রধান অনুপ্রেরণা ছিলেন গিলবার্ট।

দ্বাদশ অধ্যায়

১২·১। অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত : শোণিত-সংবহন আবিষ্কার

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শারীরস্থান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ যেসব গবেষণা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গ্রন্থাকারে লিখিয়া যান নাই। এজন্য তাঁহার অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার গবেষণার ও চিন্তাধারার লিখিত বিবরণ না থাকিলেও সমসময়ে এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পরও পূর্ণ এক শতাব্দী পর্যন্ত লিওনার্দোর প্রভাব পরোক্ষভাবে ইউরোপের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক মহলে অনুভূত হইয়াছিল। এরূপ প্রভাবের আর এক দৃষ্টান্ত ফ্লেমিশ অ্যান্ড্রিয়া ভেসালিয়াসের শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় গবেষণা। বস্তুতঃ ভেসালিয়াস লিওনার্দোর আরব্ধ কর্মকেই সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণা হইতেই আধুনিক অ্যানাটমির সূত্রপাত।

অ্যান্ড্রিয়া ভেসালিয়াস (১৫১৪-৬৪)

অ্যান্ড্রিয়া ভেসালিয়াসের জন্ম হয় ব্রুসেল্স্-এ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত ফ্লেমিশ বংশে। তিনি প্রথমে ব্রুসেল্সের এক বিদ্যালয়ে এবং পরে লুভ্যাঁ ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি বিজ্ঞানের বিশেষতঃ শারীরবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় লুভ্যাঁ ও প্যারীর শারীরবৃত্তের পাঠ ছিল নিতান্তই সেকেলে ও মধ্যযুগীয়। গ্যালেন প্রমুখ প্রাচীন শারীরবিদ্‌গণের প্রামাণিক গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের বাহিরে নূতন কিছুর শিক্ষাদান অথবা গবেষণা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনরূপ উৎসাহ ছিল না। লুভ্যাঁ ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যালেনের শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের পাঠ তাঁহার খুব ভাল-ভাবেই আয়ত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন ইহাতে বেশী দিন তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। তারপর কতকগুলি বিষয়ে গ্যালেনের পর্যবেক্ষণ ও মতবাদের উপর তাঁহার সন্দেহ ও অনাস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি প্যারী পরিত্যাগ করিয়া ইতালীর প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পাদুয়ায় স্থায়ীভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত এতটা সংরক্ষণশীল ছিল না। ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষতঃ পাদুয়ায় প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থকারদের পাণ্ডিত্যের গুরুভার বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চাপিয়া রাখে নাই; উন্নততর পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা তখন সেখানে ছিল।

পাদুয়াতে আসিয়া ভেসালিয়াস স্বাধীনভাবে শারীরস্থান সম্পর্কিত গবেষণার এই বহু প্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অধ্যাপনা ও গবেষণার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি পাদুয়ার অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াও তিনি স্বহস্তে শব-ব্যবচ্ছেদ কার্য হইতে বিরত হন নাই। পক্ষান্তরে নিম্নতন কর্মচারীদের দ্বারা শব-ব্যবচ্ছেদ করাইবার রীতি উঠাইয়া দিয়া এই কার্যে অধ্যাপকদের স্বয়ং প্রবৃত্ত হইবার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার তিনি সাধন করেন। মনদিনো দি লুজ্‌জির পর দুইশত বৎসর যাবৎ অধ্যাপক উচ্চাসন হইতে প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী শব-ব্যবচ্ছেদের হুকুম দিয়া আসিয়াছেন। ভেসালিয়াস সেই অধ্যাপককে অস্ত্রোপচার টেবিলের কাছে গিয়া স্বহস্তে ছুরি চালাইতে বাধ্য করিলেন। জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধিত হইল।

PLATE XV

অ্যাণ্ড্রিয়া ভেসালিয়াস (১৫১৪-৬৪)।

By kind permission of Messrs. George Allen & Unwin Ltd., London.

PLATE XVI
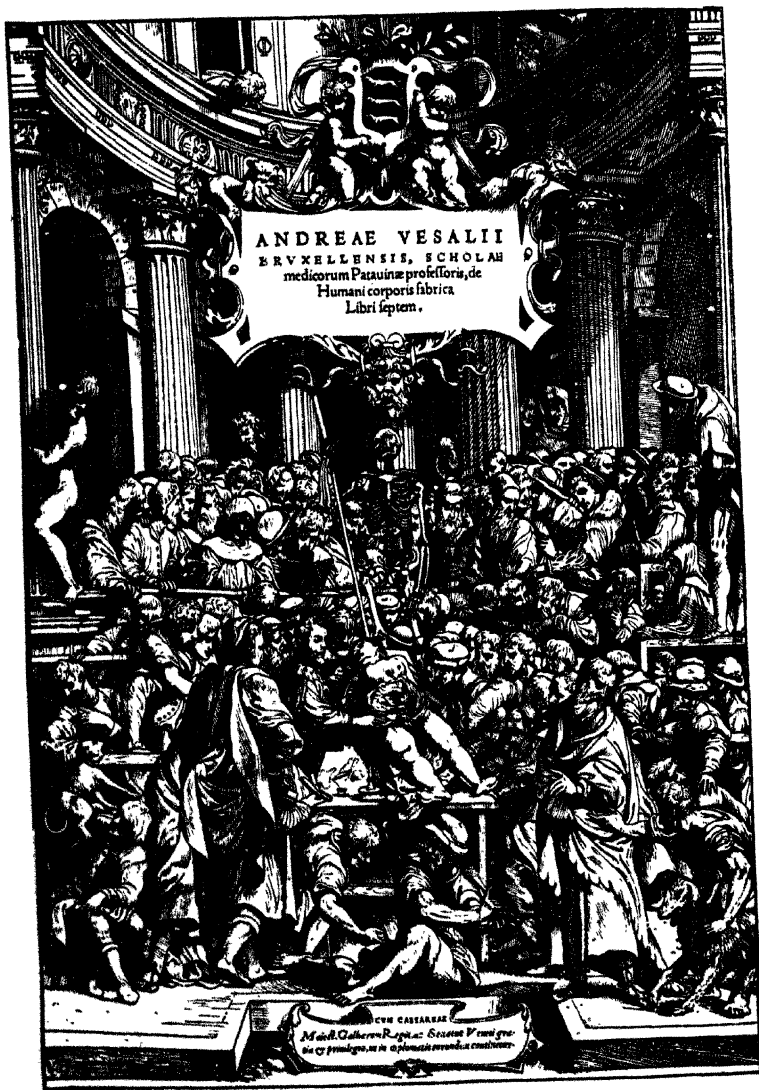
পাদ্‌য়ায় ছাত্রদের মধ্যে শব-ব্যবচ্ছেদে রত ভেসালিয়াস। *De fabrica corporis humani* গ্রন্থে চিত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে। (*Scientific American*, May, 1948).

পাদুয়ায় আসিবার কিছু পরেই ভেসালিয়াস ছাত্রদের সুবিধার্থ শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে অ্যারিস্টটল বা গ্যালেনের বাহিরে কোন নূতন তথ্যের বা মতবাদের আলোচনা নাই। কিন্তু পাদুয়ায় কয়েক বৎসরের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহাতে তাঁহার ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের নানা ব্যাপারে গ্যালেনের শিক্ষার অপর্যাপ্ততা ও ভুল তিনি বুঝিতে পারেন। এই নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ *De fabrica corporis humani*তে আলোচনা করেন। *De fabrica*র প্রকাশকাল ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ বিজ্ঞানের ইতিহাসে অতীব স্মরণীয়। এই গ্রন্থে শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় গবেষণায় যুগান্তর সূচিত হয়। ইহার পর হইতে এই বিদ্যায় গ্যালেন ও অ্যারিস্টটলের পরিবর্তে ভেসালিয়াসই হইলেন গবেষকদের প্রধান আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। চিকিৎসাবিদ্যায় বহু বিলম্বিত গ্যালেনের কাল যে শেষ হইয়া গেল তাহাতে এখন আর সন্দেহ রহিল না।
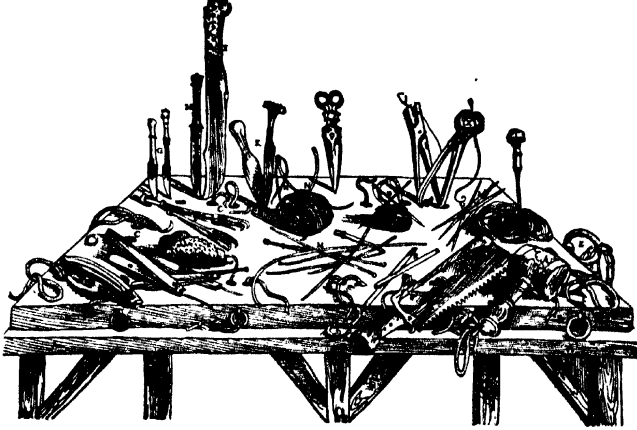
৬০। জীবন্ত প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ-কার্যে ভেসালিয়াস কর্তৃক ব্যবহৃত নানাবিধ শস্ত্র ও যন্ত্র। চিত্রটি ক্যালকার কর্তৃক অঙ্কিত। টেবিলের উপর বড় একটি কাষ্ঠখণ্ড রক্ষিত। এই কাষ্ঠখণ্ডে প্রয়োজনমত গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতি সাজাইয়া রাখা হয়। কতকগুলি লোহার আংটা ও তৎসংলগ্ন দড়ি দ্রষ্টব্য। জীবন্ত প্রাণীকে এই দড়ি ও আংটার সাহায্যে বাঁধিয়া নিস্তেজ ও নিশ্চল করিয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তাহার উপর ছুরি চালানো যায় সেই জন্য এই ব্যবস্থা।

De fabrica : প্রকাশের সময় ভেসালিয়াসের বয়স ছিল মাত্র ২৯। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ এই তরুণ অধ্যাপকের মতবাদ সাগ্রহে গ্রহণ করে। তাঁহার খ্যাতি এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, ঐ বৎসরই তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লস কর্তৃক রাজচিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য স্পেনদেশে আমন্ত্রিত হন। পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত এই রাজচিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। পাদুয়া পরিত্যাগের পর তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; এমন কি ইহার পর আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও তিনি লেখেন নাই।

De fabrica: ভেসালিয়াস তাঁহার এই গ্রন্থে প্রথমেই আলোচনা করিয়াছেন অস্থি ও অস্থি-সন্ধির কথা। অস্থির বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারে তিনি মোটামুটি গ্যালেনের

পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। অস্থির মধ্যে করোটির আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার এই আলোচনার বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব এই যে, তিনিই প্রথম করোটির আকৃতির বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া এই বিভিন্নতার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। করোটির আকৃতির এরূপ বিভিন্নতার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ আধুনিক নৃতত্ত্বীয় গবেষণার এক অপরিহার্য অঙ্গ; কারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব, তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহুল পরিমাণে করোটির আকৃতির উপর নির্ভর করে। ভেসালিয়াস করোটির আকৃতির প্রভেদই শুধু নির্ণয় করেন নাই, মানুষ ও বিভিন্ন জন্তুর করোটির এক তুলনামূলক আলোচনাও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অস্থির পর তিনি আলোচনা করিয়াছেন পেশী। পেশীর আলোচনায় ও নির্ভুল চিত্রাঙ্কনে তিনি অনেক আধুনিক শারীরবিদ্‌কেও অতিক্রম করিয়াছেন। শব-ব্যবচ্ছেদের পর পেশীদের যেমন দেখায় ভেসালিয়াসের পূর্বে অনেকেই তাহা নিখুঁতভাবে আঁকিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু জীবিতাবস্থায় পেশীসমূহের অবস্থান কিরূপ তাহা কেহ আঁকিয়া দেখাইতে পারেন নাই। এই কাজ রীতিমত সুকঠিন। ভেসালিয়াস এরূপ জীবন্ত মানুষের পেশী-সংস্থান নিখুঁতভাবে দেখাইবার চেষ্টা করেন। মানুষের চর্ম স্বচ্ছ হইলে বাহির হইতে তাহার পেশীগুলিকে কেমন দেখাইত, অপূর্ব দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত তাহার এক চিত্ররূপ তিনি প্রদান করেন। এই চিত্র অবশ্য ভেসালিয়াস নিজে আঁকেন নাই; তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ক্যালকার এগুলি আঁকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, ক্যালকার ভেসালিয়াসের প্রায় সব গ্রন্থের চিত্রই আঁকিয়াছিলেন।

ভেসালিয়াসের পূর্বে হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যেক শারীরবিদ্‌ই কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই গ্যালেনের অপেক্ষা উন্নততর মতবাদ প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। হৃৎপিণ্ডের গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে লিওনার্দো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন, যেমন কপাটক, হৃৎপিণ্ডের দুইটির পরিবর্তে চারটি প্রকোষ্ঠ, কেবলমাত্র একদিকে শোণিত সংবহন ইত্যাদি। কিন্তু তিনি কখনও শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে গ্যালেনের মতের বিরুদ্ধতা করেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, গ্যালেনের মত তাঁহারও বিশ্বাস ছিল যে, সেপটামের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে শোণিত দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেপটাম বাস্তবিকই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ এক সছিদ্র দেয়াল কিনা সে বিষয়ে ভেসালিয়াস প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। হৃৎপিণ্ড-ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেপটাম একটি অতি নিরেট দেয়াল মাত্র এবং তাহার মধ্যে ছিদ্রের অস্তিত্বের কোন লক্ষণই নাই। সুতরাং নিশ্ছিদ্র সেপটামের মধ্য দিয়া কিভাবে শোণিত-সংবহন সম্ভবপর হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তিনি লেখেন,

"হৃৎপিণ্ডের নিলয়গুলির মধ্যবর্তী সেপটাম পর্দাটি খুবই পুরু ও নিরেট। ইহার (সেপটামের) উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি গর্ত আছে বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব যত্নের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াও দেখা যায় যে, এই গর্তগুলির একটিও পর্দাটিকে দক্ষিণ হইতে বামে সম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ করে নাই। চোখে দেখা যায় না এইরূপ ছিদ্রপথে শোণিত দক্ষিণ হইতে বাম নিলয়ে যে কিরূপে প্রবেশ করিতে পারে, সৃষ্টিকর্তার এই কৌশলের কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে হয়।"

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে ভেসালিয়াস গ্যালেনের মতবাদে সংশয় প্রকাশ করিলেও অনাস্থা প্রকাশ করিতে ভরসা পান নাই। কিন্তু ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *De fabrica*র সংশোধিত সংস্করণে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। এই সংস্করণে তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন :—

"যদিও (সেপটামের) এই গর্তগুলি কখনও কখনও পরিষ্কার দেখা যায়, তথাপি ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা যতদূর বুঝা যায়, কোন গর্তই দক্ষিণ হইতে বাম নিলয় পর্যন্ত প্রসারিত

নহে। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি এমন কোন প্রচ্ছন্ন গর্ত দেখিতে পাই নাই যাহা সেপটামকে এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত ভেদ করিয়াছে। অথচ শারীরস্থান বিদ্যার অধ্যাপকগণ এইরূপ রন্ধ্রপথের বর্ণনা দিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ে বলিয়াছেন যে, শোণিত দক্ষিণ হইতে বাম নিলয়ে

৬১। ভেসালিয়াসের বর্ণনা অনুযায়ী ক্যালকার কর্তৃক অঙ্কিত একটি নরকঙ্কাল। বিভিন্ন অস্থির নাম ও পরিচয় পাশে লিপিবদ্ধ। *Tabulae Sex* গ্রন্থে (প্রকাশ-কাল—১৫৩৮)

(এইসব রন্ধ্রপথে) প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

তারপর তিনি বলেন :

"কিছুদিন আগেও গ্যালেনের ধারণা হইতে একচুল বিচ্যুত হইবার মত সাহস আমার ছিল না। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, সেপটাম হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্ট অংশের মতই পুরু, নিরেট ও ঘনসন্নিবিষ্ট। অতএব ক্ষুদ্রতম কণিকাও কিরূপে সেপটামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করিতে পারে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। এই ব্যাপার ও অন্যান্য তথ্য বিচার করিলে শোণিতবহা নালী সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক সংশয় উপস্থিত হইবে।"

De fabrica'র শেষ অধ্যায়ে জীবন্ত প্রাণীর দেহ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র আলোচনা আছে। ভেসালিয়াস নিজে যে একজন অতি সুদক্ষ ব্যবচ্ছেদক ছিলেন এই আলোচনা হইতে তাহা প্রকাশ পায়। তিনি প্লীহা চিরিবার এক পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে নার্ভের সহিত স্বরযন্ত্রের যোগ আছে তাহা কর্তিত হইলে স্বরভঙ্গ ঘটে। তারপর পেশীকে লম্বালম্বিভাবে ছেদ করিলে তাহার কার্যকলাপের বিশেষ বাধা জন্মায় না, কিন্তু আড়াআড়ি ছেদ করিলে ইহা অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এইসব পর্যবেক্ষণ অবশ্য নূতন নহে; গ্যালেনকেও আমরা এইরূপ পরীক্ষা সম্পাদন করিতে ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দেখিয়াছি। তবে ভেসালিয়াসের পদ্ধতি অবশ্য অনেক বেশী উন্নত ছিল।

De fabrica ছাড়া ভেসালিয়াস আরও কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে *Letters on Vein-Cutting, Tabulae Anatomicae* ও *Tabulae Sex* উল্লেখযোগ্য। এই রচনাগুলিও সচিত্র এবং চিত্রগুলি ক্যালকারের অঙ্কিত।

ভেসালিয়াস যে আধুনিক অ্যানাটমির জনক ইহা অত্যুক্তি নহে। তাঁহার পরে অ্যানাটমির অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, তবে এই বিদ্যায় তিনি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন অদ্যাপি তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ভেসালিয়াসের এই মহা অবদানের কথা আলোচনার সময় ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শারীরবৃত্তে তিনি ছিলেন পুরাপুরি গ্যালেনপন্থী। শোণিত-সৃষ্টি, শোণিত-সংবহন প্রভৃতি ব্যাপারে গ্যালেনের মতবাদ তিনি বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেপটামের রহস্য ভেদ করিয়াও শোণিত-সংবহনের রহস্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। এই সংবহন-প্রণালীর পরবর্তী ইঙ্গিত আমরা পাই মাইকেল সের্ভেটাসের গবেষণায়।

মাইকেল সের্ভেটাস (১৫১১-৫৩)

আরাগননিবাসী মাইকেল সের্ভেটাস প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেসালিয়াসের সহপাঠী ছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে অপ্রিয় মত ব্যক্ত করিবার অপরাধে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্মসংস্থা কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে পোড়াইয়া মারা হয়; সেই সঙ্গে তৎলিখিত *Restitutio christianismi*র প্রায় সমস্ত প্রতিলিপি অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, এই নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক গ্রন্থের মাত্র তিনখানি প্রতিলিপি নাকি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইয়াছিল।

ফুসফুসীয় সংবহন : *Restitutio christianismi*র প্রধান আলোচ্য বিষয় ধর্মতত্ত্ব হইলেও, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা শারীরবৃত্ত প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শারীরবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্যালেনের মতবাদে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তিনি যেসব মন্তব্য করেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি শোণিত-সংবহনের ব্যাপার আঁচ করিয়াছিলেন। ফুসফুসীয় সংবহনের (pulmonary

circulation) উল্লেখ এই গ্রন্থেই আমরা প্রথম পাই। তিনি বলেন, শোণিত সেপটাম ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না, এক বিশেষ পদ্ধতিতে দক্ষিণ নিলয়ের শোণিত দীর্ঘ ও ঘুরা পথে ফুসফুসের অভিমুখে সঞ্চালিত হয়। ফুসফুসে পৌঁছিয়া ইহার রং কিছুটা হাল্‌কা আকার ধারণ করে। তারপর ফুসফুসীয় ধমনী হইতে শোণিত ফুসফুসীয় শিরায় প্রবাহিত হইবার সময় উত্তেজিত বায়ুর (inspired air) সংস্পর্শে আসিয়া শোধিত হয়। এইরূপে বায়ুর সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত অবস্থায় শোণিত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডস্থিত নিলয়ের স্ফীতির জন্য শোণিতের এই প্রবেশ সম্ভবপর হয়।*
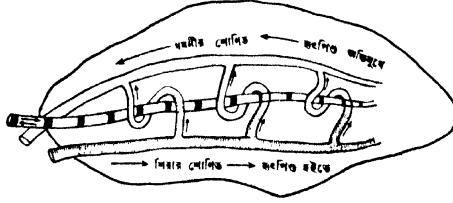
৬২। সের্ভেটাস-প্রস্তাবিত ফুসফুসীয় সংবহন।

সের্ভেটাসের সমসাময়িক ইতালীয় রিয়ালদাস কলম্বাস (১৫১৬-৫৯) ফুসফুসীয় বা ক্ষুদ্র শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে অবিকল এক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য অনেকের ধারণা রিয়াল-দাসই ফুসফুসীয় সংবহনের প্রকৃত আবিষ্কর্তা। আর একটি কথা, রিয়ালদাস *Restitutio christianismi* র কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সের্ভেটাসের গ্রন্থের ও মতামতের কথা জানিতেন না। *Restitutio*র মত নিষিদ্ধ গ্রন্থের উল্লেখে যে সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই রিয়ালদাস এই গ্রন্থের কথা চাপা দিয়া গিয়াছেন।

হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস (১৫৩৭-১৬১৯)

শিরার মধ্যস্থ কপাটক আবিষ্কার করিয়া ইতালীয় হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস শোণিত-সংবহন প্রণালীর রহস্য ভেদে আর এক ধাপ অগ্রসর হন। ফ্যাব্রিসিয়াস তাস্কানির অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চৌষট্টি বৎসর তিনি ক্রমাগত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। জীববিদ্যার বিশেষতঃ ভ্রূণতত্ত্ব ও পেশীর ক্রিয়া সংক্রান্ত বহু গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। শিরাস্থ কপাটকের অস্তিত্ব তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *On the Valves of the Veins* গ্রন্থে তিনি বলেন যে, শিরার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব অন্তর এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লী (membrane) বর্তমান; এই ঝিল্লীগুলির

---

* "This communication does not take place through the septum of the heart, as is generally believed, but a special device drives the fine blood from the right ventricle through a long passage in the lungs. There it is rendered lighter in colour and from the pulmonary artery is poured into the pulmonary vein. Here it is mixed with the inspired air, and by expiration is cleansed of its fumes. At length completely mingled with the air, it is drawn in by the left ventricle during its dilation, and is fit to be vital spirit."—*Restitutio*র ইংরেজী অনুবাদ, A Wolf, *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries,* পৃঃ ৪১০-১১ দ্রষ্টব্য।

মুখ হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে খোলা, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে ইহারা বন্ধ থাকে। তিনি দেখান, কনুই-এর উপরে হাতের কিছুটা অংশ পটি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিলে শিরা-গুলি কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই ফুলিয়া উঠিবে এবং কপাটকগুলি দেখাইবে অনেকটা গ্রন্থির মত। আমরা এখন জানি, শিরাস্থ কপাটকের মুখ হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে খুলিবার এবং তাহার বিপরীত দিকে বন্ধ হইবার জন্যই শোণিত সর্বদা একদিকে প্রবাহিত হয়। পটির দ্বারা হাত বাঁধিবার ফলে শিরার শোণিত হৃৎপিণ্ডের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে না, অথচ ধমনী হইতে জালকের মধ্য দিয়া শোণিত শিরার মধ্যে ক্রমাগত জমা হইতে থাকিলে রক্তের চাপে শিরা ফুলিয়া উঠে এবং চাপ আরও বৃদ্ধি পাইলে কপাটকের মুখগুলি বন্ধ হইয়া কতকগুলি স্ফীতি বা গ্রন্থির মত দেখায়। ফ্যাব্রিসিয়াস অবশ্য কপাটকের প্রকৃত ধর্ম ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, শোণিত-প্রবাহ মন্থর ও নিয়মিত করিবার জন্যই কপাটকের প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে দেহের কোন এক অংশে কখনও না কখনও শোণিত জমা হইবার আশঙ্কা থাকিত। গ্যালেন মনে করিতেন, দেহাভ্যন্তরে শোণিত-প্রবাহ অনেকটা নদীর জোয়ার-ভাটার মত; শিরাগুলির কাজ হইতেছে যকৃৎ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত দেহের নানা কলায় সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের পুষ্টি সাধন করা এবং এই পুষ্টি সাধনের পর দূষিত রক্তকে আবার যকৃতের মধ্যে ফিরাইয়া আনা। গ্যালেনের এইরূপ ধারণায় আস্থা স্থাপনের ফলে ফ্যাব্রিসিয়াস শোণিত-সংবহনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই।

উইলিয়ম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭)

অবশেষে উইলিয়ম হার্ভি শোণিত-সংবহনের রহস্য ভেদ করেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ভেসালিয়াস, সের্ভেটাস, ফ্যাব্রিসিয়াস প্রমুখ শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত-বিশারদগণ ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করেন সেই তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, বিশেষতঃ শোণিত-প্রবাহের সহিত ইহাদের নিবিড় সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে গিয়া হার্ভি শোণিত-সংবহনের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন। লিওনার্দো হৃৎপিণ্ডের চারিটি প্রকোষ্ঠ —দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয়, এবং এই প্রকোষ্ঠ ও শিরা বা ধমনীর সংযোগস্থলে অবস্থিত কপাটকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ভেসালিয়াস দেখান যে, সেপটামের পুরু পর্দা বিদীর্ণ করিয়া দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে গ্যালেন-প্রস্তাবিত শোণিত-প্রবাহ অসম্ভব। ফুসফুসীয় সংবহনের তথ্য প্রকাশ করেন সের্ভেটাস। আর গ্যালেনপন্থী ফ্যাব্রিসিয়াস নিজ আবিষ্কারের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইলেও শিরাস্থ কপাটকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া শোণিত-সংবহন আবিষ্কারের পথ আরও সহজ করিয়া দেন। হার্ভির প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে জীববিদ্যার দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন এক অতি দুরূহ ও জটিল রহস্যের সমাধান হইল।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : উইলিয়ম হার্ভির জন্ম ফোকস্টোনে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। কেম্ব্রিজে গন্‌ভিল ও কিস কলেজে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সেই সময় কেম্ব্রিজ ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল। চিকিৎসা ও জীববিদ্যার চর্চায় পাদুয়া তখন ইউরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভেসালিয়াস এইখানে শিক্ষকতা করিয়াছেন; লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফ্যাব্রিসিয়াস সেই সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের ও জীববিদ্যার প্রধান অধ্যাপক; তরুণ গ্যালিলিও অধ্যাপনায় ব্যস্ত। কেম্ব্রিজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া হার্ভি ফ্যাব্রিসিয়াসের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে পাদুয়ায় আসেন ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থায়ীভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ফ্রান্সিস বেকনকে চিকিৎসা করিবার ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার এক সুযোগ লাভ করেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়নের অন্যতম

PLATE XVII

হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস (১৫৩৭-১৬১৯)।
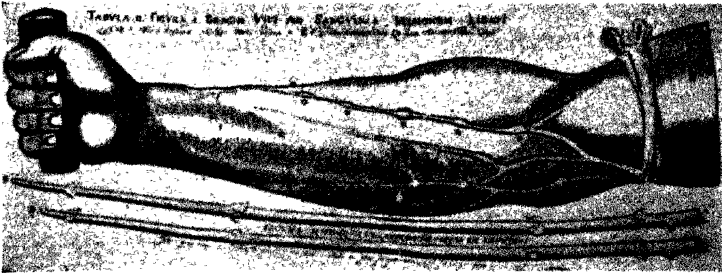
শিরার কপাটিকা—ফ্যাব্রিসিয়াস রচিত *De venarum ostiolis* (পাদুয়া, ১৬০০) হইতে।

By kind permission of Messrs. Alfred A. Knopf., Inc., New York.

PLATE XVIII

উইলিয়ম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭)। (*Scientific American, June, 1952*).

[পৃঃ ৩৬৫
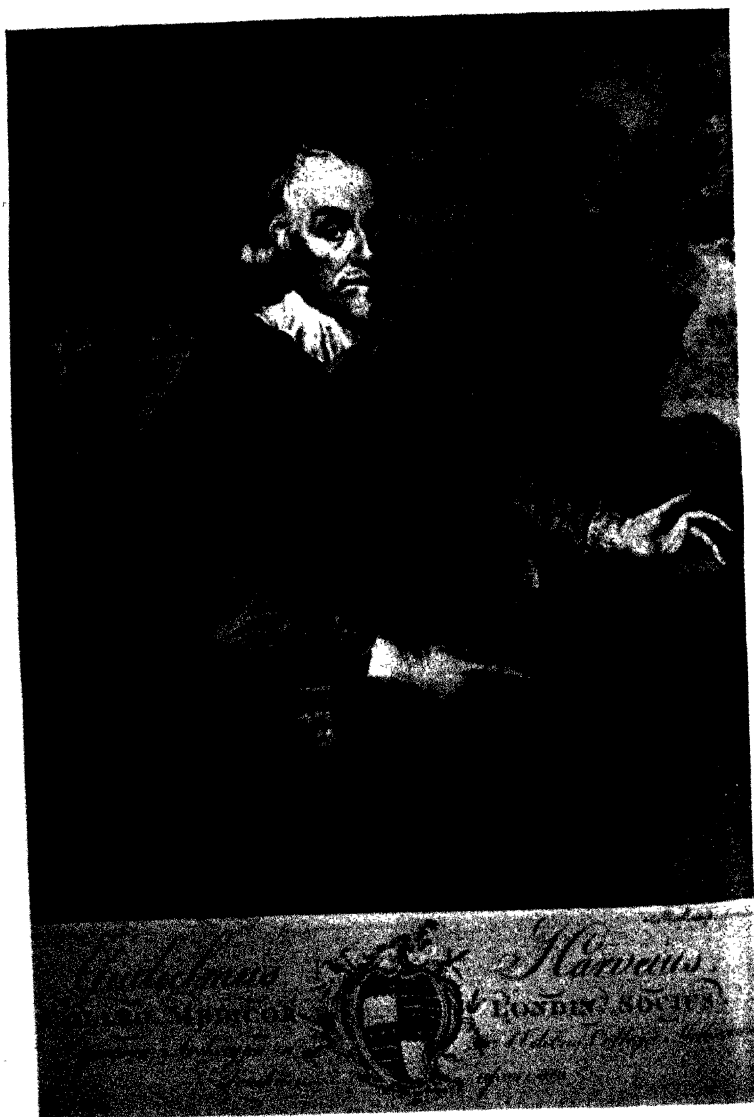
সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার দুই বৎসর পরে সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়নের অধ্যাপকের পদে আহূত হইয়া তিনি প্রথম যেসব বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল শোণিত-সংবহন। এই বক্তৃতাগুলিতে শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা ও চিন্তার ফল বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *De Motu Cordis et Sanguinis* এ তিনি এই আবিষ্কারের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। *De Motu* প্রকাশের পর তাঁহার যশ ও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইংল্যাণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লস তাঁহাকে রাজচিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন এবং তিনি বিবিধ সম্মানে ভূষিত হন। কিন্তু অচিরে গৃহযুদ্ধের ঘূর্ণিবাত্যায় চার্লসের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিলে হার্ভিকেও বহু দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। বিপ্লবীরা তাঁহার গৃহ খানাতল্লাশ করিয়া, পুঁথিপত্র পোড়াইয়া, অ্যানাটমি ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত বহু মূল্যবান সংগ্রহ বিনষ্ট করিয়া একাকার করে। গৃহযুদ্ধের প্রথম উত্তাপ প্রশমিত হইলে এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মূল্য ইংরেজ জাতি অবশ্য বুঝিতে বিলম্ব করে নাই। রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়নের সমগ্র বিভাগ পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া কর্তৃপক্ষ হার্ভির নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। হার্ভি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ কলেজকে দান করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি লণ্ডনে অবসর জীবন যাপন করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ-পরিচয় : যে গ্রন্থ হার্ভিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শারীরবৃত্তে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সেই *De Motu Cordis et Sanguinis* মোট ৭২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা মাত্র। তাঁহার সমগ্র জীবনের অধ্যবসায় ও চিন্তার ফল এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ; দীর্ঘ নয় বৎসর ধরিয়া অতীব যত্নের সহিত তিনি এই চটি বইটি লিখিয়াছিলেন, লিখিয়া কাটিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি উল্লিখিত তথ্য বার বার নিজে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলেন। পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার বক্তব্য এই যে, অ্যানাটমি সম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি ও শিখাইয়াছি তাহা কোন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হয় নাই, তাহা গৃহীত হইয়াছে কেবলমাত্র শব-ব্যবচ্ছেদজনিত অভিজ্ঞতা হইতে; ইহা কোন দার্শনিক মতবাদ সাপেক্ষ নহে, প্রকৃতির কাঠামোই ইহার একমাত্র ভিত্তি।" বলা বাহুল্য, রেণেশাঁসের আবির্ভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ, যে উদাত্ত বাণীর ঘোষণা তাঁহার পূর্বগামী মনীষিগণের রচনায় দেখা যায়, হার্ভির এই কথাগুলির মধ্যে আমরা দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি। এইরূপ সামান্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পর তিনি হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা ও শোণিত সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও মতবাদের নানা ত্রুটী-বিচ্যুতি আলোচনা করিয়া শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কি কারণে ও কিরূপ পর্যবেক্ষণের ফলে শোণিত-সংবহনের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হইয়াছিলেন তাহা বলিতেছি।

শোণিত-সংবহন : আজকাল শোণিত-সংবহন উপলব্ধি করা অবশ্য মোটেই কঠিন নহে। একটি ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সামান্য সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে হৃৎপিণ্ড কিরূপে স্পন্দিত হইতেছে এবং এই স্পন্দনের তালে তালে কিরূপে শোণিত ধমনীর মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার উপশিরা শিরা বাহিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতেছে। মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ব্যাঙের পায়ে রক্তবহা সূক্ষ্ম জালক নালী (capillaries) দেখা যাইবে; এমন কি, এই জালক নালীর মধ্যস্থতায় শোণিত কিভাবে ধমনী হইতে শিরায় প্রবাহিত হয়, তাহাও লক্ষ্য করা কঠিন নয়।

হার্ভির সময় মাইক্রস্কোপের ব্যবহার চালু হয় নাই; জালকের ব্যাপার অপরিজ্ঞাত;

সর্বোপরি দেড় হাজার বৎসরের গ্যালেনীয় ভূত মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। হার্ভি হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও স্ফীতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্কোচনের সময় হৃৎপিণ্ড কিছুটা শক্ত হয় এবং সম্প্রসারণের সময় ইহা আবার শিথিল হয়। ইহাতে হৃৎপিণ্ডকে তিনি ফাঁপা মাংসপেশী মনে করিয়াছিলেন। এরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্য হৃৎপিণ্ড প্রথমবার শোণিত ত্যাগ করে এবং দ্বিতীয়বার শোণিতের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে ধমনীগুলিও স্ফীত হইয়া উঠে; ধমনীর এই স্ফীতি কব্জির নিকটে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিলেই বুঝা যায়। এই পর্যবেক্ষণের উপর হার্ভি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একমাত্র ধমনী-পথেই শোণিত হৃৎপিণ্ডের বাহিরে নির্গত হইয়া থাকে।

ধীরে স্পন্দিত হয় এইরূপ প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া হার্ভি দেখিয়াছিলেন, প্রথমে অলিন্দ এবং পরে নিলয় দুইটি সঙ্কুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের গঠন হইতে তিনি জানিতেন, মহাশিরা (vena cava) দক্ষিণ অলিন্দের সহিত সংযুক্ত (৬৩ নং চিত্র)। সুতরাং মহাশিরা-পথে শোণিত প্রথমে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করিতে পারে। অলিন্দের স্ফীতির সময় ইহা হয়। এখন দক্ষিণ অলিন্দ সঙ্কুচিত হইলে শোণিত সরাসরি দক্ষিণ নিলয়ে গিয়া প্রবেশ করিবে, কারণ এই নিলয় এখন স্ফীত অবস্থায় আছে। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে একটি কপাটক এমনভাবে বসানো যে, রক্ত অলিন্দ হইতে নিলয়ে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে নিলয় হইতে অলিন্দে প্রবেশ করিবার তাহার উপায় নাই। অলিন্দের সঙ্কোচন শেষ হওয়া মাত্র নিলয়ের সঙ্কোচন সুরু হয়। এই সঙ্কোচনের সঙ্গে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটক বন্ধ হইবে এবং ফুসফুসীয় ধমনীর প্রবেশ-পথে অবস্থিত কপাটকের মুখ খুলিয়া যাইবে। শেষোক্ত কপাটকটিও এমনভাবে বসানো যে, শোণিত নিলয় হইতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে ধমনী হইতে নিলয়ে প্রবাহিত হইতে পারে না। হার্ভি হৃৎপিণ্ডস্থিত এইসব কপাটকের অবস্থান ও কার্যকলাপ বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ত গেল হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণভাগের কথা। বামভাগেও ঠিক একই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। শোণিত বাম অলিন্দে প্রবেশ করিতে পারে একমাত্র ফুসফুসীয় শিরা-পথে। বাম অলিন্দ হইতে প্রথমে বাম নিলয়ে এবং তথা হইতে নিলয়ের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে শোণিত এওর্টা বা মহাধমনী-পথে হৃৎপিণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। শোণিতের গতি যাহাতে অলিন্দ হইতে নিলয়ে ও নিলয় হইতে ধমনীতে অব্যাহত থাকে এবং এই গতি যাহাতে কোনক্রমে বিপরীতগামী না হইতে পারে তজ্জন্য অলিন্দ ও নিলয়ের এবং নিলয় ও এওর্টার সংযোগস্থলে কপাটকের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম উভয় ভাগেই শোণিত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইখানে হার্ভি বলিলেন, শোণিত শুধু হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই নহে, ইহার বাহিরে দেহের সর্বত্র ও সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত দেহের মধ্যে চক্রাকারে নিরন্তর প্রবাহিত হয়। হার্ভির ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য।

জীবদেহে রক্তের পরিমাণ যে নির্দিষ্ট, এই সিদ্ধান্তে হার্ভি কিভাবে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। হৃৎপিণ্ডের যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত হইতে পারে না। মনে করা যাক, প্রত্যেক নিলয় এককালে ২ আউন্স রক্ত ধারণ করিতে পারে; দুইটি নিলয়ের রক্ত ধারণ করিবার ক্ষমতা হইবে ৪ আউন্স। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দিত হয়; অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ইহা বাম নিলয় হইতে ৭২ বার ২ আউন্স করিয়া রক্ত মহাধমনী-পথে দেহের নানা অংশে প্রেরণ করে। তাহা হইলে এক ঘণ্টায় ৭২×৬০×২ অর্থাৎ ৮৬৪০ আউন্স বা ৫৪০ পাউন্ড রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত হইতেছে। এই ওজন একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ওজনের প্রায় তিন গুণ! এত অল্প সময়ে

এত রক্ত কোথা হইতে আসিতেছে, কির‍ূপেই বা তাহা উৎপন্ন হইতেছে, শেষ পর্যন্ত যাইতেছেই বা কোথায়? পরিপাকরত খাদ্য ও পানীয় হইতে প্রতি ঘণ্টায় এত অধিক রক্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা সম্ভবপর হইলেও দেহাভ্যন্তর হইতে রক্তের নির্গমের কোন পথ না থাকায় ইহার ফলে দেহের মধ্যে যে চাপের স‍ৃষ্টি হইবে তাহাতে সারা দেহ ফাটিয়া চৌচির হইয়া রক্ত-গঙ্গা বহিয়া যাইবার কথা। কিন্তু এর‍ূপ কোন ব্যাপার ঘটে না।
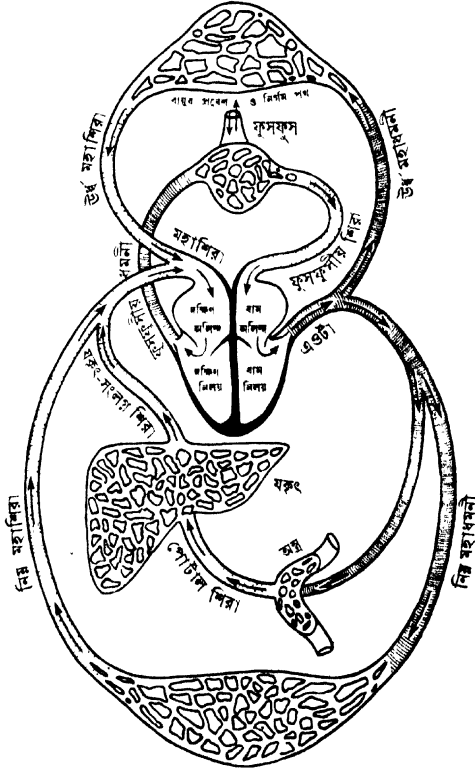
৬৩। হার্ভি-প্রস্তাবিত শোণিত-সংবহন।

বহ‍ুদিন পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোন সদ‍ুত্তর হার্ভি খ‍ুঁজিয়া পান নাই। অবশেষে তাঁহার মনে হইল, একই শোণিত ক্রমাগত ধমনী-পথে হ‍ৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া শিরার মধ্য দিয়া আবার হ‍ৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতেছে। এই চক্রাকার একম‍ুখী শোণিত-সংবহনের কোন বিরতি নাই; দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, যন্ত্রের নির্ভুল নিয়মে ততক্ষণ এই সংবহন চলিয়া থাকে। একমাত্র ম‍ৃত্যুতেই এই গতির বিরাম, অথবা ইহার বিরামের অর্থই ম‍ৃত্যু। এই সম্পর্কে হার্ভি একটি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি প্রাণীর ধমনী কাটিয়া দিলে অনবরত রক্ত-ক্ষরণের ফলে প্রাণীটির ম‍ৃত্যু ঘটে। ইহার কারণ এই যে, ধমনী কর্তিত হইবার ফলে রক্ত আর শিরার মধ্যে পৌঁছিতে পারে না, শোণিত-সংবহন বিঘ্নিত হয় এবং ধীরে ধীরে হ‍ৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া

বন্ধ হইয়া যায়। শিরার মধ্যে রক্তের গতি যে সর্বদা হৃৎপিণ্ডের অভিমুখী, সে সম্বন্ধে তিনি ফ্যাব্রিসিয়াসের গবেষণার উল্লেখ করেন। ফ্যাব্রিসিয়াস যাহা ধরিতে পারেন নাই তিনি তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, শিরাস্থ কপাটকের অস্তিত্বের জন্যই রক্তের একমুখী প্রবাহ সম্ভবপর হইয়াছে। শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দিয়া হার্ভি অবশেষে লিখিয়াছেন :—

"যুক্তির বিচারে ও চাক্ষুষ পরীক্ষার দ্বারা সব দিক দিয়াই ইহা এখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, নিলয়গুলির চাপে শোণিত ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়া দেহের সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তারপর ইহা ক্রমশঃ শিরাগুলিতে ও মাংসের নানা রন্ধ্রে প্রবেশ করে। পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত দেহের সর্বত্র শোণিত শিরার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ছোট হইতে বড় শিরার মধ্যে ইহা প্রবেশ করিতে থাকে। অবশেষে শোণিত মহাশিরার পথে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। একদিকে ধমনী-পথে ও অন্যদিকে শিরার মধ্যে যেরূপ বিপুল পরিমাণে শোণিত প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে সঙ্গে সঙ্গেই এত অধিক পরিমাণ শোণিতের উৎপাদন আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব বাধ্য হইয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, প্রাণিদেহে শোণিত চক্রাকারে সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং ইহার গতি বিরামহীন। উপরন্তু হৃৎপিণ্ডের কার্যই হইতেছে এই সংবহন অব্যাহত রাখা; রক্তবহা নালীর সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ইহা সুসম্পন্ন করিয়া থাকে।"

হার্ভির প্রস্তাবিত সংবহন-পদ্ধতিতে অবশ্য অনেক ফাঁক ছিল। যেমন, ধমনী হইতে শিরায় শোণিত কিরূপে প্রবেশ করে সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর অল্প পরে ম্যালপিঘি (১৬৬০) আবিষ্কার করেন যে, ধমনী ও শিরার সর্বশেষ প্রান্তগুলি অতি সূক্ষ্ম জালকের দ্বারা সংযুক্ত। এই জালকের মধ্য দিয়া ধমনীর রক্ত শিরার মধ্যে গিয়া পৌছে। লিউয়েনহোয়েক মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ম্যালপিঘির এই আবিষ্কার নিঃসংশয়ে পুনর্বার প্রমাণ করেন। শোণিতের উৎপত্তি সম্বন্ধেও হার্ভির সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। গ্যালেনের মত তিনি মনে করিতেন, ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে যকৃতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জাঁ পেকে, রুডবেক, বার্থোলিন প্রমুখ শারীরবিদ্‌গণ রক্তসৃষ্টির প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করেন। যকৃৎ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের অ্যানাটমির বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন গ্লিসেন (১৬৫৯); টমাস হোয়ার্টন (১৬৫৬) অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, থাইরয়েড ও অন্যান্য গ্রন্থি সম্বন্ধে নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এইসব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার মূলে ছিল হার্ভির যুগান্তকারী শোণিত-সংবহনের আবিষ্কার। বহুদিনের একটা পুরাতন সংস্কার ও ভুল একবার ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ যেমন সব কিছু নূতনভাবে যাচাই করিয়া দেখিতে শেখে, তাহার চিন্তাধারায় এক নূতন উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি হয়, হার্ভির গবেষণায় গ্যালেনীয় সংস্কার এইভাবে ধূলিসাৎ হইলে শারীরতত্ত্বীয় গবেষণায় এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ও প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল। অ্যানাটমিতে ভেসালিয়াসের যে স্থান শারীরবৃত্তে হার্ভির স্থান তদ্রূপ।

১২·২। শল্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতির কথা

শল্যবিদ্যা

ভেসালিয়াসের ও তাঁহার সমসময়ের বা অব্যবহিত পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের অ্যানাটমি সংক্রান্ত উন্নত ধরনের গবেষণা ও আবিষ্কার শল্যবিদ্যাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। অ্যানাটমির সহিত শল্যবিদ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং একের অগ্রগতি অপরের অগ্রগতিকেও ত্বরিত করে। সিঙ্গার লিখিয়াছেন, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর নৃশংস ও

নিরবচ্ছিন্ন ধর্মযুদ্ধের সময় সামরিক চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসকরা ক্ষত ও ক্ষত-চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে।*

আঁব্রোয়াজ পারে : এরূপ অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া শল্যবিদ্যার নানা উন্নতি সাধন করেন ফরাসী সামরিক চিকিৎসক আঁব্রোয়াজ পারে (১৫১৭-৯০)। পারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল, গুলির আঘাতজনিত ক্ষত বিষাক্ত নহে, সুতরাং এরূপ ক্ষত-চিকিৎসায় ফুটন্ত তৈলের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। পূর্বে ধারণা ছিল, গুলির আঘাত বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত হয় এবং ফুটন্ত তৈল প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থানের বিষ বাহির করিয়া দিতে পারিলেই ক্ষতস্থানের আরোগ্য সম্ভবপর হয়। সামরিক চিকিৎসক হিসাবে কাজ করিবার সময় একবার রাত্রিকালে হাসপাতালের তৈল সরবরাহ ফুরাইয়া আসিলে সেই রাত্রিতে বাধ্য হইয়াই তিনি কয়েকজন রোগীর ক্ষতস্থান বিধিমত ফুটন্ত তৈলের সাহায্যে পোড়াইতে পারেন নাই। পরদিন প্রত্যুষে তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, যে কয়েকজনকে তৈলাভাবের জন্য চিকিৎসা করা সম্ভব হয় নাই তাহারা প্রত্যেকেই আরামে নিদ্রা গিয়াছে এবং কেহই ক্ষতস্থানে বেদনার অভিযোগ করে নাই। পক্ষান্তরে বিধিমতে যাহাদেরই চিকিৎসা করা হইয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই সারারাত্রি অসহ্য বেদনায় কষ্ট পাইয়াছে ও চীৎকার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষতস্থান অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়াছিল ও দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা হইতে পারে বুঝিতে পারিলেন, গুলির ক্ষত চিকিৎসায় ফুটন্ত তৈলের নিষ্ঠুর ব্যবহার-বিধি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আঁব্রোয়াজ পারের দ্বিতীয় আবিষ্কার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্ত্রোপচারের পর রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের স্থান দগ্ধ (red-hot cautery) করিবার পরিবর্তে বন্ধনী বা পটির দ্বারা বাঁধিয়া দিলে অথবা শক্ত সুতার দ্বারা সেলাই করিলে (ligature) অনেক বেশী সুফল পাওয়া যায়। পারে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়টি তিনি অতীব যত্নের সহিত আয়ত্ত করেন এবং নিজে নানা ধরনের কৃত্রিম হাত, পা প্রভৃতি উদ্ভাবনে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দেন। শল্যবিদ্যার উন্নতি সম্ভবপর করিতে হইলে এই বিদ্যায় অ্যানাটমির জ্ঞান প্রয়োগ করা যে বিশেষ প্রয়োজন পারে ইহা প্রথম অনুধাবন করেন। তাঁহার পূর্বে শল্যবিদ্যা নরসুন্দরের ব্যবসায় ছিল; ইহার মর্যাদা ছিল না; চিকিৎসাবিদ্যার বিভাগ হিসাবেই ইহা গণ্য হইত না। শল্যবিদ্যার এই মর্যাদা এবং চিকিৎসাবিদ্যার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে ইহার স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রধানতঃ দায়ী আঁম্ব্রোয়াজ পারের অক্লান্ত চেষ্টা ও তাঁহার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত।

চিকিৎসাবিদ্যা

অ্যানাটমি, শারীরবৃত্ত ও শল্যবিদ্যার মত সাধারণভাবে চিকিৎসাবিদ্যার সেইরূপ কোন উন্নতি এই যুগে পরিলক্ষিত হয় না। রোগ ও রোগযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ যে সবসময় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতির শরণাপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই তখনও হাতুড়ে ও টোট্‌কা চিকিৎসায় বিশ্বাস করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। রোগ সম্বন্ধে মানুষের দুর্বলতা স্বাভাবিক। এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রায় সব শ্রেণীর ও সব বৃত্তির লোকই চিকিৎসায় পসার জমাইবার প্রয়াস পাইয়াছে, নানারূপ দ্রব্যকে ঔষধ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন ফার্মাকোপিয়ায় পিত্ত, রক্ত, পশুপক্ষীর নখ, মোরগের ঝুঁটি, পালক, পশম, লোম, ঘাম, থুথু, বৃশ্চিক, সাপের চামড়া, মাকড়সার জাল, উকুন ইত্যাদি দ্রব্য ঔষধ হিসাবে

* *A Short History of Medicine,* p. 92.

অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।* সামান্য কিছু হইলেই চিকিৎসকেরা কিছুটা রক্ত বাহির করিবার (blood letting) পরামর্শ দিতেন। সত্যকার শিক্ষিত ও বইপড়া চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ রাজন্যবর্গের পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে অথবা সামরিক চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত হইতেন। জনসাধারণকে চিকিৎসার জন্য নির্ভর করিতে হইত হাতুড়ে চিকিৎসকের উপর। হাতুড়ে চিকিৎসকরা আবার প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল মুদী বা মসলার ব্যবসায়ী। কাটা, ছেঁড়া, অস্ত্রোপচার এমন কি গোটা শল্যবিদ্যাটাই ছিল নাপিতের একচেটিয়া ব্যবসায়। প্রায় ক্ষেত্রেই চিকিৎসার ফলে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে রোগীর জীবন সংশয় ঘটিত। প্যারাসেলসাস তাঁহার সময়ের চিকিৎসকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকদের কথা বলিতে ইহা বুঝায় না যে তাঁহারা রোগী ভাল করিতেন, শুধু এইটুকু বলা যায় যে তাহারা সবচেয়ে কম রোগীর ক্ষতি করিতেন। অধিকাংশ চিকিৎসকই অত্যধিক পারদ প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যধিক রক্তপাতের দ্বার রোগীদের জীবন বিপন্ন করিত। চিকিৎসকদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এত বেশী পড়াশুনায় মত্ত থাকিতেন যে, সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা পর্যন্ত তাহাদের লোপ পাইত। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা রোগীর স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের অপেক্ষা চিকিৎসার দ্বারা লাভবান হওয়ার দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মৌলিক নীতি হিসাবে চিকিৎসকরা প্রাচীন গ্রীকদের প্রস্তাবিত বস্তুর চারিপ্রকার গুণ ও ইহা ইহতে উদ্ভূত চারিপ্রকার দেহরসের পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত হইত। বস্তুর চারিপ্রকার গুণ হইল উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা; এই চারিপ্রকার গুণ হইতেই মানুষের চারিপ্রকার ধাত বা মেজাজের (humour) এবং রক্ত, শ্লেষ্মা, কৃষ্ণ পিত্ত ও হরিদ্রা পিত্ত এই চারি দেহরসের উৎপত্তি। হিপোক্রেটিস-অ্যারিস্টটলের আমল হইতে মানবদেহের মৌলিক নীতি হিসাবে এই চারিপ্রকার ধাতের কথা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তিই হইল রক্ত, শ্লেষ্মা ও দ্বিবিধ পিত্ততে বিশ্বাস। চারিপ্রকার মৌলিক পদার্থ, পদার্থের চারিপ্রকার ধর্ম ও চারিপ্রকার দেহরসের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা ৬৪নং চিত্রে দেখানো হইল। স্বাস্থ্যের অর্থই হইল চারিপ্রকার দেহরসের মধ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণ ও সমতা রক্ষা করা; কোন কারণে ইহার কোন একটি দেহরসের মাত্রাধিক্য ঘটিলেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে ও দেহে ব্যাধির আবির্ভাব হইবে। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে দেহরসের পরিমাণ পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইতে পারিলেই ব্যাধির উপশম সম্ভবপর চিকিৎসকদের এইরূপ এক সাধারণ বিশ্বাস ছিল। এজন্যই সে যুগে কথায় কথায় চিকিৎসকদের রক্তক্ষরণ বা blood letting-এর বিধান দিতে দেখা যায়। গ্রীক চিকিৎসকেরা দেহরস ছাড়া নানাপ্রকার জীবনী শক্তিতে আস্থাবান ছিল। এই জীবনী শক্তি দেহের বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিয়া প্রয়োজনীয় জৈবক্রিয়া সম্পন্ন করিত। জীবনী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসেব ভিত্তিতেই গ্যালেনের শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। প্যারাসেলসাস ও ভ্যান হেলমণ্ট পর্যন্ত জীবনী শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ইহাকে অবিকল vital spirit না বলিয়া 'archei' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত একই।

প্রাচীন স্বাস্থ্য-রহস্যের জটিলতার এইখানের শেষ নহে। গণক ঠাকুররাও দেহলোকের নানা ঘটনার সহিত ব্রহ্মাণ্ডলোকের নানা ঘটনার নিবিড় সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে মানুষের দেহলোক বিশ্বলোকেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ও প্রতিচ্ছবি বিশেষ; ব্রহ্মাণ্ড যদি ম্যাক্রকজম্, মনুষ্যদেহ তবে মিক্রকজম্। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের রাশিচক্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের সহিত দেহের বিভিন্ন অংশের অচ্ছেদ্য যোগ আছে এবং এই যোগসূত্রের ফলে

* A. Wolf, *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries*; p. 426.

গ্রহ-নক্ষত্ররা দেহযন্ত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। নক্ষত্রের প্রভাবে বা 'ইনফ্ল‌ুয়েন্সে' যে ইনফ্ল‌ুয়েঞ্জা রোগ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালীয় চিকিৎসকেরা এইর‌ূপ মত প্রকাশ করেন।* এমতাবস্থায় চিকিৎসকেরা শ‌ুধ‌ু চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধান অন‌ুসারেই চিকিৎসা করিতেন না, পঞ্জিকার দিনক্ষণ ও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান উত্তমর‌ূপে পরীক্ষা করিয়া তবে পরামর্শ দিতেন। উদাহরণস্বর‌ূপ, ব‌ৃষ, সিংহ, কন্যা বা ব‌ৃশ্চিক রাশিতে স‌ূর্যের অবস্থানকালে চিকিৎসকেরা রোগীর দেহ হইতে রক্তক্ষরণের পরামর্শ দিতেন না।
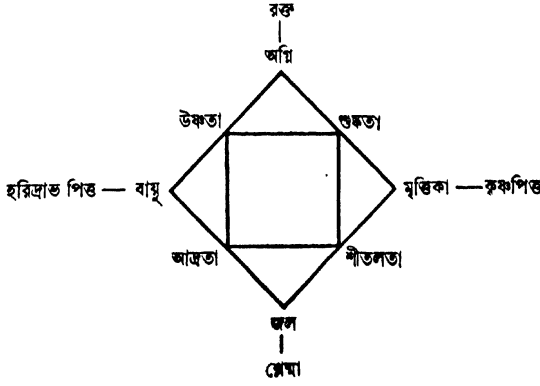
৬৪। চারি মৌলিক পদার্থ, তাহাদের ধর্ম ও দেহরসের মধ্যে সম্পর্ক।

এইর‌ূপ অবস্থায় চিকিৎসাবিদ্যার দ্র‌ুত উন্নতি সম্ভবপর ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীরব‌ৃত্ত, অ্যানাটমি ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে আশ্চর্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও চিকিৎসা-প্রণালী সেই মান্ধাতার আমলের অনগ্রসর অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যয‌ুগীয় মনোভাব কাটাইয়া বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রোগ-নির্ণয় ও রোগ-চিকিৎসার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অনেক বিলম্বে। তবে রেণেশাঁসের প্রভাব চিকিৎসার ক্ষেত্রে একেবারে ব‌ৃথা যায় নাই। ভৌগোলিক জ্ঞান ব‌ৃদ্ধির সঙ্গে নানা ভেষজের আবিষ্কার, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অ্যানাটমি ও শারীরব‌ৃত্তের প্রভূত উন্নতি, রোগ নিরাময়ে রাসায়নিক যৌগিকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, পদার্থবিদ্যা ও বস্তুবিদ্যার উন্নতি নানাভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রকেও প্রভাবিত করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিল।

ন‌ূতন ঔষধ

ভৌগোলিক জ্ঞান ব‌ৃদ্ধি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এই সময় কতকগ‌ুলি ন‌ূতন ঔষধ ইউরোপের বাজারে আমদানি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ভাল, মন্দ, আসল, নকল সবরকম ঔষধই অবশ্য ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ইহার দ্বারা ইউরোপীয় ঔষধবিদ্যা শেষ পর্যন্ত লাভবানই হইয়াছিল। উদাহরণস্বর‌ূপ, ঔষধ হিসাবে ইপিকাকুয়ানা (Ipecacuahna),

* A. Wolf, *History of Science, Technology and Philosophy* etc., p. 427.

সিনকোনা ও তামাক পাতার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু হইতে সিনকোনা বা পেরুভীয় গাছের ছাল প্রথম স্পেনে আমদানি হয় আনুমানিক ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং অল্প-কালের মধ্যেই জ্বরের প্রতিষেধক রূপে ইহার ব্যবহার ইউরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। পেরুর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সিনকোনার ব্যবহার অবশ্য সুপ্রাচীন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলা মোনার্দেস পেরুভীয়দের মধ্যে প্রচলিত সিনকোনার প্রলেপ ব্যবহারের এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পেরুর শাসনকর্তার পত্নী কাউন্টেস চিনকন রোগাক্রান্তা হইলে তাঁহার চিকিৎসক ক্যানিজারেস পেরুভীয় গাছের ছাল সেবন করিবার বিধান দিয়া কাউন্টেসকে সুস্থ করিয়া তুলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে প্রত্যাবর্তনকালে চিনকন কিছু পেরুভীয় গাছের ছাল সঙ্গে আনেন। ক্রমে খ্রীষ্টান পাদরীদের, বিশেষতঃ ইংরেজ চিকিৎসক রবার্ট ট্যালবরের চেষ্টায় সিনকোনা ইউরোপে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ট্যালবর সিনকোনার সাহায্যে ইংল্যান্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস, ফরাসীরাজ দোফাঁ ও স্পেনের রাণীকে আরোগ্য করেন।

সিফিলিস রোগে তামাক পাতা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীতে। একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে তামাক পাতা পোড়াইয়া তাহার ধোঁয়া রোগীর সর্বদেহে লাগানো হইত। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত সিফিলিস রোগের এইরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতির এক বর্ণনা ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী হইতে প্রকাশিত এক গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে গেসনার বেদনার প্রতিষেধক হিসাবে বেলেডোনার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। স্কার্ভি রোগে ন্যাসটার্সিয়াম এবং ঔষধ হিসাবে টোমাটোর ব্যবহার প্রথম অনুমোদন করেন ডোডোনিয়াস।

প্যারাসেলসাসের রাসায়নিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভেষজ গুণসম্পন্ন বিবিধ রাসায়নিক যৌগিক আবিষ্কার করা। সিফিলিস রোগে পারদ ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্যারাসেলসাস এই রোগে পারদ ব্যবহারের অধিকতর প্রসারে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেন। প্রথম অবস্থায় প্রমেহজনিত স্ফোটকের উপর প্রলেপ হিসাবে পারদ ব্যবহৃত হইত। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্ড্রিয়া মাত্তিয়লাস ঔষধ হিসাবে পারদ সেবন করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। অ্যান্টিমনি, তাম্র, লৌহ, সীসক ও গন্ধকঘটিত যৌগিক ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের বিধান ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায় এবং ইহার প্রধান কৃতিত্ব প্যারা-সেলসাসের প্রাপ্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অ্যান্টি-মনিঘটিত ঔষধের ও অ্যান্টিমনিনির্মিত পাত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। অ্যান্টিমনি পাত্রে মদ্য কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে মদ্যের টার্টারের সহিত অ্যান্টিমনি অক্সাইডের যৌগিক ক্রিয়ার ফলে টার্টার এমিটিক বা পটাশিয়ম অ্যান্টিমনি টার্ট্রেট উৎপন্ন হয়। এই টার্টার এমিটিক একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রথমে লোকে অ্যান্টিমনি পাত্রের এই রহস্যময় গুণের কথা অবশ্য জানিত না। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ান ভ্যান মিনিস্ট ঔষধ হিসাবে টার্টার এমিটিকের প্রবর্তন করেন। এই আবিষ্কারের বহু পূর্ব হইতেই অ্যান্টিমনি পাত্রের আশ্চর্য গুণের কথা লোকে অবগত হইয়াছিল এবং ইহাকে সর্বরোগহর এক অতি মূল্যবান বস্তু হিসাবে গণ্য করিত। ৬৫নং চিত্রে অ্যান্টিমনি কাপের গায়ে জার্মান ভাষায় যে লেখাটি খোদিত দেখা যাইতেছে তাহার অর্থ— "তুমি প্রকৃতির একটি বিস্ময় এবং সকল মানুষের নিশ্চিত আরোগ্য।"
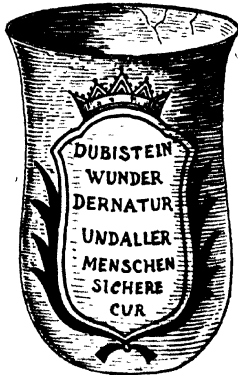
৬৫। অ্যান্টিমনি কাপ।

পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী মঙ্গল গ্রহ হইল 'শোণিত ও লৌহের' দেবতা। এইরূপ পৌরাণিক ধারণা হইতে ঔষধ হিসাবে লৌহের প্রয়োগের সূত্রপাত ঘটিয়া থাকিবে। রক্তাল্পতা

ও দুর্বলতাজনিত অসুস্থতায় লোহঘটিত লবণ ব্যবহৃত হইত। সপ্তম শতাব্দীতে সাইডেনহ্যাম ও উইলিস লোহঘটিত লবণের প্রচুর বিধান দিতেন। রৌপ্য ও স্বর্ণের ব্যবহারের পশ্চাতেও অনুরূপ পৌরাণিক প্রভাব বিদ্যমান। রৌপ্যের সহিত চন্দ্রের এবং স্বর্ণের সহিত সূর্যের সম্বন্ধ বহু প্রাচীন কাল হইতেই আলোচিত হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রের প্রভাব মস্তিষ্কের উপর; সূর্য হইল সকল প্রাণশক্তির আধার। এইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া মস্তিষ্কঘটিত রোগে,—যেমন মৃগী ও বিষাদ রোগে, রৌপ্যঘটিত ঔষধের প্রচলন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে জ্বরের ঔষধ হিসাবে পটাশিয়ম ক্লোরাইড এবং শ্বেত আর্সেনিক ও পটাশের মিশ্রণের ব্যবহার দেখা যায়।

রোগ-নির্ণয়ে উন্নতি

রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয়ে কিছু কিছু উন্নতির লক্ষণ ষোড়শ শতাব্দী হইতে প্রকাশ পাইতে থাকে। দেহরসের বিকৃতি অথবা অনুপাতের তারতম্যই যে রোগের একমাত্র কারণ নয়, রোগের অন্যবিধ বাহ্যিক কারণও যে থাকিতে পারে, এসম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভেরোনীজ চিকিৎসক জিরোলামো ফ্রাকাস্টোরো এবং ফরাসী চিকিৎসক গিয়োম দ্য বাইয়ু। জিরোলামো ফ্রাকাস্টোরো (১৪৭৪-১৫৫৩) পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোপার্নিকাসের সহপাঠী ছিলেন। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টাইফাস রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁহার প্রধান খ্যাতি সিফিলিস রোগ সংক্রান্ত গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সিফিলিস : মধ্যযুগে এই রোগ ইউরোপের নানা দেশে দেখা দেয় এবং কোন কোন স্থানে ইহার প্রকোপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইহার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে কাহারও কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অনেকেই কুষ্ঠরোগের সঙ্গে সিফিলিস রোগকে ভুল করিতেন, কেহ কেহ আবার বসন্ত রোগের সঙ্গে ইহাকে মিশাইয়া ফেলিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই রোগ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মহামারীর আকারে দেখা দেয় এবং অচিরেই ইহার নিবারণ এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্ন রূপে গণ্য হয়। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাকাস্টোরো এই রোগকে সিফিলিস নামে অভিহিত করিয়া ইহার উপর এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। বিষয়টি কবিতায় ব্যক্ত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই রোগ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে *De contagionibus* শীর্ষক এক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ব্যাধি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে কিভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে ফ্রাকাস্টোরো এই প্রথম কতকগুলি সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বিশেষ ধরনের কয়েকটি রোগ ত্রিবিধ উপায়ে সংক্রামিত হইয়া থাকে : (১) প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের দ্বারা, (২) মধ্যবর্তী বস্তুর মাধ্যমে, যেমন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর পরিত্যক্ত পরিধেয় ব্যবহারের দ্বারা; এবং (৩) আপাত কোন সংযোগ ছাড়াই কেবল দূরত্বের ব্যবধানে সংক্রমণের দ্বারা। জীবাণুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিলেও এক জাতীয় অতি সূক্ষ্ম বীজ বা seminaria দ্বারা বিশেষ ধরনের কোন কোন রোগ যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে এবং রোগীর দেহে এইরূপ seminariaদের দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্যই যে রোগের সৃষ্টি হয়, ফ্রাকাস্টোরো এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। রোগের আধুনিক জীবাণুতত্ত্বের সহিত উপরিউক্ত মতের যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে তাহা বলা বাহুল্য। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে কির্চার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিলে ফ্রাকাস্টোরোর অভিমতের গুরুত্ব চিকিৎসকদের মধ্যে উপলব্ধ হয়।

গিয়োম দ্য বাইয়ু (১৫৩৮-১৬১৬) হুপিং বা ঘুংড়ি কাসির এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন (১৫৭৮)। তিনি সাধারণ বাতরোগ (rheumatism) ও গেঁটেবাতের (gout) মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক টমাস সাইডেনহ্যাম বাইয়ুর গবেষণা ও অভিমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য চিকিৎসাবিদ্‌দের কার্যকলাপের মধ্যে জর্জ বার্টিশ চক্ষুরোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইতালীয় জিওভানি দি আকস্তা পার্বত্য অসুস্থতা সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া বলেন যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ বায়ুর স্বল্পতা এইরূপ অসুস্থতার কারণ। ফাব্রিজ ফন হিলডেন কর্ণের বহির্ভাগের গঠন-বৈচিত্র্য ও কার্যকলাপ বর্ণনা করেন। কর্ণ সংক্রান্ত পরীক্ষা ও গবেষণার সুবিধার্থ তিনি এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র Speculum auris উদ্ভাবন করেন (১৬০০)। ঐ বৎসর হিয়েরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস স্বরযন্ত্রের এক বিশদ বর্ণনা-সংবলিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *De larynge vocis organo* প্রকাশ করেন।

চিকিৎসা-কার্যে ব্যবহৃত নূতন যন্ত্রপাতি

দেহ রোগাক্রান্ত হইলে যে সকল পরিবর্তন বাহ্যতঃ পরিলক্ষিত হয়, যেমন দেহের তাপবৃদ্ধি, নাড়ীর স্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি, তাহাদের নির্ভুলভাবে মাপিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চিকিৎসার যে বিশেষ সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে স্যাংকটোরিয়াস (১৫৬১-১৬৩৬) সর্বপ্রথম মনোযোগী হন। স্যাংকটোরিয়াসের পূর্বে রোগীর অবস্থা বর্ণনাকল্পে সাধারণভাবে চিকিৎসকেরা বলিতেন, দেহে জ্বরভাব আছে, অথবা জ্বর নাই, অথবা জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। সেইরূপ নাড়ীর গতি মন্থর, স্বাভাবিক বা চঞ্চল হইয়াছে, রোগীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার বেশী কিছু বলা চিকিৎসকের সাধ্য ছিল না। তাপমান যন্ত্র, পাল্‌সিমিটার (নাড়ীর স্পন্দন মাপক যন্ত্র), তুলাদণ্ড প্রভৃতির ব্যবহার চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবর্তন করিয়া স্যাংকটোরিয়াস রোগ নির্ণয়ে ও রোগীর অবস্থা পরীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন।
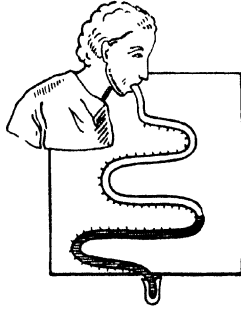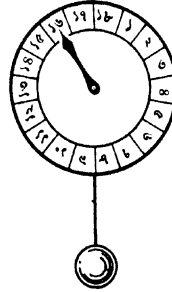
৬৬। থার্মোমিটার। ৬৭। পালসিমিটার।

স্যাংকটোরিয়াস : স্যাংকটোরিয়াস পাদুয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। গ্যালিলিও ছিলেন তাঁহার বিশেষ বন্ধু। সম্ভবতঃ গ্যালিলিওর বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্যাংকটোরিয়াস চিকিৎসাশাস্ত্রে এই নবলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে উৎসাহিত হন। দেহের তাপ মাপিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক থার্মোমিটার নির্মাণ করেন (৬৬নং চিত্র)। থার্মোমিটারের আকার অনেকটা সাপের মতো বাঁকানো; ইহার উপরের প্রান্ত বন্ধ ও একটি ক্ষুদ্র গোলকে আসিয়া শেষ হইয়াছে, অপর প্রান্ত একটি জলপাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট। উপরের ক্ষুদ্র গোলকটি রোগীর মুখের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিতে হইবে। থার্মোমিটারের দেহ কাচের পুঁতি বসাইয়া চিহ্নিত করা আছে; এই চিহ্নের সাহায্যে ভিতরের জলের উচ্চতা মাপা যায়। গ্যালিলিওর থার্মোমিটারের অনুকরণে

এই সর্পিল থার্মোমিটার নির্মিত হইয়াছিল। অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিলেও দেহের তাপ নির্ণয়ের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

নাড়ীর স্পন্দন ও তাহার গতির তারতম্য স্বাস্থ্যের বা রোগের যে এক বিশেষ লক্ষণ এই উপলব্ধি সুপ্রাচীন। নিকোলাস অব কুসা জলঘড়ির সাহায্যে এই স্পন্দন নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্যালিলিও কর্তৃক উদ্ভাবিত দোলকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া স্যাংকটোরিয়াস এক পালসিমিটার নির্মাণ করেন। দোলকের পর্যায়-কাল ইহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে ($T^2 \propto l$); সুতরাং দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া বা কমাইয়া দোলকের পর্যায়-কাল নাড়ীর স্পন্দনের পর্যায়-কালের সহিত সহজেই মিলাইয়া দেওয়া যায়। এখন একটি মাপনী বা স্কেলের সাহায্যে দোলকের দৈর্ঘ্য মাপিবার ব্যবস্থা করিলে এই দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হইতেই নাড়ীর স্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয় করা যাইবে (৬৭নং চিত্র)।
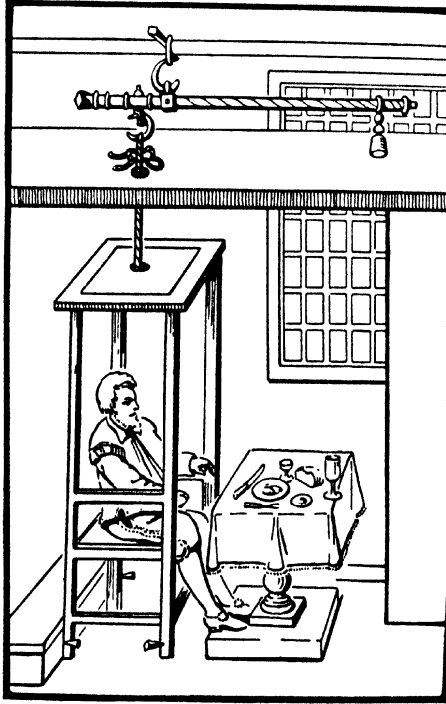
৬৮। তুলাদণ্ডে উপবিষ্ট স্যাংকটোরিয়াস।

বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের দেহের ওজনের কিরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে সে সম্বন্ধে স্যাংকটোরিয়াস দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। এই কার্যের জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের তুলাদণ্ড তৈয়ারী করেন; এই তুলাদণ্ডে উপবেশনের বন্দোবস্ত ছিল (৬৮নং চিত্র)। স্যাংকটোরিয়াস তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Ars de statica medicina*য় (১৬১৪) লিখিয়াছেন, এই তুলাদণ্ডের চেয়ারে বসিয়া তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। আহারের পূর্বে ও পরে, বিশ্রামের ও নিদ্রার সময়ে,

উত্তেজিত ও রুগ্ন অবস্থায় তিনি একটানা নিজের দেহের ওজন গ্রহণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপ পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি দেখান যে, দেহ হইতে মল, মূত্র ইত্যাদি আবর্জনা যে পরিমাণে বহির্গত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ ময়লা ঘর্মের আকারে নির্গত হয়। দেহের উপরিভাগের অসংখ্য অদৃশ্য ছিদ্র-পথে ঘাম নির্গত হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের সঙ্গে দৈনিক অর্ধ পাউন্ড ওজনের ময়লা বাহির হয়। সমস্ত দিনে আমরা যদি আট পাউন্ড খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে পাঁচ পাউন্ড অনাবশ্যক আবর্জনারূপে ঘর্মের আকারে দেহ হইতে বাহির হইবে। নিরুপদ্রবে সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাইলে জাগ্রত অবস্থায় যে পরিমাণ ঘর্ম নির্গত হয় তাহার দ্বিগুণ ঘর্ম নিদ্রিত অবস্থায় নির্গত হইয়া থাকে, ইত্যাদি। স্যাংকটোরিয়াস এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা শারীরতত্ত্বে মেটাবলিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ দেহযন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে শরীরের পুষ্টিকর উপাদান সমূহের জৈবপদার্থে পরিণতি সংক্রান্ত জ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন।

১২·৩। রসায়ন

ইয়াত্রো-রসায়নের যুগ—প্যারাসেলসাস, লিবাভিয়াস, ভ্যান হেলমণ্ট, জর্জ এগ্রিকোলা

মধ্যযুগের অবসান ও রেনেশাঁসের প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কিমিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি যে প্রশমিত হয় নাই তাহা আমরা নবম অধ্যায়ে (৯·৪) আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাসায়নিকদের মধ্যে অনেককেই কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রভৃতি মহার্ঘ ধাতু প্রস্তুত করিবার সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া রসায়নের অগ্রগতিতে রেনেশাঁসের প্রভাবও ব্যর্থ হয় নাই। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় আধুনিক রসায়নের আত্মপ্রকাশের লক্ষণ সমূহ প্রথম প্রকাশ পায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। কিমিয়া-বিদ্‌দের মূল দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষতঃ পরশপাথর আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একদল বিজ্ঞানী এই সময় হইতেই ক্রমশঃ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং কিমিয়ার প্রভাবমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হন।

যে কোন গবেষণাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সম্মুখে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধাতু-রূপান্তর ছিল কিমিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণা। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কিমিয়াবিদ্‌রা বহু শত বৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার সত্যমিথ্যা নানা গুণাগুণ আবিষ্কার করিয়াছে। যখন দেখা গেল এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই আর নাই, কিমিয়াবিদ্‌দের ধাতু-রূপান্তরের আশা এক অলীক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাত্র, তখন রাসায়নিক গবেষণাকে জীবিত রাখিবার জন্য বিজ্ঞানীর সম্মুখে অন্যপ্রকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংস্থাপন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। এরূপ পরিবর্তনের মুখে প্যারাসেলসাস, লিবাভিয়াস, ভ্যান হেলমণ্ট প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ দেখাইলেন, উন্নততর ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে এক বিরাট অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র, এক বিপুল ভবিষ্যৎ রাসায়নিকদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সময় নানা প্রকার গাছ-গাছড়া ও ভেষজই ছিল একমাত্র ঔষধ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা প্রস্তুত হইত বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কহীন হাতুড়ে ও অশিক্ষিত ঔষধনির্মাতাদের দ্বারা। প্যারাসেলসাস প্রমুখ রাসায়নিকগণ ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে রসায়নের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিলেন। ইহার দ্বারা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঔষধ প্রস্তুত ছাড়া নূতন ঔষধ আবিষ্কারের সম্ভাবনাও তাঁহারা প্রমাণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, এই কার্যে রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কামনা করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, রাসায়নিকের কাজ হইবে নূতন ঔষধ আবিষ্কার করা, বিশুদ্ধভাবে তাহাদের প্রস্তুত করা ও রাসায়নিক উপায়ে তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করা; আর চিকিৎসকের কাজ হইবে এইসব

নবাবিষ্কৃত দ্রব্যের ঔষধ-ক্রিয়া পরীক্ষা ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করা। রসায়নের সহিত চিকিৎসা-বিদ্যার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রাসায়নিক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্য এই যুগকে ইয়াট্রো-রসায়নের যুগ বলা হয়।

খনিজ শিল্পের প্রসার ও তৎসংশ্লিষ্ট ধাতু-নিষ্কাশন-পদ্ধতির নানাবিধ উন্নতি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সাধারণভাবে রসায়নের উন্নতির আর একটি অন্যতম কারণ। এই শিল্পের ব্যাপক ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে নিযুক্ত কারিগরদের ধাতু-নিষ্কাশন সংক্রান্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা হইতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ধাতু সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু খনির কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা না থাকায় তাহাদের এই ব্যবহারিক বিদ্যার মূল্য বিদ্বৎসমাজে বহুদিন পর্যন্ত উপলব্ধ হয় নাই। মুদ্রা-প্রচলনের প্রসার ও নূতন গোলার্ধে মূল্যবান ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হইবার ফলে ধাতুশিল্পের প্রভূত উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইলে এই বিদ্যার প্রতি বিদ্বৎসমাজের কৌতূহল ও উৎসাহ ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়। খনিজ ও ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে রচিত জর্জিয়াস এগ্রিকোলার ও বিরিংগুচ্চিওর গ্রন্থগুলির ব্যাপক সমাদর ও প্রসার এই উৎসাহের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এগ্রিকোলার *De re metallica, De natura fossilium,* বিরিংগুচ্চিওর *Pirotechnia* এবং দুইজন অজ্ঞাতনামা লেখকের *Ein Nützlich Bergbüchlein* ও *Probierbüchlein* ইত্যাদি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে রাসায়নিক গবেষণার অগ্রগতিতে ধাতু ও খনিজবিদ্যার গুরুত্ব স্পষ্টই প্রমাণিত হইল। ঔষধ উদ্ভাবন ও প্রস্তুতের কাজে রসায়নের প্রয়োগ প্রস্তাব করিয়া প্যারাসেলসাস ও তাঁহার অনুগামী ইয়াট্রো-রাসায়নিকগণ রসায়নের যেইরূপ উপকার সাধন করিয়াছিলেন সেইরূপ ধাতু-বিদ্যায় রসায়নের ব্যাপক প্রয়োগের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া এগ্রিকোলা, বিরিংগুচ্চিও প্রমুখ ধাতুবিজ্ঞানিগণ রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের গোড়াপত্তন করেন।

প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১)

সুইট্জারল্যাণ্ডে আইনজিডেল্ন্ নামক স্থানে প্যারাসেলসাস জন্মগ্রহণ করেন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর। তাঁহার পুরা নাম ফিলিপ্পাস অরিওলাস প্যারাসেলসাস থিওফ্রেসটাস বম্বাসটাস ফন হোহেনহাইম। ইউরোপের নানা স্থানে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া তিনি খনিজবিদ্যা, কিমিয়া ও চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন, ফেররারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাজ্লে (সুইট্জারল্যাণ্ড) চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাজ্লে অবস্থান কালে তিনি এক উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের গেঁটে বাত আরোগ্য করেন এবং এই চিকিৎসায় প্রদত্ত মাত্র তিনটি ক্ষুদ্র বড়ির জন্য প্রচুর অর্থ দাবী করেন। ধর্মযাজক এই অর্থ প্রদানে অস্বীকৃত হইলে প্যারাসেলসাস আদালতে এক মামলা দায়ের করেন। এই সামান্য ব্যাপার হইতে অবস্থা এইরূপ গড়ায় যে, তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাজ্ল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ইহার পর অনিশ্চিতভাবে তিনি আলসাস, ব্যাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও সুইট্জারল্যাণ্ডের নানাস্থানে দীর্ঘ ১৪ বৎসর দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাইরোলের কাছে সল্ৎজবুর্গে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

প্যারাসেলসাস প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতির তীব্র বিরোধী ও সমালোচক ছিলেন। এই বিরোধিতা ও সমালোচনার মধ্যে তাঁহার আত্মম্ভরিতার উগ্র প্রকাশ এবং সমসাময়িক নামজাদা চিকিৎসকদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা ব্যঙ্গোক্তি প্রথম হইতেই তাঁহাকে চিকিৎসক-সমাজের বিশেষ অপ্রীতিভাজন ও বিদ্বেষের পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। কথিত আছে, ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্যালেন ও আভিসেনার শিক্ষার অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের গ্রন্থরাজি একটি পিতলের পাত্রে গন্ধক ও শোরা সংযোগে ভস্মীভূত করিতেন। এইরূপ আত্মম্ভরিতা ও কলহ-প্রিয় স্বভাব তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। অধিকাংশ রচনার অতিশয়োক্তি

দোষের জন্য অনেক সময় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও স্বকীয়তার বিচার-বিশ্লেষণ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য প্যারাসেলসাসের বৈজ্ঞানিক অবদান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিস্তর মতদ্বৈধ দেখা যায়; একদল তাঁহার প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ, আর একদল তাঁহার গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে সেইরূপ কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। তথাপি কিমিয়ার বন্ধন হইতে রসায়নকে মুক্ত করিবার কার্যে ও ঔষধ-প্রস্তুত ব্যাপারে রসায়নকে প্রয়োগ করিতে প্যারাসেলসাস যে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। রসায়নের উদ্দেশ্য হইল ঔষধ প্রস্তুত করা, 'কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করা নহে', তাঁহার এই নির্ভীক ঘোষণা হইতেই ধীরে ধীরে ইয়াট্রো-রাসায়নিক যুগের উদ্ভব হইয়াছিল। প্যারাসেলসাস লিখিয়াছেন :

> "I praise alchemy, which compounds secret medicines, whereby all hopeless maladies are cured. They who are ignorant of this deserve neither to be called chemists nor physicians. For these remedies lie either in the power of the alchemists or in that of the physicians. If they reside with the latter, the former are ignorant of them. If with the former, the latter have not learnt them. How, therefore, shall those men deserve any praise? I, for my part, have neither judged that such a man shall be highly extolled who is able to bring Nature to such a point that she will lend help, that is, who shall know how after the extraction of the health-giving parts what is useless is to be rejected; who is also acquainted with the efficacy, for he must see that it is impossible that the preparation and the science—in other words, the chemia and the medicine—can be separated from one another, because should anyone attempt to separate them he will introduce more obscurities into medicine, and the result will be absolute folly." *

অর্থাৎ রসায়ন ও চিকিৎসার সম্বন্ধ অভেদ্য। দুইটি বিষয়কে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। উভয় বিদ্যার উন্নতির জন্য উভয় বিদ্যার সর্ববিষয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য।

ঔষধ হিসাবে নানা রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ ও যৌগিকের ব্যবহার প্যারাসেলসাসের বহু পূর্ব হইতেই সুবিদিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মতবাদের বিশেষত্ব এই যে, সুস্থ মানবদেহ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত; ইহাদের যে কোন একটির কোন প্রকার অভাব ঘটিলেই দেহে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; সুতরাং একমাত্র রাসায়নিক ঔষধ সেবনের দ্বারাই রোগ নিরাময় সম্ভবপর। বলা বাহুল্য, রাসায়নিক ঔষধের উপর এইরূপ গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। তিনি নিজে চিকিৎসার্থে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, যেমন, তুঁতিয়া, রসকর্পূর, অ্যান্টিমনিঘটিত ঔষধ, সীসকঘটিত লবণ ইত্যাদি। এইসব যৌগিকের অল্প-বিস্তর বিষক্রিয়ার জন্য ঔষধ হিসাবে ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে এককালে চিকিৎসকদের ভয়ানক আতঙ্ক ও ভীতি ছিল। তিনি দেখাইলেন এই ভীতি অমূলক। ইহা ছাড়া লঘু স্যালফিউরিক অ্যাসিড, লোহের টিংচার, নানাবিধ উদ্বায়ী আরক ও নির্যাসের ব্যবহার তিনি প্রচলন করেন। টার্টার সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি সুরা হইতে টার্টার অধঃক্ষিপ্ত হইতে লক্ষ্য

* Henry M. Leicester and Herbert S. Klickstein, *A Source Book in Chemistry (1400-1900)*, McGraw Hill, 1952; p. 17.

করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার ধারণা জন্মে যে, দেহাভ্যন্তরে টার্টারের অধঃক্ষেপণের ফলে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্যারাসেলসাস চারি মৌলিক পদার্থের মতবাদ বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল যে, বস্তুর মধ্যে ইহারা প্রধানতঃ তিন ভাবে অবস্থান করে—লবণ, গন্ধক ও পারদ। বস্তুর বন্ধন ও অদাহ্যতা নির্ধারিত হয় লবণের দ্বারা; পারদ বস্তুর উদ্বায়িতা ও দ্রবণের জন্য দায়ী; গন্ধকের কল্যাণে বস্তু দাহ্যতা প্রাপ্ত হয়। বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণে পারদ ও গন্ধকের ভূমিকার কথা প্যারাসেলসাসের পূর্বে কিমিয়াবিদ্‌রা অবশ্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু বস্তুর গঠনে লবণের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। তীব্র সুরাকে কোহল নামে অভিহিত করিবার ও ইউরোপীয় রাসায়নিকদের মধ্যে দস্তার প্রথম উল্লেখের কৃতিত্ব প্যারাসেলসাসের প্রাপ্য।* তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে *Archidoxa, De tinctura physicorum, De morbis ex tartaro oriundis, Paragranum, Paramirum* ও *Grosse wundarznei* উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনপন্থী চিকিৎসকেরা প্যারাসেলসাসের অভিনব মতবাদের বিরুদ্ধতা করিয়া ইহার প্রচারে যেমন বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন, অতি উৎসাহী প্যারাসেলসাসপন্থীরা আবার যথেষ্ট রাসায়নিক জ্ঞানের অভাবে বেপরোয়া রাসায়নিক যৌগিকগুলিকে ঔষধ হিসাবে চালাইতে গিয়া অনেক সময় বিভ্রাট বাধাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীদেরও অভাব ছিল না। তুর্কে দ্য মেইয়ের্ণ, লিবাভিয়াস, অসওয়াল্ড ক্রোল্, হেড্রিয়ান মিনসিস্ট প্রমুখ রাসায়নিক ও চিকিৎসকগণ প্যারাসেলসাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রসায়নের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সিলভার ক্লোরাইডের বর্ণনা প্রদান করেন ক্রোল; তিনি ঔষধ হিসাবে পটাশিয়ম সালফেট ও সাকসিনিক অ্যাসিডের ব্যবহারও চালু করেন। হেড্রিয়ান টার্টার এমিটিকের প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

লিবাভিয়াস (১৫৪০-১৬১৬)

জার্মান ইয়াট্রো-রাসায়নিক অ্যান্ড্রিয়া লিবাভিয়াসের তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সুচিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। *Alchemia* নামে রসায়নের এক পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন (১৫৯৭) করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। লিবাভিয়াস এই গ্রন্থে সমসময়ে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক গবেষণার মধ্যে অনার্দ্র স্ট্যানিক ক্লোরাইডের (anhydrous stannic chloride) আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টার্টার ও ভস্মীভূত অ্যান্টিমনি সংযোগে উদ্ভূত এক যৌগিকের বর্ণনা তিনি দিয়াছেন; এই যৌগিকের নাম এখন টার্ট্রেটেড অ্যান্টিমনি। জ্বলন্ত গন্ধকের বাষ্প জলে দ্রবীভূত করিয়া তিনি দেখান যে, এইভাবে একপ্রকার অম্ল তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং এই অম্ল ও হিরাকস পাতিত করিয়া অথবা গন্ধক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করিয়া প্রাপ্ত অম্ল এক জিনিস। রাসায়নিক উপায়ে জল বিশ্লেষণ করিবার এক পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করেন। খনিজ জল পরীক্ষার এক সহজ উপায়ও তিনি বাহির করিয়াছিলেন। একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডকে ওজন করিয়া জলে ভিজাইবার পর ইহাকে আবার শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যদি ওজন বৃদ্ধি পায় ও বস্ত্রখণ্ডে দাগ দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে ইহা খনিজ জল। তিনি ধাতব অক্সাইডের সাহায্যে রঙ্গীন কাচ প্রস্তুত ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম অ্যামোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত করেন।

---

* J. R. Partington, *A Short History of Chemistry*, p. 44.

জোহান ব্যাপটিস্টা ভ্যান হেলমণ্ট (১৫৭৭-১৬৪৪)

জোহান ব্যাপটিস্টা ভ্যান হেলমণ্ট ইয়াত্রো-রাসায়নিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক। প্যারাসেলসাসের গবেষণার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও তিনি পুরোপুরি প্যারাসেলসাসকে গ্রহণ করেন নাই। গবেষণার মৌলিকতায় ও নূতন রাসায়নিক পদ্ধতির ও নীতির আবিষ্কারে তিনি প্যারাসেলসাসকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। নানাবিধ গ্যাসের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ ও ভরের নিত্যতা প্রদর্শনকল্পে মূল্যবান পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া তিনি আধুনিক রসায়নের বনিয়াদ স্থাপনে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। রাসায়নিক গবেষণায় এরূপ আশ্চর্য স্বকীয়তা ও আধুনিকতা সত্ত্বেও তিনি কিমিয়ার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণোৎপাদনের সম্ভাবনা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন।

ব্রুসেলসের এক ধনী সম্ভ্রান্ত বংশে ভ্যান হেলমণ্টের জন্ম হয় ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথা হইতে এম. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভ্যান হেলমণ্ট অনায়াসে রাজসভার ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় তিনি দরিদ্রের চিকিৎসায় ও কঠোর শ্রমসাধ্য রাসায়নিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন। বোয়েরহাভে লিখিয়াছেন, তিনি বহু বৎসর দিনরাত রাসায়নিক পরীক্ষা লইয়া কাটাইয়াছেন; এমন কি দিনের পর দিন বাড়ীর বাহির পর্যন্ত হন নাই। তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রবার্ট বয়েল ভ্যান হেলমণ্টের নিকট তাঁহার অপূরণীয় ঋণ অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। *Opuscula medica*-য় (প্রকাশকাল—১৬৪৪) ও *Ortus medicinae* তে (প্রকাশকাল—১৬৪৮; জে. চ্যাণ্ডলার এই গ্রন্থ *Oriatricke* বা *Physick Refined* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন) তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা ও মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্যাস সম্বন্ধে পরীক্ষা : রসায়নে ভ্যান হেলমণ্টের প্রধান অবদান গ্যাসের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা। তাঁহার পূর্বে একমাত্র বাতাস গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত হইত। তিনি দেখান, বায়ু ছাড়াও অন্য প্রকার গ্যাস বিদ্যমান। বস্তুতঃ গ্যাস কথাটার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। ইহা গ্রীক 'chaos' হইতে গৃহীত। কেহ কেহ আবার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা 'gäscht' (ফেনা, froth) অথবা 'geist' (ভূত বা স্পিরিট) কথা হইতে উদ্ভূত। এই শেষোক্ত মত এক সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও এখন আর গ্রাহ্য নহে। হেলমণ্ট 'গ্যাস' শব্দের ও তাৎপর্যের প্রথম প্রবর্তক হইলেও লাভোয়াসিয়েই প্রকৃতপক্ষে ইহার ব্যাপক প্রয়োগের জন্য দায়ী।

পাত্রের মধ্যে গ্যাস সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিবার কোন উপায় তখন জানা না থাকায় হেলমণ্ট বিভিন্ন গ্যাসের গুণাগুণ পৃথকভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এজন্য বিবিধ পরীক্ষার সময় প্রাপ্ত গ্যাসের সাময়িক বাহ্যিক প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তিনি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন গ্যাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। (১) বিষাক্ত গ্যাস—ইহা মোমবাতির শিখা নির্বাপিত করে এবং খনির অভ্যন্তরে ও কোন কোন গুহার মধ্যে (নেপল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী বিখ্যাত গ্রোত্তো দেল কান) অবস্থান করে; আমরা এখন জানি, ইহা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। (২) গ্যাস কার্বনাম (gas carbonum),—কাঠকয়লা বা অনুরূপ দাহ্য পদার্থ পোড়াইয়া ইহা পাওয়া যায়; কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জ্বলন্ত কাঠকয়লা হইতে নির্গত এই গ্যাস (সম্ভবতঃ কার্বন মনোক্সাইড) নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণের ফলে হেলমণ্টের একবার প্রায় জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। (৩) ভূনিম্নস্থ মদ্য ভাণ্ডার গৃহে বিশেষতঃ মদ্য সন্ধানের ফলে উদ্ভূত গ্যাস; কার্বন ডাই-অক্সাইড। (৪) সালফিউরিক অ্যাসিড ও টার্টার লবণের সংমিশ্রণে অথবা পাতিত সির্কা ও ক্যালসিয়ম কার্বনেটের সংযোগে উৎপন্ন গ্যাস; কার্বন ডাই-অক্সাইড। (৫) ধাতু বিশেষের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন এক প্রকার

রক্তিমাভ বিষাক্ত গ্যাস; নাইট্রিক অক্সাইড। (৬) নাইট্রিক অ্যাসিড ও স্যাল অ্যামোনিয়াক যোগে উৎপন্ন গ্যাস; ক্লোরিণ ও নাইট্রোসিল ক্লোরাইড। (৭) পচন ও অন্ত্র হইতে উদ্ভূত অদাহ্য গ্যাস। (৮) জৈব পদার্থের পাতনের ফলে উদ্ভূত দাহ্য গ্যাস; হাইড্রোজেন, মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ। (৯) জ্বলন্ত গন্ধক হইতে উৎপন্ন সালফিউরাস অ্যাসিড গ্যাস। (১০) গলান শোরা ও কাঠকয়লা হইতে উদ্ভূত গ্যাস; ইহার নাম তিনি দেন gas sylvestre; প্রকৃতপক্ষে ইহাও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস; ইত্যাদি। এইখানে লক্ষণীয় এই যে, বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত একই গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তিনি বিভিন্ন বিভাগে ফেলিয়াছেন। নানা-ভাবে এই গ্যাস উৎপন্ন করিয়াও তিনি শেষ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। গ্যাস সংগ্রহ করিবার উপায় জানা থাকিলে তিনি অনায়াসে ইহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেন। সেইরূপ শোরা, কাঠকয়লা ইত্যাদি দ্রব্যের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়াও তিনি অক্সিজেন গ্যাসের উদ্ভব লক্ষ্য করেন নাই। গ্যাস লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে, পাত্রের মুখ বন্ধ থাকিলে ঠাণ্ডা অবস্থাতেও অনেক সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়া পাত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। নির্গত গ্যাসের জন্যই যে এইরূপ হইয়া থাকে ইহা তিনি আঁচ করেন এবং এইরূপ ধারণা হইতে তিনি বলেন, অগ্নি-সংযোগের ফলে বারুদ হইতে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস নির্গমই বিস্ফোরণের প্রধান কারণ।

গ্যাস সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি পরীক্ষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একটি পাত্রে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া পাত্রের মধ্যে কিছুটা জল ঢালিলেন। এইবার একদিক বন্ধ একটি কাচপাত্রের দ্বারা মোমবাতিটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দিবার অল্প পরেই লক্ষ্য করিলেন যে, কাচপাত্রের মধ্যে জল বাহিরের জলের উচ্চতা অপেক্ষা কিছুটা বেশী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। হেলমণ্টের উপসংহার হইল, জ্বলন্ত মোমবাতির ক্রিয়ার ফলে কাচপাত্রের মধ্যে কিছুটা শূন্যতার উদ্ভব হইতেছে এবং প্রকৃতিতে শূন্যস্থান অপূর্ণ থাকা অসম্ভব বলিয়া বাহিরের জল কাচপাত্রের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়া এই শূন্যতা ভরাইয়া দিতেছে। কিন্তু কেন শূন্যতার সৃষ্টি হইতেছে, মোমবাতি জ্বলিবার সহিত ইহার সম্পর্ক কি, দহনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাচ-পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর কিছুটা অংশ উধাও হইতেছে কিনা এজাতীয় প্রশ্ন ভ্যান হেলমণ্টের মনে উদয় হয় নাই। হইলে, এই পরীক্ষা হইতে তিনি আরও অনেক আশ্চর্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে উপনীত হইতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হেলমণ্টের বহু পূর্বে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকে বাইজানটাইনের ফিলো ও দশম শতাব্দীতে মুসলমান বিজ্ঞানী ইব্‌ন্‌ রুস্‌দ্‌ এই জাতীয় পরীক্ষা সম্পাদন করেন।

মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে মতবাদ—বৃক্ষ-পরীক্ষা : মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে ভ্যান হেলমণ্টের মতবাদ ও কয়েকটি পরীক্ষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এম্পিডকলেস ও অ্যারিস্টটলের আমল হইতে সর্ববাদিসম্মত চারি মৌলিক পদার্থের মতবাদ তিনি অস্বীকার করেন। প্যারাসেলসাস ইহার উপর যে রং ফলাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার প্রত্যয় হইয়াছিল, সত্যকার মৌলিক পদার্থ মাত্র দুইটি—বায়ু ও জল। অপর দুইটি মৌলিক পদার্থ অগ্নি ও মৃত্তিকার প্রকৃত মৌলিকত্ব বলিয়া কিছু নাই। প্রথমতঃ অগ্নি আদপেই পদার্থ নহে, কারণ ইহার পদার্থের কোন আকৃতি নাই। মৃত্তিকাকেও ঠিক মৌলিক পদার্থ বলা যায় না, কারণ ইহা শেষ পর্যন্ত জল হইতে উদ্ভূত। মৃত্তিকা সম্বন্ধে তাঁহার এই ধারণা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক পরীক্ষা সম্পাদন করেন। পরীক্ষাটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে হেলমণ্টের 'বৃক্ষ-পরীক্ষা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হেলমণ্ট নিজে ইহার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"আমি একটি মৃন্ময় পাত্রে ২০০ পাউণ্ড ওজনের মৃত্তিকা গ্রহণ করি; এই মৃত্তিকাকে চুল্লীর আগুনে পূর্বেই শুষ্ক করা হইয়াছিল। তারপর বৃষ্টির জলে এই মাটি ভিজাইয়া পাঁচ পাউণ্ড

ওজনের একটি উইলো গাছের কাণ্ড ইহাতে রোপণ করি। পাঁচ বৎসর পরে দেখি এই গাছটি অনেক বড় হইয়াছে এবং ইহার ওজন দাঁড়াইয়াছে ১৬৯ পাউণ্ড ৩ আউন্সের মত। আমি প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে এই পাত্রে শুধু বৃষ্টির জল অথবা পাতিত জল ঢালিতাম......বাহিরের ধুলোবালি উড়িয়া আসিয়া পাত্রস্থ মৃত্তিকার সহিত যাহাতে মিশিয়া না যায় সেজন্য পাত্রের মুখ একটি লোহার ঢাকনার দ্বারা সর্বদা বন্ধ করিয়া রাখিতাম।......অবশ্য এই চারিটি শরৎকালে গাছটি হইতে যত পাতা খসিয়া পড়িয়াছিল তাহার ওজন আমি গ্রহণ করি নাই। যাহা হউক, অবশেষে পাত্রস্থ মৃত্তিকা আবার শুষ্ক করিয়া উহার ওজন গ্রহণ করিতে গিয়া দেখি, প্রায় আগেকার ওজন ২০০ পাউণ্ডই রহিয়া গিয়াছে,—প্রকৃত ওজন দুই আউন্স কম হইয়াছিল মাত্র। অতএব ১৬৪ পাউণ্ড ওজনের কাষ্ঠ, ছাল ও মূল কেবল জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।"

সুতরাং মৃত্তিকাবৎ কাষ্ঠ, ছাল, মূল ইত্যাদি জল হইতেই যখন উদ্ভূত হইতেছে তখন মৃত্তিকাকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না। কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করা সত্ত্বেও উপরিউক্ত পরীক্ষায় উইলো গাছের বৃদ্ধি-সাধনে এই গ্যাস যে কিরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তারপর উইলো গাছের পরিকল্পনারও তিনি প্রথম উদ্যোক্তা নহেন; ভ্যান হেলমণ্টের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নিকোলাস অব কুসা এইরূপ একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতে কলমে পরীক্ষাটি করিয়া দেখিবার প্রথম কৃতিত্ব হেলমণ্টের প্রাপ্য।

বস্তুর নিত্যতা : হেলমণ্টের রাসায়নিক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পরিমাণাত্মক (quantitative)। তাঁহার সমস্ত গবেষণায় তুলাদণ্ডের ব্যাপক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পূর্বে ও পরে ব্যবহৃত বস্তুর ওজন তিনি নিয়মিতভাবে ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেন। এই কারণে বস্তুর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মে। তিনি দেখান যে, কোন ধাতু অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইলে ইহা সত্যসত্যই কিছু আর একেবারে লুপ্ত হয় না, চেষ্টা করিলে সুবিধামত পদ্ধতির সাহায্যে এই ধাতুকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে রৌপ্য যখন দ্রবীভূত হয় তখন ইহা বিনষ্ট হয় না, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দ্রবণে ইহা আত্মগোপন করিয়া থাকে মাত্র, যেমন জলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে দ্রবীভূত লবণ। দ্রবীভূত রৌপ্যকে আবার উদ্ধার করা যায়।

হেলমণ্ট তুঁতিয়া ও হিরাকসের পার্থক্য নির্ণয় করেন। প্রথমোক্তটি পাতিত করিলে তাহা হইতে কোন অম্ল নির্গত হয় না। অনুরূপ অবস্থায় শেষোক্তটি হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। তিনি সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড, অম্লরাজ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি অম্লের উৎপাদনের একাধিক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হেলমণ্টের উপরিউক্ত গবেষণায় আধুনিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট। তথাপি কিমিয়ায় তিনি ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার তিনি এক বর্ণনা প্রদান করেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জনৈক বিদেশী কিমিয়াবিদের নিকট তিনি একবার মাত্র এক গ্রেনের এক-চতুর্থাংশের মত ওজনের পরশ পাথর পাইয়াছিলেন। ইহা এক রকমের ভারী লোহিত চূর্ণ বিশেষ, দেখিতে অনেকটা চূর্ণ কাচের মত ঝকঝকে, এবং গন্ধে জাফরানকে স্মরণ করায়। মোমের আবরণে ইহাকে উত্তপ্ত পারদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার কিছু পরেই দেখা গেল পারদ ক্রমশঃ গাঢ় হইতেছে। এইবার উত্তাপের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলে সমগ্র বস্তুটি গলিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হইল। কিমিয়াবিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী ধাতুরূপান্তরে তিনি যে বিশ্বাসী ছিলেন, এই বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ব্রুসেল্‌সে অথবা এই সহরের নিকট ভিল্‌ভোর্ড নামক স্থানে হেলমণ্টের মৃত্যু হয়।

ফলিত রসায়ন ও ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যা—বিরিংগ্চিও, এগ্রিকোলা

ইয়াট্রো-রাসায়নিকরা যে সময়ে নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়া রসায়নকে নূতন খাতে বহাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় আর এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের তৎপরতায় সমগ্রভাবে রসায়নশাস্ত্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছিল। আমরা খনি ও ধাতু-নিষ্কাশনের কার্যে নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও কারিগরদের প্রচেষ্টার কথা বলিতেছি। খনি হইতে খনিজদ্রব্য উত্তোলন এবং সেই খনিজ হইতে ধাতু-নিষ্কাশন অবশ্য অতি প্রাচীন বিদ্যা। শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় এই ব্যাপারে কারিগরশ্রেণীর ব্যক্তিরাই ছিল সর্বেসর্বা এবং এই শ্রেণীর লোকেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা না থাকায় তাহাদের কার্যকলাপ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বহু শত বৎসর যাবৎ শিক্ষিত সমাজের ও বৈজ্ঞানিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অনিবার্য কারণে ও কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় খনিজ সম্বন্ধীয় বিষয় ও ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যা বিদ্বৎসমাজের বিশেষতঃ রাসায়নিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে এই সময় অধিক সংখ্যায় মুদ্রা প্রচলনের জন্য অধিক পরিমাণ স্বর্ণরৌপ্যাদি মহার্ঘ ধাতু উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ইউরোপের খনি অঞ্চলে ধাতু উৎপাদনের এক মরসুম পড়িয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাইরোলে, বোহেমিয়ায় ও হাঙ্গেরীতে ব্যাপক খনি সন্ধান, মূল্যবান ধাতুর নূতন নূতন খনি আবিষ্কার ও ধাতুর উৎপাদন সংক্রান্ত নানাবিধ তৎপরতার ইহাই প্রধান কারণ। এই অঞ্চলে রৌপ্যখনি প্রথম উৎপাদন আরম্ভ করে ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ইহার দশ বৎসর পরে হাঙ্গেরীতে তাম্রখনির কার্যও সুরু হয়। হাঙ্গেরীর তাম্রশিল্প অল্পকালের মধ্যে ভেনিসের তামার বাজারকে কোণঠাসা করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ধাতুর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যার ও তৎসংক্রান্ত টেকনিকেরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ধাতু উত্তোলন ও ধাতু-নিষ্কাশন সম্বন্ধে ছোটবড় কয়েকটি চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের *Ein Nützlich Bergbüchlein* (খনি সম্বন্ধীয় একটি প্রয়োজনীয় পুস্তিকা) প্রাচীনতম। সম্ভবতঃ ইহা আউগ্‌স্‌বুর্গ হইতে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পরবর্তী ও অধিকতর মূল্যবান গ্রন্থ *Probierbüchlein*-এর (প্রকাশ-কাল ১৫১০) লেখকও অজ্ঞাতনামা। ইহার পর উল্লেখযোগ্য ইতালীর বিরিংগুচ্চিওর *De la Pirotechnia*। *Pirotechnia* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহা ইতালী ভাষায় রচিত। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়।* বিরিংগুচ্চিওর রচনা বিশেষ প্রণালীবদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ। রৌপ্য নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে তথাকথিত পারদ-প্রণালীর (mercury process) এক চমৎকার এবং সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম মুদ্রিত বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরাবর্তক চুল্লীর (reverberatory furnace) একটি বর্ণনা ইহার আর একটি বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত বিরিংগুচ্চিও তরলীভবন পদ্ধতিতে (liquation process) চুল্লীর উত্তাপের মাত্রা রৌপ্যের গলনাঙ্কের (melting point) কাছাকাছি কিন্তু তাম্রের গলনাঙ্কের নীচে রক্ষা করিবার ব্যবস্থার দ্বারা তাম্র হইতে রৌপ্যের পৃথকীকরণের এক অতি সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। নীল কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানীজের প্রথম উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। *Pirotechnia* প্রকাশের ষোল বৎসর পরে আত্মপ্রকাশ করে এগ্রিকোলার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ *De re metallica*। এই গ্রন্থ দুই শত বৎসর ধরিয়া

**The Pirotechnia of Vannucio Biringuccio,* Cyril Stanley Smith ও Martha Teach Gnudi কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, New York, 1942.

ধাতু উত্তোলন ও নিষ্কাশন-বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞানী হিসাবেও এগ্রিকোলার স্থান বহু উচ্চে। এই বিজ্ঞানে তিনি বাস্তবিকই এক সম্পূর্ণ নূতন যুগের প্রবর্তক।

জর্জিয়াস এগ্রিকোলা (১৪৯৪-১৫৫৫)

জর্জিয়াস এগ্রিকোলার (জার্মান নাম জর্জ বাওয়ের) জন্ম হয় স্যাক্সনিতে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি লাইপ্‌জিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করিয়া কিছুকাল জিকাউ-এর এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পরে লাইপ্‌জিকে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান অনুপ্রেরণার স্থান ছিল ইতালী। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষার্থ তিনি প্রথম ইতালীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং বোলোনা, ভেনিস ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁহার অধ্যয়নের প্রধান বিষয় ছিল চিকিৎসা-বিদ্যা। বিভিন্ন ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের পর দেশে ফিরিয়া তিনি জোয়াকিমস্টালের পৌরচিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। খনি-অঞ্চলে অবস্থিত জোয়াকিমস্টাল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর; ইহার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ফ্রাইবের্গ, শ্নীবের্গ, গেয়ার, অল্টেনবের্গ, অ্যানাবের্গ প্রভৃতি সহরগুলি ইতিপূর্বেই বিবিধ মূল্যবান ধাতুর খনির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের খনি-সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হইলে মধ্য-ইউরোপের এইসব প্রসিদ্ধ খনি-অঞ্চল হইতেই তিনি সুদক্ষ কারিগরদের আনাইয়াছিলেন।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে কর্মজীবন আরম্ভ হওয়ায় এগ্রিকোলা স্বভাবতঃই খনির কার্যে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। চিকিৎসাকার্যের ফাঁকে ফাঁকে সময় পাইলেই তিনি খনি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এবং ধাতু উত্তোলন ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত নানা ব্যবহারিক সমস্যা লইয়া চিন্তা করিতেন। কি ভাবে খনি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, খনির কাজ কি ভাবে চলে, ইহাতে কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, কি পদ্ধতিতে ও কিরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশিত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের তিনি অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁহার কাজে আসিল; তিনি নিজে কয়েকটি নবাবিষ্কৃত খনির অংশ ক্রয় করিলেন। এইসব অংশ হইতে এবং খনি সম্বন্ধীয় পরামর্শ দানের জন্য যে আয় হইতে থাকে তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য চিকিৎসা-ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়া খনি ও ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য চিকিৎসা-ব্যবসায় হইতে বরাবরের জন্য তিনি কখনও অবসর গ্রহণ করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে তিনি শেমনিৎস নামক আর একটি সহরের প্রধান পৌরচিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন (১৫৩৩) এবং ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সহরেই বাস করেন। শেষ বয়সে তিনি শেমনিৎসের মেয়র বা পৌরাধিপতির পদে নিযুক্ত হন।

স্মরণীয় গ্রন্থ: এগ্রিকোলা কুড়ি বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *De re metallica*-র মাল-মসলা সংগ্রহ করেন।* এই গ্রন্থের প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ হয় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং গ্রন্থের চিত্রাঙ্কনগুলি সম্পূর্ণ করিতে আরও পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। চিত্রাঙ্কনগুলি তদানীন্তন খনিজ ও ধাতু-নিষ্কাশনবিদ্যার অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ। দুরূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ও যন্ত্রপাতির লিখিত বর্ণনা যে পর্যাপ্ত নহে, এই বর্ণনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ

---

* Georgius Agricola, *De re metallica,* Eng. tran. H. C. Hoover and L. H. Hoover, Dover Publications, New York, 1950. First published, London, 1912.

করিয়া তুলিতে হইলে যে নিখুঁত চিত্রাঙ্কন অপরিহার্য, এই সত্য তিনি অনুধাবন করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অতি চমৎকার সব চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইসব চিত্র হইতে প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যে শুধু মূল্যবান তথ্যই জানা যায় তাহা নহে, খনির কর্মীদের জীবনযাত্রার এক নিখুঁত ছবিও ইহাদের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ এগ্রিকোলার জীবিতাবস্থায় আরম্ভ হইলেও শেষ হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর।

দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত *De re metallica*য় খনি, খনিজশিল্প ও ধাতু-নিষ্কাশন সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় নাই যাহার আলোচনা বাদ পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে খনি-পরিচালনা, ভূবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য সংশিলষ্ট বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে 'divining rod' বা সন্ধানী দণ্ডের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কুসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ধারণার জাল রচিত হইয়াছিল এগ্রিকোলা তাহার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন।

৬৯। সন্ধানী দণ্ড (*De re metallica* হইতে)।

এই সন্ধানী দণ্ড একটি গাছের ডাল ছাড়া আর কিছুই নহে; ইহার এক অগ্রভাগ কাঁটার মত দুইভাগে বিভক্ত। সেই সময় ধারণা ছিল যে, এইরূপ সন্ধানী দণ্ড অলৌকিক গুণসম্পন্ন এবং ইহাকে ঠিক মত চালনা করিতে পারিলেই ভূগর্ভস্থ খনিজ-শিরা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ধাতু বিশেষের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের গাছের ডাল কাটিয়া সন্ধানী দণ্ড তৈয়ারী করা হইত। যেমন, ফিন্দিক গাছের (hazel) ডাল ব্যবহৃত হইত রৌপ্যঘটিত খনিজ আবিষ্কারের কার্যে, সীসক ও টিনের জন্য পাইন গাছের ডাল, ইত্যাদি। তবে স্বর্ণের জন্য লৌহ দণ্ড ব্যবহারের বিধান ছিল। এইরূপ একটি সন্ধানী দণ্ড হাতে লইয়া খনি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হইত (৬৯নং চিত্র)। সন্ধানী দণ্ডের এইরূপ গুণ যে, ভ্রাম্যমান ব্যক্তি কোন খনিজ-শিরার উপর পদার্পণ করা মাত্র হাতের মধ্যে

আপনা হইতেই দণ্ডটি ঘুরিয়া যাইবে। সন্ধানী দণ্ডের এই প্রকার অলৌকিক গুণ ও ব্যবহারের উপর তখন প্রায় প্রত্যেকেরই অটুট বিশ্বাস ছিল এবং খনি আবিষ্কারের কার্যে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হইত। এগ্রিকোলা এই পদ্ধতির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া ইহার প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "A miner, since we think he ought to be a good and serious man, should not make use of an enchanted twig, because if he is prudent and skilled in the nature of signs, he understands that a forked stick is of no use to him, for, as I have said before, there are the natural indications of the veins which he can see for himself without the help of twigs."

স্বাভাবিক লক্ষণ বলিতে এগ্রিকোলা বুঝাইয়াছেন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ও তত্রস্থ উদ্ভিদের কতকগুলি বিশেষত্ব। যেমন প্রস্তর ও শিলার প্রকার ভেদ; নিকটবর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌পত্রে স্বাভাবিকভাবে শিশির জমা সত্ত্বেও স্থান বিশেষের উদ্ভিদ্‌পত্রের উপর শিশির না জমিতে পারা; স্থান বিশেষের উদ্ভিদের নানাপ্রকার স্বাভাবিক বিকৃতি—পুষ্প ও পত্রের নীলাভ রং, শাখা-প্রশাখার অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ, কাণ্ডের বিভক্তি ইত্যাদি। তারপর প্রস্রবণ হইতে বুদ্বুদাকারে জল-নির্গমও খনিজের অস্তিত্বের নির্দেশক। এগ্রিকোলা এই জাতীয় লক্ষণগুলিকে স্বাভাবিক লক্ষণ বলিয়াছেন, কারণ ভূগর্ভস্থ ধাতু হইতে এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে।
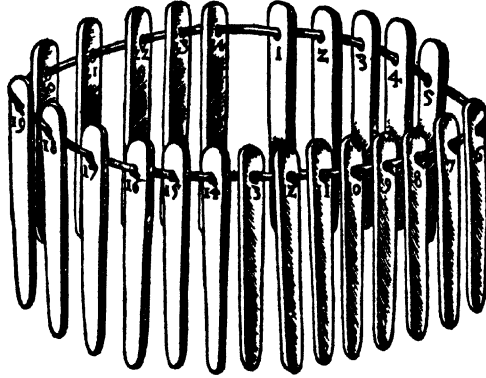
৭০। কষ্টিপাথরের সূচ (*De re metallica* হইতে)।

পরবর্তী কয়েক খণ্ডে নানাপ্রকার ধাতব শিরা ও খননকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বর্ণনা আছে। খনিজ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বর্ণনা আমরা পাই সপ্তম খণ্ডে: এই বর্ণনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। খনিজকে গলাইবার পূর্বে ইহার বিশুদ্ধতা, ধাতুর পরিমাণ, মিশ্রিত খাদের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করা আবশ্যক। এই কার্যে ব্যবহৃত চুল্লী, মুচি, কিউপেল, ছাঁচ, তুলাদণ্ড ও নানা ধরনের সূচের অতি প্রাঞ্জল বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ***Probierbüchlein*** ও ***Pirotechnia***তে অবশ্য এইসব যন্ত্রপাতির আলোচনা আছে; কিন্তু ***De re metallica*** তে যেরূপ বিশদ ও সম্পূর্ণ বর্ণনা

পাওয়া যায় উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অথবা পূর্বে প্রকাশিত আর কোন গ্রন্থে সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। টিন, বিসমথ, পারদ ও লোহঘটিত খনিজের প্রাথমিক পরীক্ষার নির্দেশগুলি রীতিমত মৌলিক। ধাতু চিনিতে ও তাহার বিশুদ্ধতা নির্ণয় করিতে কষ্টিপাথরের প্রয়োগ খুবই সুপ্রাচীন; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কষ্টিপাথরের নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহার সাহায্যে ধাতু পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এগ্রিকোলা পূর্ব হইতে নির্ধারিত বিভিন্ন মিশ্রণের কতকগুলি সূচ প্রস্তুত করেন। এখন কোন একটি অজ্ঞাত খনিজে কতটুকু স্বর্ণ বা রৌপ্য আছে তাহা বাহির করিতে হইলে কষ্টিপাথরের উপরিউক্ত সূচগুলির দাগের সহিত অজ্ঞাত খনিজের দাগ মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ৭০নং চিত্রে এইরূপ ২৪টি সূচ দেখানো হইয়াছে; প্রথম ১১টির সাহায্যে একটি রৌপ্যখণ্ডে কি পরিমাণ স্বর্ণের খাদ বর্তমান থাকে তাহা নির্ণয় করা যায়, অবশিষ্ট ১৩টি সূচের সাহায্যে একটি প্রদত্ত স্বর্ণখণ্ডে রৌপ্যের ভাগ নির্ণীত হইয়া থাকে। এই উপায়ে মুদ্রায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হইত। তাম্র, সীসক প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এগ্রিকোলা অন্যবিধ সূচের বর্ণনা দিয়াছেন।

৭১। বিসমথ অথবা লোহ নিষ্কাশনের উপযোগী চুল্লী
(*De re metallica* হইতে)।

গলাইবার পূর্বে খনিজকে প্রথমে বাছিয়া গুঁড়া করিয়া পরে জলে উত্তমরূপে ধুইয়া এবং সবশেষে জারিত করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। এইসব পদ্ধতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে অষ্টম খণ্ডে। এই খণ্ডে পারদ ব্যবহার করিয়া স্বর্ণোদ্ধারের এক পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অ্যামালগাম পদ্ধতিতে রৌপ্য উদ্ধারের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। বিরিংগুচ্চিও

তাঁহার *Pirotechnia*য় শেষোক্ত পদ্ধতির এক বর্ণনা দিয়াছেন। যাহা হউক, উপরিউক্ত উপায়ে তৈয়ারী করিবার পর খনিজকে বিগলিত করিবার পালা। বিগলনের উপযোগী নানাবিধ চুল্লীর কথা আলোচিত হইয়াছে নবম খণ্ডে। শুধু চুল্লী নহে, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত নানা প্রকার হাপরও ইহার অন্তর্ভুক্ত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসক, টিন, অ্যান্টিমনি, পারদ ও বিসমথ কেবল এই কয়টি ধাতুর বিগলন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য *De re metallica*য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিসমথের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ নূতন। বিগলনের পূর্বে বিসমথঘটিত খনিজকে কিরূপে তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় এগ্রিকোলার পূর্বে সেকথা আর কেহ উল্লেখ করেন নাই। বিসমথ ধাতুর প্রথম বর্ণনাও আমরা এইখানে পাই। *De re metallica*য় বর্ণিত ও চিত্রিত মারুত চুল্লীর একটি নমুনা দেওয়া হইতেছে (৭১নং চিত্র)। এই চুল্লীটির ব্যাস প্রায় ২৪ ফুট ও উচ্চতা ৩০ ফুট। জলচাকার দ্বারা বড় বড় হাপর চালাইয়া চুল্লীর মধ্যে সজোরে বাতাস প্রবেশ করানো হইত।

প্রত্যেক খনিজেই একাধিক ধাতু বর্তমান এবং প্রায় ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধাতু একত্রে অবস্থান করে। রৌপ্য ও তাম্রের সহিত প্রায়শঃই কিছুটা স্বর্ণের খাদ থাকে; সেইরূপ আবার স্বর্ণ, তাম্র, সীসক ও লৌহঘটিত খনিজে থাকে অল্প-বিস্তর রৌপ্যের খাদ। সুতরাং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ধাতু-নিষ্কাশন এক দুরূহ ও জটিল সমস্যা। নিকৃষ্ট ধাতুরা পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকিলে বিশুদ্ধতার প্রশ্ন এত বড় করিয়া দেখা দিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু নিকৃষ্ট ধাতুর সহিত উৎকৃষ্ট ধাতুর একত্র অবস্থানের জন্য বিশুদ্ধতার প্রশ্ন বহু পূর্ব হইতেই ধাতুশিল্পে সংশ্লিষ্ট কারিগরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এগ্রিকোলাও এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং দশম ও একাদশ খণ্ডে ধাতু পৃথকীকরণের বিবিধ পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তরলীভবন পদ্ধতিতে তাম্র ও লৌহ হইতে রৌপ্যের পৃথকীকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পদ্ধতি সম্ভবতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। *Pirotechnia*য় বিরিংগুচ্চিও এই পদ্ধতির সাহায্যে তাম্র ও রৌপ্য পৃথকীকরণের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে এগ্রিকোলার বর্ণনা আরও অনেক বিশদ। বারংবার তরলীভবনের দ্বারা কি ভাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ধাতুদের উদ্ধার করা সম্ভবপর তাহা তিনি দেখান।

অম্ল ও ধাতব লবণ সম্বন্ধেও অনেক বর্ণনা আছে। গুণাগুণ অথবা প্রস্তুত-প্রণালীর দিক হইতে তাঁহার নিজস্ব কোন অবদান নাই। অধিকাংশ তথ্যই পূর্বে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

এগ্রিকোলার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে *De natura fossilium, libri X* ও *De ortu et causis subterraneorum* উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ দুইটি প্রধানতঃ মণিকবিদ্যার উপর লিখিত এবং মণিকবিদ্যার ইতিহাসে ইহাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমরা এগ্রিকোলার রাসায়নিক গবেষণার দিকটাই বেশী করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু মণিকবিদ্যাতেও তাঁহার অবদান অসামান্য। যাহা হউক, বিজ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি অবিস্মরণীয়। সর্বোপরি তাঁহার রচনায় ও চিন্তাধারায় যে খাঁটী বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও পদ্ধতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমরা লিওনার্দো, গ্যালিলিও, স্টেভিনাস, হার্ভি প্রমুখ এই যুগের অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যে লক্ষ্য করি। এগ্রিকোলা নিঃসন্দেহে ইঁহাদের সমগোত্রীয়। তাঁহার সম্বন্ধে হুভার লিখিয়াছেন :

> "That Agricola occupied a very considerable place in the great awakening of learning will be disputed by none except by those who place the development of science in rank far below religion, politics, literature, and art. Of wider importance than

the details of his achievements in the mere confines of the particular science to which he applied himself, is the fact that he was the first to found any of the natural sciences upon research and observation, as opposed to previous fruitless speculation. . . . Science is the base upon which is reared the civilization of today, and while we give daily credit to all those who toil in the superstructure, let none forget those men who laid its first foundation stones. One of the greatest of these was Georgius Agricola."*

১২.৪। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা

রেণেশাঁসের সঞ্জীবনী আবহাওয়ায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাও তাহার চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছিল। চিকিৎসার কার্যে ভেষজের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত গবেষণাকে ত্বরিত করে। তারপর রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি সংঘটিত হওয়ায় সুন্দরভাবে জীবনযাপন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। লোকে বৃক্ষরোপণে ও উদ্যান-রচনায় মনোযোগী হয়। পাদুয়া, পিসা, লাইডেন প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বড় বড় উদ্ভিদের বাগান গড়িয়া উঠে এবং পর্যটকগণ নানাদেশ হইতে নূতন নূতন উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়া এইসব বাগানের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করেন। চিকিৎসার প্রয়োজন ও উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক কৌতূহল—এই দ্বিবিধ কারণেই উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চা ইউরোপে এই সময়ে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়কার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্রুনফেলস, বক, কর্ডাস ও ফুকসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবং ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন জার্মান। ইঁহাদের গবেষণার ফলেই আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সূত্রপাত। স্প্রেঙ্গেল তাঁহার 'উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের ইতিহাসে' এই জার্মান উদ্ভিদ্‌বিদ্‌দের আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিদ্যার জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই।

জার্মান উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানিগণ

ব্রুনফেলস (১৪৬৪-১৫৩৪) : অটো ব্রুনফেলসিয়াস, সংক্ষেপে ব্রুনফেলস, ষোড়শ শতাব্দীর উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সংস্কারকদের মধ্যে প্রথম। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মাইনৎজে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যু হয় বের্ণে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রুনফেলসের খ্যাতি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Herbarum vivae eicones*-এর উপর প্রতিষ্ঠিত; এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাসবুর্গ হইতে। ভৈষজ্যগুণসম্পন্ন উদ্ভিদের ব্যবহারই ছিল তাঁহার গবেষণার প্রধান বিষয় এবং এই জাতীয় উদ্ভিদ্ সংগ্রহকারীদের সুবিধার জন্যই তিনি *Herbarum* রচনা করেন।

ব্রুনফেলস মধ্যযুগীয় প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার বহু উপকরণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থ হইতে গৃহীত। *Herbarum*-এর বিশেষত্ব এই যে, এই গ্রন্থে প্রদত্ত লতা, পাতা, উদ্ভিদ্ ইত্যাদির চিত্রাঙ্কনগুলি বিশেষ প্রাণবন্ত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত উদ্ভিদের যেসব কাষ্ঠখোদাই-এর (wood cut) নমুনা পাওয়া যায় ব্রুনফেলসের চিত্রগুলি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাভাবিক ও উন্নত ধরনের। এই

* *De re metallica,* Introduction to Hoover translation, xiv.

চিত্রাঙ্কন অবলম্বনে পরে ব্রুনফেলস কর্তৃক বর্ণিত বহু উদ্ভিদের প্রজাতি নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি প্রায় ৪৭টি নূতন প্রজাতির উদ্ভিদের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বলিতে গেলে একরূপ তাঁহার রচনা হইতেই উদ্ভিদ্ শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার (taxonomy) সূত্রপাত হয়।

হিয়েরোনিমাস বক (১৪৯৮-১৫৫৪): হিয়েরোনিমাস বক (তিনি হিয়েরোনিমাস ট্রাগাস নামেও পরিচিত) ব্রুনফেলসের সমসাময়িক ছিলেন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় দীর্ঘকাল ব্রুনফেলসের সহিত সহযোগিতা করেন। *Herbarum* গ্রন্থের বহু উপকরণ তিনি সরবরাহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও *New Kreutterbuch* নামে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। পুষ্পের গঠন-বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত অনেক রহস্যের তিনি সমাধান করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, দলমণ্ডল (corolla), গর্ভকেশর (pistil) ও পুংকেশর (stamen) পুষ্পমাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এক স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্তমান। পুষ্পের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থান ও তাহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা মধ্যযুগে রীতিমত কৌতূহলের বিষয় ছিল।

লিওনহার্ড ফুকস (১৫০১-১৫৬৬): রেনেশাঁস আমলের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী লিওনহার্ড ফুকস সম্বন্ধে অ্যাগনেস আর্বার মন্তব্য করিয়াছেন:

> "Of all the botanists of the Renaissance, Fuchs is perhaps the one who deserves most to be held in honour. He is notably superior to his two predecessors in matters calling for scholarship, such as the critical study of the plant nomenclature of classical authors. His herbal rivals, or even surpasses, that of Brunfels in its illustrations, and that of Bock in its German text." *

ফুকস ছিলেন তাঁহার কালের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক; উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ছিল তাঁহার অবসর সময়ের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়। তিনি ইনগোলস্টাট বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে এই শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকালের জন্য মার্গ্রেভ জর্জ অব ব্রাণ্ডেনবুর্গের রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে স্থায়ীভাবে টুবিংগেনের প্রোটেস্টান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

চিকিৎসক হিসাবে ফুকস একান্ত স্বাভাবিক কারণেই ভৈষজ্য উদ্ভিদের গবেষণায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য উদ্ভিদের গঠন-বৈচিত্র্য, ইহার অন্তর্নিহিত জটিল জৈবপ্রক্রিয়ার রহস্যের পরিবর্তে উদ্ভিদের রোগনাশক গুণাবলীই তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। গবেষণার ক্ষেত্র এইভাবে কিছুটা সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার *De historia stirpium* উদ্ভিদ্‌বিদ্যার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থে ৫১১টি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সম্পূর্ণ নূতন এবং ব্রুনফেলস বা বকের গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। তারপর উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কনগুলিও ব্রুনফেলসের অপেক্ষা অনেক বেশী নিখুঁত ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই কার্যে তিনি স্ট্রাসবুর্গের দুইজন বিখ্যাত শিল্পী ও সবচেয়ে নামকরা এক কাষ্ঠখোদককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তাহাদের অঙ্গসংস্থানের নিখুঁত বর্ণনা প্রদান করিয়াই তিনি তাঁহার কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের অন্তর্নিহিত গঠন-বৈচিত্র্য, তাহার কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা তিনি করেন নাই। এই বিষয়ে

---

* Agnes Arber, *Herbals—Their Origin and Evolution*, Cambridge, 1912, p. 60.

থিওফ্রেসটাস ও ডিওস্কোরিডিসের ধারণাকেই তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। ফ্‌কসের এই দুর্বলতার জন্য আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরা তাঁহাকে খাঁটী উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করিতে কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। তৎসত্ত্বেও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন এই বিজ্ঞানে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় রাখিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট।

ভ্যালেরিয়াস কর্ডাস (১৫১৫-৪৪) : ভ্যালেরিয়াস কর্ডাস মাত্র ২৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Historia plantarum* -এর পাঁচ খণ্ড সম্পূর্ণ করেন। সুইস উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ কনরাড গেসনার কর্ডাসের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কর্ডাসের রচনা প্রণালীবদ্ধ। তিনি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের শারীরস্থান বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করেন,—যেমন, ডিম্বাশয়ের মধ্যে কয়টি করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে, আমরা-বিন্যাসের (placentation) স্বরূপ কি ইত্যাদি। তিনি পরাগরেণুর (pollen grains) উল্লেখ করেন এবং ছত্র-বিন্যাস (umbel) ও কোরিম্বের (corymb) প্রভেদ সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন।* এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে প্রাপ্ত বহু নূতন কাষ্ঠ, বল্কল, ফল ও রঞ্জনের বর্ণনায় তাঁহার গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তৎপরতা

ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের গবেষণায় জার্মানী প্রথমদিকে প্রাধান্য লাভ করিলেও সুইট্‌জারল্যান্ড, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশও পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। সুইট্‌জারল্যান্ডে গেসনার ও বোহ্যাঁ, হল্যান্ডে রেমবার্ট ডোডোয়েনস, চার্লস লেকলুস ও লো'বেল, ইংল্যান্ডে টার্নার ও জিরার্ড, ইতালীতে মাত্তিওলি, কলোম্না ও সেসাল্পিনি উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে মূল্যবান গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

কনরাড গেসনার (১৫১৬-৬৫) : কর্ডাসের *Historia plantarum* -এর প্রকাশক হিসাবে গেসনারের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। গেসনারের প্রতিভা ছিল বহুমুখী এবং তাঁহার জ্ঞানও ছিল বিশাল। চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তবে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

জোহান ব্যোহ্যাঁ (১৫৪১-১৬১৩) : বোহ্যাঁ ফ্‌কস-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদের বর্ণনা প্রদান করেন এবং এই বর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুণাগুণ ও বাস্তু-সংস্থান (ecology) আলোচনা করেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত ***Historia plantarum universalis*** তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

রেমবার্ট ডোডোয়েনস (১৫১৭-৮৫) ও চার্লস দ্য লেকলুস (১৫২৬-১৬০৯) ভৈষজ্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। *Stirpium historiae* গ্রন্থে রেমবার্ট সর্বপ্রথম হল্যান্ডে প্রাপ্ত বহু অজ্ঞাত উদ্ভিদের বর্ণনা ও আলোচনা করেন। *Cruy de boeck* তৎলিখিত আর একটি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেকলুস মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং সেই সূত্রে উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় আকৃষ্ট হন। তিনি রেমবার্টের *Cruy de boeck*-এর এক ফরাসী তর্জমা রচনা করেন। পরিণত বয়সে তিনি *Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum* শীর্ষক এক অতি মৌলিক গ্রন্থে স্পেন ও পর্তুগালের উদ্ভিদের আলোচনা করেন। ওলন্দাজ লো'বেলের

* H. S. Reed, *A Short History of Plant Sciences*, p. 65.

গবেষণা প্রধানতঃ উদ্ভিদ্‌শ্রেণীবন্ধবিদ্যায় নিবদ্ধ। তিনি উদ্ভিদ্‌কে দ্বিবীজপত্রী (dicotyledon) ও একবীজপত্রী (monocotyledon) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন।

উইলিয়ম টার্নার (১৫১৫-৬৮) ও জন জিরার্ড (১৫৪৫-১৬১২): ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানীদের মধ্যে উইলিয়ম টার্নারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টার্নারের সময় হইতেই ইংল্যাণ্ডে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রপাত। তিনি ইউরোপের বহু স্থানে পর্যটন করেন এবং সেই সূত্রে নানা দেশের বিচিত্র উদ্ভিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। বোলোনায় ঘিনির নিকট তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গেসনারের নিকট তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। লিওনহার্ড ফুকস-এর সহিত তাঁহার এই সময় পত্র-বিনিময় হয় এবং ফুকসের নিকট হইতে তিনি কয়েকটি উদ্ভিদের কাষ্ঠখোদাই সংগ্রহ করেন। ইউরোপ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়া তিনি ডিউক অব সমার্সেটের চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। টার্নারের প্রথম গ্রন্থ *Libellus de re herbaria novus* প্রকাশিত হয় ১৫৩৮ খৃীষ্টাব্দে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল *Herball*; এই গ্রন্থের শিরোনামা তিনি এইভাবে লিখিয়াছেন: 'A new Herball, wherein are conteyned the names of Herbes . . . with the properties degrees and natural places of the same, gathered and made by Wylliam Turner, Physicion unto the Duke of Somersettes Grace.' * টার্নার তাঁহার গ্রন্থে প্রধানতঃ নিজ পর্যবেক্ষণের ফলই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বহু উদ্ভিদের ইংরেজী নাম প্রদান করিয়াছেন। উদ্ভিদ্‌রাজ্যে প্রচলিত বহু মধ্যযুগীয় কুসংস্কার তিনি দূর করিতে সচেষ্ট ও সফল হন।

সাধারণ বাগান করার অভিজ্ঞতা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অগ্রগতিতে যে কিরূপ সাহায্য করিতে পারে ইংরেজ জন জিরার্ড তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লণ্ডনে ফেটার লেন বা হোবোর্নের নিকটে তাঁহার এক বিরাট বাগান ছিল। এই বাগানে ১০৩৩টির উপর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *The Herbal or General Historie of Plants*-এ ১৮০০ কাষ্ঠখোদাই চিত্র সংবলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আলুর কয়েকটি চমৎকার চিত্র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভুলক্রমে তিনি আলুর বর্ণনায় লেখেন যে, ইহা ভার্জিনিয়ার আলু (Battata Virginiana Sive Virginianorum et Pappus)। এই আলু অবশ্য আদৌ ভার্জিনিয়া হইতে আসে নাই এবং ইহা *Ipomeabatatas* প্রজাতিরও অন্তর্ভুক্ত নহে।† জিরার্ডের এই ভুল বহুদিন পর্যন্ত অসংশোধিত ছিল।

রেনেশাঁসের সময় ইতালীয় উদ্ভিদ্‌বিদদের গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা অ্যারিষ্টটল, থিওফ্রেসটাস, ডিওস্কোরিডিস, প্লিনি প্রমুখ প্রাচীন উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিবিজ্ঞানীদের বর্ণিত উদ্ভিদের সঙ্গে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উদ্ভিদের আকৃতি ও গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন এবং সেই প্রচেষ্টায় যেসব ভুল ও অসঙ্গতি আবিষ্কার করেন তাহার ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রন্থের নানা সমালোচনা প্রস্তুত করেন। প্রাচীন উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানিগণ প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌দের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন; এই কারণেও নূতন আবিষ্কারের পরিবর্তে প্রাচীন বর্ণনার সত্যতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা ইতালীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পিয়ান্দ্রিয়া মাত্তিওলি (১৫০১-৭৭): মাত্তিওলি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Commentarii in sex libros' Padacii Dioscorides*-এ ডিওস্কোরিডিসের বর্ণিত উদ্ভিদের সমালোচনা করেন। তাইরোলে প্রাপ্ত বহু নূতন উদ্ভিদের বর্ণনাও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। উপরিউক্ত

* Agnes Arber, *Herbals*, p. 102.
† H. S. Reed, *A Short History of Plant Sciences*, p. 70.

ডিওস্কোরিডিসের সমালোচনা প্রণয়নে তিনি বিখ্যাত পররাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বুসবেকের সাহায্য লাভ করেন। বুসবেক কনস্তান্তিনোপল সফরকালে যে কয়েকটি মূল্যবান প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে ছিল জুলিয়ানা অ্যানিসিয়া কর্তৃক সম্পাদিত ডিওস্কোরিডিসের মেটিরিয়া মেডিকার একটি পাণ্ডুলিপি। জনৈক ইহুদীর নিকট এই পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাইয়া উচ্চ মূল্যে (একশত ডুকা)* তিনি ইহা ক্রয় করেন এবং পরে মাত্তিওলির নিকট প্রেরণ করেন।

ফাবিও কলোন্না (১৫৬৭-১৬৫০) : কলোন্না *Phytobasanos* গ্রন্থে মাত্তিওলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রাচীন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের বর্ণিত উদ্ভিদ্দের সহজে চিনাইবার প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছেন। উদ্ভিদের গণ (genus) সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কেবলমাত্র পত্রের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদের গণ নির্ণয় করিলে ভুল হইবে। গণ নির্ণয় ব্যাপারে পুষ্প, পুষ্পাধার ও বীজের প্রকারভেদ সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইসব প্রভেদ ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তবে উদ্ভিদের গণ নির্ণয় করা উচিত।

অ্যান্ড্রিয়া সেসালপিনি (১৫১৯-১৬০৩) : ষোড়শ শতাব্দীর যে সকল উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের কথা এপর্যন্ত আলোচিত হইল তাঁহারা প্রত্যেকেই উদ্ভিদ্বিদ্যার গবেষণায় মোটামুটি এক সাধারণ পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই পন্থা ছিল উদ্ভিদের অধিকতর নিখুঁত বর্ণনা প্রদান করা; নির্ভুল ও স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে এই বর্ণনা সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা; এবং উদ্ভিদ্কে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা। চিকিৎসার্থ উদ্ভিদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এই গবেষণার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও উদ্ভিদের আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যের দিক,—উদ্ভিদ্জগতের এক আশ্চর্য বৈচিত্র্যের দিক। এই বিচিত্র সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যহীন? যদি ইহার পশ্চাতে কোন সুনিয়ন্ত্রিত উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে তাহার স্বরূপ কি? প্রাণিজগতের সহিত উদ্ভিদ্জগতের কি কোন সম্বন্ধ আছে? থাকিলে তাহা কিরূপ? এই জাতীয় প্রশ্ন সিদ্ধান্তমূলক; ইহা দর্শনের (প্রাকৃতিক দর্শনের) এলাকাভুক্ত। অ্যারিষ্টটল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন; থিওফ্রেসটাস এইরূপ এক ব্যাপক দার্শনিক ভিত্তিতেই তাঁহার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের কাঠামো রচনা করেন; মধ্যযুগে এই আদর্শের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের গবেষণায়। সেসালপিনি এই আদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন ষোড়শ শতাব্দীতে। অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এক ব্যাপক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি সমগ্র উদ্ভিদ্জগতকে বিচার করেন। তাঁহার আলোচনায় ও বর্ণনায় অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে বটে, তথাপি পরবর্তী শতাব্দীতে তাঁহার রচনা ও মতবাদ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর আর কোন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীর গবেষণা সেরূপ করিতে পারে নাই। সেসালপিনি ও লিনিয়াসের (১৭০৭-৭৮) মধ্যবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে আর কাহাকেও এইরূপ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উদ্ভিদ্বিদ্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না।

সেসালপিনি পিসায় ঘিনির নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বোলোনার বিখ্যাত উদ্যানের প্রধান উদ্যানসচিবের পদে নিযুক্ত হন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পোপ অষ্টম ক্লিমেটের চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং ঐরূপ সময়ে সাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ষোল খণ্ডে সমাপ্ত *De plantis* (প্রকাশ কাল—১৫৮৩) সেসালপিনির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ভিদ্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ লিপিবদ্ধ; অবশিষ্ট পনর খণ্ডে অন্যূন ১৫০০ উদ্ভিদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই প্রথম খণ্ডের আলোচনাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তিনি প্রমাণ করিবার

---

* *Herbals*, p. 85.

চেষ্টা করেন উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় শ্রেণীবিভাগের অপরিহার্যতা। তারপর প্রধানতঃ ফল ও বীজের নানা তারতম্য বিচার করিয়া তিনি উদ্ভিদ্‌দের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। ফল ও বীজ ছাড়া ভ্রূণমুকুল (radicle), মূল, পুষ্পের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার তিনি শ্রেণীবিভাগের কাজে প্রয়োগ করেন। প্রাণীদের মধ্যে তিনি শোণিত-সংবহন প্রণালী আঁচ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ এই ধরনের সংবহন যে উদ্ভিদ্‌জগতেও বিদ্যমান এইরূপ অভিমত তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মূল ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে এই সংবহন প্রণালীর কেন্দ্র বা উদ্ভিদাত্মা (plant soul) অবস্থিত। প্রাণীদের সহিত উদ্ভিদের তুলনায় তিনি আরও অনেক দূর অগ্রসর হন। উদ্ভিদস্থ মজ্জার সহিত তিনি প্রাণীদের সুষুম্নাকাণ্ডের তুলনা করেন। উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ণয়ে বীজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁহার পূর্বে আর কেহ অনুধাবন করেন নাই। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখিয়াছেন যে, কোন কোন উদ্ভিদের দুইটি করিয়া বীজপত্র (cotyledon) থাকে, কোন কোন উদ্ভিদের মাত্র একটি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বীজপত্র মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং এইরূপ অবস্থাতেই চারার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। কোন ক্ষেত্রে আবার বীজপত্র মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়াই পুষ্টি যোগাইয়া বীজকে অঙ্কুরিত হইতে সাহায্য করে।

অনেক বিষয়ে সেসালপিনি নানা ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করিতেন। উদ্ভিদে লিঙ্গের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন। পত্রের কার্য ফলকে রক্ষা করা এবং এই পত্রের উৎপত্তি বল্কল হইতে, তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল। বীজবিহীন উদ্ভিদ্ পচনক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয়, তিনি এরূপ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বেকন, দেকার্ত ও গ্যালিলিও

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পর গবেষণার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ও আদর্শের উদ্ভব হয় অদ্যাবধি তাহার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। এই পদ্ধতি ও আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিবার ফলেই বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়াছে। তথ্য ও তত্ত্বের দিক হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিজ্ঞানের সহিত আজিকার বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অবশ্য কোন তুলনাই হয় না। এই চারিশত বৎসরের অল্পপরিসর সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানের যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং এই জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের দ্বারা মানব জাতির ঐহিক ভাগ্যের যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা এক কথায় বিস্ময়কর। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাত্মক উন্নতি ও সাফল্যের পাশে বিভিন্ন বিশ্বধর্মের উত্থান, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথবা কম্যুনিজমের উদ্ভব, সাহিত্য ও চারুশিল্পের বিকাশ এক এক সময় নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি, মানুষের এইসব বিবিধ তৎপরতা অতীতে বিজ্ঞানের বিবর্তনে ও বিপ্লব সাধনে সহায়ক হইয়াছিল। এখন বিজ্ঞানই এই জাতীয় মানব-তৎপরতার প্রধান নিয়ামক। গত চারিশত বৎসরের যে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে তাহা আজ এক গভীর পরিবর্তনের সম্মুখীন। এই পরিবর্তনের মুখে সেই সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন খ্রীষ্টধর্ম, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি, টিকিবে কিনা বলা কঠিন। ইহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা একে একে শেষ হইয়া গেলেও মানুষের বৈজ্ঞানিক তৎপরতায় ও গবেষণায় পূর্ণচ্ছেদ পড়িবার আশঙ্কা অমূলক। কারণ, যতদূর দেখা যাইতেছে বিজ্ঞানই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ-বিবর্তনে ইহার প্রভাবই হইবে অবিসংবাদী। এজন্য যে পদ্ধতি ও আদর্শবলে বিজ্ঞানের এই উন্নতি ও প্রভাব সম্ভবপর হইয়াছে তাহার আলোচনার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। বিচ্ছিন্নভাবে এই পদ্ধতি ও আদর্শের কথা অবশ্য একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি; ইহার সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা এখন প্রণিধানযোগ্য।

সুপ্রাচীন কাল হইতে বিজ্ঞানের বিবর্তনে দুই প্রকার প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সংজ্ঞাত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞানলাভের চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধি ও মননশীলতার দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম, নীতি ও শৃঙ্খলার স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয়দের আমলে বিজ্ঞান বলিয়া আমরা যাহাকে অভিহিত করি তাহা প্রধানতঃ বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণলব্ধ, জ্ঞান। ইহা মূলতঃ কারিগরিবিদ্যার স্তরে নিবদ্ধ। এরূপ প্রয়াসের দ্বারা বস্তুর গুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, শল্যবিদ্যার উন্নতি ঘটিয়াছে, পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের এবং গণিত ও পরিমিতিবিদ্যার গোড়াপত্তন হইয়াছে, ইত্যাদি। প্রায়োগিক পদ্ধতিতে যখন যেমন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধানের চেষ্টার দ্বারা এই বিজ্ঞানের কলেবর গঠিত। এই উপায়ে যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে অচিরে ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের স্থবিরত্ব প্রাপ্তি এবং দীর্ঘকাল এই স্থবিরত্ব কাটাইয়া উঠিবার ব্যর্থতা তাহার প্রমাণ।

গ্রীকরা প্রথম হইতেই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী। প্রকৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন তথ্য আবিষ্কার যে যথেষ্ট নহে, এইসব ব্যবহার ও তথ্যের পশ্চাতে নেপথ্যে ক্রিয়াশীল নিয়ম ও নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনই যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আসল উদ্দেশ্য, গ্রীকরাই এই আদর্শের প্রথম উদ্যোক্তা। গ্রীক ধারণায় প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে শুদ্ধবুদ্ধি ও মননশীলতার মাধ্যমে;

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল অসম্পূর্ণ জগৎকে প্রণিধান করিবার চেষ্টা বৃথা। তারপর প্রকৃতিতে কতকগুলি সাধারণ বা সার্বজনীন সত্য আছে; বুদ্ধি ও মননশীলতার দ্বারা এই সত্যগুলি একবার আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহাদের ভিত্তিতে তখন অনায়াসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইবে। প্লেটোর মতে কতকগুলি বিমূর্ত ভাব (Idea) এইরূপ সাধারণ সত্য; এই ভাবের সাহায্যে নিখুঁত আকৃতির এমন এক আদর্শ জগৎ তিনি পরিকল্পনা করেন যাহার এক অতি ত্রুটিবহুল অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হইতেছে আমাদের দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগৎ। অ্যারিস্টটল প্লেটোর ভাব ও বস্তুর পৃথক সত্তা অস্বীকার করিলেও মনগড়া কতকগুলি আদর্শ আকৃতিকে (Form) তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই আদর্শ আকৃতি হইতে সুরু করিয়া নিগমন-পদ্ধতিতে তিনি বস্তুর গুণ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং অ্যারিস্টটলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেও বিজ্ঞানী বা প্রাকৃতিক দার্শনিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইবে বুদ্ধির দ্বারা আদর্শ আকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করা।

অ্যারিস্টটল উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, আবহবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে। কিন্তু জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগে তিনি যে অসামান্য সাফল্য লাভ করেন তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫-৯৪)। জীববিদ্যায় অ্যারিস্টটলের পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার দৃষ্টান্ত সমগ্রভাবে গ্রীক বিজ্ঞানকে প্রভাবিত না করিলেও থিওফ্রেস্টাস্, ষ্ট্রাটো ও লাইসিয়ামের পরবর্তী পণ্ডিতগণ প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও কিমিয়ার গবেষণায় এই আদর্শকে কিছুটা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতির দিক হইতে গ্রীকদের তৃতীয়, সম্ভবতঃ প্রধানতম, অবদান হইতেছে গণিতের প্রয়োগ। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা (যেমন রেখা ও বিন্দু) হইতে সুরু করিয়া নিগমন-পদ্ধতিতে গ্রীকরা গণিতের একটি সম্পূর্ণ নূতন ও উর্বর বিভাগ জ্যামিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, স্বতঃসিদ্ধ ও সংজ্ঞা ঠিক থাকিলে সিদ্ধান্তও ঠিক হইতে বাধ্য। গাণিতিক পদ্ধতির এই নিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া সম্ভবপর প্রাকৃতিক সমস্যা বিশেষের ক্ষেত্রে,—যেমন আলোকবিদ্যায় ও উদস্থিতিবিদ্যায়, গ্রীকরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই ধরনের গবেষণার শ্রেষ্ঠ গ্রীক প্রতিভূ ছিলেন আর্কিমিডিস। গাণিতিক বিশ্লেষণ যাহাতে সম্ভবপর হয় সেইমত বাস্তব সমস্যা বিশেষকে প্রথমে রূপান্তরিত করিয়া তিনি সমাধানে অগ্রসর হইতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই তত্ত্বীয় দিক ছাড়া কারিগরি-বিদ্যাতেও তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন: বহু যন্ত্র ও যান্ত্রিক কৌশল তিনি আবিষ্কার করেন। আর্কিমিডিসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাট সাফল্যের প্রধান কারণ এই যে, তিনি একই সঙ্গে গাণিতিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে গাণিতিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত সত্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিকে যথাযথ বুঝিতে গ্রীকরা গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব রকম পদ্ধতিই পরখ করিয়া দেখিয়াছিল। তন্মধ্যে শুদ্ধবুদ্ধি ও ধীশক্তির দ্বারা কতকগুলি চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়া তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জগৎকে বুঝিবার অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতির প্রাধান্য লাভের কারণ এই যে, গ্রীক আমলে ও তাহার পর বহুকাল পর্যন্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত যান্ত্রিক উন্নতি সংঘটিত হয় নাই। কাচপ্রস্তুতবিদ্যার উন্নতি ও গবেষণায় কাচপাত্রের প্রচলন, যান্ত্রিক ঘড়ি, রাসায়নিক তুলাদণ্ড, তাপমান ও চাপমান যন্ত্র, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি বিবিধ পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ অনেক পরের ঘটনা। ইহাদের অভাবে বস্তুর বিচিত্র গুণ ও ব্যবহার যথাযথ নিরূপণ করা সম্ভবপর ছিল না; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল অভিজ্ঞতাই ছিল প্রধান সম্বল। এজন্য একমাত্র শুদ্ধবুদ্ধি ও মননশীলতার

দ্বারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রণিধান করা সম্ভবপর, গ্রীক চিন্তায় এইরূপ ধারণার প্রাধান্য লাভে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় মননশীলতা প্রধানতঃ গ্রীক চিন্তাধারার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাতেই ব্যস্ত। এই কার্যে তাহারা স্বয়ংসম্পূর্ণ, মোটামুটি সন্তোষজনক ও তৈয়ারী একটি মতবাদ ও বিশ্বচিত্র হাতে পাইয়াছিল। প্রথমে প্লেটোর এবং পরে অ্যারিস্টটলের পরিণত চিন্তাধারার, বিশেষতঃ তাঁহার অধিবিদ্যা ও হেতুবিদ্যার, সহিত পরিচিত হইবার পর কিভাবে ল্যাটিন ইউরোপীয় মনীষা অ্যারিস্টটলের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহা আমরা বিশদভাবে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অধ্যাপক বাটারফিল্ড লিখিয়াছেন,

> "So in the middle ages men found themselves endowed with an explanation of the physical universe and the workings of nature which had fallen upon them out of the blue, and which they had taken over full-grown and ready-made. And they were infinitely more the slaves of that intellectual system than if they had actually invented it themselves, developing it out of their own original researches and their own wrestlings with truth."*

এই সম্পর্কে এ কথাও সত্য যে, গ্রীক বিজ্ঞানের অপর দুই পদ্ধতি,—পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণমূলক ও গাণিতিক পদ্ধতি, মধ্যযুগেই কতিপয় ল্যাটিন পণ্ডিতের কল্যাণে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রবার্ট গ্রোসেটেস্ট, রজার বেকন ও অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন নাই। বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে পর্যবেক্ষণ ও গাণিতিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব ইঁহারা প্রত্যেকেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। মধ্যযুগে নানা কারিগরি আবিষ্কার, আলোকবিদ্যা ও চুম্বকের ব্যবহার সম্বন্ধে নূতন তথ্যের সন্ধান, কিমিয়া-চর্চার ক্রমোন্নতি ইত্যাদি ব্যাপার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অপরিহার্যতা প্রদর্শন করিতেছিল। এইসব কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পদ্ধতির প্রশ্ন ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে। রজার বেকন *Opus majus* এর প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডে এই পদ্ধতির প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অপরিহার্যতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার পূর্বে গ্রোসেটেস্ট এবং সমসময়ে অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস এই একই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিজেদের গবেষণাও ছিল প্রধানতঃ পর্যবেক্ষণমূলক।

রেনেশাঁসের সময় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাহার কারণ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গণিতের প্রয়োজনীয়তাও বৈজ্ঞানিক মহলে অনুভূত হইয়াছিল। গ্রীক আমলে আর্কিমিডিস ছিলেন এই ধরনের গবেষণার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। আর্কিমিডিসের রচনাবলী বহুদিন পর্যন্ত নিখোঁজ ছিল; রেনেশাঁসের সময় তাঁহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলিলে তার্তাগ্লিয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণের চেষ্টায় তাহা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই পদ্ধতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; স্টেভিনাস, কেপ্লার ও গ্যালিলিও প্রধানতঃ এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে গ্রীকদের অনুসৃত প্রধান তিনটি পদ্ধতি,—(১) শুদ্ধ মননশীলতা ও যুক্তিমূলক, (২) পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক, (৩) গাণিতিক বিশ্লেষণমূলক, মধ্যযুগে ও রেনেশাঁসের সময় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একে একে চালু হইলে এবং ইহাদের প্রয়োগে নূতন নূতন সাফল্য লাভ ঘটিতে থাকিলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই পদ্ধতির প্রশ্ন আবার নূতন

---

* H. Butterfield. *The Origins of Modern Science*. G. Bell & Sons Ltd., 1950 ; p. 66.

করিয়া কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে কেমন করিয়া তাহা অব্যাহত রাখা যায়, শুধু তাহাই নহে, কোন পদ্ধতিবলে মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির সকল অজ্ঞাত রহস্যের কিনারা করিয়া তাহার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে, এ সম্বন্ধে যাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করেন ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), ও রেণে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) তাঁহাদের অগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেকন ও দেকার্তের মত লিখিতভাবে কোন নির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা না করিলেও তাঁহার অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু মন্তব্যের মধ্যে তিনি যে পদ্ধতি ও নীতির ইঙ্গিত দেন তাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী।

বেকন বলিতেন, আদমের নির্বুদ্ধিতা ও পতনের শাস্তিস্বরূপ মানবজাতি সৃষ্ট পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত কর্তৃত্ব হারাইলেও প্রকৃতির উপর আংশিক কর্তৃত্ব লাভের সম্ভাবনা তাহার কখনই তিরোহিত হয় নাই। যথেষ্ট পরিশ্রম করিলে এই শেষোক্ত কর্তৃত্ব লাভ বহু পূর্বেই তাহার ভাগ্যে ঘটিতে পারিত; কিন্তু তাহাও সে অবহেলা করিয়াছে। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, ঐতিহাসিককালে অল্প সময়ের জন্য মাত্র তিন বার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়,—প্রথম বার গ্রীকদের আমলে, দ্বিতীয় বার রোমক প্রাধান্যের কালে, তৃতীয় ও সর্বশেষ বার বেকনের সমসময়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে। গ্রেকো-রোমক আমল ও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিজ্ঞানের অতি সামান্য অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বেকন রীতিমত বিস্মিত হন। এত দীর্ঘকাল যাবৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব মনীষার এরূপ পূর্ণচ্ছেদ পড়িবার কারণ কি? এই অবস্থার জন্য বেকন প্রধানতঃ দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রকে দায়ী করেন। দর্শন ও ন্যায়ের দৌরাত্ম্য হইতে বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়া কেবলমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারিলে যে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হন।

বিজ্ঞানী যখন কোন গবেষণায় নিযুক্ত হন তখন তিনি সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—(১) 'আমি কেমন করিয়া ইহা দেখাইতে বা প্রমাণ করিতে পারি যে...'; এবং (২) 'এই সমস্যার সহিত কোন কোন তথ্য বা তথ্যসমূহের সম্পর্ক বিদ্যমান', অথবা 'কোন তথ্যগুলি উত্তমরূপে জানিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।' সমস্যা সম্বন্ধে অন্ততঃ অস্পষ্ট একটা মত বা ধারণা না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীর পক্ষে প্রথম ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্ভবপর নয়; এইরূপ প্রশ্নের অর্থই এই যে, বিজ্ঞানী তাহার কোন ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। কোপার্নিকাসের গবেষণা প্রথম প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্ন হইতে বুঝা যায়, বিজ্ঞানীর তৎপরতা তথ্য-নিরূপণের পর্যায়ে নিবদ্ধ; নির্দিষ্ট সমস্যার সহিত যেসব তথ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান সেই তথ্যসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কিমিয়াবিদ্ ও রাসায়নিকদের গবেষণা এই দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নের দৃষ্টান্ত। এই শেষোক্ত ধরনের প্রশ্নের গুরুত্বই বেকনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রকৃতির বিশেষ কোন ব্যবহার ও নীতিকে আবিষ্কার করিতে হইলে সেই সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে আগে সম্যকরূপে জানিতে হইবে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলিই অজ্ঞাত। তাই বিজ্ঞানীর প্রাথমিক কর্তব্য এই তথ্যগুলিকে যথাযথ নিরূপণ করা, ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা, ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো ইত্যাদি। এইভাবে অগ্রসর হইলে আপনা হইতেই প্রকৃতির নিয়ম ও নীতিগুলি আত্মপ্রকাশ করিবে।

বেকনের বিরুদ্ধ সমালোচকগণ এই পদ্ধতিকে নিছক প্রয়োগবাদেরই (empiricism) নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কেবল তথ্যের পাহাড়ই সৃষ্টি করা যায় কিন্তু প্রকৃতির রহস্যের আসল কিনারা সম্ভবপর কিনা সন্দেহজনক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রায়োগিক পদ্ধতির দুর্বলতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বেকন কেবল এই পদ্ধতিরই জয়গান করিয়া

গিয়াছেন, একথা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে তাঁহার একটি বচন (*Novum Organum*, Book I) প্রণিধানযোগ্য। "পিপীলিকা কেবল সংগ্রহ করিয়াই যায়; মাকড়সা একই জিনিসের অনবরত জাল বোনে; কিন্তু মৌমাছির কাজ এই দুই-এর মাঝামাঝি,—সে ফুল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে মধুতে পরিণত করে। প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাজ অনেকটা এই মৌমাছির মত।" বেকন বিজ্ঞানীদের প্রধান দুই দলে ভাগ করিয়াছিলেন;—প্রথম দলের কাজ হইবে তথ্য সংগ্রহ করা, দ্বিতীয় দলের চেষ্টা হইবে সেইসব তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই দুই দলের মিলিত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার সম্ভবপর। জ্যোতিষে ও পদার্থবিদ্যায় বেকনের পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হইলেও রসায়ন, ভূবিদ্যা, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে তাঁহার পদ্ধতি যে সহায়ক হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেখানে তথ্য সংগ্রহের, নূতন তথ্য আবিষ্কারের এবং তাহাদের বিচার-বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এবং এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন সাধারণ নীতি বা সত্যের আবিষ্কার সম্ভবপর হয় নাই। ডাঃ হল লিখিয়াছেন,

> "This is most clearly true of the biological sciences; no Galileo could have defined the strategic ideas of geology or physiology which only emerged from the wider and deeper knowledge of facts obtained in the nineteenth century. Bacon's advice that solid facts, certified by experiment, should be collected and recorded was sound and practical; this task occupied chemistry and biology till towards the end of the next century."*

তারপর তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা সম্পাদনের ব্যাপারে তাঁহার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পূর্বপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার আলোচনা করিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীদের খেয়াল-খুসী মত পরীক্ষা সম্পাদনের দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি যে সম্ভবপর নয় তাহা তিনি জোরের সহিত বলিয়াছেন। এই কাজে বিজ্ঞানীদের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন এবং মিলিতভাবে সুপরিকল্পিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদি গ্রহণ করা উচিত। *New Atlantis*-এর Solomon's House ইহারই ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য, উত্তর কালে রয়্যাল সোসাইটির পরিকল্পনা ও স্থাপনা বেকনের এজাতীয় চিন্তাধারার এক সার্থক পরিণতি।

বেকন জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। তাঁহার মতে জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান লাভের দ্বারা মানুষ যে শক্তি অর্জন করে একমাত্র তাহার দ্বারাই প্রকৃতির উপর তাহার কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। মানুষকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে বিজ্ঞানের এই বিরাট অংশ গ্রহণের কথা বেকনের পূর্বে আরও অনেকে বলিয়াছিলেন; বেকন পুনর্বার আরও জোরাল ভাষায় তাহা প্রচার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে এক নূতন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণে এই পদ্ধতির আলোচনায় রেণে দেকার্ত বেকনের প্রায় বিপরীত পথ অনুসরণ করেন। সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ ও বিভিন্ন বিদ্যার্জনের পর দেকার্তের মনে হয়, তিনি যতই পড়িতেছেন ততই সর্ব বিষয়ে তাঁহার সংশয় ও সন্দেহ যেন বাড়িয়া যাইতেছে এবং নিজের অজ্ঞানতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলেন এই শাস্ত্রের সব কিছুই বিতর্কমূলক ও অনিশ্চিত; সুতরাং এরূপ বিতর্কমূলক ও অনিশ্চিত বিষয় হইতে

* A. R. Hall, *The Scientific Revolution, 1500-1800*, Longmans. 1954; p. 167.

বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। কেবল গণিতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। দেকার্ত বলিতেন, একমাত্র গাণিতিক ধারণাগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রণিধান করা সম্ভবপর; এজন্য গাণিতিক বিশ্লেষণে যেসব সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। তিনি নিজে একজন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ ছিলেন। বীজগণিত ও জ্যামিতির সমন্বয় সাধন করিয়া তিনি গণিতের যে নূতন বিভাগ 'কো-অর্ডিনেট জ্যামিতি' আবিষ্কার করেন তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। পূর্বে যেসব সমস্যার গাণিতিক রূপদান সম্ভবপর ছিল না কো-অর্ডিনেট জ্যামিতির কল্যাণে এখন তাহা সুসাধ্য হইল। দেকার্ত নিজে ইহার প্রয়োগের দ্বারা পদার্থবিদ্যার বিশেষতঃ আলোক সংক্রান্ত বহু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয় করিয়া কো-অর্ডিনেট জ্যামিতির বিপুল সম্ভাবনা প্রমাণ করেন।

কিন্তু আসল প্রশ্ন,—প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য কিভাবে প্রতিভাত হয়? এই সত্য উপলব্ধির প্রশ্ন সম্বন্ধে প্লেটো-অ্যারিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু বিচক্ষণ দার্শনিক চিন্তা করিয়াছেন। দেকার্তও এবিষয়ে একাদিক্রমে দীর্ঘ বার বৎসর চিন্তা করেন। এই দীর্ঘ চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেই *Discourse de la Méthode* বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। ইহা কোন সুবৃহৎ গ্রন্থ নহে, একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। দুই শত বৎসর যাবৎ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রভাব ইউরোপীয় চিন্তাজগতের সর্বত্র গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

দেকার্ত তাঁহার সত্য উপলব্ধি মাত্র অল্প কয়েকটি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন,—'cogito, ergo sum' (I think, therefore I am),—'আমি চিন্তা করি, তাই আমি।' তিনি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি বলিতে যে বস্তুকে বুঝা যায় তাহা আসলে হইতেছে আমার চিন্তাশক্তি; ইহার (চিন্তাশক্তির) অস্তিত্বের জন্য কোন স্থানের প্রয়োজন নাই, এমন কি কোন পার্থিব বস্তুর উপরও ইহা নির্ভরশীল নহে। সুতরাং 'আমি'—অর্থাৎ মন যাহার জন্য আমার আমিত্ব, দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এই মনকে দেহ অপেক্ষা অনেক সহজে জানা যায়; এজন্য দেহ না থাকিলেও মন তাহার সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া বজায় থাকিতে পারে।" ইহার পর দেকার্তের কথা হইল, এই মনই যখন সর্বস্ব তখন মন যাহা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে তাহাই সত্য। অবশ্য মনও সম্পূর্ণ ত্রুটীহীন নয়; এজন্য দেকার্তের ধারণায় মনের ঊর্ধ্বেও ত্রুটীহীন ও অনন্ত এক সত্তা বিদ্যমান। এই সত্তা হইতে যেসব ধারণা উৎসারিত হয় তাহাই সত্য। দেকার্ত এই সত্তাকেই ভগবান বলিয়াছেন। ইহাই সকল জ্ঞানের উৎস; মন তাহার যুক্তি দিয়া এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে। তাঁহার নিজের কথায়, "আমি আমার এই ধারণায় শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রহিয়াছি।..পূর্বে জ্যামিতিবিশারদগণ যেভাবে প্রশ্নের সমাধান দিতেন তাহা অপেক্ষাও পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মন কোন বিষয় প্রণিধান করিতে না পারিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না। আমি নির্ভয়ে বলিতেছি, এই উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি সবগুলি প্রধান সমস্যার সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে, আমি দেখিয়াছি প্রকৃতিতে ভগবান কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের মনের উপরও তিনি তাহার দাগ কাটিয়া দিয়াছেন; উত্তমরূপে চিন্তা করিলে নিঃসন্দেহে দেখিতে পাইব, এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুই সংঘটিত হয় তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই নিয়ম ও নীতিগুলি প্রকাশমান।"

দেকার্তের এইরূপ চিন্তাধারা প্লেটো-অ্যারিষ্টটলের ধারণার প্রায় পুনরাবৃত্তি। তিনি নিজে অবশ্য প্লেটো, অ্যারিষ্টটল ও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের দার্শনিক চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মন ও শুদ্ধবুদ্ধির উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপের ফলে শেষ পর্যন্ত দেকার্তের দর্শন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের মতই নিষ্ফল হইয়াছিল। দেকার্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই; আলোকবিদ্যার ও পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বিভাগে তিনি নিজে কয়েকটি অতি মৌলিক পরীক্ষা সাফল্যের সহিত

সম্পাদন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য দক্ষতা ক্রিশ্চিয়ান হাইজেন্‌স্‌ ও অপরাপর বিজ্ঞানীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে পরীক্ষার স্থান ছিল গৌণ। যুক্তি ও শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বস্তুর ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবে মাঝে মাঝে তাহা পরীক্ষার দ্বারাও দেখানো যায় বটে, তবে ইহা দেখাইতে না পারিলেও ক্ষতি নাই, কারণ এমন অনেক সত্য আছে যাহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। ব্রহ্মাণ্ডের গতি ও পদার্থের বিবিধ ধর্ম ব্যাখ্যাকল্পে দেকার্ত যে এক অতীন্দ্রিয় ঘূর্ণাবর্তের (vortices) কল্পনা করেন তাহার অস্তিত্বকে কোন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সত্য, কারণ মন এইরূপ ঘূর্ণাবর্তকে অতি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে প্রণিধান করিতে পারে।

গ্যালিলিওকে অনেকটা বেকন ও দেকার্তের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করিতে দেখা যায়। তিনি তাঁহার পদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছু লিখিয়া যান নাই। জ্যোতিষ ও বলবিদ্যার উপর তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয় *Dialogues* ও *Discourses* কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। তথাপি তাঁহার আলোচনার ধারা ও নানা মন্তব্য হইতে তিনি কিভাবে সমস্যা বিশেষের সমাধানে অগ্রসর হইতেন তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়ায় বেকন ও দেকার্তের পদ্ধতি যেমন ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ও আলোচনার খোরাক যোগাইয়াছিল গ্যালিলিওর পদ্ধতি সম্বন্ধে সেইরূপ কিছুই বলা যায় না; কিন্তু নির্দিষ্ট বিজ্ঞানী মহলে বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার পদ্ধতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক সমস্যা সম্বন্ধে বিমূর্তভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা গ্যালিলিও প্রথম হইতেই উপলব্ধি করেন। গণিত এইরূপ বিমূর্ত চিন্তার ও বিশ্লেষণের এক অতি শক্তিশালী সহায়। এজন্য বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন বিশেষকে কিভাবে গণিতের কাঠামোর মধ্যে ফেলা যায় ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম ও প্রধান প্রয়াস। গ্যালিলিও জানিতেন, স্থূলে অভিজ্ঞতা হইতে যেসব সমস্যা হাতে আসে তাহা নানা ত্রুটী, অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ থাকে। ইহাকে গাণিতিক বিশ্লেষণের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে প্রয়োজনমত প্রধান সর্তগুলিকে সহজ ও সরল করিয়া লইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক, একটি দোলকের দোলন-গতির নীতি ও নিয়ম বাহির করিতে হইবে। দড়ির এক প্রান্তে একটি ওজন চাপাইয়া যে ধরনের দোলকের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে ঠিক সেইরূপ এক দোলকের দোলন-গতি নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। এমত ক্ষেত্রে গ্যালিলিও কল্পনা করিলেন এমন এক আদর্শ দোলক যাহার দড়ি একটি জ্যামিতিক রেখার মত সূক্ষ্ম ও ওজনহীন এবং প্রান্তভাগের ওজনটি একটি বিন্দুতে পর্যবসিত। শুধু তাহাই নহে, ইহা এমন একটি স্থানে দুলিতেছে যেখানে বাতাসের বা অন্য কিছুর বাধা দোলকটির দোলনে এতটুকু ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এরূপ এক আদর্শ দোলক কল্পনা করিবার পর গ্যালিলিও অতি সহজে গণিতেব সাহায্যে ইহার গতির নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য কষিয়া বাহির করিলেন। একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর একটি গোলকের গতি নির্ণয় করিতে হইবে। বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ নিখুঁত সমতল ক্ষেত্রের অথবা নিখুঁত গোলকের অস্তিত্ব অসম্ভব; এখানে কল্পনা করিতে হইবে সম্পূর্ণ নিখুঁত এমন এক সমতল ক্ষেত্র যাহার উপর দিয়া ততোধিক সম্পূর্ণ এক জ্যামিতিক গোলক বিনা বাধায় প্রয়োজন হইলে অনন্তকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিতে পারে। এইরূপ বিমূর্তনের পরই গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর। প্রাকৃতিক সমস্যাগুলিকে এইভাবে দেখিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাবলেই গ্যালিলিও তাঁহার জ্যোতিষ ও বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এইভাবে বস্তুর আদর্শ রূপ, ধর্ম বা ব্যবহার কল্পনা করিয়া যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় তাহা কতদূর সত্য, ইহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? একমাত্র পরীক্ষার দ্বারা ইহার মীমাংসা সম্ভবপর। নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্ত অনুযায়ী উপরিউক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা যদি দেখা যায় যে, A ঘটনা হইতে B ঘটনাটি ঘটিতেছে, তাহা

হইলে A ঘটনার অনুকূল অবস্থা হুবহু সৃষ্টি করিয়া বাস্তবিকই B ঘটনাটি ঘটে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হইল। পড়ন্ত বস্তুর গতি ত্বরিত হয়, এইরূপ ধারণা হইতে গ্যালিলিও কষিয়া দেখাইলেন যে, ১ সেকেণ্ডে পড়ন্ত বস্তু যে দূরত্ব নামিয়া আসে ২ সেকেণ্ডে তাহার নামিয়া আসা উচিত ইহার ৪ গুণ দূরত্ব, ৩ সেকেণ্ডে ৯ গুণ দূরত্ব ইত্যাদি (পৃঃ ৩৫৩)। পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এইরূপ হয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নত সমতলের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পরীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণের অর্থই এই যে, বস্তুর ত্বরণ সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান সর্বৈব সত্য। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হইতেছে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা। তত্ত্বীয় জিজ্ঞাসা হইতে আপনা হইতেই এই ধরনের পরীক্ষার উদ্ভব হয়। পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেকনের সহিত গ্যালিলিওর মতের এইখানেই প্রধান প্রভেদ। বেকনের ধারণায় কেবলমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই জ্ঞানার্জন ও সত্য-নিরূপণ সম্ভবপর; গ্যালিলিও মনে করিতেন, কোন মতবাদ বা সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচারের জন্য পরীক্ষার একটা প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহাই সত্য-নিরূপণের একমাত্র পন্থা নহে। এইখানে দেকার্তের সহিত গ্যালিলিওর মিল লক্ষণীয়।

যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা আলোচনা করিলাম তাহার কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অভ্রান্ত নহে এবং হইতেও পারে না। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োগেই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। নূতন জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে বেকন, দেকার্ত ও গ্যালিলিও নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে যেসব পদ্ধতির অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মিলিত প্রয়োগের দ্বারাই যে আধুনিক বিজ্ঞানের কলেবর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী

প্রথম খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় যে গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জীতে দ্বিতীয়বার উল্লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত বিষয়বস্তুর বহু উপকরণ অবশ্য প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে; এজন্য পাঠকগণকে উভয় খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জী দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। বিশেষতঃ Bernal, *Science in History*, Berry, *A Short History of Astronomy*, Burgess, *Surya Siddhanta*, Cajori, *A Short History of Mathematics*, Datta & Singha, *History of Hindu Mathematics*, Ray (P. C.), *History of Hindu Chemistry*, Sarton, *Introduction to the History of Science*, (all vols.), Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, Singer, *A Short History of Medicine*, *A Short History of Biology* গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য। তারকাচিহ্নিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ফুটনোট হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

* ACHARYA, P. K., 'University Life in Ancient India', *Science & Culture*, December 1935.
* AGRICOLA, GEORGIUS, *De re metallica*, Eng. trans. by H. C. Hoover and L. H. Hoover, Dover Publications, New York, 1950 ; first published, London 1912.
* ALLBUTT, T. C., *The Historical Relations of Medicine and Surgery to the End of the Sixteenth Century*, London, 1905.
* ALTEKAR, A. S., *Education in Ancient India*, Benaras, 1934.

ARMITAGE, A., *Copernicus*, London, 1938 ; *A Century of Astronomy*, London, 1950.

* ARNOLD, T. AND GUILLAUME, A. (eds.), *The Legacy of Islam*, Oxford, 1931.
* আকবর আলি, এম., বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, কলিকাতা, ১৯৪৩।

* BAGCHI, P. C., *India and China*, China Press Limited, 1944.

BAUR, L., 'Die Philosophie des Robert Grosseteste', *in Beiträge zur Geschichte des Mittelalters*, vol. 18, Heft 4-6, 1917.

* BERTHELOT, M., *La chimie au moyen âge* (vol. 3, L'alchimie arabe), Paris, 1893.
* BEVAN, E. R., 'India in Early Greek and Latin Literature,' *The Cambridge History of India*, vol. 1, 1922.

BEVERIDGE, W. I. B., *The Art of Scientific Investigation*, London, 1950.

BLOCH, M., *La Société Féodale*, Paris, 1949.

* BRIDGES, J. H. (ed.), *Opus majus* of Roger Bacon, Oxford, 1897 ; *The Life and Work of Roger Bacon*, London, 1914.

BROWNE, E. G., *Arabian Medicine*, Cambridge, 1921.

BURCHARDT, J., *The Civilization of the Renaissance in Italy*, London, 1937.

* CARRA DE VAUX, 'Astronomy and Mathematics', *The Legacy of Islam*, Oxford, 1931.

CARTER, T. C., *Invention of Printing in China*, 1925.

* CHARPENTIER, JARL, 'The History of the Jains', *The Cambridge History of India*, vol. I, 1922.

CLARK, G. N., *The Seventeenth Century*, Oxford, 1929.

* CLARK, W. E., *The Āryabhaṭīya of Āryabhata*, Chicago, 1930.

COHEN, I. B., 'Galileo', *Scientific American*, August, 1949.

COHEN, M. R. AND NAGEL, E., *An Introduction to Logic and Scientific Method*, London, 1934.

* CRACROFT, W., 'Smelting of Iron in the Kasya Hills', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. 1, 1832.

CROMBIE, A. C., 'Galileo's "Dialogues concerning the two Principal Systems of the World", *Dominican Studies*, vol. 3, 1950 ; *Augustine to Galileo*, William Heinemann Ltd., London, 1952 ; *Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science*, Oxford, 1953.

DINGLE, H., 'Copernicus's Work', *Polish Science and Learning*, June, 1943 ; 'Nicolaus Copernicus', *Endeavour*, October, 1943 ; 'Tycho Brahe', *Endeavour*, vol. 5, 1946.

DREYER, J. L. E., 'Mediaeval Astronomy', *Studies in the History and Method of Science*, (ed.) Charles Singer, vol. 2, Oxford, 1921.

DUHEM, P., *Etudes sur Léonard de Vinci*, 2e serie, Paris, 1909.

DURAND, D. B. 'Nicole Oresme and mediaeval origins of modern science', *Speculum*, vol. 16, 1941.

EDDINGTON, A. S., *The Philosophy of Physical Science*, Cambridge, 1939.

* EHRENBERG, RICHARD, *Capital and Finance in the Age of Renaissance*, Eng. trans. by H. M. Lucas, 1928.

FAHIE, J. J., *Galileo, His Life and Works, London*, 1903.

FARRINGTON, B., *Francis Bacon, Philosopher of Industrial Science*, Schuman, 1949.

FELDHAUS, F. M., *Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvolker*, Leipzig and Berlin, 1914. *Die Technik der Antike und des Mittelalters*, Postdam, 1931.

GADE, J. A., *The Life and Times of Tycho Brahe*, Princeton, 1947.

GANDZ, S., 'Sources of Al-Khowārizmi's Algebra', *Osiris*, vol. I.

GARREAU, A., *Saint Albert le Grand*, Paris, 1932.

GAUTHIER, L., *Ibn Rochd* (Averroès), Paris, 1948.

GILSON, E., *La Philosophie au moyen âge*, Paris, 1947.

GRINZBURG, B., 'Scientific Value of the Copernican Induction', *Osiris*, vol. I.

GUMPERT, MARTIN, 'Vesalius: Discoverer of the Human Body', *Scientific American*, May, 1948.

GUTHRIE, D., *A History of Medicine*, Edinburgh, 1945.

* HALL, A. R., *The Scientific Revolution, 1500-1800*, Longmans, 1954.

HASKINS, C. H., *Studies in the History of Medieval Science*, Cambridge, Mass., 1927 ; *The Renaissance of the Twelfth Century*, Cambridge, Mass, 1928.

* HOERNLÉ, A. F. RUDOLF (ed.), *The Bower Manuscript*, Archaeological Survey of India.

* HOLMYARD, E. J., 'Jabir ibn Hayyān', *Proc. Roy. Soc. Medicine*, vol. 16, 1923 ; *The Identity of Geber*', *Nature*, vol. 111, No. 2780, 1923 ; *Makers of Chemistry*, Oxford, 1931.

HOPSTOCK, H., 'Leonardo as Anatomist', Eng. trans. from Norwegian by E. A. Fleming, *Studies in the History and Method of Science*, (ed.) Charles Singer, vol. 2, Oxford, 1921.

* HUDSON, G. F., *Europe and China—a Survey of their Relations from the Earliest Times to 1800*, Arnold, 1931.

HUDSON, W. H., *The Story of the Renaissance*, George H. Harrap & Co., 1912.

* JEBB, SAMUEL (ed.), *Opus majus*, London, 1733.
JOHNSON, F. R., *Astronomical Thought in Renaissance England*, Baltimore, 1937.

KAYE, G. R., 'Indian Mathematics', *Isis*, vol. 2; *The Bākhshālī Manuscript* (ed.), Archaeological Survey of India, 1927.
* KEITH, ARTHUR B., *Indian Logic and Atomism—an Exposition of the Nyāya Vaiçesika Systems*, Oxford, 1921.
* KEPLER, J., *Astronomica Nova*, ed. C. Frisch, Frankfort.
KILGOUR, F. G., 'William Harvey', *Scientific American*, June, 1952.
* KRISHNAN, M. S., *Iron Ores of India*, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta, 1955.

* LEFEBVRE DE NOËTTES, *L'Attelage: Le Cheval de selle à travers les âges*, Paris, 1931.
* LEICESTER, HENRY M. AND KLICKSTEIN, HERBERT S., *A Source Book in Chemistry (1400-1900)*, McGraw Hill, 1952.
* LIEBMANN, A. J., 'History of Distillation', *Journal of Chemical Education*, April, 1956.
LILLEY, S., *Men, Machines and History*, London, 1948.
* LITTLE, A. G. (ed.), *Roger Bacon Commemoration Essays*, Oxford, 1914.
* LODGE, OLIVER, *Pioneers of Science*, Macmillan, 1910.

* MACDONALD, GEORGE, 'The Hellenic Kingdoms of Syria, Bactria and Parthia', *The Cambridge History of India*, vol. I, 1922.
MACKINNY, L. C., *Early Medieval Medicine*, Baltimore, 1937.
* MAJUMDER, RAYCHAUDHURI AND DATTA, *An Advanced History of India*, Macmillan, 1946.
* MASON, STEPHEN S., *Main Currents of Scientific Thought*, Schuman, 1957.
* McCRINDLE, J. W., *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*, being a translation of *Periplus Maris Erythraei* and of Arrean's Account of the Voyages of Nearkhos, Thacker, Spink and Co., Calcutta, 1879.
* McCURDY, EDWARD, *Leonardo da Vinci's Note Books, arranged and rendered into English*, 1906.
MIELI, A., *La Science Arabe*, Leyden, 1938.
MILHAUD, G., *Descartes Savant*, Paris, 1921.
MOODY, E. A., *The Logic of William Ockham*, New York, 1935.
* MOOKERJI, RADHA KUMUD, *Ancient Indian Education*, Macmillan, 1951.
* MUMFORD, LEWIS, *Technics and Civilization*, George Routledge, 1934.

* NAUDE, GABRIEL, *Apologie pour tous les grands personages qui ont eté faussement soupçonnez de Magie*, Paris, 1625.
* NEEDHAM, JOSEPH, *Science and Civilisation in China*, vol. I, Cambridge University Press, 1954.
* NEOGI, PANCHANAN, *Copper in Ancient India*, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta, 1918.

PAGEL, WALTER, 'J. B. van Helmont', *Osiris*, vol. 8; 'William Harvey and the Purpose of the Circulation', *Isis*, vol. 42.
PIRENNE, H., *Economic and Social History of Medieval Europe*, London, 1936; *A History of Europe from the Invasion to the Sixteenth Century*, London, 1939.

PLEDGE, H. T., *Science Since 1500*, London, 1939.

* POUCHET, F. A., *Histoire des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le grand et son époque consideré comme point de depart de l'ecole experimental*, Paris, 1853.

POWER, D'ARCY, *William Harvey*, London, 1897.

RANDALL, J. H. (Jr.), *The Renaissance Philosophy of Man*, Chicago, 1948.

* RASHDALL, HASTINGS, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, in 3 vols., Oxford, 1895, reprinted 1936.

* RAY, P. (ed.), *History of Chemistry in Ancient and Medieval India*, Indian Chemical Society, Calcutta, 1955.

RAY, P. C., 'Chemical Knowledge of the Hindus', *Isis*, vol. 2.

READ, J., *Prelude to Chemistry*, London, 1936; 'Alchemy and Alchemists', *Scientific American*, October, 1952.

* RICHTER, IRMA A. (ed.), *Selections from the Note books of Leonardo da Vinci*, Oxford, 1952.

RIESEMAN, E., *The Story of Medicine in the Middle Ages*, Oxford, 1928.

ROSEN, EDWARD, 'The Commentariolus of Copernicus', *Osiris*, vol. 3.

ROSEN, F. (ed. and Eng. trans.), *The Algebra of Muhammed Ben Musa (al-Khwarizimi)*, 1831.

ROUSE BALL, W. W., *A Short Account of the History of Mathematics*, London, 1901.

* RUSKA, JULIUS, *Arabische Alchemisten*, 2 vols., Heidelberg, 1924.

* রায়, যোগেশচন্দ্র, আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী, কলিকাতা।

* SACHAU, EDWARD C., *Alberuni's India*, in 2 vols, Kegan Paul, 1910.

* SAHA, M. N. AND LAHIRI, N. C., 'History of the Calendar in different countries through the Ages', *Report of the Calendar Reform Committee*, Part C., 1955.

SCOTT, J. F., *The Scientific Work of René Descartes*, London, 1952.

* SEN GUPTA, P. C., 'Hindu Astronomy', *The Cultural Heritage of India*, vol. 3, Belur Math; 'Āryabhata's Lost Works', *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 23, 2 & 3.

SINGER, C., *The Earliest Chemical Industry*, London, 1949; *The Discovery of the Circulation of the Blood*, London, 1922; *The Evolution of Anatomy*, London, 1926.

* SMITH, CYRIL STANLEY AND GNUDI, MARTHA TEACH, *The Pirotechnia of Vannucio Birringuccio* (Eng. trans.), American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, New York, 1942.

SMITH, D. E., 'The Geometry of the Hindus', *Isis*, vol. 1.

* STAPLETON, H. E., AZO, R. F. AND HIDĀYAT HUSAIN, M., Chemistry in Iraq and Persia in the Tenth Century A.D.', and 'Ar-Rāzī's Al-Madkhal At-ta'limi or Instructive Introduction', *Memoires of the Asiatic Society of Bengal*, vol. 8, No. 6, 1927.

STEELE, ROBERT, 'Roger Bacon and the state of Science in the Thirteenth Century', *Studies in the History and Method of Science*, (ed.) Charles Singer, Oxford, 1921.

* SUTER, H., *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke*, 1900.

* সেন, গণনাথ, আয়ুর্বেদ পরিচয়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

* সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ (বাং)।

* স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত, বেলুড় মঠ, ১৯০৯।

TAYLOR, F. SHERWOOD, *Galileo and the Freedom of Thought*, London, 1938.

THOMPSON, S. P., 'Petrus Peregrinus de Maricourt and his Epistola de Magnete', *Proceedings of the British Academy*, vol. 2, 1905-6.

THOMSON, S. Harrison, 'The Text of Michael Scott's Ars Alchemie', *Osiris*, vol. 5.

THORNDIKE, LYNN, *Science and Thought in the 15th Century*, New York, 1929.

URANOVIC, DANIEL, 'Indian Prelude to European Mathematics', *Osiris*, vol. 1.

* USHER, A. P., *A History of Mechanical Inventions* (revised edition), Harvard, 1954.

* VIRARAGHAVA IYER, K. C., 'The Study of Alchemy', *Acharyya Ray Commemoration Volume*, Calcutta, 1932.

WALSH, J. J., Medieval Medicine, London, 1920.

* WHETHAM, W. C. D. and M. D., *Readings in the Literature of Science*, Cambridge, 1924.

WIENER, P. P., 'The Tradition behind Galileo's Methodology', *Osiris*, vol. 1.

* WILLIAM JACKSON, A. V., 'The Persian Dominions in Northern India down to the time of Alexander's invasion', *The Cambridge History of India*, vol. 1, 1922.

* WINTER, H. J. J., 'The Arabic Achievement in Physics', *Endeavour*, April, 1950; 'Muslim Tradition in Astronomy', *Endeavour*, July, 1951; *Eastern Science*, London, 1952.

* WINTERNITZ, M., *A History of Indian Literature*.

* WOLF, A., *A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries*, London, 1935.

নির্ঘণ্ট

বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রাগৈতিহাসিক কাল—ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ

বিজ্ঞানের অর্থ, বিজ্ঞান ও সমাজ, বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতা। মানুষের আবির্ভাব ও প্রাচীনত্ব; প্রাগৈতিহাসিক যুগের তৎপরতা ও আবিষ্কার; ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার। ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ; লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার; গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যার আদি ইতিহাস; প্রাচীন বিজ্ঞানের অবসান ও কারণ।

গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান

গ্রীক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য; আয়োনীয় দার্শনিকগণ; পিথাগোরীয় বিজ্ঞান; আণবিক তত্ত্ব; গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান; আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উত্থান-পতন ও কারণ। এথেন্স, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল; গণিত, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন; একাডেমী ও লাইসিয়াম। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান—শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা, রসায়ন ও কিমিয়া।

রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান—প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা

রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য; গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, পূর্তবিদ্যা ও স্থপতি-বিজ্ঞান, ভূগোল; ল্যাটিন ইউরোপে অন্ধকার যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা; গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কারণ; সেই অধঃপতনে দাস-প্রথা, তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের দায়িত্ব।